প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

২৮তম পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল, 2017

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পাঠসংকলন প্রণীত হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পাঠ উপকরণ অবলম্বনে। ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আনুকূল্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

মূল সংকলনের লেখক, সম্পাদক, পরিকল্পনাকার প্রত্যেকের অবদান আমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি।

পাঠসংকলনের বর্তমান আকার দিতে বিশেষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ঃ

অনুসৃজন ঃ 1 পর্যায় এবং 2	**সম্পাদনা**
অধ্যাপক ভোলানাথ ব্যানার্জী	অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী
অধ্যাপক দীপঙ্কর সিনহা	অধ্যাপক স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ড. পঞ্চানন চ্যাটার্জী	

অনুসৃজন ঃ পর্যায় 1 এবং 2	**সম্পাদনা**
অধ্যাপিকা মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক কে. এল. চট্টোপাধ্যায়	ড. সুকুমার সেন
অধ্যাপিকা পৃথা লাহিড়ী	
অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ দত্ত	

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এফ. এইচ. এস. - 1, 2, 3 & 4

মানববিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিমূলক পাঠক্রম

পর্যায় 1 এবং 2

কলা ও সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক পাঠ

মানুষ ও সমাজবিকাশ ঃ একটি দৃষ্টিকোণ

একক 1	মানুষ সম্পর্কে অধ্যয়নের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ	1
একক 2	যন্ত্রনির্মাণ ও যন্ত্র ব্যবহারকারী জীব হিসেবে মানুষ	15
একক 3	চিন্তাশীল জীব হিসেবে মানুষ	32
একক 4	সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তন	53
সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায়		70
একক 5	গৃহপালিত পশু ও কৃষির সূচনা	72
একক 6	নদীভিত্তিক সভ্যতা	87
একক 7	সামন্ততান্ত্রিক সমাজ	111
একক 8	নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার	130
একক 9	শিল্প বিপ্লব	161
পর্যায় 3 এবং 4		179
একক 10	ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ঃ প্রাক্ ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক	181
একক 11	জাতীয় আন্দোলন - 1	199
একক 12	জাতীয় আন্দোলন - 2	222
একক 13	ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল্যবোধ	248
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাবলী		262
একক 14	উন্নয়ন-লক্ষ্য ও বিচারবস্তু	263
একক 15	পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা	281
একক 16	পরিকল্পনার কৌশলসমূহ - 1	297
একক 17	পরিকল্পনার কৌশলসমূহ - 2	320
একক 18	জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন	339

পর্যায় 1 এবং 2

কলা ও সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক পাঠ

পাঠ সম্পর্কে ভূমিকা

কলা ও সমাজবিজ্ঞানসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবিজ্ঞানীর মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও ঐতিহাসিক আগ্রহ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এই উপাদানগুলি বিদ্যাশিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা ও তত্ত্বকেও প্রভাবিত করে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের তুলনায় সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও সমাজ পর্যালোচনার হাতিয়ার নির্মাণে সামাজিক উপাদানগুলিই বেশী প্রভাবশালী। ভারতীয় সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং সমাজতাত্ত্বিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্যি। বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে ভারতীয় সমাজের বিবর্তন ঘটেছে। প্রস্তরযুগ থেকে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মহান প্রাচীন সভ্যতা পর্যন্ত, অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুধ্বে অনন্য সংগ্রাম সবই এই বিবর্তনের পিছনে অবদান রেখেছে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলিকেই পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

কলা ও সমাজবিজ্ঞানের এই মৌলিক পাঠে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আপনি পাবেন তা পরিপ্রেক্ষিত, ধারণাগত কাঠামো এবং প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলোর বিশদ আলোচনার মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেছে।

এই পাঠক্রমের বিভিন্ন শাখা যেভাবে সংগঠিত করা হয়েছে তার মধ্যেই আপনি এটি লক্ষ করতে পারবেন। এখানে আপনাকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাবলী সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয় ভারতে সমাজ পরিবর্তনের বিবর্তন, বিকাশ বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যাই হোক্ না কেন, আপনি দেখবেন যে, এগুলিকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়া হিসেবে দেখলেই তাদের আরো ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে। একই রকম আগ্রহের প্রতিফলন ঘটেছে পর্যায় ১-এর ধারণা, তত্ত্ব ও পদ্ধতির আলোচনায়। এই পর্যায়-এর আলোচ্য বিষয় হল মানুষের বিবর্তনের সার্বজনীন প্রক্রিয়া। এরপর আমরা ইতিহাস পাঠের বিশেষ বিশেষ এলাকার দিকে অগ্রসর হব। তাদের আলোচ্য বিষয় হল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মহান নদীউপত্যকার সভ্যতাসমূহ পর্যন্ত এবং সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্র থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমাজসহ আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের উত্থান পর্যন্ত সমাজ ও সংস্কৃতির প্রধান প্রধান ধাপ। এগুলি হল এই পাঠক্রমের পর্যায় ২-এর আলোচ্য বিষয়।

মানবসভ্যতার বিবর্তনের সার্বজনীন প্রক্রিয়াসমূহের সঙ্গে জড়িত সমস্যাবলী অনুধাবনের পর আমরা আপনাকে আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রের সামাজিক পরিবর্তনের বিশেষ পাঠ দেব। এর বিষয়বস্তু হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উদ্ভব এবং জাতীয় আন্দোলন। পর্যায় ৩-এ আপনি এ বিষয়ে পাঠ নেবেন। এর পরে আসবে পর্যায়-৪, যেখানে স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের বিশ্লেষণ করা হবে। এই পরিবর্তনগুলি অবশ্যই নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছে; কিন্তু একই সঙ্গে সমাজে নতুন নতুন সংকট ও দ্বন্দ্বেরও জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, জাতপাত, উপজাতি, অঞ্চল, ভাষা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সংকট দেখা দিয়েছে। জাতীয় সংহতির এইসব সমস্যা নিয়ে পর্যায় ৫-এ আলোচনা করা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল তার সামাজিক শক্তিগুলিকে একটি জাতি-রাষ্ট্রে সুসংহত করা। ভারতের সংবিধান যদিও জাতি-রাষ্ট্রের মান নির্ধারণ করেছে তথাপি কিছু কিছু বিচ্যুতিও রয়ে গেছে। নানা ক্ষেত্রে সংবিধান কার্যকর করার প্রক্রিয়া থেকেই এই বিচ্যুতিগুলি দেখা দেয়, যেমন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির সঙ্গে মৌলিক অধিকারগুলির সম্পর্ক ইত্যাদি। সংবিধানের মৌলিক উদ্দেশ্য ও নির্দেশিকা রূপায়ণের সমস্যা হল পর্যায় ৬-এর আলোচ্য বিষয়।

ভারতের সাংবিধানিক দায় পূরণের হাতিয়ার হল পরিকল্পনা-প্রক্রিয়া। সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর-সাধন করাই এর উদ্দেশ্য। পর্যায় ৭-এ এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এটা অবশ্য স্বীকার করা হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে এসেছে। এর ফলে আমাদের জাতীয় সত্তার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন, পরিবেশ, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বিচার-বিবেচনার উপযোগী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাটাও আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ন্যায়সম্মত ও সুষম বিশ্ব-ব্যবস্থা ছাড়া আজ কোন জাতিই তার সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে এবং স্বাধীনতা-চর্চা বা সংহতিসাধন করতে পারে না। সমস্যার এই দিকটির পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে আমরা পর্যায় ৪-এ আলোচনা করেছি।

মানুষ ও সমাজবিকাশ ঃ একটি দৃষ্টিকোণ

কলাবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান শুধু আমাদের চারপাশের সামাজিক বাস্তবতাকে উপলব্ধির পদ্ধতি প্রদান করে না, মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে অর্ন্তদৃষ্টি সৃষ্টিতেও সাহায্য করে। পর্যায় ১-এর চারটি একক মানবসমস্যা পর্যালোচনার জন্য সমাজবৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু নির্বাচিত সমস্যা এবং সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিবিদ্যার সঙ্গে আপনার পরিচয় ঘটাবে। উপরন্তু যে সমস্ত বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবজাতির ঐতিহাসিক পরিক্রমা ঘটেছে তার সঙ্গেও এই এককগুলি আপনাকে পরিচিত করাবে।

একক ১-র বিষয়বস্তু হল মানবসংক্রান্ত বিদ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ। এই একক প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিত ও পদ্ধতিসমূহের মিশ্রণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়। মানবপ্রকৃতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছে। মানুষ অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে শুধু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অংশীদার নয়, তার সৃজনীক্ষমতার কল্যাণে প্রকৃতির সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক রূপান্তরের নায়কও বটে।

এরপর আসবে একক ২, ৩, ও ৪ যেখানে প্রকৃতিকে সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। একক ২-এর বিষয় হল ''যন্ত্র প্রস্তুতকারক ও ব্যবহারকারী জীব হিসেবে মানুষ''। মানুষের প্রযুক্তিগত ও সামাজিক সৃজনশীলতা, এবং প্রস্তরযুগ থেকে শুরু করে ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগ পার হয়ে সমসাময়িক পারমাণবিক ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির যুগ পর্যন্ত অগ্রগতির ইতিহাস সম্পর্কে এখানে পরিচয় ঘটানো হবে। এখানে প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হবে। কালক্রমে এইসব গুণাবলী কিভাবে সামাজিক শ্রেণীবিভাজন, সমাজসংগঠনের নতুন নতুন রূপ এবং মূল্যবোধের জন্ম দেয় তা আলোচনা করা হয়েছে একক ৪-এ, যার আলোচ্য বিষয় হল বিবর্তন ও সমাজপরিবর্তনের প্রক্রিয়া। ধারণা এবং বাস্তব ইতিহাসের কাঠামো হিসেবে সমাজপরিবর্তনের প্রাসঙ্গিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ এই এককেই দেওয়া হয়েছে।

মনুষ্য প্রজাতির পক্ষে এতসব সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে, তাদের চিন্তা করার এবং প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকেসহ প্রকৃতিকে জানার ক্ষমতার ফলে। ভাষার ব্যবহার এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করেছে। ২ ও ৪ নং এককের মধ্যে এই বিষয়টিরই আলোচনা করা হয়েছে। একক ৩-এ আলোচনা করা হয়েছে মানুষের চিন্তাশক্তির উৎপত্তি সম্পর্কে। তত্ত্ব নিয়ে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাশক্তি সৃষ্টিশীল পদক্ষেপ নেবার ফলে যে সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে জ্ঞানের উন্নতি ও পৃথকীকরণ হয় তাও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার মধ্যে বিভাজনের ফলে যে সমস্ত বিষয় আপনি এখন পাঠ করেন, অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি এই প্রক্রিয়ার ফলেই আবির্ভূত হয়েছে। জ্ঞানের পৃথকীকরণ অবশ্য পরবর্তীকালে তাদের পদ্ধতি ও ধারণার মধ্যে সংহতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। বাস্তবপক্ষে মূর্ত সমস্যাবলীর আরো গভীর ও বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিই এই প্রচেষ্টাকে অবধারিত করে তোলে। এই সম্পর্কে পাঠ্য বিষয়বস্তু দেওয়া ছাড়াও শ্রবণ ও দর্শনের কর্মসূচীও আপনাদের জন্য রাখার চেষ্টা করা হবে। ভবিষ্যতে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাদের পাওয়া যাবে।

একক ১ ❒ মানুষ সম্পর্কে অধ্যয়নের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের কেন্দ্রে মানুষ

১.২.১ চিন্তাপূর্ণ সমালোচনারূপে সমাজবিজ্ঞান

১.২.২ সৃজনীপ্রতিভারূপে মানুষ

১.২.৩. সহমর্মী চিন্তা হিসেবে বিজ্ঞান

১.৩ সমাজবিজ্ঞান প্রণালী

১.৩.১ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষকে বোঝা

১.৩.১ মানবজাতির অবস্থার সমালোচনা হিসাবে বিজ্ঞান

১.৪ কৌমগত পার্থক্য এবং মানবজাতির ঐক্য

১.৫ পক্ষপাতের সামাজিক উৎস ও বিভিন্ন রূপ

১.৫.১ বিজ্ঞানে পক্ষপাত

১৫.২ আঞ্চলিক পক্ষপাত

১.৬ জ্ঞান ও সমাজ

১.৭ সংস্কৃতির সার্বজনীনতা ও স্বাতন্ত্র্য

১.৭ সারাংশ

১.৮ শব্দগুচ্ছ

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ সমাপ্ত করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করতে পারবেন ঃ

মানুষ কেন সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের কেন্দ্রে রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রক্রিয়া কি।

মানুষ ও বিভিন্ন রকম সংস্কারের সামাজিক উৎস।

জ্ঞান ও সমাজের সংযোগ।

১.১ প্রস্তাবনা

সমাজতত্ত্ব, সামাজিক নৃতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞানের অন্য কোন বিষয়—সে যে বিষয়ই হোক না কেন, কলাবিদ্যার বিভিন্ন শাখার মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি? এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'ল এটাই যে, কোনও-না-

কোনও সময় তাদের সকলকেই মানুষ তাদের কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গণ্য করতে হয়। আলোচ্য বিষয় হিসেবে মানুষের এই কেন্দ্রীয় গুরুত্বই সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি বা প্রকৃতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়কে একত্রে ঐক্যবন্ধ করে। এই সমস্ত শাস্ত্র বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও পন্ধতি অনুসরণ করলেও তাদের সকলেরই সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু হল মানুষ।

১.২ সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের কেন্দ্রে মানুষ

সমাজ কিভাবে গঠিত হয় এবং টিকে থাকে ? উন্নয়নের পথে সমাজকে কে নিয়ে এসেছে? কে খাদ্য উৎপাদন করে? রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্মদাতা কে? প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্তর কি মানুষ নয়? এই কারণেই সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে মানুষকে আরো বেশী করে মুখ্য বিষয়রূপে গণ্য করা হচ্ছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, একসময় বৈজ্ঞানিকেরা সমাজবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় মানুষকে তার যোগ্য স্থান দিতে অস্বীকার করেছিলেন। সে সময় বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের পরিবর্তে অন্য বিষয় নিয়ে বিচার করতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। আজ (প্রকৃতি বা সমাজ) বিজ্ঞানীর আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যাকে কেন্দ্র করে—সে হল মানুষ। প্রকৃতিবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানগুলিতে বিশেষজ্ঞতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও মানুষ তার কেন্দ্রীয় অবস্থানের জন্য সব বিদ্যারই আলোচ্য বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রাণীবিদ্যাবিদ্, যিনি প্রাণীদের নিয়ে পড়াশুনা করেন, তিনি প্রাণীদেহের কাঠামো ইত্যাদির সঙ্গো মানবদেহেরও তুলনা করেন; আবার যিনি গাছপালা নিয়ে অধ্যয়ন করেন সেই উদ্ভিদবিদ্যাবিদও মানুষের কাছে তাদের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতেই উদ্ভিদচর্চা করেন।

১.২.১ চিন্তাপূর্ণ সমালোচনারূপে সমাজবিজ্ঞান

এই ধারণা জনপ্রিয় যে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে কেবলমাত্র অটল বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি নিয়েই বিজ্ঞান এগোতে পারে। তথ্য বা ঘটনার অভিজ্ঞানমূলক পর্যবেক্ষণ তাদের শ্রেণীবিভাগ এবং সামান্যকরণ নিয়েই বিজ্ঞান গঠিত হয়। সমস্ত পর্যবেক্ষণই গ্রহণ ও বর্জনের নিয়মাবলী অবশ্যই অনুসরণ করবে। বিজ্ঞান যখন বৈজ্ঞানিকের পর্যবেক্ষণ বা সিন্ধান্তকে এমনভাবে সামান্যীকরণ করতে পারবে যাতে সেগুলির সঙ্গো এই নিয়মাবলীর সঙ্গতি থাকে তখনই কেবল তাকে সিন্ধ বলে গণ্য করা যাবে। এইসব নিয়মাবলী অনেকক্ষেত্রেই মানবিক মূল্যবোধ, অর্থ এবং তাদের চিন্তাশীল চরিত্রকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেয় না। সেই কারণেই বিজ্ঞানীর পক্ষে খোলাখুলিভাবে মানুষকে তাঁর বিদ্যার বিষয় হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে দ্বিধা থাকে।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানে এই সমস্যা প্রকট, যদিও সমাজবিজ্ঞানের সবকটি শাখাই সমানভাবে এই সমস্যার মুখে পড়ে না। অনুরূপভাবে অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলি নিজের নিজের ক্ষেত্রে মানুষের মাধ্যমে যে সামজিক বাস্তবতা গড়ে ওঠে, তার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে। বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানসমূহ বিজ্ঞানের দৃষ্টবাদী ধ্যানধারণা গ্রহণ করছে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গুরুত্ব দিচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ, তাদের অর্থ এবং চিন্তাশীল চরিত্রকে। সুতরাং প্রাকৃতিক বা সামাজিক সব ধরনের বিজ্ঞানেরই কেন্দ্রীয় চরিত্র হল মানুষ।

১.২.২ সৃজনীপ্রতিভারূপে মানুষ

সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। সৃজনীপ্রতিভার সাহায্যে বেঁচে থাকার ক্ষমতা তার আছে বলেই সে প্রতিনিয়ত তার চারপাশের পরিবেশ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে এবং তার উন্নতি ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ, পাখি বাসা বানায় কিন্তু বাসার আকৃতি ও গঠন বদলায় না। যুগ যুগ ধরে তা একই রকম রয়েছে। অনুরূপভাবে দীর্ঘকাল ধরে সিংহ গুহাকেই তার বাসস্থান করেছে। কিন্তু যে মানুষ গাছে, জঙ্গলে ও গুহায় আশ্রয় নিয়ে জীবন শুরু করেছিল সে ধীরে ধীরে কুঁড়েঘর, ছোট বাড়ি, তারপর বাংলো এবং বর্তমানে বহুতল বাড়ি নির্মাণে অগ্রসর হয়েছে। মানুষের সৃষ্টি করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

মানুষ শুধু সংস্কৃতি, পরম্পরা ও সামাজিক কাঠামোর নিষ্ক্রিয় ধারক ও বাহক নয়। তারা মূল্যবোধ, অর্থ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির স্রষ্টাও বটে। এই সৃজনীক্ষমতাই সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে এবং পক্ষান্তরে এই সংস্কৃতিই মানুষকে তার সৃজনীপ্রতিভা প্রকাশের বিষয়গত শর্তাবলী প্রদান করে। ম্যালিনোয়স্কি তাই মন্তব্য করেছেন, ‘‘মানুষের সংস্কৃতি আছে বলে সে স্বাধীন’’ এবং ‘‘সংস্কৃতি হল স্বাধীনতার প্রাথমিক কিস্তি’’।

১.২.৩ সহমর্মী চিন্তা হিসেবে বিজ্ঞান

মানুষ সম্পর্কে পাঠ নিতে গিয়ে আপনি বলতে পারেন যে, আমার হাতে মাত্র দুটি বিকল্প আছে ঃ হয় মানুষের আবশ্যিক মানবিকতাকে অস্বীকার করা এবং তাকে প্রকৃতির লক্ষ্যবস্তু হিসেবে দেখা অথবা তার প্রকৃতিক উৎসমূল অস্বীকার করে তাকে নিছক ধারণা বা অর্থের বিষয় হিসেবে গণ্য করা।

সৌভাগ্যক্রমে এই দুই চরম মতের মধ্যে একটির তুলনামূলক সুষম পরিপ্রেক্ষিত আছে, অর্থাৎ মানুষ হল প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক জীব। সহমর্মিতা ও চিন্তার সাহায্যেই একথা বোঝা সম্ভব। এই এলাকাতেই সমাজবিজ্ঞানীরা মানুষকে নিয়ে গবেষণা করেন এবং এজন্য তাঁরা নিজেদের এবং নিজস্ব সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অপরের সংস্কৃতি বিচার করতে অস্বীকার করেন।

এটা অত্যন্ত জরুরী যে বিজ্ঞান সাধনায় সমাজবিজ্ঞানী সচেতন থাকবেন। কেননা কেবল তাহলেই তিনি তাঁর বিষয়বস্তুর প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে পারেন ও তার সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন। সহমর্মিতা দেখানোর অর্থ বিষয়ীকে শুধু আপনার নিজস্ব মান দিয়ে বিচার নয়, এর অর্থ হল বিষয়ীর নিজস্ব প্রত্যক্ষণ এবং নিজের সম্পর্কে নিজস্ব মূল্যায়নের দিক থেকেও বিচার করা। এটা করা সহজ নয়, কারণ শিক্ষা ও অভ্যাসের কারণে সমাজবিজ্ঞানী অনেক বাধ্যবাধকতার শিকার হন। যে জগতে ভালভাবে বাঁচার অর্থ হল কর্তৃত্ব করতে পারা, সেই জগতে লালিত পালিত হয়ে তার মধ্যে এই প্রবণতা জন্মাতেই পারে যে অন্য মানুষকে যেন নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়। ব্যবহারজীবী সমাজবিজ্ঞানী হিসেবেও তাঁর অন্যান্য বাধ্যবাধকতাও আছে। বিজ্ঞানের নিয়মাবলী তাঁকে বস্তুনিষ্ঠ ও মূল্যমান নিরপেক্ষ হতে বলে, তা সে পর্যবেক্ষণের হাতিয়ার তৈরীতই হোক বা প্রকল্প নির্মাণেই হোক। তা সত্তেও গবেষণার সমস্যা নির্বাচনেই মূল্যমান ও মূল্যায়নের প্রশ্ন জড়িত থাকে এবং সমস্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন গবেষণাপদ্ধতিশাস্ত্রই সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠা সুনিশ্চিত করতে পারে না। প্রায়শই যে পদ্ধতি সুপারিশ করা হয় তা হল একই ধরনের ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে অন্যের গবেষণার সারাংশ পাঠ করে সমস্যা চিহ্নিত করা। এইভাবে ঐতিহ্য, সময়ের পছন্দ অথবা এমনকি

অভ্যাসও স্থির করতে পারে কোন্ সমস্যা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠা ও মূল্যায়ন নিরপেক্ষতার আদর্শের সামনে এসবই চ্যালেঞ্জ পেশ করে। সমাজবিজ্ঞানীর সমস্যা এখানেই শেষ হয় না। তাঁর সময় ও অর্থ সীমিত এবং তাঁকে অন্য জনসমষ্টিকেও অনুধাবন করতে হয়। তাই যে পথে বাধা সবচেয়ে কম তা হল সেই পথ যেখানে সামাজবিজ্ঞানী সচেতন চিন্তার পরিবর্তে অভ্যাসবশে বা প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যানুসারে দ্রুত ও সম্পূর্ণভাবে সামাজবিজ্ঞানের ‘‘নিয়মাবলী’’ মেনে চলেন। যে সমাজিক নৃতত্ত্ব অন্য সমাজের সংস্কৃতি অনুধাবন করতে চায় সেখানেও অপর সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্কে অতীত গবেষণার ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করা জনপ্রিয় পন্ধতি। অথবা সমাজতত্ত্বের সাম্প্রতিক ধারাতেও দেখা যায় যে, সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাপমূলক বিশ্লেষণের মধ্যেই কোন সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি থাকে। তাই প্রায়শই এটা দেখা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টবাদী অবদান মানবসমাজের মৌলিক সমস্যার উপলব্ধিতে খুব কমই সাহায্য করে।

১.৩ সমাজবিজ্ঞান প্রণালী

সমাজবিজ্ঞান কিভাবে পরিচালনা করা উচিত তাই নিয়ে নানারকম পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে। বিভিন্ন গবেষক দুটি চরম অবস্থানের কথা বলেছেন যার একদিকে রয়েছে বিশুদ্ধ বোধির সাহায্য নেওয়া এবং অন্যদিকে রয়েছে প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিয়মাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করা। মানবজাতি সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পাঠের জন্য বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতিবিদ্যাগত কৌশলের সঙ্গে বোধি-ভিত্তিক চিন্তার সমন্বয় ঘটানোর প্রয়োজন হতে পারে, কারণ, মানুষের মধ্যে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি উভয়ের বৈশিষ্ট্যই রয়েছে। তারা জৈবিক সত্তা ঠিকই, একই সঙ্গে তারা সমাজ ও সংস্কৃতির সৃষ্ট ফল।

১.৩.১ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষকে বোঝা

সমাজবিজ্ঞানের প্রথমেই উচিত মানুষের বিচিত্র দিকসমূহের তার সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে চেষ্টা করা। অর্থবহ সমাজবিজ্ঞানের স্তরে উপনীত হতে গেলে সমাজবিজ্ঞানীকে সহমর্মিতার মনোভাব নিয়ে বিষয়ীকে দেখতে হবে। মানুষ সমাজে যে সমস্ত চাপ ও বাধা, স্বাধীনতা এবং পছন্দ-অপছন্দের সম্মুখীন হয় তা পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে সমাজবিজ্ঞানীর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে এই সহমর্মিতা সাহায্য করে। এটা তাঁকে সেই পরিপ্রেক্ষিত প্রদান করে যার মাধ্যমে তিনি কোন বিষয়কে পর্যবেক্ষিত আচরণের একটি দিক বলে দেখতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, একথা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, গ্রামীণ মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অদৃষ্টবাদী। বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলের মাধ্যমে আমরা সম্ভবত এই বিশ্বাসকে সমর্থনও করতে পারব। এটা হতেই পারে যে, কোন গ্রামবাসীকে যদি এই প্রশ্ন করা হয় ‘‘আপনার ফসল এবছর খারাপ হয়েছে কেন?’’ তাহলে তিনি হয়তো বলবেন, ‘‘সবই ভাগ্য’’। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যদি একথা বোঝান যে একজন গ্রামবাসীও তাঁরই মত সমান যৌক্তিকতা, নম্রতা ও চিন্তা করার ক্ষমতার অধিকারী, তাহলে তিনি এই উত্তরের অর্থ করার সময় সাবধান হবেন। কোন্ পরিস্থিতিতে একথা বলা হয়েছে তা তিনি অনুসন্ধান করবেন। গ্রামীণ জনগণের অন্যান্য বিশ্বাসের ডালি এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মের সঙ্গে তিনি এগুলিকে তুলনা করবেন। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামবাসীর তরফে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি সহজেই মেনে নেওয়ার কথা বলা যায়। তখন সমাজবিজ্ঞানী হয়ত বুঝতে পারবেন যে, তাঁর গবেষণালব্ধ সিধান্তই শেষ কথা নয়। কোন্ পরিস্থিতিতে আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে

পারি যে কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী অদৃষ্টবাদী। সমাজবিজ্ঞানীরা যদি তাঁদের বিষয়ের বৌদ্ধিক আয়ুধ এবং বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে অদৃষ্টবাদ সংক্রান্ত ধারণার উপর মতামত দিতে যান তাহলে আবার যে সিদ্ধান্ত তড়িঘড়ি তাঁরা নিয়েছিলেন তা সংশোধন করতে হবে।

১.৩.২ মানবজাতির অবস্থার সমালোচনা হিসেবে বিজ্ঞান

উপরের যুক্তিগুলি কোনভাবেই বিজ্ঞানের মর্যাদাহানি ঘটায় না। তারা যে জিনিসটা তুলে ধরে তা হল সাধারণভাবে সমাজবিজ্ঞানে মানবজাতির অবস্থার চিন্তাশীল সমালোচনার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বের অভাব। সমাজবিজ্ঞানী যদি যাদের সমাজজীবন অনুধাবন করবেন তাদের সঙ্গে নিজের জীবনকেও জড়াতে না চান তাহলে শুধু নৃবিজ্ঞানীদের মত নির্দিষ্ট জনসমাজের কুঁড়েঘরে বাস করলে বা তাদের ভাষা শিখে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলে বা আস্থা অর্জন করলেই চলবে না; কি করে গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত ও পর্যালোচনা করা যায় সে প্রশ্নও এখানে জড়িত। নিজস্ব নীতি-মানবিচারের ভিত্তিতে কোন জনসমষ্টিকে অদৃষ্টবাদী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গতানুগতিক বা শীতল যুক্তিবাদী অথবা অমানুষিক হিসেবী বলে অপবাদ দেওয়া অনেক বেশী সহজ। সমাজবিজ্ঞানী যদি সহমর্মিতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তাহলে তাঁর অধীত সামাজিক সমস্যাবলীর প্রতি তিনি ব্যাপক ও বৈধ অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারবেন। একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিই এটা সুনিশ্চিত করতে পারে যে সমাজবিজ্ঞান মানবজাতির অবস্থার যুক্তিপূর্ণ সমালোচনাও করতে পারবে। গবেষণার বিষয় হিসেবে যে সমস্ত সমস্যার গুরুত্ব বেশী সে সব বিষয়েই আবার সমাজবিজ্ঞানের সমালোচনাপূর্ণ, চিন্তাশীল ও মানবিকতাবাদী লক্ষ্য সর্বাধিক পূর্ণ হতে পারে।

অনুশীলনী ১

১. **নিম্নলিখিত কোন্ বক্তব্যটি সঠিক (✓) বা ভুল (x)**

ক) বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষ।
খ) মানুষ সংস্কৃতির নিষ্ক্রিয় ধারক ও বাহক।
গ) মানুষ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পাঠ নিতে হলে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ঘটান প্রয়োজন।

২. মানুষের সৃজনী ক্ষমতা সম্পর্কে পঞ্চাশটি শব্দ লিখুন।

....

....

....

....

....

....

১.৪ কৌমগত পার্থক্য এবং মানবজাতির ঐক্য

মানবিক বাস্তবতাকে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের প্রায়শই একটি অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। তাঁরা এটা জানেন যে মানুষের ঐক্যে তাঁদের অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে এবং তাঁরা ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুকও, কিন্তু তাঁদের নিজস্ব অনুসন্ধানই দেখায় যে তাঁদের অধীত বিষয় (অর্থাৎ অন্য সমাজের মানুষ) সর্বদা সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক নয়। সামাজিক নৃবিজ্ঞানে যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতাজাত সামান্যীকরণ থেকে থাকে তা হল এই যে এক সমাজের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্য সমাজের মানুষের থেকে নিজেদের পৃথক বলে ভাবতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, জাতপাত, কৌম, এবং স্বীয় গোষ্ঠী বা জ্ঞাতিসম্পর্ক ইত্যাদির ভিত্তিতে ঐ ধরনের পৃথকীকরণ করা হয়। অনেক সময়ই এই পৃথকীকরণ পক্ষপাতপূর্ণ ঝোঁকে পরিণত হয় এবং সেটাই সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে। যেমন, কাচিন অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস করে যে তাদের চারপাশে যে শান্, বর্মী, থাই বা আহোম্‌রা আছে তারা পুরোপুরি মানুষ নয়। ইউরোপবাসীরা দীর্ঘকাল নিজেদের অন্য সব অঞ্চলের মানুষের তুলনায় নিজেদের উন্নত বলে মনে করত এবং তারা বিশ্বাস করত যে অন্যান্য কৌম ও সমাজকে সভ্য করাটা শ্বেতাঙ্গ মানুষদেরই দায়। ধীরে ধীরে অন্যান্য অঞ্চলের (সামাজিক ও প্রকৃতিক বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রম ও গবেষণার সাহায্যে মানুষের বোঝার তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত করেন এবং দেখিয়ে দেন যে, সংস্কৃতির দিক থেকে অন্যান্য সমাজ ইউরোপীয় সমাজের থেকে কোন অংশেই কম নয়।

কৌম বিজ্ঞানের ভিত্তি, তার সম্পর্কে ভুল এবং কিবাবে তারা অস্বীকৃত হয়েছিল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আমরা আপনাকে অবহিত করব।

১. কৌমের ভিত্তিতে বিভাজন

কৌম বলতে মানবসমাজের মধ্যে ত্বকের রং, চোখ, নাক, ঠোঁট ও চুলের গঠন এবং অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যের প্রজননগত বণ্টনের ভিত্তিতে গঠিত জনসমাজকে বোঝায়। এই বংশগতিসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলির বণ্টনে ভৌগোলিক পার্থক্য ধরা পড়ে, কিন্তু এমন কোনও মানব গোষ্ঠী নেই যাকে বিশুদ্ধ কৌম বলা যায়।

যাকে কৌম বলা হয় তা হ'ল একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জনসমাজে বংশানুগতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান 'জীন্'-এর প্যাটার্নের বণ্টন ও কেন্দ্রীভবন। অন্যথায় জীন-বৈশিষ্ট্যের সাধারণ ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন মাত্রায় সমাজে মানুষই ভাগ নেয়। সুতরাং, জীববিজ্ঞানের দিক থেকে কৌমের পার্থক্য কোনও মৌলিক গুণগত পার্থক্য নয়, মাত্রার পার্থক্য। দ্বিতীয়ত, গবেষণায় এটা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, ভাষাতাত্ত্বিক ক্ষমতা, বুদ্ধি, যুক্তিজ্ঞান ও বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতার মত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুণাবলী এবং সভ্যতার অন্যান্য গুণাবলী সব মানব গোষ্ঠীর মধ্যেই সমানভাবে উপস্থিত। এই অর্থে মানবজাতি সাধারণ সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও মানবিক গুণাবলীর অংশীদার। প্রধান প্রধান কৌমের রূপ, যথা—অস্ট্রালয়েড্ (কৃষ্ণাঙ্গ), ককেসয়েড্ (শ্বেতাঙ্গ) ও মঙ্গোলয়েড্ (পীতবর্ণ) মনুষেরা সাধারণভাবে এই মানবিক ও সাংস্কৃতিক সম্ভাবনার অংশীদার।

২. কৌম ও কৌমের কর্তৃত্ববাদ

বিভিন্ন কৌমের অভ্যন্তরীণ জীনসংক্রান্ত বিভাজনের অনেক সময়েই ভুল অর্থ করা হয়। এরকম

ভুল করেই ত্বকের রংকে প্রায়শই সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়, যেমন 'শ্বেতাঙ্গারা কৃষ্ণাঙ্গদের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান'। এরপরেই তার সঙ্গে উৎকর্ষ ও অপকর্ষের ধারণা চাপিয়ে দেওয়া হয়, যার ফল হ'ল পক্ষপাত। এই ধরনের পক্ষপাত থেকেই কৌমগত বৈষম্য ও শোষণের জন্ম হয়। সাধারণভাবে তাকেই আমরা কৌম কর্তৃত্ববাদ বলি। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ অফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা বর্ণবৈষম্যবাদের যুগে কৌম কর্তৃত্ববাদে বিশ্বাস করত এবং কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করত। সেখানকার শ্বেতাঙ্গ শাসনব্যবস্থাকে তাই কৌমকর্তৃত্ববাদী শাসন বলে ঘৃণা করা হত।

৩. কৌমকর্তৃত্ববাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

দীর্ঘদিন ধরে মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে তার সাংস্কৃতিক যোগ্যতা এবং বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টার ফলে কৌমকর্তৃত্ববাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধ্যানধারণাগুলি পুষ্টিলাভ করেছে। যেসব সমাজবিজ্ঞানী এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তাঁদের নিজেদের কৌমগত পক্ষপাত ছিল। তাছাড়া বুদ্ধ্যঙ্ক পরিমাপ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাই তাঁদের এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করেছিল যে, শ্বেতাঙ্গরে তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গরা নিকৃষ্টতর। এই ব্যাপারটা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল যে, বুদ্ধ্যঙ্ক পরিমাপ পদ্ধতি সংস্কৃতিগতভাবে সেইসব কৌম-গোষ্ঠীর অনুকূলে ছিল যারা শ্বেতাঙ্গদের মত নিজেদের বেশী উন্নত বলে জাহির করত।

এই কৌমকর্তৃত্ববাদীরা সাংবাদিক, রাজনীতিক বা পরিব্রাজক যাই হোন না কেন, তাঁদের অধিকাংশই এই মতের সমর্থক ছিলেন এবং এই নিয়ম প্রমাণের উদ্দেশ্যে রাশি রাশি প্রবন্ধে লিখেছেন যে আবহাওয়া যত বেশী সূর্যকরোউজ্জ্বল হবে বুদ্ধিও ততই বেশী দুর্বল হবে। উদাহরণস্বরূপ, এই মতের সমর্থকরা বিশ্বাস করত যে, ইটালিয়ানরা বিখ্যাত তাদের ম্যানডোলিনের জন্য এবং স্পেনীয়রা বিখ্যাত তাদের সুন্দর সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্য। আমরা যদি আরো দক্ষিণে, অফ্রিকায় যাই তাহলে শুনতে পাব কেবল ঢাকের উদ্দাম বাজনা এবং উপজাতি-সঙ্গীতের উন্মাদনাগ্রস্ত ছন্দ। সুতরাং যে এলাকা যত বেশী উষ্ণ সে এলাকার অধিবাসীরাও যৌক্তিকতা থেকে ততই দূরে অবস্থিত। এই লেখকেরা যুক্তি দেখাবেন যে, এই ছবি আঁকা ভীষণ কষ্টকর যে একজন ভিক্টোরীয় ভদ্রলোক বারমুডা প্যান্ট পরে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে নেচে নেচে গান গাইছেন। এসবের কারণ শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি সবই উন্নত শ্বেতাঙ্গ মনের ফসল বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু 'অন্যরা' কি তা মেনে নিয়েছিলেন?

৪. এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হ'ল

১৯৩০ সাল নাগাদ ভৌত-নৃবিজ্ঞানী ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা আফ্রিকায় পর পর অনেকগুলি খননকার্য চালান এবং খুব কৌতূহলোদ্দীপক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁরা এ বিষয়ে বাস্তব সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেন যে, তিন হাজার বছরেরও আগে আফ্রিকা মহাদেশ মানব সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে প্রতিপালন করেছিল। আর সেটা বিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল না, বরং সে সভ্যতা এমনই অত্যুৎকৃষ্ট ছিল যে বিশ্বের অন্যান্য অংশের মানুষকেও তা আকৃষ্ট করেছিল। এই সভ্যতার শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বৌদ্ধিক সিদ্ধির যে স্তরে পৌঁছেছিল, অনেক পরে তার কিছুটা কাছে আনতে পেরেছিল উত্তরাঞ্চলের মানুষেরা।

এই প্রাচীন আফ্রিকান্ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ একাধিক স্থানে এবং কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই সাহারা মরুভূমিতে পাওয়া গেছে। কেউ কি এটা কল্পনা করতে পারত? অর্থাৎ, জলবায়ুসংক্রান্ত, সামাজিক ও অন্যান্য কারণে আফ্রিকায় যে পরিমাণে অবস্থার অবনতি ঘটেছে তা কি কেউ কল্পনা করতে পারত? যে মহাদেশের

সংস্কৃতির উজ্জ্বল আসনগুলিতে সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী ও চিন্তাবিদদের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল, সেই আফ্রিকা পরিণত হয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং দাস-ব্যবসা, দারিদ্র ও রোগাক্রান্ত একটি মহাদেশ।

গ্রীসের কথাই বিবেচনা করা যাক। গ্রীক সভ্যতার কীর্তিকাহিনী নির্বিঘ্নে গড়ে ওঠেনি। যারা গ্রীসের অধিবাসী নন, এমনকি ইউরোপবাসীও নন, সেই আরবদের হাতেই পরবর্তীকালে এই সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছিল। আরবরা যদি হিপ্পোক্র্যাটিক জ্ঞান অনুবাদ করে নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে না মেলাত এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি না ঘটাত তা হ'লে হিপ্পোক্র্যাটিক ওষুধ কোথায় থাকত? রোমানরা এটা শিখেছিল আরবদের কাছ থেকে, কিন্তু ততদিনে এই প্রাচীন ওষুধের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা হয়ে গিয়েছিল। তাই সুবিন্যস্ত ঐতিহাসিক গবেষণাই এটা প্রমাণ করেছে যে কৌমকর্তৃত্ববাদী গোঁড়ামি দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৫. ছদ্ম-বিজ্ঞান ও কৌম

কিন্তু, বিজ্ঞানের যে অনুমিত পদ্ধতি (বা যে ছদ্ম-বিজ্ঞান) কৌম পক্ষপাতকে জোরালো করেছিল তার কি হল? বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষা? করোটি বা দৈহিক পরিমাপ? এটা কি ঠিক নয় যে, এই ধরনের আপাতগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেই বর্ণবিদ্বেষীরা তাদের মতের সমর্থন পেয়েছিল? এইসব পরীক্ষা সাংস্কৃতিক অর্থে পক্ষপাতপূর্ণ এবং যুক্তির দিক থেকেও ছিল দুর্বল; এদের বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য নিয়ে প্রথম প্রশ্ন তোলেন সেই চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী সমাজবিজ্ঞানীরাই। কৌমকর্তৃত্ববাদের অসিদ্ধতা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক মতৈক্য সত্ত্বেও আমাদের গভীর দুর্ভাগ্য এই সম্ভবত মানবগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিভাগের গভীরে প্রোথিত রয়েছে। এর ভিত্তি জীবতাত্ত্বিক নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক।

১.৫ পক্ষপাতের সামাজিক উৎস ও বিভিন্ন রূপ

সামজিক পক্ষপাতের চরমতম রূপ হল কৌমকর্তৃত্ববাদ। আমরা যখন অন্যান্য ধরনের পক্ষপাতের মুখোমুখি হই তখন কৌমকর্তৃত্ববাদ কথাটি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করি। কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবধানকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য প্রাকৃতিক পার্থক্যসমূহকে চোখে দেখা না গেলেও চাপিয়ে দেওয়া হয় সে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা যদি সামাজিক পক্ষপাতের ভিত্তি পরীক্ষা করি তাহলে সম্ভবত আরো বড় শিক্ষা পাব। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন জাতের মধ্যে লক্ষণীয় কৌমগত কোন পার্থক্য না থাকলেও, প্রতিটি জাত বা জাতি অন্যান্য জাতির থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠ না হলেও প্রকৃতিগতভাবে পৃথক বলে মনে করে। যেহেতু বিভিন্ন জাতের মর্যাদা জন্মসূত্রে আরোপিত হয় সেহেতু তারা প্রকৃতিগতভাবে পৃথক এই বিশ্বাসের মধ্যেই শুদ্ধিকরণ আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্য সম্পর্কে বিধিনিষেধ এবং জাতপাতের আচারবিধি তাদের অন্তিম সমর্থন খুঁজে পায়।

এখানেও সমাজবিজ্ঞানীকে শুধু বর্তমান সামাজিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করলেই চলবে না, তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান স্তরের পূর্ববর্তী স্তরগুলি সম্পর্কেও ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। কেন এবং কিভাবে এটা ঘটল সমাজবিজ্ঞানীকে সেটাও অনুসন্ধান করতে হবে।

ভারতে যে সমস্ত ভিত্তিহীন পক্ষপাতের ছড়াছড়ি দুর্ভাগ্যক্রমে তার সবটাই জাতিভেদের তত্ত্বে ঘুরপাক খায় না। ধনী মহল থেকে এই অভিযোগ কি আমরা শুনিনি যে গরীব মানুষেরা কত বোকা ও অজ্ঞ? একথাও কি বহুবার আমরা শুনিনি যে গরীব লোকের সংখ্যা অযৌক্তিকভাবে অবিরাম বেড়েই চলেছে?

অথবা একথাও কি আমাদের কানে আসেনি যে, যুক্তিহীন এবং কুসংস্কারপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি গ্রামের মানুষের একটা স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে? একজন দরিদ্র ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জীবন কাটাতে না পারেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি বোকা বা অজ্ঞ। আর্থিক দুরবস্থার কারণে তাঁর সন্তানেরা হয়ত স্কুলে যায় না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাদের পড়াশুনা করার বুদ্ধি নেই। বস্তুতপক্ষে, এই যে সামাজিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এবং তা সত্ত্বেও সাধারণীকরণ করা হচ্ছে তা তার অন্তর্নিহিত পাহাড়প্রমাণ পক্ষপাতকেই প্রমাণ করে।

১.৫.১ বিজ্ঞানে পক্ষপাত

আপনারা লক্ষ করবেন, এমন কি বিজ্ঞানও পক্ষপাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। একজন চিন্তাশীল সমাজবিজ্ঞানী যুক্তির প্রতিষ্ঠাতারূপে ঐ ধরনের প্রবণতা তখনই অতিক্রম করতে পারবেন যখন তিনি তাঁর পাঠ্যবিষয়কে মৌলিক মানবিক বিষয় হিসেবে দেখবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে সমাজবিজ্ঞানী দরিদ্র মানুষকে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট বলে ছাপ দিয়ে দেন তিনি আসলে সঠিক প্রশ্নই করতে ব্যর্থ হন। কারণ ঐ ধরনের সমাজবিজ্ঞানীরা কিছুতেই তাঁদের বাঁধাধরা গতের বাইরে যেতে পারেন না।

বিজ্ঞানের পরিচিত মান হল সিদ্ধতা ও সত্যাখ্যান-এর প্রমাণ। এদুটির সাহায্যেই সমাজবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। তাছাড়া তার অনুসন্ধানের বিষয়ের মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শর্তাবলীর বৈচিত্র্য ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহমর্মিতার জন্য প্রয়োজন সংবেদনশীলতার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠতা মেলানোর ক্ষমতা; সমাজবিজ্ঞানীদের এই ক্ষমতাকেই সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বে চিন্তাশীল প্রতিফলনের ক্ষমতা বলা হয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

এটা লক্ষ করা যায় যে, গ্রামবাসীদের কাছে আয়ুর্বেদিক বা ইউনানী চিকিৎসকদের তুলনায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসকদের বৈধতা ও গণমোহিনী শক্তি অনেক বেশি। আপনারা এটা শুধুমাত্র গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের জন্য মানুষের লম্বা লাইন দেখেই নয়, তাদের স্বাস্থ্যবিধি ও আচরণ অনুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করেও বুঝতে পারবেন। কঠিন কোন রোগে যখন মানুষ তার দৈনন্দিন কাজ করতেও অপারগ হয় তখন সে দেশীয় চিকিৎসা ও ওযুধের চেয়ে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ও ওযুধই বেশী পছন্দ করে। একমাত্র যখন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার হাতের বাইরে বা চিকিৎসা করতে অনিচ্ছুক বা চিকিৎসায় অকৃতকার্য হন, কেবলমাত্র তখনি গ্রামের মানুষ রোগ নিরাময়ের বিকল্প ব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সবেকি ও আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা সহাবস্থান করে এবং রোগীদের কোন একটি বা একাধিক চিকিৎসাপদ্ধতির উপর নির্ভরতা তাদের বাস্তব পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। চিকিৎসার প্রতি এই আচরণ গ্রাম্য মানুষের মানসিক অনগ্রসরতা সম্পর্কে অতিকথা (myth) -কে ভুল প্রমাণিত করে। বিভিন্নপ্রকার চিকিৎসাপদ্ধতির এই সহাবস্থান ভারতের মধ্যবিত্ত শহরগুলিতে যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি লক্ষ করা যায় অগ্রসর শিল্পসমাজগুলিতেও।

১.৫.২ আঞ্চলিক পক্ষপাত

একটি দেশে বা একটি সমাজে কিছু আঞ্চলিক পক্ষপাত বা কুসংস্কার থাকে। তারা কি নির্দেশ করে? তারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতা সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ

চিন্তাধারা প্রদর্শন করে। এগুলি প্রায়শই সমাজবিজ্ঞানীদের কাজে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের তুলনায় পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে খাদ্য উৎপাদনের উচ্চতর হার ব্যাখ্যা করা হয়েছিল শেষোক্ত অঞ্চলগুলির কৃষকদের স্বাভাবিক দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু তা কি প্রকৃতই সত্য? না, সত্য নয়। বস্তুতপক্ষে, খাদ্য উৎপাদনশীলতার নিম্নতর ও উচ্চতর স্তর কৃষি কাঠামো, সেচের সুবিধা, ভূমির উর্বরতা, বীজের প্রকৃতি এবং যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। এটাও সমাজবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টাতেই প্রমাণিত হয়েছিল। পূর্বাঞ্চলের জনগণের অভ্যাস, প্রথা ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা করে সমাজতাত্ত্বিকেরা দেখিয়েছেন যে, তাদের মধ্যে জড়িমা বা আলস্যের কোন ব্যাপার নেই। সুতরাং (প্রকৃতি এবং সমাজ) বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার ফলেই মানুষে-মানুষে জড়িমা-ভিত্তিক পার্থক্য-সংক্রান্ত আঞ্চলিক পক্ষপাত অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

অনুশীলনী ২

১. কৌমকর্তৃবাদ এবং কৌমগত বৈষম্য বলতে আপনি কি বোঝেন ? (পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন)

২. ভারতে খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত আঞ্চলিক পক্ষপাত কিভাবে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে? পাঁচ লাইনে উত্তর দিন।

৩. নিম্নলিখিত কোন মন্তব্যগুলি ঠিক অথবা ভুল?
   ক) দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বর্ণবিদ্বেষী।
   খ) 'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' সংক্রান্ত ধারণাটি ভ্রান্ত।
   গ) কৌমগত পক্ষপাতের মূল জীবতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে নিহিত আছে।
   ঘ) সমাজ সম্পর্কে প্রকৃত পাঠ নিতে হলে সামাজিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে হবে।

১.৬ জ্ঞান ও সমাজ

এতক্ষণ আমরা যা শিখলাম তা জ্ঞান ও সমাজের সম্পর্কে বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা যাক। কিছু কিছু সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ তার সামাজিক জগৎকে বুঝতে ও শ্রেণীবিভাগ করতে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক আদর্শকে ব্যবহার করে এসেছে। সামাজিক জগতে যা নেই সেই নির্দিষ্ট স্থিতিশীলতা প্রকৃতিতে আছে। বৃক্ষের শাখা আছে, কাকেরা কালো, গরু দুধ দেয়, গুবরে পোকা গুবরে পোকার মতো আচরণ করে, শকুন শকুনের মতই আবর্জনা খায়, পাথর সাধারণত অনড় থাকে ইত্যাদি। কিন্তু সামাজিক জগৎকে যখন পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন এত বেশী নমনীয়তা ও পরিবর্তন চোখে পড়ে যে, কোন কিছু সম্পর্কে আদৌ স্থির নিশ্চিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সামাজিক জগৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হয় এবং তার আদর্শ হিসেবে কাজ করার জন্য প্রাকৃতিক জগতের স্থিতিশীলতা ধার করার চেয়ে আর ভাল পথ কিই বা থাকতে পারে। এই কারণেই যেখানে কেবলমাত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য বর্তমান সেখানেও প্রাকৃতিক পার্থক্য আরোপ করার প্রবণতা দেখা যায়।

এই ধরনের উপলব্ধির সঙ্গে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য আছে যা প্রথম দর্শনশাস্ত্রেই আবির্ভূত হয় এবং পরবর্তীকালে মনঃসমীক্ষণ ও নৃতত্ত্বে স্থান করে নেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষ কখনই জগৎকে

তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান না করে থাকতে পারে না। কোপার্নিকাসের আগে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। অন্য অনেকে এই অতিকথায় বিশ্বাস করত যে, অ্যাটলাসকে চালাকি করে পৃথিবীকে তার কাঁধে করে রাখতে বাধ্য করা হয়েছিল। অমনকি আজও এমন কিছু মানুষ থাকতে পারে যারা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী একটি শক্তিশালী ষাঁড়ের শিঙের উপর সূক্ষ্মভাবে বসানো আছে এবং যতবার সেই ষাঁড় হেঁচকি তোলে ততবার ভূমিকম্প হয়। এমন কোন প্রাকৃতিক ঘটনা বা সার্বজনীন রহস্য নেই যার সম্পর্কে তত্ত্ব রচনা বা যার সমাধান করা স্থগিত রাখা হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে যে, তার যথোপযুক্ত, নির্ভরযোগ্য অথবা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হাতে নেই। সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে মানবজাতিকে একের পর এক শ্রেণিবিভক্ত করা হবে এবং বিশ্ব সম্পর্কেও বারে বারে তত্ত্ব রচনা করা হবে।

এই ধারণা থেকে আমরা যদি এগোই তাহলে এই উপলব্ধিতে মাথা নোয়ানো ছাড়া উপায় নেই যে, অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানের কিছু কিছু ধারণার মূলে রয়েছে অপরিণত প্রাকৃতিক মডেল এবং ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের কাছে আমাদের সমসাময়িক কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ভট অথবা এমনকি মজাদার বলেও মনে হতে পারে। সেই কারণেই যখনই একজন সমাজবিজ্ঞানী জ্ঞান সম্পর্কে বিচার করতে বসেন— তা সে বিশ্বাস, মূল্যবোধ, তত্ত্ব, কাজ বা নির্দেশ যাই হোক না কেন— সর্বদাই তাঁর নিজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত; কেবলমাত্র তখনই তিনি যে মানবিক পরিস্থিতিতে জ্ঞান সৃষ্টি হয় তা বুঝতে পারবেন। কেননা এই পরিস্থিতিই শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট প্রকার জ্ঞানের স্বীকৃতি বা প্রত্যাখ্যান নিশ্চিত করে। বিজ্ঞান সম্পর্কে বর্তমান ধারণা যে আমাদের সন্তানদের জীবদ্দশায় শিশুসুলভ বলে মনে হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

একথা মানলেও আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না যে, মানুষের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়াই জ্ঞান নির্দিষ্ট এলাকায় ঘোরাফেরা করে। মানুষই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রায় বৈজ্ঞানিক বিকাশ ও পরিবর্তনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার, রক্তসঞ্চালনের আবিষ্কার, অ্যান্টিসেপ্টিক নিয়ে গোড়ার দিকের খেলা এবং আরও অনেক আবিষ্কার মানবজাতিকে বৃহত্তর সম্ভাবনা প্রদান করেছে। মানুষ তার পছন্দের তালিকা কতটা দীর্ঘ করতে পারে তা সামাজিক কাঠামোর দ্বারা সীমিত, কিন্তু আরো সম্ভাবনার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে না। বস্তুতপক্ষে একজন মানুষের পক্ষে তার সহোদর ভাইয়ের থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও একই পরিবারের সদস্য হওয়া সম্ভব হয় একমাত্র এই দ্বিত্বের কারণে। বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকেও আমরা বেশ ভালোভাবেই স্বাধীন। এভাবেই আবার অধীত জ্ঞান নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরীক্ষিত হয়। মানুষের জ্ঞানোৎপাদন হয় দুটি পূর্বানুমানের দ্বারা ঃ

ক) জ্ঞান সৃষ্টি করার অর্থ পুরানো জ্ঞান নষ্ট করা, এবং

খ) মানুষের যদি স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা না থাকে তাহলে জ্ঞান সৃষ্টি করা অসম্ভব।

ধর্মীয় দিব্যতন্ত্র এবং অসাফল্যের সঙ্গে এই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে যে মানবজাতি তার অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। কিন্তু মানুষের বিরামহীন অস্থিরতা সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে, শাসনব্যবস্থা কাঁপিয়ে দেয় এবং মহান তত্ত্বগুলিকে অপসারিত করে। সুতরাং এই বিশ্বে কোন কিছুই চরম নয়।

১.৭ সংস্কৃতির সর্বজনীনতা ও স্বাতন্ত্র্য

সর্বজনীন ও নিবিড় অনুসন্ধান একটি পুরনো নৃতাত্ত্বিক সাধারণ নীতি। উদাহরণস্বরূপ, পরিবার বলতে

শুধু ক্ষুদ্র পরিবার বোঝায়, অথবা আইনী ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ ব্যবহারজীবী, আদালত এবং লিখিত আইন অবশ্যই থাকবে, অথবা আমাদের নিজেদের ছাড়া অন্য সব ধর্মই হল অর্থহীন অশ্রদ্ধার বস্তু—এইসব সম্পর্কে বিশ্বাস সাংস্কৃতিক-সর্বজনীনের জন্য চিন্তাশীল মানুষের অনুসন্ধানকে প্রকাশ করে না, প্রকাশ করে চরম সম্পর্কে কামনা।

যেভাবে ট্রব্রিয়ান্ড উপজাতি প্রধান তাঁর বিশাল রাঙা আলুর গুদাম সম্পর্কে তাঁর লোকজনের কাছে উল্লাস প্রকাশ করতেন তাই নিয়ে মজা করা পরিব্রাজক ও নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, খাওয়ার পক্ষে অনেক বেশী রাঙা আলুই সেখানে ছিল এবং হয়ত অধিকাংশ রাঙা আলু কখনোই খাওয়া হবে না। ম্যালিনোয়স্কি বলেছিলেন, রাঙা আলুর ঐ গুদামের সঙ্গে রানীর অলঙ্কারের কোন পার্থক্য নেই। এই কথার রহস্য যতদিন না উদঘাটন করা হয়েছে ততদিন ঐ আচরণকে উদ্ভট বলেই গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং লন্ডন শহরের মানুষের পক্ষে যদি পয়সা দিয়ে রাজা বা রানীর অলঙ্কার দেখা ঠিক কাজ হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপবাসীর কাছে তাঁর গুদামঘর নিয়ে ট্রব্রিয়াণ্ড-প্রধানের উচ্ছ্বাস প্রকাশের মধ্যে অন্যায়টা কোথায়?

নৃতত্ত্ববিদদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দৌলতে আমরা এটাও জানি যে, নৈতিক আচরণ ও যৌন আচরণ সম্পর্কে কঠোর নিয়মাবলী ও বিধিনিষেধ সব সমাজেই আছে। কোন নিয়মই চরম নয় এবং এমন কোন প্রাকৃতিক কারণ নেই যার জন্য একগুচ্ছ নিয়ম ও বিধিনিষেধকে চরম বলে গণ্য করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, মাতৃপরিচায়ী (matrilineal) ও পিতৃপরিচায়ী (Patrilineal) পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে তথাপি উভয় ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব ও স্নেহ সমানভাবেই উপস্থিত। মাতৃপরিচায়ী সমাজে পিতার পরিবর্তে মাতার ভাই মামাই কর্তৃত্বের উৎস। এইসব সমাজে বাবা প্রায়শই হলেন একজন খুব কাছের এবং আদরণীয় ব্যক্তিত্ব যার কাছে পুত্র প্রচুর স্বাধীনতা পায়। তবে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল এই যে, আমাদের জানা ও পরিচিত বাস্তব চিত্রের অনেকরকম সম্ভাব্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে এবং এমন কোন কারণ নেই যে তার-একটি রূপকে অন্যান্য রূপের থেকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

অন্যভাবে বলা যায়, সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতার মধ্যেই সর্বজনীনতা বর্তমান থাকে। বাহ্যিকরূপের আপাত বৈচিত্র্যের আড়ালে যে সর্বজনীনতা লুকিয়ে থাকে তার প্রতি আলোকপাত করাই মানব সম্পর্কে পাঠ নেওয়ার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের প্রকৃত মানবিক পরিপ্রেক্ষিতে সেইসব বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলে দেবে যাদের মাধ্যমে মানবসমাজকে প্রত্যক্ষ করা যাবে। সমাজবিজ্ঞান যদি মানবসমাজের এই লক্ষণীয় বৈচিত্র্যের গভীরে অনুসন্ধান করে কেবল তখনই বৈজ্ঞানিকেরা মানুষ সম্পর্কে চিন্তাশীল অথচ বিজ্ঞানসম্মত পাঠ দিতে সমর্থ হবে। সমাজবিজ্ঞানের মাধ্যমে গবেষক শেষপর্যন্ত নিজেকেই অধ্যয়ন করেন।

অনুশীলনী ৩

১. নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি ভুল (x) না ঠিক (✓) নির্ণয় করুন :

ক) একটি শক্তিশালী ষাঁড়ের শিঙের উপর পৃথিবী সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্য রক্ষা করেছে।

খ) জগৎ সম্পর্কে তত্ত্ব রচনা না করে মানুষ থাকতে পারে না।

গ) জাতিকুলগত শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ঘ) একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

২.	সমাজে তত্ত্ব রচনা করার ভূমিকা কি? (পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে লিখুন।)

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

১.৮ সারাংশ

আমরা আশা করি এই একক পাঠ করে আপনি শিখতে পেরেছেন যে,—

- মানবজাতি সম্পর্কে পাঠ নেবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মানবিক বাস্তবতাকে আরো বেশী চিন্তাশীল পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
- মানুষকে জানার ও বোঝার জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দৃষ্টবাদী পদ্ধতি যখন প্রয়োগ করা হয় তখন মানুষকে প্রকৃতির লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু আমাদের উচিত ঐ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা।
- মানুষ প্রকৃতি ও সংস্কৃতি উভয়েরই সৃষ্টি।
- মানুষ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পাঠের জন্য সহমর্মিতা প্রয়োজন।

আমরা দেখলাম যে সামাজিক বাস্তবতা ও প্রাত্যহিক জীবনের মানবিক শর্তাবলী সম্পর্কে ধারণা এবং তাদের সম্পর্কে আমাদের যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব নেওয়া উচিত—এই দুইয়ের কোন সাযুজ্য প্রায়ই থাকে না। এমনকি সমাজবিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার ধারণা ও পদ্ধতিসমূহ সর্বদা আমাদের চতুষ্পর্শ্বস্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধতার মান ও মানবিক বিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। এ থেকেই জাতিকুলগত, আঞ্চলিক ও সামাজিক পক্ষপাতের জন্ম হয়। জাতিকুলকর্তৃত্ববাদ, জাতপাত সংক্রান্ত পক্ষপাত এবং আঞ্চলিক পক্ষপাত কেবলমাত্র তখনই দূর করা সম্ভব যখন সমাজবিজ্ঞান এইসব ঘটনাকে এমন একটি মডেল অনুসারে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা করবে যা মানুষেরই কেন্দ্রিকতাকে স্বীকার করে।

মানুষ সম্পর্কে অধ্যয়নের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এটাই প্রমাণ করে যে মানবজাতির মধ্যে বিশ্বব্যাপী ঐক্য, মর্যাদা ও স্বাধীনতা আছে। মানব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পাঠ এটাই জোর দিয়ে বলে।

১.৯ শব্দগুচ্ছ

অভ্যস্ত হওয়া : কোন বিষয় সম্পর্কে অভ্যাস গড়ে ওঠা।

সহমর্মিতা : মানসিকভাবে অন্য ব্যক্তির অবস্থানে নিজেকে বসানো।

শোষণ : শ্রমের মূল্য না দিয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর শ্রম আত্মসাৎ করা।
অদৃষ্টবাদ : নিয়তির অনিবার্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস।
অনুকল্প : একটি প্রস্তাব/বিবৃতি বা বক্তব্য যা পরীক্ষা বা সত্যতা প্রমাণের জন্য অপেক্ষমান; অসমর্থিত তত্ত্ব।
হীনতা : অন্যান্য মানুষ বা গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে অপর্যাপ্ততার অনুভূতি।
অযৌক্তিক : যা যুক্তিসম্মত নয়।
সাধারণ নীতি বা নিয়ম : নিয়ম বা পূর্বানুমান।
স্ববিরোধী : যা নিজের পক্ষে নয়।
দৃষ্টবাদ : একটি দার্শনিক তন্ত্র এভং সমাজবিদ্যার একটি পদ্ধতি যা সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণীয় তথ্যের উপর নির্ভরশীল।
পক্ষপাত : কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অভ্যাস ও আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মনোভাব।
ছদ্ম-বিজ্ঞান : প্রকৃত বিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তা নয়।
জাতিকুল কর্তৃত্ববাদ : যে মতবাদ এক জাতিকুলের চেয়ে অন্য জাতিকুলের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করে, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের তুলনায় শ্বেতাঙ্গদের উৎকৃষ্ট বলে মনে করা হত।
অনুষ্ঠান আচার : জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পর্বগুলোর চক্রসংক্রান্ত আচারবিধি।
বিশেষিকতা : সমাজবিজ্ঞানে যা বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে ভাবে।
সার্বজনীনতা : সমাজবিজ্ঞানে যা ব্যাপক সাধারণীকরণ নিয়ে ভাবে।
সিদ্ধতা : তথ্যের দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা।
নীতিমানবিচার : মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ-ভিত্তিক বিচার।
সত্যতা-প্রমাণ : তথ্য বা অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণ।

১.১০ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১) (ক) ✓ (খ) x (গ)✓

২) ১.২.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন

অনুশীলনী ২.

১) ১.৪ অনুচ্ছেদটি দেখুন

২) ১.৫.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন

৩) (ক) ✓ (খ) ✓ (গ) x (ঘ) x

অনুশীলনী ৩

১) (ক) x (খ) ✓ (গ) x (ঘ) x

২) ১.৫ অনুচ্ছেদটি দেখুন

একক ২ ❐ যন্ত্রনির্মাণ ও ব্যবহারকারী জীব হিসেবে মানুষ

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২. যন্ত্রনির্মাণ ঃ একটি বিবর্তনমূলক দৃষ্টিকোণ
২.২.১ প্রাচীন প্রস্তরযুগ
২.২.২ নব্য প্রস্তরযুগ
২.২.৩ তাম্রযুগ
২.২.৪ লৌহযুগ
২.৩ যন্ত্রনির্মাণ ও সংস্কৃতির অগ্রগতি
২.৩.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আদানপ্রদান
২.৩.২ বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাজন
২.৩.৩ নগরায়ণ বিপ্লব
২.৩.৪ ধর্মসমূহের উত্থান
২.৪ মানুষ ও প্রকৃতি ঃ অভিযোজন ও আদানপ্রদান
২.৪.১ অভিযোজনের ধারা
২.৪.২ উপজাতিগোষ্ঠী ও তাদের অভিযোজনের ধারা
২.৪.৩ খাদাভ্যাস ও নিষেধাজ্ঞা
২.৫ মানুষ ও প্রকৃতি ঃ নির্ভরতা, বিজয়াভিযান ও সমন্বয়
২.৬ সারাংশ
২.৭ শব্দগুচ্ছ
২.৮ উত্তরমালা

২.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে ও শিখতে পারবেন ঃ

- সংস্কৃতির বিবর্তনে যন্ত্রনির্মাণ কি ধরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- মানুষের যন্ত্রনির্মাণ ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের স্তরগুলি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে।
- মানুষ ও প্রকৃতির অভিযোজন ও আদানপ্রদানের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কৃতির উন্নতি কিভাবে দৃঢ় হয়েছে। এবং
- মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নির্ভরতা, বিজয় ও সমন্বয়ের ভূমিকা।

২.১ প্রস্তাবনা

একক ১-এর মাধ্যমে আপনারা জেনেছেন মানুষের জীবনযাত্রা বুঝতে হলে কেন যত্নসহকারে একটি

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। মানুষ প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটায় আবার তাদের প্রতিনিধিত্বও করে। মানুষ প্রকৃতির জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলি অঙ্গীভূত করলেও নিজের উন্নত বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক ক্ষমতা ও সৃজনীশক্তির মাধ্যমে তা ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মানুষের বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস প্রস্তর যুগ থেকে বৈদ্যুতিক ও আণবিক যুগ অবধি বিস্তৃত। এই এককের মাধ্যমে আমরা এই বিবর্তনের প্রমাণসহ বর্ণনা দেব। এই অংশে আমাদের আলোচনা প্রস্তরযুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

কতকগুলি বিশেষ সহজাত ক্ষমতার মাধ্যমেই মানুষ যন্ত্রনির্মাণে তার সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তি সাফল্য লাভ করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও এই ক্ষমতাগুলির বিশেষ ভূমিকা ছিল। প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে নব্য প্রস্তরযুগের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে যুগ যুগ ধরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তাম্রযুগ ও লৌহযুগ আরও পরিবর্তন আনে— সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।

আপনি জানতে পারবেন যে, বিবর্তনমুখী পরিবর্তনের স্তরগুলি কিভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৃদ্ধি ঘটায়। এই পরিবর্তনের ফলেই সৃষ্ট হয় শ্রমবিভাজন, কৃষি ও শিল্প, নগরায়ণ ও জ্ঞানের জগতে বিশাল অগ্রগতি। এই পরিবর্তনের ধারাই একদিকে বিভিন্ন ধর্মব্যবস্থা ও তাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানুষের প্রচেষ্টা ও প্রাকৃতিক শক্তির আদানপ্রদান বরাবরই অভিযোজনের সমস্যা তৈরী করে। প্রকৃতিকে অতিমাত্রায় শোষণ করলে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়। মানুষ কতটা প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছে এ প্রশ্নটি বরাবরই সমাজের কাছে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এই এককে আমরা মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কে বিভিন্ন দিক যা মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তা আপনার সামনে তুলে ধরব।

২.২ যন্ত্রনির্মাণ ঃ একটি বিবর্তনমূলক দৃষ্টিকোণ

প্রায়ই একথা বলা হয় যে কোন কোন অগ্রসর আদিম মানুষ হয়ত বা হাড় এবং পাথরকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তবে যন্ত্রনির্মাণ ও ব্যবহার প্রকৃত অর্থে শুরু হয় 'হোমোসেপিয়ান'-দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শুধু যন্ত্র ব্যবহারই করে না, সর্বদা তাতে উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা যদি বন্ধ হয়ে যেত তাহলে বর্তমান যুগের যে চেহারা আমরা দেখছি তা আর দেখা সম্ভব হ'ত না।

> প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মানুষের আদিপুরুষ বলতে সিনান্থ্রোপাস বা অন্যান্যদের উল্লেখ করেন।
>
> আদিমমানবের কিছু কিছু প্রত্ননিদর্শন জার্মানী (নিয়ানডার্থাল ম্যান), জাভা (জাভা ম্যান) ও রোডেশিয়ায় (রোডেশিয়া ম্যান) পাওয়া যায়। তবে পিকিং ম্যান-এর আবিষ্কারের গুরুত্বই আলাদা, কারণ এর মাধ্যমেই জানা যায় সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে বাস করা মানুষের অস্তিত্ব। পিকিংম্যান পাঁচ লক্ষ বছর আগে বাস করত বলে ধরে নেওয়া হয়।

সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ যন্ত্রের ভিত্তিতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা হস্তকুশলতার বিবর্তনের ইতিহাস তৈরী করেছেন। আপনারা হয়ত এই বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রস্তরযুগ (প্রাচীন

এবং নব্য), তাম্রযুগ ও লৌহযুগ—এইভাবে স্তরগুলি সাজিয়েছেন। তবে, সব স্তরগুলি একইভাবে পৃথিবীর সর্বত্র প্রকাশিত হয়নি। যখন একটি অঞ্চলে প্রস্তরযুগের শুরু হয়ে গিয়েছে, আবার তখন অন্য এক অঞ্চলে হয়ত লৌহযুগ চলছে। এই ক্রমবিকাশের ভিত্তিতেই তৈরী আদিম যুগের যন্ত্রনির্মাণ ও ব্যবহারের ইতিহাস।

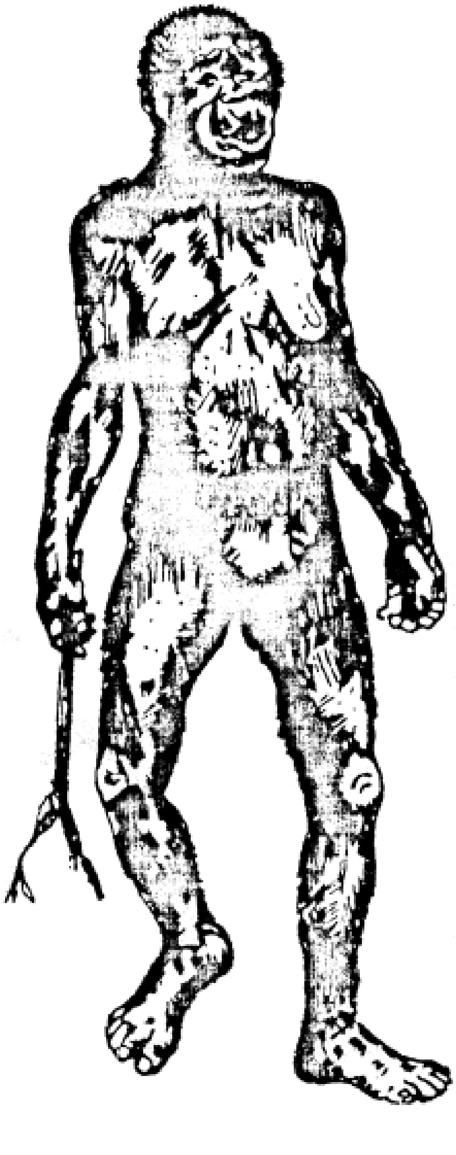

চিত্র ১. আদিম মানুষ

২.২.১ প্রাচীন প্রস্তরযুগ (প্যালিওলিথিক)

প্রাচীন প্রস্তরযুগ বা প্যালিওলিথিক যুগ শুরু হয় পাঁচ লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ বছরের মধ্যে। এই যুগে মানুষ সম্পূর্ণভাবে শিকার, মাছধরা এবং খাদ্য সগ্রহের মাধ্যমে জীবন ধারণ করত। এই সময় তারা খুবই সাধারণ মানের পাথরের অস্ত্র তৈরী করে শিকারের কাজে ব্যবহার করত। তাদের প্রয়োজন মিটতে থাকে মূলত ফাঁদ পাতা, শিকার করা, ফলমূল সংগ্রহ এবং খোঁড়াখুড়ির মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতির ওপর মানুষের কোনও নিয়ন্ত্রণ তো ছিলই না, উপরন্তু তারা প্রকৃতিনির্ভর ছিল।

এই যুগের সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ মর্গান আদিম বা বন্য স্তর বলে বর্ণনা করেছেন। এই সময় ধারালো চকমকি পাথর দিয়ে শিকারকে হত্যা করা, তার ছাল ছাড়ানো এবং নানা ধরনের শেকড়বাকড় খুঁজে বার করার কাজ চলতে থাকে। এখানেও অস্ত্র নির্মাণের এক ধরনের অগ্রগতি বা উন্নতি লক্ষ করা যায়। বড় বড় পাথরের দ্বারা তীক্ষ্ণ ফলা তৈরী করা ছাড়াও এই সময় কাঠের মুগুরের সাহায্যে সরু ফলা তৈরীতেও মানুষ সক্ষম ছিল।

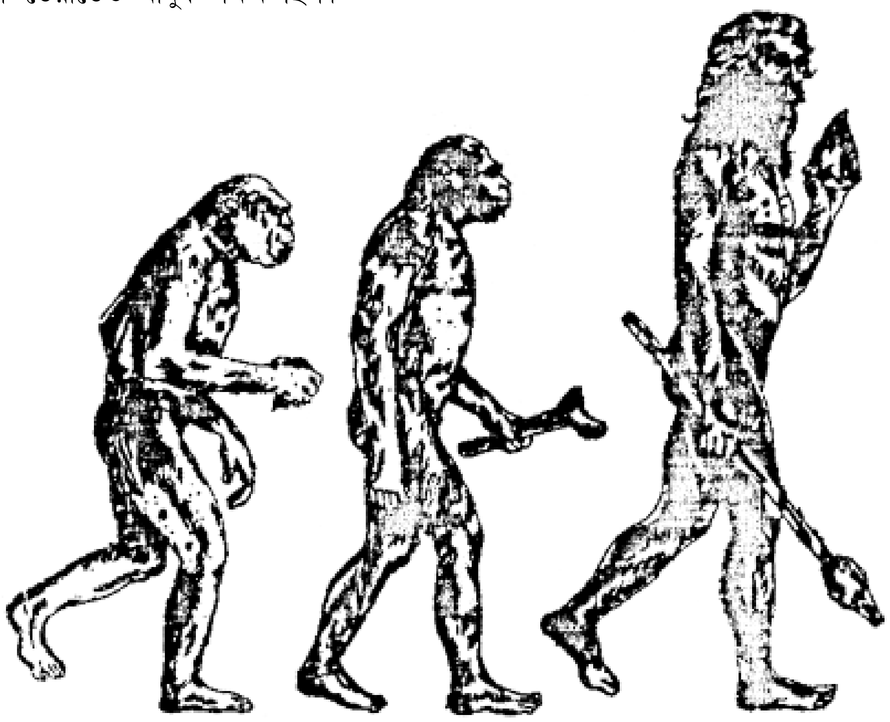

চিত্র ২. মানুষের বিবর্তন

২.২.২ নব্য প্রস্তরযুগ (নিওলিথিক)

এই যুগ শুরু হয় দশ হাজার থেকে বারো হাজার বছর আগে। এই যুগে মানুষ তার খাদ্যের জোগান বাড়াতে এবং অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। তারা এই কাজটি করে খাদ্যশস্য চাষ এবং পশু

পালনের মধ্যে দিয়ে। এই যুগের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে মর্গান বর্বর যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই সময় মৃৎপাত্র নির্মাণ, পশম, শণ এবং তুলো থেকে সুতো তৈরী করা শুরু হয়। এছাড়া উন্নতমানের ধারালো পাথুরে কুঠারও এই সময় তৈরী হয়। এসবের প্রভাব এত চমকপ্রদ হয় যে, এর ফলে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে 'নব্য প্রস্তরযুগ বিপ্লব' বলে বর্ণনা করা হয় যা পরবর্তীকালে মহান সংক্রমণ স্তরের সূচনা করে। দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক অবশিষ্ট থেকে বহু সংখ্যায় পাথরের তীক্ষ্ণ ফলা, হাড় দিয়ে তৈরী হারপুন ও নিড়ানীর ফাল, কাস্তে ও হার্ড-মিলের অমসৃণ পাথরের জাঁতার সন্ধান মেলে।

এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে, নব্য প্রস্তরযুগে খাদ্যচাষ কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই যুগে নির্মিত শস্যভাণ্ডারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যশস্য বেশী উৎপাদিত হত।

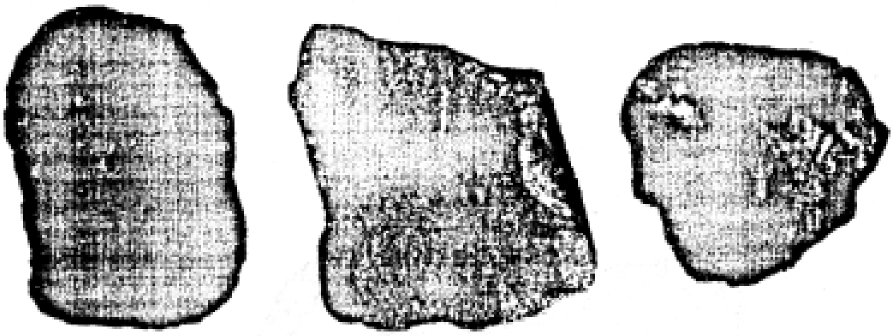

পাথুরে অস্ত্র

চিত্র ৩. (ক) বাঁদিকে—হাত কুঠার (কেনিয়া, আটলক্ষ বছর) মধ্যে—লওরেল লিফ পয়েন্ট (পশ্চিম এশিয়া, যাট হাজার-পঞ্চাশ হাজার বছর) ডানদিকে - স্ক্র্যাপার, (পশ্চিম এশিয়া, যাট হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর)

(খ) অসমাপ্ত হাতকুঠার (কেনিয়া, আট লক্ষ বছর) (গ) ক্লেভার (কেনিয়া, আট লক্ষ বছর)

২.২.৩ তাম্রযুগ

অস্ত্র নির্মাণে পরবর্তী বিপ্লব আসে পাঁচহাজার বছর আগে তাম্রযুগে। সেটা তিনহাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই সময় নগরকেন্দ্রিক বসতি, কুশলী মিস্ত্রি, ব্যবসায়ী, পুরোহিত, লিপিকার শ্রেণির সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময়ই লিপির চল গড়ে ওঠে । যেহেতু এ যুগে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে মূলত। তামাই ব্যবহার করা হত সেজন্য এ যুগকে তাম্রযুগ বলা হয়। এধরনের নির্মাণ পদ্ধতির জন্যই এ যুগে খনিশ্রমিক ও কামারদের উৎসাহ দেওয়া হত। একথা ঠিক যে, একটি তামার কুঠার নির্মাণে প্রস্তরযুগের থেকে বেশী বিজ্ঞান চেতনা দরকার হত। তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ভারত, মেসোপটেমিয়া এবং গ্রীসে তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরীর কৌশল আবিষ্কৃত হয়। এই সময়ই আবিষ্কৃত হয় চাকা। তামার পেরেক কাজে লাগিয়ে নির্মিত চাকা ও তার ব্যবহার পরিবহণে বিপ্লব ঘটায়। এযুগে বিভিন্ন কাজে দুচাকা এবং চার চাকার গাড়ি ব্যবহার হতে থাকে।

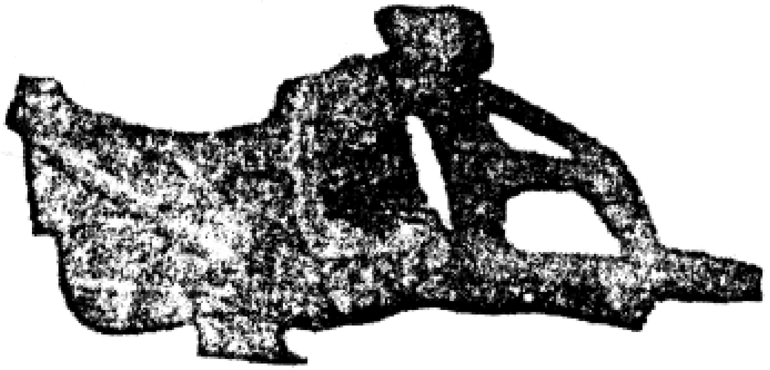

চিত্র নং ৪ সিন্ধুউপত্যকার রথ (৩৫০০ - ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

এই সময়ই হাওয়ার গতিকে কাজে লাগিয়ে জল পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়। পলিনেশিয়া থেকে মিশর যেতে ব্যবহার করা হতে থাকে পাল তোলা নৌকা। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে জানা যায় যে, এই যুগে পোড়া ইট ব্যবহার করা হত। সুতরাং, প্রভূত জ্বালানী ব্যবহার এবং উচ্চ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এ যুগে অজানা ছিল না।

তাম্রযুগে সংগঠিতভাবে জমি ব্যবহার করা হত। জলাভূমি ও মরুভূমি থেকে তৈরী করা জমিতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হত। কৃত্রিম প্রণালী প্রয়োজনে কাজে লাগিয়ে আবহাওয়র খামখেয়ালীপনা থেকে সমাজকে রক্ষা করা যেত। তবে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এই যুগে মানুষ তামা গলিয়ে ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন না করলে এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসত না। তামাকে প্রয়োজন মত বাঁকানো যায়, পিটিয়ে বিভিন্ন আকার দেওয়া যায় বা পাতে পরিণত করা যায়। পাথরে এ কাজ সম্ভব নয়। এছাড়া, তামা গলিয়ে তরলে পরিণত করা যায় এবং সেই তরল তামাকে যে কোন আকৃতি দেওয়া যায়। আবার তামার মধ্যে পাথর, হাড় বা কাঠের সব গুণাবলীই আছে। তামা পাথরের মতই ধারালো কিন্তু বেশী টেঁকে।

তামার অস্ত্র ভেঙে গেলেও তা আবার সহজেই তৈরী করে নেওয়া যায়। আর সেই কারণেই তামার সুবিধা পাথরের থেকে অনেক বেশী। তাম্রযুগে তামাকে এই ধরনের নানা কাজে ব্যবহার করা হত।

২.২.৪ লৌহযুগ

এই যুগ শুরু হয় আনুমানিক বারোশো খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ। লোহা, তামা বা টিনের মত দুষ্প্রাপ্য নয়। পৃথিবীর বুকে লোহা সহজেই পাওয়া যায় (তার মানে অবশ্য এই নয় যে সেই যুগে লোহা সহজলভ্য ছিল)। শুরুতে লোহা দুষ্প্রাপ্য ধাতু ছিল। লোহাকে সেই পদ্ধতিতেই খনি থেকে বার করা হত যে পদ্ধতি তামার ক্ষেত্রে চালু ছিল। তবে তফাৎ ছিল এই যে, তামা গলানোর ক্ষেত্রে যে তাপমাত্রা প্রয়োজন, খনি থেকে লোহা বার করার ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশী তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। শুরুতে শুধু পেটানো লোহার প্রচলন ছিল। দীর্ঘদিন পরে আর্মেনীয় পার্বত্য এলাকার বর্বর উপজাতিরা লোহা গলানোর কৌশল আবিষ্কার করে। এই কৌশলটি বিশেষভাবে গোপন রাখা হত, এবং এর ফলে তা বিভিন্ন সূত্র ধরে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে পৌঁছতে বহু সময় নেয়।

তাম্রযুগের প্রযুক্তির এই অগ্রগতির সময়েই গ্রীস, এশিয়া মাইনর, মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের বড় বড় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। ইউরেশী এলাকার বর্বর জাতির দ্বারা লোহার অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার হওয়ার ফলে এই সাম্রাজ্যগুলি বিপদের সম্মুখীন হয়। ভারতে এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ লোহা ব্যবহার হতে থাকে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক খননের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আটশো খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ উত্তর প্রদেশের পশ্চিমে তীর ও বর্শায় লোহার তৈরী ফলা ব্যবহার করা হত।

গর্ডন চাইল্ডের (Gordon Childe) মতে, "সস্তা লোহা কৃষি, শিল্প এমন কি যুদ্ধবিগ্রহকে এক গণতান্ত্রিক রূপ দেয়।" যে কোন কৃষকই লোহার কুঠারের সাহায্যে নিজের জমি তৈরী করে নিতে পারত এবং লোহার হালের ফলার সাহায্যে পাথুরে জমি ভাঙ্গাতে পারত। অতীতে উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্র ছিল দামী, দুর্লভ। লোহা আবিষ্কারের পরে এই পার্থক্য দূর হয়।

চিত্র নং ৫ তক্ষশিলার লোহার অস্ত্রশস্ত্র (এক থেকে পাঁচ খ্রীষ্টাব্দ)

অনুশীলনী ১

সতর্কভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি পড়ুন ও সঠিক উত্তরে দাগ দিন।

(প্রত্যেক প্রশ্নে একাধিক সঠিক উত্তর থাকতে পারে)

১. প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত

ক) শস্য চাষ করে

খ) শিকার করে

গ) জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে

ঘ) অন্য দেশ থেকে আমদানী করে

২. নিচের বিবৃতিগুলির সত্য মিথ্যা যাচাই করুন

১) নব্য প্রস্তরযুগে

ক) ভোগ করার পর অতিরিক্ত খাদ্য পাওয়া যেত না

খ) হাতকুঠার বানানোর কৌশল মানুষের জানা ছিল না

গ) মানুষ পশুপালন করত

ঘ) অস্ত্র তৈরীতে হাড় ব্যবহার করা হত

(২) ব্রোঞ্জের অস্ত্র তৈরী করার জন্য ব্যবহার করা হত

ক) তামা

খ) টিন

গ) তামা ও লোহার মিশ্রণ

ঘ) তামা ও টিনের মিশ্রণ

(৩) হাওয়াকে শক্তি হিসেবে এবং চাকা প্রথম ব্যবহার করা হয়

ক) প্রাচীন প্রস্তরযুগে

খ) নব্য প্রস্তরযুগে

গ) লৌহযুগে

ঘ) তাম্রযুগে

(৪) লৌহযুগে লোহা ব্যবহার করা হত

ক) বন্দুক তৈরীতে

খ) জঙ্গল পরিষ্কারের কুঠার তৈরীতে

গ) কৃষির জন্য হাল তৈরীতে

ঘ) যন্ত্র তৈরীতে

২.৩ যন্ত্রনির্মাণ ও সংস্কৃতির অগ্রগতি

মানুষ শৈশবে বিশেষভাবে দুর্বল থাকে। দীর্ঘদিন লালিত হয়ে শিশু বড় হয়। এটা ধরে নেওয়া হয় যে দীর্ঘ সামাজিকীকরণ ও যত্নের ফলেই মানবশিশু সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। মানুষের উন্নত ধীশক্তি তাকে অন্য জীবের ওপরে কর্তৃত্ব স্থাপনে সাহায্য করে। একথা আমরা বলতে পারি যে,

এই মানসিক শক্তি তৈরী করে সংস্কৃতি এবং তার ক্রমোন্নতি। হোমোসেপিয়ানদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এর পর শুরু হয় তার দ্রুত উন্নতি। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবেই মানুষ তার নিজের সৃষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি করার ও তার উন্নতিবিধান করার ক্ষমতা রাখে। এখানে আমরা সর্বজনীন অর্থে মানুষ কথাটি ব্যবহার করছি। প্রত্যেক জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষ একই ক্ষমতার অধিকারী। এরা সকলেই হোমোসেপিয়ান্স্। প্যালিওলিথিক যুগ থেকে মানুষ শুধুমাত্র অস্ত্র নির্মাণ, শিকার ও বংশবৃদ্ধিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। তারা আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির অধিকারীও ছিল। তাদের প্রেতাত্মা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল। তারা বলিদান করত এবং উৎসবের মধ্যে দিয়ে মৃতকে সমাধিস্থ করত। শুধু তাই নয়, তাদের এই আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি আরও উন্নত হয় অঙ্কন ও খোদাই শিল্পের মধ্যে দিয়ে।

নব্যপ্রস্তর যুগে মানবসংস্কৃতি আরও এগিয়ে যায়। গম ও যব উৎপাদনের ক্ষমতা, গৃহপালিত পশুর উপর নিয়ন্ত্রণ ও মৃৎশিল্পের মাধ্যমে সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি হয়। এ যুগের বহু আবিষ্কার, যেমন, মদ তৈরীর প্রণালী বা মৃৎশিল্প সেই সময়কার মহিলাদের অবদান বলে ধরা হয়। যখন পুরুষেরা জমি ও কুটির তৈরী করত, শিকার করত, পশুপালনে মন দিত এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি নির্মাণ করত, তখন মহিলারা বাসগৃহসংলগ্ন জমির চাষ, রান্না, পোশাক-আশাক তৈরী ও পোড়ামাটির বাসন তৈরীতে ব্যস্ত থাকত। মহিলারা গয়নাগাঁটি ও জাদু এবং আধ্যাত্মিক উৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্মাণ করত।

২.৩.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আদানপ্রদান

এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও নব্য প্রস্তরযুগে মানুষ যথেষ্ট নিঃসঙ্গ ছিল। তাদের গ্রামগুলি সাধারণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং যা খাদ্য উৎপাদন হত তা গ্রামের জনসংখার পক্ষে মোটামুটিভাবে পর্যাপ্ত ছিল। অতিরিক্ত উৎপাদনের কোনও উৎসাহ ছিল না। গ্রামবাসীরা সাধারণত মরুদ্যান বা পর্বতের পাদদেশে বা ঘন জঙ্গলের মধ্যে বাস করত। এর ফলে এযুগের মানুষের বাইরের জগতের সঙ্গে খুব বেশী সম্পর্ক বা যোগাযোগ থাকত না। তুলনামূলকভাবে শুষ্ক ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং এর ঠিক পূর্বদিকে স্থাপিত বসতির মানুষের মধ্যে অধিকতর আদানপ্রদান ছিল।

মৃৎশিল্প, সেঁকা পদ্ধতি, মদ চোলাইয়ের কৌশল ও গাছ-গাছড়া নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে নব্য প্রস্তর-যুগে বিজ্ঞানের কিছু অগ্রগতি ঘটলেও এ যুগে কোনও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধান বা 'নেতৃত্ব নীতি'-র সন্ধান পাওয়া যায় না। নব্য প্রস্তরযুগের প্রথম দিকে মানুষ শান্তিপ্রিয় ছিল বলেই মনে হয়। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের শিকারের চেয়ে হাতিয়ারই এ যুগে বেশী পাওয়া যায়। বেশ কিছু সমাধিস্থল ও কবরের তুলনা করে দেখা গেছে যে, জনসংখ্যা পূর্বতন প্রস্তরযুগের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এ থেকেই বলা যায় যে, এ যুগের বস্তুগত উৎপাদন যথেষ্ট পরিশীলিত চেহারা পায়।

২.৩.২ বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাজন

তামা বা ব্রোঞ্জ-এর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এই যুগে বিশেষজ্ঞ, যেমন ধাতু বিশেষজ্ঞ ও ধাতু শ্রমিক প্রভৃতির উদ্ভব হয়। এরা নিজেদের কৌশল রক্ষা করার তাগিদে সংঘ ও গোষ্ঠী তৈরী করে। ধাতুর অস্ত্র জন্ম দেয় এক স্থায়ী শাসক শ্রেণির। ছোট বসতি বা গ্রামের মধ্যে আদানপ্রদান আরও বাড়তে থাকে। ছোট্ট

জমির বদলে বৃহৎ এলাকা জুড়ে চাষ প্রচলিত হওয়ায় মহিলাদের কৃষিক্ষেত্রে আর ভূমিকা থাকে না। যখন মহিলারা জমির আগাছা পরিষ্কার করত তখন পুরুষেরা হাল চালাত। এই প্রক্রিয়ার শুরুতে এক জোড়া বলদকে কাজে লাগিয়ে জমি থেকে আগাছা তোলা হত। এভাবেই হয়ত লাঙলের ফলার উদ্ভব হয়েছে।

২.৩.৩ নগরায়ণ বিপ্লব

ব্রোঞ্জ যুগে নগরায়ণ বিপ্লব ঘটে যায়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠে সুমের ও অক্কড অঞ্চলে। নগরগুলি নানা কর্মব্যস্ততার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে বহুশত শ্রমিককে পরিচালিত করে মন্দির গড়ে তোলা হত। এর জন্য পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা তৈরী করা হত। প্রথমদিকে সুতোর সাহায্যে মন্দিরের বিন্যাস করে নিয়ে নির্মাণকাজ শুরু হত।

তাই স্বাভাবিকভাবেই স্থাপত্যবিদ্যার প্রাচীন জ্ঞানকে ভারতে শুল্ব(সূতা) সূত্র বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এই ধরনের মনোহর মন্দিরগুলি পরিচালনা করার প্রয়োজন ছিল। এর জন্য আয় ব্যয়ের হিসেবও রাখতে হত। এই কারণেই দুহাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ অক্ষরের আবির্ভাব ঘটে। পূজাপাঠ প্রতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ায় এটা স্বাভাবিক ছিল যে এক বিশেষ পুরোহিত শ্রেণির উদ্ভব হবে। এই পুরোহিতরাই ছিল লিখনধারার প্রথম বাহক। এই ধারায় প্রতিফলিত হত পুরোহিত শ্রেণিরই দৃষ্টিকোণ।

এই সময় থেকে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য ভয়াবহ হতে থাকে। বলপ্রয়োগ, দুর্ব্যবহার, দাসত্ব এবং সব ধরনের অত্যাচারের মুখেই পড়ত দরিদ্ররা। ব্রোঞ্জযুগের জটিল প্রযুক্তি কৌশল অর্জন করার ফলেই এ সমস্ত বিভাজন ও সামাজিক বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। এই কুশলতার ফলে খাদ্য উৎপাদনের উদ্বৃত্ত জন্ম দেয় স্তরবিন্যাসের এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের। নগরায়ণ বিপ্লব জ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতি এনে দেয়। জ্যামিতি, অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা এবং ঈশ্বরতত্ত্বের অসাধারণ অগ্রগতি হয়। মিশরীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে চিহ্নের ব্যবহার আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নীলনদ উপত্যকায় গড়ে ওঠে সৌর ক্যালেন্ডার। ব্রোঞ্জযুগের পরবর্তী পর্যায়ে গড়ে ওঠে নগরসভ্যতা। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার মধ্যে এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই সময়কার অন্য সভ্যতাগুলির সঙ্গে দুই সভ্যতা জ্ঞান বণ্টন করে নেয়।

উদ্বৃত্ত খাদ্য ও অস্ত্র উৎপাদন এবং এক শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিকতা ও আচার ব্যবস্থার আওতায় দেখা যায়।

২.৩.৪ ধর্মসমূহের উত্থান

ব্রোঞ্জযুগে বৌদ্ধিক উন্নতি আরও পরিশীলিত রূপ নেয়। সিন্ধুসভ্যতাই এর এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। এছাড়া বেদ এবং উপনিষদের উচ্চ বৌদ্ধিক মানের কথা আমরা জানি। এই অসাধারণ গ্রন্থগুলি শুধু যে প্রাত্যহিক জীবন বিষয় সম্বলিত তাই নয়, জীবনের রহস্য এবং অন্যান্য দার্শনিক প্রেক্ষিতেরও আলোচনা আছে এসবে। এখানে বিশদভাবে বিভিন্ন ধর্মমত এবং মানুষের জীবনযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়।

ধর্মমতবাদের ক্রমোন্নতি বিভিন্নভাবে ঘটে। গৌতম বুদ্ধ আবির্ভূত হন তাঁর নতুন ধর্মমত নিয়ে এবং আনুমানিক পাঁচশো খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বা তার কিছু পরে নির্বাণলাভ করেন। এই সময় বা পরবর্তী শতাব্দে কন্‌ফ্যুসিয়াস এবং লাও-ৎ- সে যথাক্রমে চীনে কন্‌ফ্যুসিয়বাদ এবং তাওবাদের প্রচলন করেন। ইরানে যখন

লৌহযুগ শুরু হয়, তখন সেদেশের উত্তরাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন ধর্মপ্রচারক জরথুষ্ট্র। সুতরাং দেখা যায় যে, লৌহযুগে ঝোঁক ছিল ব্রোঞ্জযুগের পুরোহিতদের ধর্মধারার সঙ্গে একধরনের পার্থক্য তৈরী করা। লৌহযুগে ঈশ্বরতত্ত্বে সবথেকে বড় সমস্যা ছিল ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সমন্বয় সাধিত করা। এরই মধ্যে গ্রীস এবং ভারতে দর্শন এক নতুন পথে চালিত হতে থাকে, এবং প্রকৃতিকে বিভিন্ন অংশের সমষ্টি হিসাবে দেখতে থাকে। এর মধ্যে গ্রীসে ''অ্যাটম''-এর তত্ত্ব ও ভারতে অণুর ধারণা গড়ে ওঠে।

অনুশীলনী ২

(নিচের অংশটুকু উত্তর লেখার জন্য ব্যবহার করুন।)

১. ব্রোঞ্জ ও লৌহ-যুগের উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রধান কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল ?

....

....

....

....

....

....

....

....

২. নীচের বিবৃতিগুলির সত্য বা মিথ্যা যাচাই করুন

ক) নব্য প্রস্তরযুগের মনুষেরা শান্তিপ্রিয় ছিল

খ) নব্য প্রস্তরযুগে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল

গ) প্রস্তরযুগে নগর-বসতি ছিল

৩. নগরায়ণ বিপ্লব সম্পর্কে আপনার ধারণা পাঁচটি লাইনে লিখুন

....

....

....

....

....

....

....

....

২.৪ মানুষ ও প্রকৃতি ঃ অভিযোজন এবং আদানপ্রদান

আবহাওয়া এবং ভূগোলের প্রকৃতিগত পার্থক্যের মাধ্যমে মানব জাতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা একটি প্রচলিত ধারা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অস্ত্র নির্মাণ ক্ষমতা এবং সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং ধর্মের অগ্রগতির কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। শুধু ভৌগোলিক পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে মানবসভ্যতার এই ধরনের তফাৎ ধরা যাবে না। ব্রোঞ্জযুগ বা নব্য প্রস্তরযুগের প্রভাব একটিমাত্র ভৌগোলিক ক্ষেত্রে সীমিত না থেকে ইউরোপ ও এশিয়ায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শৈল্পিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিও বিশ্বে একই ভাবে ছড়িয়েছিল।

২.৪.১ অভিযোজনের ধারা

এ সত্ত্বেও অস্ত্র নির্মাণকারী হিসেবে মানুষ কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেয় এবং প্রকৃতিকে দমন করে তা আলোচনা করা দরকার। প্রত্যন্ত উত্তরমেরুর এস্কিমোরা তাদের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। একইভাবে মানিয়ে নিয়েছে মধ্য এশিয়ার ঘোড়া ও ভেড়া পালনকারী কাজাক ও কিরঘিজ উপজাতি।

অন্যদিকে এও দেখা যায় একই পরিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রা ভিন্ন হচ্ছে; যেমন, রাজস্থানেই পাওয়া যায় যাযাবর শ্রেণীর মানুষ আবার স্থায়ীভাবে বসবাসকারী গোষ্ঠীকে। আসলে প্রকৃতি অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষ তার পরিবেশ থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত, মানুষ তার এলাকা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সম্পদ আহোরনের বিভিন্ন পথও খুঁজে বের করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ছোটনাগপুর উপত্যকার অধিবাসীদর কথা বলা যায়। এরা জীবনধারণের জন্য অজৈব প্রাকৃতিক পদার্থ আহরণ করে এবং এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন ধারার আদানপ্রদান ঘটে।

স্বাভাবিক ভাবেই পরিবেশ মানুষের উপর কতকগুলি সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এস্কিমোদের গরম পোশাক পরতেই হয় আবার সাঁওতালরা প্রয়োজনে নগ্ন থাকতে পারে। এস্কিমোরা কৃষি কাজ করতে পারে না বলে জীবনধারণের জন্য শিকার করে। হোপিরা কৃষি কাজের কৌশল জানে কিন্তু মরুভূমিতে বাস করে বলে ভূট্টার ফলনের জন্য বন্যার জলের ওপর নির্ভরশীল।

মানুষ নিজের সুবিধার জন্য পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়। শস্য এবং ঝোপঝাড় জমিকে উর্বর করে কৃষিকাজ করার উদাহরণ আছে। বাঁধ তৈরী করে জল জমানো পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার আর একটি দৃষ্টান্ত। আগে অনুমান করা হত যে, ‘‘আদিম’’ সমাজের মানুষ প্রকৃতিকে রহস্যের চোখে দেখে। কিন্তু আধুনিক নৃতত্ত্বে বলা হয় শিল্পোন্নত যুগের নগরবাসীদের থেকে ঐ যুগের মানুষেরা প্রকৃতিকে সূক্ষভাবে দেখত এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তাদের সম্যক্ জ্ঞান ছিল বেশী।

২.৪.২ উপজাতি গোষ্ঠী এবং তাদের অভিযোজনের ধারা

আধুনিক সভ্যতা স্পর্শ করার অনেক আগে থেকেই উপজাতিদের বেশী সচলতা ছিল এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তারা বিচরণ করত। প্রস্তরযুগের মানুষের মত তারা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত জমিতে উর্বরতা ফেরাতে সচেষ্ট থাকত। উপজাতিগোষ্ঠীগুলির চাষ করার জন্য বিস্তীর্ণ জমি থাকা সত্ত্বেও তারা কিছুটা জমি ফাঁকা রেখে দিত। সেই জমিতে চারা গাছ পুঁতে জঙ্গল বানানোর চেষ্টা করত। পরে তারা সেই জমি

আবার ব্যবহার করতে ফিরে আসত। এই ভাবে তারা নিজেদের সুবিধার্থে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করত।

চিত্র ৬. একজন উপজাতি শিকারী

আদিম মানুষকে প্রকৃতি এবং পরিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হত। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে দমিয়ে রাখার কৌশল সে শিখেছিল, যা কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি ব্যবহার করতে দেখা যেত। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সে মিতব্যয়ী ছিল। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ক্যাঙারুর মাংস খাওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিরা ক্যাঙারুর হাড় দিয়ে অস্ত্র, নখ দিয়ে গলার হার, পেশী দিয়ে বর্শার বাঁধন, চর্বি দিয়ে প্রসাধন এবং রক্তকে কাঠকয়লার সাথে মিশিয়ে রং হিসেবে ব্যবহার করত। উপজাতিরা শেকড়বাকড়ের সাহয্যে মাংসের পচন রোধ করা অথবা একই উদ্দেশ্যে মাংসকে ঝলাসানোর কৌশলও জানত।

উপজাতির চিকিৎসাপদ্ধতি থেকে নানাধরনের প্রকৃতি নির্ভর ঔষধাদি সম্বন্ধে জানা যায়। এটা

দুর্ভাগ্যজনক যে ভেশজ ঔষধাদি সম্পর্কে বহু গবেষণা করা হলেও তা মূলত উপজাতি চিকিৎসা অতি প্রকৃতি দিকগুলি তুলে ধরে। আসলে উপজাতীয় জ্ঞানধারায় প্রকৃতি নির্ভর ঔষাধাদি ব্যবহার করে কোন্ কোন্ অসুখ সারানো যাবে এবং কোন্টা যাবে না তার মধ্যে পার্থক্য করা হত। শুধুমাত্র কয়েকটি ব্যাধির ক্ষেত্রেই অতিপ্রকৃত শক্তির উপর নির্ভর করা হত। এর থেকে বলা যায় যে, মানুষ তার পরিবেশগত সীমাবন্ধতার মধ্যেই ক্রমাগত পরীক্ষানিরীক্ষা এবং অবলোকনের মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করত। উপজাতিগোষ্ঠীগুলি গাছ, তন্তু, শেকড়- বাকড়, পাথর, মাছ ও জীবজন্তুর অপেক্ষাকৃত অজানা গুণগুলির সম্পর্কে অবহিত ছিল। তারা গ্রহের আবর্তন, জোয়ার-ভাঁটা, আবহাওয়া, ঋতু এবং এই ধরনের বিষয় সম্পর্কেও কিছু জানত। তারা প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্কে দারুণ প্রকৃতির ভাষা বুঝতে পারে যা অন্যরা পারে না। এবং এর মাধ্যমে তারা ঋতুর-দৈঘ্য, সময়কাল এবং মাত্রা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে পারত। এই জ্ঞানের অনেকাংশই লোকসমাজে বাহিত হয়ে এসেছে এবং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এই অর্জিত জ্ঞানের উন্নতিসাধনও হয়েছে।

২.৪.৩ খাদ্যাভ্যাস এবং নিষেধাজ্ঞা

খাদ্যাভ্যাস এবং নিষেধাজ্ঞা বলতে এমন প্রক্রিয়াগুলির কথা বলা হচ্ছে যা কোনও কোনও গোষ্ঠীর মানুষকে কোন কিছু খেতে বা না খেতে উদ্বুদ্ধ করে। খাদ্যাভ্যাস বা নিষেধাজ্ঞার সম্পূর্ণ যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা সবসময় দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষ এক সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবও বটে। খাদ্যাভ্যাসের মধ্য দিয়ে মানুষের এলাকাভিত্তিক পার্থক্য গড়ে ওঠে । ভারতের বাংলা থেকে কন্যাকুমারী এবং গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে নানা সাদৃশ্যের মধ্যেও ভিন্ন ধরনের খাদাভ্যাস এবং খাদ্য সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আছে। বাঙালী ভদ্রলোক মাছ খেয়ে তৃপ্তি পায় কিন্তু কোনও গুজরাটী ভদ্রলোক কখনও তার রান্নাঘরে মাছ ঢোকায় না। এও আমরা জানি যে, মুসলমানরা গরু বা পাঁঠার মাংস খেলেও শুয়োরের মাংস কখনও ছোঁবে না। সেরকম অনেক হিন্দু আছেন যাঁরা পাঁটা এবং মুরগীর মাংস খেলেও গরুর মাংস কখনও খান না। এমন অনেকে আছেন যাঁরা ডিম খেলেও মুরগী খান না। খাদ্য সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার অনেক কারণ আছে, যেমন কৃষি কাজে গরু এবং বলদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে কোনও কৃষিভিত্তিক সমাজে তাদের হত্যা করে খাওয়া বারণ। আরব অঞ্চলে শুয়োরের মাংস খেয়ে অসুখ করত বলেই সম্ভবত মুসলমানদের শুয়োরের মাংস খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

২.৫ মানুষ ও প্রকৃতি ঃ নির্ভরতা, বিজয়াভিযান ও সমন্বয়

প্রস্তরযুগ থেকেই মানুষ তার অস্ত্রের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে আদানপ্রদান এবং অভিযোজন করে চলেছে। প্রস্তরযুগে মানুষ বা কালাহারির জংলী মানুষ হয়তো খুবই সাধারণ মানের হাতিয়ার যেমন খুরপি, আগাছা কাটার যন্ত্র, হাড় নির্মিত লাঙল ব্যবহার করত। এই ধরনের হাতিয়ারের দ্বারাই এই যুগের মানুষ খাদ্য, বাসস্থান ও পোশাকের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর যুঝত। পরবর্তীকালে প্রস্তর যুগের মানুষ আর শুধু শিকারী ও খাদ্যসংগ্রহকারী রূপে থাকল না।

যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহের জন্য উন্নত মানের অস্ত্র ও আরও উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে থাকল। কিন্তু এর ফলে মানুষের মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্য তৈরী হতে

থাকল। দক্ষিণ আফ্রিকার হটেনটট্ গোষ্ঠীর মানুষ যারা কিছুদিন আগেও শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করত, তারা একাকিত্ব ও নিজস্বতা বুঝত না, দল বেঁধে থাকত ও একে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। কোন মানুষই এই পরিস্থিতিতে নিজের শিকার অন্যের মধ্যে বন্টন না করে নিজের কাছে রাখার কথা ভাবতে পারত না। এদের অস্ত্র এতই অনুন্নত ছিল যে এই গোষ্ঠীর মানুষ জানত না সে কখন আর একটি শিকার পাবে। সুতরাং সে গোষ্ঠীর ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হত।

এমন কি আজও আমরা নব্য প্রস্তরযুগের মানুষের কৃষির মাধ্যমে প্রকৃতিকে সুসংহতভাবে ব্যবহার করার ঐতিহ্য বহন করে আসছি। নব্য প্রস্তরযুগ থেকেই প্রয়োজনের তাগিদে প্রকৃতিকে আরও বেশী ব্যবহার করার প্রক্রিয়া চলে আসছে। কৃষি ও পশুপালনে অগ্রগতি, ব্রোঞ্জ ও লোহার আবিস্কার, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ও গাড়ির আবিষ্কার এসবই প্রকৃতিকে জয় করার প্রমাণ দেয়। সুতরাং প্রকৃতির সংগে আদানপ্রদানের দুটি দিক আছে — ১) প্রকৃতির সঙ্গে সহজ অভিযোজন এবং (২) প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা।

প্রকৃতির বিশাল ক্ষমতার কথা ভাবলে অবশ্য বলা যায় তুলনায় মানুষ খুব কমই প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাতে পেরেছে; কিন্তু এ সত্ত্বেও আজ সমাজ প্রকৃতি সম্পর্কে এক আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়েছে। একথা আমরা ভুলে গেছি যে, প্রকৃতিকে ব্যবহার করার একটি সীমা থাকা প্রয়োজন।

উন্নততর নতুন মাত্রায় পৌঁছানোর জন্য অস্থির চেষ্টা মানবপ্রকৃতির একটা দিক। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় মানুষকে জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণের সাহায্যে, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও ধ্বংস করার কথা ভুলে এমন অস্ত্র এবং প্রযুক্তি বানাতে হবে যার সঙ্গে প্রকৃতির সমন্বয় আছে। হতাশার সঙ্গে আমরা লক্ষ করি আমাদের চারদিকে বনাঞ্চলের ধ্বংসলীলা এবং জল ও বায়ু দূষণ। একইরকমভাবে হতাশার মধ্যেই আমরা দেখি, শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নতি কিভাবে আমাদের প্রকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করেছে। এখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা আবিষ্কার থেকে পিছিয়ে আসার কথা বলা হচ্ছে না। সে প্রচেষ্টা হবে ব্যর্থ এবং তা সময়ের স্রোতের বিরুধে। আমাদের সমস্যাগুলির সমাধানের পথ লুকিয়ে আছে নয়া প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহারের মাধম্যে। ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ যখক শিকারী ও সংগ্রহকারীর ভূমিকায় ছিল তখন বিভিন্ন রোগের কারণে তাদের কি বেদনাদায়ক মৃত্যু হয়েছে। বিজ্ঞানের যাদু মানুষের জীবন দীর্ঘায়িত করেছে । খুবই ভালো হয় যদি এই বিজ্ঞানই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে দীর্ঘায়িত করে।

অনুশীলনী ৩

১. উপজাতির জীবন সম্পর্কে আপনার ধারণা পাঁচলাইনের মধ্যে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

২. মানুষ কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে তা পাঁচ লাইনের মধ্যে লিখুন।

....

....

....

....

....

২.৬ সারাংশ

প্রকৃতি মানুষকে চিন্তা করার এবং সক্রিয় হবার ক্ষমতা দিয়েছে। জৈবিক বিবর্তন মানুষকে অস্ত্র তৈরী, প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বা প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিয়েছে। অস্ত্র নির্মানের ক্ষমতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় পাথরের অস্ত্রের বদলে এসেছে ব্রোঞ্জ এবং পরে লৌহ নির্মিত অস্ত্র। প্রত্যেক পর্যায়ের সংস্কৃতি, শিল্প, সামাজিক সংগঠন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি ঘটেছে। ব্রোঞ্জযুগে তৈরী হয় পেশাভিত্তিক সঙ্ঘ এবং নগর কেন্দ্রিক বসতি। লৌহযুগে গড়ে ওঠে জটিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা এবং অঙ্কশাস্ত্র যা পরবর্তীকালে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক সভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ব্রোঞ্জযুগ থেকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে লৌহযুগে লিখন সম্পূর্ণ চেহারা পায়।

সংস্কৃতির বস্তুগত প্রেক্ষিতগুলির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধারণা মূল্যবোধ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও বিবর্তন ঘটে। মানুষের অস্ত্র তৈরীর ক্ষমতা তাকে প্রকৃতির সাথে মানিয়ে নিতে এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্যে করে। আমাদের সভ্যতার সংকটের একটা বড় অংশ এই অভিযোজনের প্রকৃতির কারণে ঘটে। বর্তমান শিল্প এবং আনবিক সভ্যতার উত্থানে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সমন্বয়সাধনের পথ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।

২.৭ প্রধান শ্বব্দগুচ্ছ

অভিযোজন - যে কোনো অবস্থার সাথে মানুষের মানিয়ে চালার প্রক্রিয়া।

কালবিরুদ্ধ - কাল (সময়) নিরূপণে ভ্রান্তি ঘটেছে এমন।

বিবর্তনমূলক - অপরিবর্তনীয় ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া যা প্রাণী বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উচ্চতর স্তরে এগিয়ে দেয়। যেমন লেজহীন বানর থেকে মানুষে বিবর্তন।

মুগুর - কাঠের তৈরী অস্ত্র।

সংস্কৃতি - জীবন, শিল্পকলা, চিন্তাশক্তি, নিয়মশৃঙ্খলা ইত্যাদি, যার মাধ্যমে সমাজ চালিত হয়।

পরিবেশ - মানুষের চারদিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যেমন, গাছপালা, বাড়িঘর, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি।

হোমোসেপিয়েনস্ - একই সম্প্রদায়ভুক্ত গোষ্ঠীর লাতিন নাম, বর্তমানে যে মানবগোষ্ঠী পৃথিবীতে আছে তাদের নৃতাত্ত্বিক নাম।

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ - আদর্শ এবং নিয়মকানুন যা সামজিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে।

মোনোলিথিক - একখানা পাথরের তৈরী স্তম্ভ নির্মান সংক্রান্ত বিষয়।

নিওলিথিক - নব্য প্রস্তরযুগ, প্রস্তরযুগের সভ্যতার চরম উন্নতির যুগ, যে সময় থেকে মানুষ কৃষিকাজ শুরু করে এ জায়গায় বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং উন্নত ধরনের জীবনযাপন করতে শেখে।

নির্বাণ - জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি।

প্যালিওলিথিক - পুরাতন প্রস্তরযুগ - প্রস্তরযুগের প্রথম দিকটাকে ধরা হয়।

প্রযুক্তিবিদ্যা - প্রয়োগবিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান।

২.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১) (খ), (গ)
২) (ক) মিথ্যা (খ) মিথ্যা (গ) সত্য (ঘ) সত্য
৩) (ঘ)
৪) (ঘ)
৫) (খ), (গ)

অনুশীলনী ২

১) অনুচ্ছেদ ২.৩.২ দেখুন
২) (ক), (খ) (গ)
৩) অনুচ্ছেদ ২.৩.৩ দেখুন

অনুশীলনী ৩

১) অনুচ্ছেদ ২.৩.৫ দেখুন
২) অনুচ্ছেদ ২.৫ দেখুন

একক ৩ ❐ চিন্তাশীল জীব হিসেবে মানুষ

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ চিন্তা করার ক্ষমতা (চিন্তাশক্তি)
৩.২.১ চিন্তা এবং সংস্কৃতি
৩.২.২ ভাষা এবং সংস্কৃতি
৩.৩ সংস্কৃতি এবং জীববিদ্যা
৩.৪ জ্ঞানের চিরকালীন অনুসন্ধান
৩.৪.১ জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য
৩.৪.২ সৃজনীশক্তি এবং বিজ্ঞান ও মূল্যবোধের সামাজিক চরিত্র
৩.৪.৩ "দুই সংস্কৃতি"র ক্রমোন্নতি
৩.৪.৪ বিজ্ঞান ও মানবিকতার সম্পৃক্তকরণ ঃ যোগ
৩.৪.৫ সত্যের প্রকৃতি ঃ বিজ্ঞান ও ধর্ম
৩.৫ ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান
৩.৫.১ জ্ঞানের মোহিনী রূপ
৩.৫.২ বিজ্ঞান ও ধর্মের বিচ্ছেদ
৩.৬ জ্ঞানের বিভাজন
৩.৬.১ ধ্রুববাদ
৩.৬.২ বিষয়বস্তু ঃ ধারণাগত কাঠামো
৩.৭ জ্ঞানের সম্পৃক্তকরণ
৩.৮ সারাংশ
৩.৯ শব্দগুচ্ছ
৩.১০ উত্তরমালা

৩.০ উদ্দেশ্য

পূর্বে বর্ণিত এককগুলি থেকে আপনি জেনেছেন যে, মানুষ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার বিষয়ই নয়, সমস্ত জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী অস্ত্র বানাতে ও ব্যবহার করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু কী ভাবে এটা সম্ভব হল? এটা সম্ভব হয়েছিল মানুষের চিন্তাশক্তির বিবর্তনের ফলে যা পরবর্তীকালে সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই এককে চিন্তাশক্তির বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এই একক পাঠ করার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন ঃ

- সংস্কৃতি এবং জীববিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক।
- কিভাবে মানুষের জ্ঞান এবং আবিষ্কারের অনুসন্ধিৎসা সংস্কৃতির উন্নতির সাহায়ক হয়েছে।
- মোহিনীবিদ্য এবং ধর্মশাস্ত্রের রূপ থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বর্তমান অন্যাধ্যাত্মিক রূপে জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারা খুজে বের করা।
- সমাজের উন্নতির জন্য মানুষ উপাদান হিসেবে কীভাবে জ্ঞানের ব্যবহার করেছে তার ব্যাখ্যা করা।

৩.১ প্রস্তাবনা

বিবর্তন প্রক্রিয়া মানুষকে কতকগুলি অদ্বিতীয় ক্ষমতার সমৃদ্ধ করে তুলেছে। চিহ্ন বা প্রতীকের ব্যবহার, চিন্তাশক্তি, হাস্যপরিহাস, জীবন ও মৃত্যুর গোপন তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা—এ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হল একমাত্র মানুষ; অন্যান্য প্রণীরা ক্ষমতার অধিকারী নয়। মানুষ কী করে এই ক্ষমতা অর্জন করল নৃতত্ত্ববিদরা তা নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। মানুষের বৃহৎ করোটির(যার মস্তিষ্কধারণ ক্ষমতা প্রায় ৫০০ সি সি) থেকে বর্তমান গড় ক্ষমতার (১৪৫০ সি সি) ক্রমবিকাশ ঘটেছিল ধীর গতিতে - প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার বছর ধরে। তুলনামূলকভাবে ভাষার ব্যবহারের প্রকাশ দ্রুত হয়েছিল, যদিও এটা মস্তিষ্কের আকারের ক্রমবৃদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

বিবর্তনের 'সন্ধিক্ষণকালীন তত্ত্ব' এবং চিন্তাশক্তির ক্রমান্বয়িক অথচ অবিছিন্ন অভিব্যক্তিবাদের ব্যাখ্যা জীববিদ্যা ও মানুষের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই বিষয়ে আপনার এই এককে জানতে পারবেন।

ওপরের তথ্যগুলি ছাড়া, এই এককে আপনি আরো জানতে পারেবেন যে, জ্ঞানের একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে। শৈশবকালীন সামাজিকীকরণ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি জ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও সৃজনশীলতার লক্ষ্য ও গঠনের আকার নির্দেশ করে। বিষয়ের পৃথকীকরণ ও তাদের সংগঠনের মূল উপাদানগুলির ভিত্তি শুধুমাত্র তত্ত্ব বা ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং বলা যায় এগুলো দাঁড়িয়ে আছে সামজিক ব্যবহারের উপরে। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক শক্তিগুলির মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছে যার ফলে মোহিনীবিদ্যা, ধর্ম ও বিজ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই অংশ যোগ (ঐক্য), সত্য, গুণ এবং সৌন্দর্যের নীতি ভারতীয় ঐতিহ্যে কিভাবে জ্ঞানের সমন্বয় ঘটায় এবং তা কীভাবে প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞান এবং অন্যান্য ধরনের জ্ঞানের মধ্যে এক সৃষ্টিশীল সমন্বয় ঘটানোর পথনির্দেশ দেয় তা দেখান হয়েছে।

৩.২ চিন্তা করার ক্ষমতা (চিন্তাশক্তি)

আনুপাতিকভাবে শরীরের তুলনায় বড় মানুষের মস্তিষ্ক মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা করার ক্ষমতা দিয়েছে। ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে অর্থপূর্ণ বর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক প্রতীকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার দক্ষতাই এই ক্ষমতা। এর মধ্যে দিয়ে মানুষ মানসিক বিমূর্তকরণের ক্ষমতা অর্জন করেছে। এর মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরতা কমাতে পেরেছে এবং তা পরিবর্তনের ক্ষমতা অর্জন করেছে। মানুষ শুধু বর্তমানই নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে শিখেছে। চিন্তা ক্ষমতাকে

কাজে লাগিয়ে পূর্বানুমান করা, জীবনের বাস্তবকে তুলে ধরা ও বদলানোর ক্ষমতাও পেয়েছে। শিকার ও সংগ্রহের বদলে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছে। অন্যের সঙ্গে ভাবগত আদানপ্রদানও সম্ভব হয়েছে। এর ফলে মানুষের সামাজিকতা ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র নং ৭

ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগের মূল তত্ত্বই হল প্রতীকের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক স্থাপন করা। প্রতীকের ব্যবহার কাজে লাগিয়ে অর্থের আদানপ্রদান ঘটালে চিন্তা ও সংস্কৃতি বৃদ্ধি পায়। নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন বিমূর্ত থেকে বাস্তবকে আলাদা করা এবং ধারণা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তৈরী হবার পরই মানুষের ভাষার বিবর্তন ঘটে।

চিত্র নং ৮

৩.২.১ চিন্তা এবং সংস্কৃতি

মানুষের আর একটি বৈশিষ্ট্য-সংস্কৃতি জন্ম নেয় মানুষের ধারণা, সৃষ্টি ও প্রতীকের মাধ্যমে বিমূর্তকরণের ক্ষমতা থেকে। মানুষের জৈবিক বিবর্তন ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এর ধীর বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু গত কুড়ি হাজার বছরের মধ্যে মানুষের জৈবিক নয় সাংস্কৃতিক বিবর্তনই সমাজপরিবর্তনের মূল ধারা হিসেবে এসেছে, ভাষার ব্যবহার সংস্কৃতির জটিল বিন্যাসকে সহজতর ভাবে প্রকাশ করেছে এবং ফলে ভাষাও সমৃদ্ধ হয়েছে প্রতিষ্ঠানিক চেহারা পেয়ে। তবে মানুষের ভাষা ব্যবহার করার ক্ষমতা তৈরী হবার আগেই সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল।

প্রাগ্‌ভাষা প্রতীকের মাধ্যমেই ধারণা সৃষ্টির প্রক্রিয়া প্রথম তৈরী হয়। এভাবেই চিহ্ন এবং চিত্রকে ঘটনা ও অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ হিসেবে ব্যবহার করা থেকে শব্দ ও অর্থের ব্যবহারের প্রচলন হয়। আদিম মানুষসৃষ্ট গুহাচিত্রের মধ্যে দিয়েই তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস জানা যায়। এই চিত্রের মধ্যে দিয়েই সাংস্কৃতিক জীবন ফুটে ওঠে। ভাষার প্রতিরূপ হিসেবে চিত্রের ব্যবহারের পরেই আসে ভাষাগত প্রতীক। এর দ্বারা ক্রমান্বয়ে পারস্পরিক ভাববিনিময় সম্ভব হল—যার ফলে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেল। এক্ষেত্রেও ভাষাভিত্তিক প্রতীকের বিবর্তনে সময়ের সাথে সাথে অঞ্চলগত পার্থক্য দেখা দেয়। চিত্র নং ৯ প্রমান করে যে যেখানে মেক্সিকোতে প্রতীকী চিত্রের ব্যবহার এক হাজার সালে দেখা যায় সেখানে ভারতে তিন হাজার পাঁচশো খ্রীষ্টপূর্বাব্দেই লিপির প্রচলন শুরু হয়।

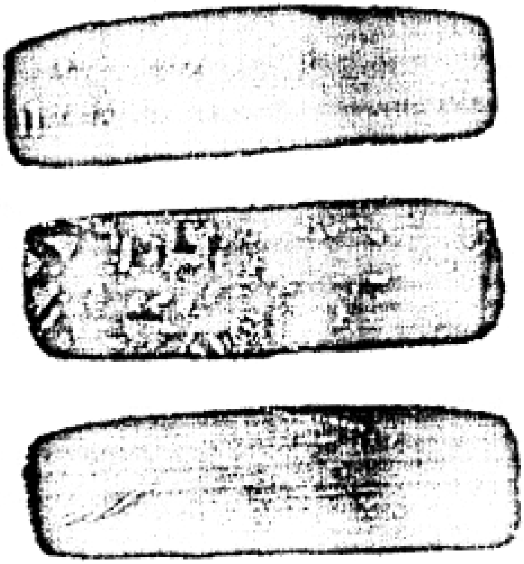

চিত্র নং ৯

উপরে : মহেঞ্জোদারো লিপি (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০-২৫০০ সাল)

মধ্যে : মেক্সিকোর চিত্রিত লিপি (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ)

নীচে : নন্দনগিরি লিপি (বিজয়নগর, ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)

৩.২.২ ভাষা এবং সংস্কৃতি

শীঘ্রই ঘটনা ও অভিজ্ঞতা, ভাষাভিত্তিক প্রতীকের মাধ্যমে বর্ণনা করার ক্ষমতা, অন্যের সঙ্গে স্থায়ী যোগাযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা গড়ে তোলে। এর মধ্যে দিয়ে সমাজিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব হয়। এগুলি মানুষের চেতনাকে আরও ধারালো করে তোলে। তাদের আত্মসচেতনতা, মর্যাদা ও মানবিকতা এই চেতনার মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে। এখানেই মানুষের সঙ্গে জীবের পার্থক্য। জৈবিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারার মধ্যে দিয়েই এর উদ্ভব হয়।

ভাষা ভিত্তিকে প্রতীকের ব্যবহার মানুষকে তার ভৌত ও পরিবেশগত নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে। এর ফলে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিষয় সম্পর্কে মানুষের বস্তুগত এবং বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়ন ক্ষমতা গড়ে ওঠে। এই ক্ষমতা মানুষের সাংস্কৃতিক গুণাবলীর এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

৩.৩ সংস্কৃতি এবং জীববিদ্যা

মানুষের সাস্কৃতিক এবং জৈবিক বিবর্তনের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিকেরা গবেষণা করেছেন। তাঁরা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের নানা তত্ত্বের অবতারনা করেছেন।

মার্কিনী নৃতত্ত্ববিদ অ্যালফ্রেড ক্রোবার মনে করতেন যে, অসম্বন্ধ ভাব ও অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে উঠে আসা যোগযোগ, শিক্ষা, প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ক্ষমতা মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে হঠাৎই এক সন্ধিক্ষণে উদ্ভাবিত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে মানুষের পর্যায়ে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি সম্ভব হয় আমাদের মস্তিষ্কের কাঠামো বদলে যাওয়ার ফলে, যা সম্ভব হয়েছিল মানুষের চিন্তা ও প্রতীক ব্যবহার ও যোগাযোগের ক্ষমতার যুগান্তকারী পরিবর্তনের মাধ্যমে। জীববিদ্যার ভাষার এক ক্ষুদ্র সংখ্যাগত পরিবর্তন মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষমতায় বড় ধরনের গুনগত পরিবর্তন ঘটায়।

নীচে সংক্ষেপে সাংস্কতিক বিবর্তনের দুটি তত্ত্ব অলোচিত হল।

১. সন্ধিক্ষণ তত্ত্ব

সন্ধিক্ষণ তত্ত্বের প্রকৃতি জানা জরুরী। এই তত্ত্বে একটি সূত্র হল মানুষ এবং তার নিকটতম জীবিত জ্ঞাতি বানরের চিন্তা শক্তির ফারাক। মানুষ কথা বলতে পারে, চিহ্ন ব্যবহার করে এবং অস্ত্র তৈরী করতে পারে যা অন্য আদিম প্রাণীরা পারেনা। শিম্পাঞ্জীরা নানা ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতে শিখতে পারে এবং অঙ্গাভঙ্গিও করে কিন্তু কথা বলা বা শেখার ব্যাপারে এগোতে পারে না। এছাড়াও ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা, চিহ্নের ব্যবহার এবং বিমূর্ত চিন্তার শক্তি হয় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, না হলে একেবারেই নয়।

বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় হল সহজ প্রতিবর্ত ক্রিয়া, শর্তাধীন প্রতিক্রিয়া, চিহ্নের ব্যবহার, জটিল আচরণ এবং সব শেষে প্রতীকী চিন্তার ব্যবহার। এই তত্ত্বের সমতাবলম্বী নৃতত্ত্ববিদরা বলেন এই পর্যায়গুলি অবিচ্ছিন্ন ক্রমাগ্রসরণের ফলে আসে নি, এসেছে ধারাবাহিক অসমৃদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে। মানুষের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করে যে, মানবজাতির ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বে একথা বলা হয় যে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তাধারা এবং মানসিক ক্ষমতায় কোন পার্থক্য নেই। এটা সম্ভব হয়েছে মানুষের সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে একধরনের যৌথ মানসিকতা ও ঐক্য থাকায়।

২. বিবর্তনবাদ তত্ত্ব

উপরোক্ত তত্ত্বের বিরোধিতায় সংস্কৃতির তত্ত্বে বিশ্বাসী নৃতত্ত্ববিদেরা মানব জীবাশ্মকে ভিত্তি করে তাদের বক্তব্য গড়ে তোলেন। এঁরা মনে করেন না যে, বিবর্তনের কোনো সংকটমাত্রায় হঠাৎ মানবমস্তিষ্কে কোন অগ্রগতির ফলে মানুষের সাংস্কৃতিক ক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছে। অস্ট্রালোপিথেকান প্রজাতির জীবাশ্ম থেকে দেখা যায় যে, তারা অঙ্গাসংস্থানসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যে কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগণ্য ছিল। তাদের মস্কিষ্ক ছিল বানর প্রজাতির মত অনুন্নত কিন্তু তারা মানুষের মত দ্বিপদ জীব ছিল। এরই সঙ্গে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাদের একধরনের প্রাথমিক পর্যায়ের সংস্কৃতি ছিল, তাদের অস্ত্রনির্মাণ ক্ষমতা ছিল এবং তারা শিকারের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত।

এই অধুনা বিলুপ্ত অস্ট্রালোপিথিসিন জাতি ৭,৫০০০০ বছর আগে আফ্রিকার বসবাস করত। এরা আধুনিক মস্তিষ্কের এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হয়েও এই প্রাথমিক সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

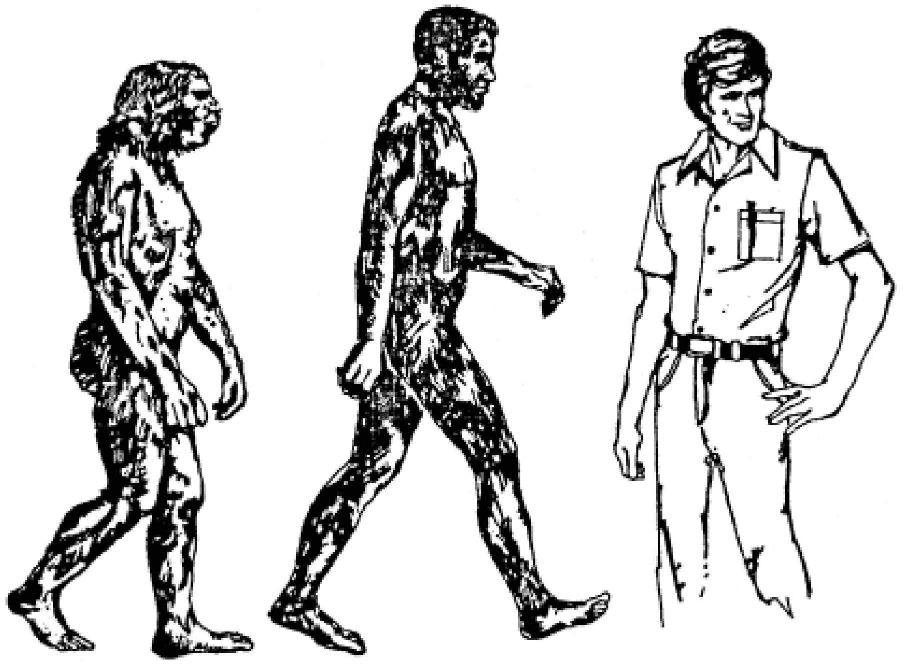

চিত্র নং ১০ মানুষের বিবর্তন, আদিম থেকে আধুনিক

মস্তিষ্কে অনুন্নত স্তরে চিন্তা ও এর সাথে যুক্ত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম সংস্কৃতির হঠাৎ আবির্ভাবের প্রকল্পকে বদলে দেয়। এর বদলে গুরুত্ব পায় মানুষের পর্যায়ক্রমে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের তত্ত্ব।

এর থেকে বোঝা যায় যে, বিবর্তনে জৈবিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত দুটি মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে পরস্পরকে বদলায়, একদিকে মানুষের করোটির অধিক মস্তিষ্কধারণ ক্ষমতা যেমন সংস্কৃতি ও মানসিক দক্ষতা ও জটিলতা

বাড়িয়ে দেয় অন্যদিকে সমাজভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে মানুষের মগজের বিবর্তন ঘটে। যত দিন না জৈবিক বিবর্তন সুস্থিতি পায় তত দিন এই প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলতে থাকে। এই সুস্থিতি আসার আগেই যে মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তন শুরু হয় তা মানুষের প্রকৃতির উপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলে।

মানুষ সংস্কৃতির সৃষ্টিকারীই নয়, দৈবিক অর্থে তারা এর ফসলও বটে। কিন্তু, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এই ফসল নিষ্ক্রিয় নয় বরং সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। মানুষের চিন্তাশক্তি মানুষকে এই সৃজনীমূলক প্রক্রিয়ায় এবং সাংস্কৃতিক উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় বড় ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করেছে।

৩.৪ জ্ঞানের চিরকালীন অনুসন্ধান

কোনরাড় লরেঞ্জ, বি. এফ স্কিনার এবং অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিকেরা মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর মধ্যে সাদৃশ্য পেয়েছেন। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকা সত্তেও মানুষ অদ্বিতীয়। এর মূলে আছে জ্ঞানের জন্য মানুষের চিরকালীন অনুসন্ধিৎসা এবং তাতে সফল হবার ক্ষমতা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে এর প্রমাণ মেলে।

৩.৪.১ জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

মানুষের চিন্তাশক্তি তৈরী হয়েছে তার মগজের ক্ষমতা ও তা ব্যবহারের আদল থেকে। এছাড়াও মানুষকে শৈশবে দীর্ঘকালীন সামাজিকীকরনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এটা তাদের নির্দিষ্ট প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য।

মানুষের মগজ তাকে ভৌত এবং পরিবশগত নির্ভরতা থেকে যুক্ত করেছে। অস্ত্র তৈরী করতে বা কোন সামগ্রী তৈরী করতে মানুষ তার মগজকে ব্যবহার করেছে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা থেকেই এসেছে কথার শক্তি, ভাষা, স্মৃতি এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করার ক্ষমতা।

মানুষের মগজের ক্ষমতা শৈশব থেকেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের মধ্য প্রবাহিত হয়। এর মধ্যে দিয়ে মানুষের চিন্তাশক্তির তারতম্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া গড়ে ওঠে। পরিবারের সামাজিকীকরণ এবং শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এটা সম্ভব হয়। সাাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কতিক এবং ভৌতপরিবেশ শিশুর জ্ঞান এবং শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। মানুষের সাংস্কৃতিক ধারার বৈচিত্র্য দেখায় মানবপ্রকৃতি কিভাবে সৃষ্টিশীল অভিযোজনের পথ বেছে নেয়। ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, মতাদর্শ, জীবনযাত্রার ধরন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানব প্রকৃতির নমনীয়তার প্রমাণ।

শৈশবের সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব, সমাজ ও সমাজের মূল কাঠামোগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। ভাষার মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ এবং নিজের সঙ্গে সমাজের আদানপ্রদান সংস্কৃতি ও সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি মুজবুত করে।

এই সম্পর্ক অবশ্য স্থির নয়। সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে মানুষ সমাজের মূল্যবোধ গ্রহণ করে, ভাষা শেখে এবং ধারণাগত ও মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার ক্ষমতা পায়। এই প্রক্রিয়া কখনো সম্পূর্ণ হয় না। মানব প্রকৃতির নমনীয়তা মানুষকে আবিষ্কার ক্ষমতার সৃজনীশক্তি দেয় যার মাধ্যমে মানুষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সৃষ্টি করে, সভ্যতা ও প্রগতির অগ্রগতিতে অংশ নেয়।

৩.৪.২ সৃজনীশক্তি এবং বিজ্ঞান ও মূল্যবোধের সামাজিক চরিত্র

জ্ঞানের চিরকালীন সন্ধানের সঙ্গে মানুষের সৃজনশীলতা ও ক্ষমতার গভীর যোগ আছে। ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ভাবানুষঙ্গ (স্থান, কাল পেরিয়ে প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে) মানুষের কার্যকারণগত সম্পর্কে সম্বন্ধে আলোকিত করে। এর মধ্যে দিয়েই আসে বৈজ্ঞানিক যুক্তি। অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে দেখার ক্ষমতা, ভাবাবেগ এবং প্রয়োজনকে দমিয়ে রাখার শক্তির মধ্যে দিয়েই উদ্ভব নৈতিকতা।

এক দিক থেকে দেখতে গেলে মানুষের জ্ঞান অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি বাড়ার জন্যই বিজ্ঞান এবং নৈতিকতার উদ্ভব হয়। মানুষের যুক্তিক্ষমতা যা ভাষা ও অঙ্কের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে তার সঙ্গেই আসে ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা। এই সচেতনতাই উন্নত করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে, যা আবার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে।

জ্ঞানের অনুসন্ধানে লিপ্ত মানুষ একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও মূল্যবোধকে আবিস্কার করে। বিজ্ঞান তাদের কারণ দর্শাবার এবং প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যাখ্যা এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়। মূল্যবোধের মধ্যে দিয়ে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। ভাষা, যার মধ্যে দিয়ে আমরা বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কতিক আলোচনা করি, একটি সামাজিক ঐতিহ্য। তাই বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ উভয়েরই এক সমাজিক বৈশিষ্ট্য আছে।

মানুষের জ্ঞানের অনুসন্ধান, তাদের মহান আবিস্কার বৈজ্ঞানিক সাফ্যলের দিকে নিয়ে যায়। প্রস্তরযুগের হাতিয়ারের শুরু থেকে মানুষ যে প্রযুক্তিগত উন্নতি করে, এই তার বাস্তব প্রমাণ। মানুষের দার্শনিক চিন্তা, যুক্তি কৌশল এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই এটা সম্ভব হয়েছে। এই প্রগতির ফলে জ্ঞান বহুগুণ এবং বহুমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি হিসেবে বলা হয়, প্রতি দশ বছরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বিগুণ হয় এবং ক্রমশ এই সময়সীমা কমছে।

অনুশীলনী ১

১. মানুষের শিক্ষা ও চিন্তাক্ষমতার উদ্ভব সংক্রান্ত বিবর্তনবাদী তত্ত্বে বলা হয় যে (একটিকে সঠিক উত্তর হিসেবে বেছে নিন)

   ক) এই ক্ষমতা বিভিন্ন পর্যায়ে ধীর গতিতে তৈরী হয়েছে।

   খ) প্রকৃতির বিভিন্ন থেকে এই ক্ষমতা মানুষের এসেছে।

   গ) এই ক্ষমতা হঠাৎ এক সন্ধিক্ষণে সৃষ্টি হয়।

   ঘ) এই ক্ষমতা বংশানুক্রমে আসে।

২. মানুষের চিন্তাক্ষমতার বিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে (একটিকে ঠিক বলে বেছে নিন)

   ক) মানুষ নতুন পরিবেশ থেকে এই ক্ষমতা পায়।

   খ) মানুষ সামাজিক আদানপ্রদান থেকে এই ক্ষমতা পায়।

   গ) মানুষ জীববিদ্যা ও সামজিকতার পারস্পরিক বিবর্তনের মাধ্যমে এই ক্ষমতা পায়।

   ঘ) মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে এই ক্ষমতা পায়।

৩.৪.৩ "দুই সংস্কৃতি"র ক্রমোন্নতি

বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সমাজের মূল্যবোধ ও নীতিবিন্যাসের সম্পর্কে সমস্যা এসেছে। পশ্চিমী সমাজের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক বিন্যাসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাক সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধের ঐক্যবন্ধ হওয়ার বদলে বিচ্ছেদ, এমনকি বিচ্ছিন্নতা গড়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান ও মূল্যবোধের এই বিচ্ছেদ শুধুমাত্র দুই সংস্কৃতিই তৈরী করছে না, তাদের মধ্যে বিরোধ ও ঘটাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান এবং তার প্রযুক্তি, মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার দরুণ মানুষের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করতে পারে। বর্তমানে আমরা অস্ত্র সংগ্রহের লড়াই, শিল্পায়নের মাধ্যমে পরিবেশ ধ্বংস, মানবস্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ এবং আণবিক বোমার মত ভয়ঙ্কর গণহত্যার অস্ত্র দেখছি। মানুষের বেঁচে থাকার জন্যেই বিজ্ঞানের সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র টিকিয়ে রাখা দরকার।

ভারতীয় ধারার বিপরীতে মূল পশ্চিমী ধারার পণ্ডিতরা প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে অথবা মানুষ ও তার ভৌত পরিবেশের মধ্যে বিরোধে বিশ্বাস করেন। এই ধারণা থেকেই পশ্চিমের কিছু দার্শনিক গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দাবি করেছেন।

তাঁরা এই দুটি বিষয়কে আলাদা করে দেখেন এবং মনে করেন যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ঘটনা (বিষয় বা প্রকৃতি) এবং সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান আত্মাকে বিশ্লেষণ করে। প্রকৃতি (বাহ্যমূর্ত্তি) ও সংস্কৃতির (বুদ্ধি দ্বারা অধিগম্য বিষয়) পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ধারণার ফলেই এই পার্থক্য তৈরী হয়। এর ফলে মূল্যবোধের জগৎ থেকে বিজ্ঞান বিছিন্ন হয়ে পড়ে। বিজ্ঞান ও মানবিকতার এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন তৈরী হয়, যার একটি বিজ্ঞান ও অন্যটি হল কলা। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ দুটি পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত। প্রাকৃতিক বা সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যেও সে কারণে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

অন্যদিকে, ভারতীয় ঐতিহ্য শুরু থেকেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং তার সাংস্কৃতিক কাঠামোকে একই আঙ্গিকের রূপ হিসেবে দেখেন যা পশ্চিমী ঐতিহ্যের সাথে মেলে না। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান জড়িয়ে থাকে নীতির বিশ্ববীক্ষার মধ্যে এবং সত্যের (সত্যম্) আবিস্কার ঘটে মূলত সুন্দর (সুন্দরম) ও কল্যাণ (শিবম্) এর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে পবিত্র ও অপবিত্র, যান্ত্রিক ও নির্জ্ঞেয় বিজ্ঞান এবং মূল্যবোধ-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সত্যম্, শিবম্ সুন্দরম্ হল, এমন এক মূল্যবোধের শ্রেণীবিন্যাস যার মধ্যে বিজ্ঞান ও কলা জ্ঞান বৃক্ষের দুই শাখা হিসেবে থাকে। এই শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে বিজ্ঞান ও মূল্যবোধের একটি জৈবিক সম্পর্ক তৈরী হয়, যা সত্যম্, শিবম ও সুন্দরমের সম্পর্ক।

৩.৪.৪ বিজ্ঞান ও মানবিকতা সম্পৃক্তকরণ ঃ যোগ

এখন দেখা যাক, বিজ্ঞান ও মানবিকতার সম্পৃক্তকরণ কিভাবে ঘটেছিল। এই দুই ধারা সম্পর্কে ভারতীয় চিন্তায় বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর ভূমিকাকে সম্পৃক্ত করা হয়। এদের বৃহত্তম যৌগিক সীমাহীন ঐক্যের আধারে সাধক (পবিত্র লক্ষ্যের ধারক) এবং যোগী (কর্ম বা নিরীক্ষায় ঐক্যের সন্ধানী) হিসেবে দেখা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ এবং পবিত্র, বিজ্ঞান এবং মূল্যবোধ, পেশাদারী এবং অপেশাদারী প্রভৃতি যে সমস্ত পার্থক্যকে পশ্চিমী প্রক্রিয়া এবং বিজ্ঞানতত্ত্বের শুরুতে তুলে ধরা হত সে ধরণের পার্থক্য ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রথম থেকেই ছিল না। এর ফলে পশ্চিমী চিন্তাবিদদের এক ভুল ধারণা হয় যে ভারতে বিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার

কোনো প্রবর্ত্তন ছিলনা এবং বিজ্ঞানের ধারণা পশ্চিম থেকে ভারতে এসেছে। ভারতে বিজ্ঞানে যান্ত্রিক (পরীক্ষা নির্ভর) এবং মূল্যদ্যোতক (মূল্যবোধ) নীতির সংমিশ্রণে ব্যবহারিক রূপ পাওয়া যায় শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা, ভৌতবিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্রের মধ্যে। যুক্তি এবং অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের ছিল পথিকৃৎ-র ভূমিকা। যেমন আর্যভট্টই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং পৃথিবী তার অক্ষেই আবর্তিত হয়। অঙ্কশাস্ত্রে তিনি π (পাই) এর মূল্যমান এবং অন্যান্য গণনা দেখান পাঁচশো খ্রীষ্টাব্দে।

বিজ্ঞান ক্রমোন্নতির মাধ্যমে যত উচ্চতর আবিস্কারের দিকে এগিয়েছে, ততই বিজ্ঞানে এই অখণ্ডতার ধারা পশ্চিম এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রকৃতি বা সংস্কৃতি সমস্ত বস্তুর মূল নীতিগুলির স্বীকৃতি পেয়েছে। মন এবং বিষয়ের মধ্যে অথবা প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা বর্তমান যুগে বিজ্ঞানে স্থান পায় না। প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা পদ্ধতিগত বা বিতর্কগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যার খাতিরে টিকে আছে।

৩.৪.৫ সত্যের প্রকৃতি ঃ বিজ্ঞান ও ধর্ম

বিজ্ঞানের অবিষ্কার এবং জ্ঞানের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে তার ধারণা বাড়াতে শুরু করে। ভারতীয় ধারায় সত্যমের যে ধারণা তাতে স্বীকার করা হয় যে পূর্ণ অখণ্ড সত্য সম্পূর্ণরূপে কোন মানুষের আয়ত্ত্বাধীন নয়। সাধনা বা যোগের মাধ্যমে শুধু এর আংশিক রূপ ধরা পড়ে। আগেই বলা হয়েছে যে ভারতীয় ধারায় বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনস্থলে আছে এবং সাধনা রূপে বিজ্ঞান। অস্থায়ী বা অসম্পূর্ণ রূপে সত্যের ধারণা ও সত্যের প্রকৃতি বদলানো যায় এই ধারণার ভিত্তিতেই নতুন আবিষ্কার ও পরীক্ষানিরীক্ষা করে। এই কারণেই জ্ঞানের অন্বেষণ চিরকালীন। ভারতীয় ঐতিহ্যে বিজ্ঞান (সত্যের আবিষ্কার) এবং মূল্যবোধ (সত্যের মূল্যদ্যোতক ভিত্তি) এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই ঐতিহ্য সত্যম্, শিবম্ এবং সুন্দরমের মধ্যে ঐক্য খোঁজে।

ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক কাঠামোয় সত্যকে ভিন্ন রূপে দেখা হয়। ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞায় বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখান হয়। মূল্যদ্যোতক নীতির ভিত্তিতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের এক বৃহত্তর ঐক্য থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়গুলিতে তা থাকে না। সেক্ষেত্রে ধর্ম মানে গোঁড়ামী, মান্ধাতা আমলের সামজিক রীতি ও কুসংস্কার বোঝায়। জাতিগত পার্থক্য এবং বৈষম্য, নারীর অবস্থার অবনতী, দূষণ ও পবিত্রতার ধারণা, এবং এর সঙ্গে জাড়িত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের খারাপ দিকগুলি এর উদাহরণ। এই ধরনের বিশ্বাসগুলির সঙ্গে সত্যম্, শিবম্ এবং সুন্দরমের কোনও সম্পর্ক নেই। এগুলির সঙ্গে কোনও ধর্মের প্রকৃত অর্থের বা তত্ত্বের কোনও সম্বন্ধ নেই।

ইতিহাস এবং তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের ছাত্ররা দেখেছেন যে, এই ধরনের নেতিবাচক উপাদানগুলির সঙ্গে ধর্মীয় মতাদর্শসমূহের কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক ক্ষেত্রে এই ধারণাগুলিকে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ধর্মের নামে অন্যান্য মানুষকে নিষ্পেষিত করবার জন্য হাতিযার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সব ধর্মের মূল্যদ্যোতক নীতি প্রকৃতিগতভাবে মানবিক। জাতি, ধর্ম এবং রাষ্ট্রের বাধা পেরিয়ে এক সার্বজনীন সৌন্দর্য, মর্যাদা এবং সাম্যের ভিত্তিতে এবং সাম্যে বিশ্বাসই এর মূল্য বৈশিষ্ট্য। মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার হয় এমন সত্যানুসন্ধানকে বিজ্ঞান নৈতিক রূপ দেয়।

অনুশীলনী ২

১. ‘‘দুই সংস্কৃতি’’র ধারণা উদ্ভূত হয়েছে এই বিশ্বাস থেকে যে (সঠিক উত্তরটি বেছে নিন)

  ক) মানবজাতির সমস্যাগুলি সামাধানের জন্য বিজ্ঞান যথেষ্ট নয়।
  খ) বিজ্ঞান এবং মানবজাতি সংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞানের মধ্যেকার গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
  গ) বিত্তবানদের সংস্কৃতি গরীবদের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন।
  ঘ) গ্রাম্যসমাজ ও নগরসমাজ দুটি আলাদা সংস্কৃতি গঠন করে।

২. প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের কোন কোন দার্শনিকেরা যা ভেবেছিলেন তা হল (সঠিক উত্তরটি বেছে নিন)

  ক) বিশ্বাসযোগ্য ও অবিশ্বাস্য-এর মধ্যে দ্বৈতবাদ।
  খ) যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে দ্বৈতবাদ।
  গ) বাহ্যরূপ (বস্তু) এবং বুদ্ধিদ্বারা অধিগম্য-এর দ্বৈতবাদ।
  ঘ) প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত ফলের মধ্যে দ্বৈতবাদ।

৩. সাধক সেই ব্যাক্তি যিনি (সঠিক উত্তরটি বেছে নিন)

  ক) তাঁর উচ্চাকাঙ্খায় অটল।
  খ) ঈশ্বরের আন্তরিক ভক্ত।
  গ) শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনুশীলনে রত।
  ঘ) তাঁর লক্ষ্যের প্রতি প্রতিশ্রুত।

৪. বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন (দেড়শটি শব্দের মধ্যে)

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

৩.৫ ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান

প্রকৃতি, অন্যান্য মানুষ এবং ইতিহাসের শক্তির সঙ্গে মানুষের আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়েই মানব জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ায় মানুষের অস্তিত্বের পরিবেশ, তার প্রাথমিক প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন মেটাবার পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের অস্তিত্বের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য তৈরী হয় প্রাকৃতিক সম্পদ, জৈবিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক ধারা ও সাফল্যের সংমিশ্রণে।

৩.৫.১ জ্ঞানের মোহিনী রূপ

জ্ঞান প্রাথমিকভাবে প্রকৃতি, অহং এবং অন্যান্য মানুষের প্রতীকি প্রতিনিধিত্বের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। মানুষেব সঙ্গে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সম্পর্ক সৃষ্টিতে জ্ঞান কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। প্রথমে জ্ঞান মোহিনী এবং ধর্মীয় আকারে সৃষ্টি হয়। যাদু, যা আদিম মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি পেত তা দুটি নীতির দ্বারা পরিচালিতা হত।

(ক) প্রথম নীতি ছিল সমজাতীয় বিষয় সমজাতীয় বস্তুর সৃষ্টি করে। উদাহারণ হিসেবে বলা যায় যে, যেহেতু বজ্রপাতের সঙ্গে বৃষ্টিপাত হয় সেহেতু বজ্রপাতের আওয়াজ করলে বৃষ্টি হবে। কিছু আদিম প্রজাতি প্রায়শই বৃষ্টি আনার চেষ্টায় পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর ফেলে বজ্রপাতের মত আওয়াজ সৃষ্টি করত।

চিত্র নং ১১

(খ) দ্বিতীয় নীতি ছিল মূলের অংশবিশেষের উপর মূল্যের সার্বিক গুরুত্ব আরোপ। একথা বিশ্বাস করা হত যে, মানুষের কোন অংশে বা তার কোন প্রতিচ্ছবিকে যদি কিছু করা হয় তাহলে তার ফল ঐ মানুষের ওপর গিয়ে পড়বে। বস্তুর ক্ষেত্রেও তাই ভাবা হত। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যদি কোন মানুষের নখ বা চুল সংগ্রহ করে পোড়ান বা ক্ষতি করা হত তাহলে ওই মানুষেরও ক্ষতি হবে বলে ভাবা হ'ত।

অথবা যদি তার ছায়ার কোন ক্ষতি করা হ'ত তাহলে ঐ মানুষেরও ক্ষতি হবে বলে ভাবা হ'ত।

> যাদুর এই নীতি আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের মতই কারণ প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা করত। কিন্তু সেগুলি মিথ্যে ধারণার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। এই নীতিগুলি বৈধতার নীতি লঙ্ঘন করে বলেই যাদুকে ছদ্ম-বিজ্ঞান বলা হয়।

কিছু যাদু ভুলত্রুটির মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে মিশে যায়। শিকার, খাদ্য সংগ্রহ, কৃষিকাজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কাজে যাদুভিত্তিক আচার ব্যবহার হত। মৃত্যু, জন্ম, বিবাহ প্রভৃতি আচারেও যাদু ব্যবহার করা হত । ঈশ্বরের মাতৃরূপের পূজাও যাদু নির্ভর আচার থেকে উদ্ভূত হয়। মানুষের শিক্ষার প্রক্রিয়া প্রথম থেকেই জড়িত ছিল প্রকৃতি, আত্মা এবং অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে তার ধ্যানধারণার ওপর।

যাদুতে	আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যায়
রোগ	রোগ
উদ্ভূত হয়	উদ্ভূত হয়
মানব শরীরে প্রবেশ করা (বাহ্যিক উপাদান)	জীবানু ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস
দুষ্ট আত্মার জন্য	দ্বারা

মোহিনী বিদ্যার প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মে বিশ্বাস বাড়তে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মোহনের নীতি ব্যর্থ হওয়ার ফলেই ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে ওঠে। একথা বলা হয় যে, বিজ্ঞানের মতই যাদু প্রকৃতির ওপর কৃর্তৃত্ব করতে চায়। যখন যাদু তা পারে না তখন ধর্মীয় বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে অতিপ্রাকৃত শক্তির চিন্তা গড়ে ওঠে। তখন পূর্জাপ্রার্থনার বিষয় হয়ে ওঠে।

সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, মানুষের জন্ম বা মৃত্যুর মত ঘটনা যাদু এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, মানুষের মৃত্যু মানুষেরই মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বেশীর ভাগ আচার বা বিশ্বাসই জড়িয়ে থাকে পরজন্ম, স্বর্গ, নরকের ধারণা, চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ঈশ্বর এবং ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে। মানুষের জন্ম-মৃত্যুর বৃত্তের মধ্যে এদের শিকড় খুঁজে পাওয়া যায়। এজন্যই নৃতত্ত্ববিদরা বলেন যে মানুষের প্রথম মন্দিরটি ছিল সমাধি এবং প্রথম ঈশ্বরটি ছিল মৃত পূর্বপুরুষ (মৃত্যুর পর আত্মা)।

জীবিত মানুষের থেকে মানুষের মৃত্যুপরবর্তী আত্মাকে বেশী শক্তিশালী বলে ধরা হ'ত। ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর বা সর্বোচ্চ ঈশ্বরের যে ধারণা তা মৃত পূর্বপুরুষের আত্মার ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়। একে পরে আধিদৈবিক বিষয়ে পরিণত করা হয়। জাদু-ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাসের মধ্যে দিয়েই কারণগত ধারণা, ঘটনার প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব, অভিজ্ঞতা এবং প্রাকৃতিক রূপকে মানব জ্ঞানের আওতায় আনা হয়। প্রথম যুগের জাদু ও ধর্মীয় আচারের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাবধারা, যেমন নৃত্য, গীত, নাটক ও শিল্পের অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক আছে বলে ধরা হয়।

মানবসংস্কৃতি এবং সভ্যতা কৃষি, শিল্প এবং প্রযুক্তির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যত এগোতে থাকে ধর্ম ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য ততই বাড়তে থাকে। ইউরোপে রোমান চার্চ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংগঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ধর্মের বিবর্তন হয়। জাদু, যা গোড়া থেকেই এক উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তি কেন্দ্রিক কৌশল বা জ্ঞানের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, বিজ্ঞান ও ধর্মের মাধ্যমে তা চাপের মুখে পড়ে। ইউরোপে

মধ্যযুগে জাদুকর এবং ডাইনির ওপর অত্যাচার থেকে তা প্রমাণিত। যেখানেই জাদু টিকে গেছে, সেখানেই তা এক ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির কৌশল হিসেবে থেকেছে। জাদু প্রতিষ্ঠানিক সংগঠন বা সংগঠিত ভিত্তির মধ্যে দিয়ে উন্নত হয়নি। আদিম থেকে সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়ে সমাজের যে পরিবর্তন হয় তার মধ্যে দিয়েই জাদু থেকে ধর্মীয় আচার, বিশ্বাস এবং ব্যবহারে সমাজ বিবর্তিত হয়।

৩.৫.২ বিজ্ঞান ও ধর্মের বিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং শিল্পোৎপাদনে বড় ধরনের উন্নতি ঘটে। ভারত, মিশর ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস থেকেই তা দেখা যায়। এর ফলে, কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া, বৈজ্ঞানিক ও পুরোহিত শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য বাড়তে থাকে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান ব্যবহৃত হতে থাকে শিল্প এবং যুদ্ধের কাজে। এগুলি ছিল নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি যা সংগঠিত হয়েছিল সুসংহত প্রতিষ্ঠানরূপে। সামাজিক উন্নতির এই স্তরে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিচ্ছেদের যে রূপ তা অস্পষ্ট হলেও এদের নির্দিষ্ট ভূমিকা ক্রিয়ামূলক পার্থক্য ঘটায়।

গ্রীক ও রোমান সভ্যতার অবনতি এবং খ্রীষ্টধর্মের উত্থানের ফলে ইউরোপের চার্চ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে দেখা দেয়। এর ফলে ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া

চিত্র নং ১২ সন্ত (পলিক্রম কাঠ, ফ্রান্স ১৫০০ শতাব্দী)

খায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বা নিরীক্ষার সুযোগ এবং বিজ্ঞানের মানবিক ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্ববীক্ষার অবনতি বড় রকমের ধাক্কা ঘটে। যে কোন ধরনের জ্ঞানের চার্চই চার্চের অনুমোদন সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। চর্চা-এর 'সেমিনারী'ই ছিল একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের প্রচার এবং সম্প্রসারণ স্বীকৃত ছিল। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দে রেনেসাঁস এবং সংস্কার আন্দোলনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার আগে এই ধারাই বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল।

কোপারনিকাস, গ্যালিলিও এবং নিউটন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক এবং লুথার ও ক্যালভিন-এর মত সমাজসংস্কারকের অবদানেই ফলেই মানবিক যুক্তিনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ক্রমশ বেড়ে ওঠে। লুথার ও ক্যালভিন ধর্মীয় মোক্ষলাভের জন্য চার্চ অপেক্ষা ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেন। গ্যালিলিও এবং নিউটন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে মানুষকে জগতের প্রাকৃতিক প্রকল্পে অংশীদাররূপে ফিরিয়ে আনেন। ধীরে ধীরে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সেমিনারীগুলির চরিত্র পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রশাসন ও জ্ঞানচর্চার জন্য নাগরিক পৌর পর্ষদগুলি এগুলিকে চার্চের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে আসে। জ্ঞানের ধর্মনিরপেক্ষকরণ ইউরোপীয় সমাজে কয়েকশ বছর ধরে চলেছিল এবং তার নিজস্ব সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীলতা সহায়তা লাভ করেছিল। ক্রমশ সেমিনারীগুলি চার্চ-এর আওতার বাইরে এসে জ্ঞান চর্চার জন্য নগরসভ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়। এভাবেই ধর্মনিপেক্ষতার ভিত্তিতে জ্ঞানের সংগঠন এবং সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়। নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তীনের মাধ্যমে ইউরোপীয় সমাজে জ্ঞানের এই ধর্মনিরপেক্ষ রূপ তৈরী হতে কয়েক শতাব্দী লেগে যায়।

৩.৬ জ্ঞানের বিভাজন

ইউরোপীয় সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানএবং মানববিদ্যা ইত্যাদি ভাগে জ্ঞান বিভক্ত হয়। এই বিভাজনকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায় (ক) তত্ত্বগত এবং (খ) প্রশাসনিক -ব্যবহারিক

(ক) জ্ঞান বিভাজনের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি

বাস্তবের প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক ধ্যানধারণার ওপর ভিত্তি করে এই পর্যায় গড়ে ওঠে। জার্মান দার্শনিকেরা বাস্তবকে দুটি বৃহত্তর শ্রেণিতে ভাগ করেন ঃ ঘটনাগত বা প্রাকৃতিক বাস্তব এবং সাংস্কৃতিক বা আত্মিক বাস্তব। এঁরা মনে করতেন যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাত্ম নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র প্রথম ধরনের বাস্তবকেই বিশ্লেষণ করা যায়। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বাস্তবকে বুঝতে হলে অনুভূতি অথবা সামগ্রিকতার অর্থ বোঝার মাধ্যমেই সম্ভব।

ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ অগাস্ট কোঁৎ জ্ঞান বিভাজনের এক বিবর্তনমুখী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, অঙ্কশাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যার মত সাধারণ বিজ্ঞান থেকে উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন এবং সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক পদার্থবিদ্যার মধ্যে দিয়ে এই বিভাজন ঘটে। কোঁৎ মনে করতেন জৈবিক বিবর্তনের মতই জ্ঞানের বিবর্তন একই ধরনের পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ঘটে। যেমন দর্শন এবং অঙ্কশাস্ত্র থেকে সমাজবিজ্ঞান এবং মানববিদ্যার নির্দিষ্ট ভিন্নজাতীয় একক বিষয়ের উদ্ভব হয়।

(খ) ব্যবহারিক প্রেক্ষিত এবং জ্ঞানের বিভাজন

অধিকাংশ বিজ্ঞানেরই সূত্রপাত মানবজীবনে জ্ঞানের ব্যবহার থেকে হওয়ার দরুণ জ্ঞানের বিভাজন ঘটে। ঐতিহাসিকভাবে অধিকাংশ বিষয়ে তত্ত্ব এবং দর্শনের সঙ্গে মানুষের সমস্যা সমাধানের কৌশলের যোগ আছে। জ্ঞানের এই ব্যবহারিক প্রেক্ষিত উদ্ভূত হওয়ার পর তা সংগঠিতভাবে একটি যুক্তিনিষ্ঠ রূপ পায়। জ্যোতির্বিদ্যা বা সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কারের আগেই মানুষ তারাকে ব্যবহার করতে থাকে নৌচালনার ক্ষেত্রে। এইভাবে পদার্থবিদ্যা বা বলবিদ্যা সৃষ্টি হওয়ার আগেই মানুষ তীর, ধনুক প্রভৃতি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে শিখে যায়। বহু সামাজিক এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমন রাশিশাস্ত্র, অর্থনীতি, রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা সমাজের কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণ করার জন্যই উদ্ভূত হয়। এক্ষেত্রে আবিষ্কারের জনক হয়ে ওঠে প্রয়োজন। তবে হঠাৎ ঘটে যাওয়া আবিষ্কার এবং সৃজনীশক্তিও জ্ঞানের বিভাজনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৩.৬.১ ধ্রুববাদ

পূর্বে আলোচিত জ্ঞানের বিভাজন মূলত কিছু দার্শনিক ভিত্তিতে গড়া ওঠা বাস্তবের শ্রেণিবিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল। মান এবং বিষয় অথবা বাহ্যমূর্তি এবং বুদ্ধি দ্বারা অধিগম্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ পারস্পরিক বিচ্ছেদের ধারণা থেকে। এই বিচ্ছেদের ফলে ধারণা, পদ্ধতি বা জ্ঞানের ব্যবহারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিকবিজ্ঞান এবং সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে মিলন সম্ভব ছিল না।

পরবর্তীকালে এই ধারার বিরোধী চিন্তা গড়ে ওঠে। এতে মনে করা হয় যে অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক বা শৈল্পিক বাস্তব প্রকৃতিক বাস্তবের নীতিরই অন্তর্গত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি বা ধারণা একইভাবে এই ধরনের জ্ঞানচর্চাতেও ব্যবহার করা যায়। পশ্চিমী চিন্তাধারায় এই ছিল ধ্রুববাদের যুগ। পরবর্তীকালে একথা স্বীকার করা হয় যে, 'সামগ্রী' নয়, 'মূল্য' বা 'অর্থ' সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবকে সৃষ্টি করে বলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি এক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যবহার করা যায় না। এও দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক 'আচরণ' বা 'কর্ম' যে নীতিসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নীতিসমূহের থেকে আলাদা।

৩.৬.২ বিষয়বস্তু ঃ ধারণাগত কাঠামো

যে নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়, তার মূলে ছিল এই ধারণা যে প্রত্যেক বিষয়েরই আলাদা বিষয়বস্তু আছে। প্রত্যেক বিষয়েরই নিজস্ব তথ্য বা উপদেশের ওপর ভিত্তি করে এই বিভাজন হয়। বিজ্ঞানগবেষণা যত উন্নত হতে থাকে তত বোঝা যায় যে বিষয়বস্তু নয়, বাস্তবকে বোঝার নিজ নিজ নিজ ধারণাগত কাঠামোর উপর ভিত্তি করে এই বিভাজন হওয়া উচিত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি চেয়ারকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতিনিধিরা ভিন্নভাবে দেখবেন। একটি বস্তু হিসেবে এটি বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্রদের—পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের, যদি তারা জানতে চায়, কেন চেয়ারটি দাঁড়িয়ে থাকে বা পড়ে যায় (মাধ্যাকর্ষণ নীতি)।

রসায়নের ছাত্রদের, যদি তারা ব্যাখ্যা করতে চায় কাঠটি কি উপাদানে তৈরী।
প্রত্নতত্ত্বের ছাত্রদের, যদি তারা জানতে চায় এর বয়স ও ইতিহাস।
অর্থনীতির ছাত্রদের, যদি তারা ব্যাখ্যা করতে চায় এর বাজার ও মূল্য।
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের, যদি তারা জানতে চায় ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের প্রতীকী প্রতিনিধিত্বকরণ চেয়ারটি করে কিনা।
সমাজতত্ত্বের ছাত্রদের, যদি তারা জানতে চায় চেয়ারটির সামাজিক মর্যাদা।
এবং চারুকলার ছাত্রদের, যদি তারা জানতে চায় এর শৈল্পিক গুণাবলী, ইত্যাদি।

সুতরাং জ্ঞানের বিভাজন যুক্তিসম্মতভাবে করতে গেলে বাস্তবের কোন নকল বিভাজন দ্বারা তা সম্ভব নয়। প্রত্যেক বিষয়ের ধারণাগত ও পদ্ধতিগত প্রেক্ষিতের মাধ্যমে সাধারণভাবে বাস্তবকে বোঝার চেষ্টার সূত্রে এই বিভাজন করা সম্ভব।

অনুশীলনী ৩

১. মোহিনীবিদ্যাকে ছদ্ম-বিজ্ঞান বলা হয়, কারণ (সঠিক উত্তরটি বেছে নিন)
 (ক) মোহিনীবিদ্যা অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
 (খ) মোহিনীবিদ্যার কোন প্রামাণিক তথ্য নেই।
 (গ) মোহিনীবিদ্যা হেতুবাদের নিয়মগুলি অবলম্বন করে, কিন্তু এগুলি ভুল ধারণা।
 (ঘ) মোহিনীবিদ্যা একটি ব্যক্তিগত ক্ষমতা।

২. ধ্রুববাদ যে দৃষ্টিভঙ্গির উপর স্থাপিত তা হল (সঠিক উত্তরটি বেছে নিন)
 (ক) বিজ্ঞান মানবজাতির ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।
 (খ) বিজ্ঞান সমাজে কোনটা সম্ভব বা অসম্ভব তার প্রমাণ দিতে পারে।
 (গ) বৈজ্ঞানিক (বা বিজ্ঞানসম্মত) প্রণালী সামাজিক বা প্রাকৃতিক—সমস্ত বাস্তব বস্তুতেই সমানভাবে প্রয়োগ হয়ে থাকে।
 (ঘ) একমাত্র বিজ্ঞানই কোনটা ভাল বা কোনটা মন্দ তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।

৩. জ্ঞানের প্রয়োগ এবং এর নিয়মাবদ্ধতার সম্পর্কে এমন যে (সঠিক উত্তরটি বেছে নিন)
 (ক) নিয়মাবদ্ধতা প্রায়োগিক জ্ঞানের পূর্বসূরী।
 (খ) জ্ঞানের প্রয়োগ প্রথমে হয়েছিল এবং নিয়মাবদ্ধতা সময়কালে অনুসরণ করেছিল।
 (গ) জ্ঞানের প্রয়োগ এবং নিয়মাবদ্ধতার মধ্যে সম্পর্ক ছিল না।
 (ঘ) জ্ঞানের প্রয়োগ এবং নিয়মাবদ্ধতা একমাত্র সঙ্কটকালীন সময়েই সম্বন্ধযুক্ত ছিল।

৩.৭ জ্ঞানের সম্পৃক্তকরণ

জ্ঞানের বিভাজনকে বিষয়বস্তুর বিভাজন হিসেবে না দেখে ভিন্ন ভিন্ন ধারণাগত কাঠামোর প্রেক্ষিতে

দেখলে জ্ঞানের সম্পৃক্তকরণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক এবং সমাজ বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় গভীর গবেষণার মধ্যে দিয়েই এই সম্পৃক্তকরণ ঘটা সম্ভব। যত বেশী একটি সমস্যার গভীরে যাওয়া যায়, ততই বোঝা যায় যে, বাস্তবকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে অন্যান্য বিজ্ঞানের প্রক্ষিত কিভাবে ওই সমস্যাকে দেখছে তা দেখা দরকার।

প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের এই সমকেন্দ্রিক ধারণা থেকেই নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। এই উপলব্ধি থেকেই জীবরসায়ন, জীববিজ্ঞান, জীবপদার্থবিদ্যা ইত্যাদি নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। কোন একটি বিশেষ বিষয় ছাপিয়ে ধারণাগুলির বৃহত্তর চিন্তা থেকেই জন্ম নিয়েছে জ্ঞানের সম্পৃক্তকরণ। সমাজবিজ্ঞানে যেমন দেখা যায় ঃ

(ক) সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব থেকে সাহায্য নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'সামাজিকীকরণ' এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা বলেছেন।

(খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত ধারণা যেমন 'ক্ষমতা' এবং 'কর্তৃত্ব' নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা কাজ করেছেন।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি এবং সমাজে আর্থিক বৃদ্ধির ধরন ও হারের তফাৎ খুঁজতে গিয়ে অর্থনীতিবিদরা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, ব্যক্তিত্ব গঠন এবং আবিষ্কারের কথা বলেছেন।

(ঘ) শিল্প এবং সংস্কৃতির রূপ ও ধরনের পার্থক্য বুঝতে গিয়েই ছাত্রেরা শিল্পীর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যর গুরুত্ব বুঝতে পারছেন।

সুতরাং জ্ঞানের এক একটি শাখায় গবেষণার গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জ্ঞানের সম্পৃকতিকরণও ঘটেছে। বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত স্তরে আদানপ্রদান থেকে ধারণাগত স্তরে জ্ঞানের সম্পৃক্তকরণ অনেক সহজ।

প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা, শিক্ষা-বহির্ভূত বিষয়, যেমন মানসিকতার তারতম্য, গবেষণার অর্থ বণ্টন বা গবেষণার স্বীকৃতি বণ্টন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এও দেখা যায় যে, জ্ঞানতত্ত্বের কারণে নয়, এইসব কারণেই গবেষণার লব্ধ ফল যা জ্ঞানের সম্পৃক্তকরণ ঘটায় তা যৌথ গবেষণায় লিপ্ত বিশেষজ্ঞরা ব্যবহার করতে পারেন না।

মানুষের সমস্যা, বিশেষ করে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা এবং বিষয়ের পারস্পরিক আদানপ্রদানের সমস্যা, জ্ঞানের সম্পৃক্তকরণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য, গত কয়েক বছরে যুক্তি, ধারণা এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা এগোন গেছে যার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের সম্পৃক্তকরণের সম্ভাবনা বেড়েছে।

অনুশীলনী ৪

১. জ্ঞানের সম্পৃক্তকরণ বলতে কি বোঝায় পাঁচ লাইনের মধ্যে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

২. জ্ঞানের সম্পৃক্তকরণ সমস্যা কি কি পাঁচ লাইনের মধ্যে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

....

৩.৮ সারাংশ

চিন্তার ক্ষমতা বলতে বোঝায় আমাদের আত্মবাদী অভিজ্ঞতার বাইরে প্রতীক ব্যবহারের বাস্তবের বিমূর্ত প্রতিনিধিত্বকরণ। এর মানে চিহ্ন, চিত্র এবং পরবর্তীকালে ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতা ও আবেগকে বস্তুগত রূপ দেওয়া। মানুষের এই ক্ষমতার বিবর্তন, মানসিক উন্নতি এবং সংস্কৃতির প্রসারণে সাহায্য করেছে।

এটা হঠাৎ ঘটেনি, ঘটেছে মানুষের অদ্বিতীয় জৈব ঐতিহ্য এবং সামাজিকতার মধ্যে দিয়ে।

চিন্তার ক্ষমতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুসংহত শিক্ষা ও জ্ঞানে পরিণত হয়। জাদু, বিজ্ঞান ও ধর্মের নীতিরূপে উদ্ভব ঘটে যায়, যার মধ্য দিয়ে জগতের বাস্তবকে সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীকালে ধর্ম ইউরোপের সংগঠিত চার্চ এবং মানুষের অবস্থার ব্যাখ্যার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গুরুত্ব পায়। সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি এবং সংস্কারপন্থী আন্দোলনের বড় ভূমিকা আছে।

এর মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান নৈতিক রূপ পায় এবং তাকে সমাজের ও মানুষের সমস্যার সমাধানে কাজে লাগান হয়। এর মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের বিশেষীকরণ ও সম্পৃক্তকরণ ঘটে।

জ্ঞানের ধর্মনিরপেক্ষ রূপ তৈরী করতে এবং অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান সৃষ্টিতে এর অবদান আছে।

এই সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়ায় মানুষের ভূমিকা প্রয়োগ ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ও মানবিকতা অথবা দুই সংস্কৃতির মধ্যে ফারাক অর্থহীন, একথা জানা থাকলেও উপযুক্ত এবং সম্পূর্ণ সম্পৃক্তকরণ এখনও হয়ে ওঠেনি।

৩.৯ শব্দগুচ্ছ

বিমূর্ত ঃ অবয়াহীন।

নন্দনতত্ত্ব ঃ চারুকলা বা সৌন্দর্যশাস্ত্র।

বিলয় ঃ শূন্যতায় নিয়ে আসা, ধ্বংস।

নৃতত্ত্ববিদ ঃ ছাত্র বা বিশেষজ্ঞ যিনি মানুষের সম্পূর্ণ দিক, যেমন তার শারীরিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে গবেষণা করেন।

অস্ট্র্যালোপিথেকাস ঃ দশ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকার বসবাসকারী আদিম মানুষের একটি আদিম দল।

জ্ঞান, অবধারণ ঃ জানার বা ধারণা করার ক্ষমতা।

মগজ-স্মৃতি-সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত ঃ মগজের ধূসর অংশ সম্পর্কিত, মগজের বাইরের স্তর সংক্রান্ত।

সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির গঠন ও প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান।

করোটি সংক্রান্ত ঃ মগজের বা মস্তিষ্কের করোটি বা খুলি সম্পর্কিত।

কথ্যভাষা বা স্থানিক ভাষা ঃ কোনো বিশেষ অঞ্চলের কথা বলার ভাষা।

নীতিশাস্ত্র ঃ নৈতিক চরিত্র বা স্বভাবের ভালমন্দ বিচার সংক্রান্ত বিদ্যা।

বিদ্যমান ঃ অস্তিত্বের প্রকাশ করা।

উত্তরাধিকার ঃ বংশানুক্রমিক সম্পত্তির হস্তান্তর।

স্বকীয় ঃ সহজাত, খাঁটি।

অধিবিদ্যামূলক ঃ অতিপ্রাকৃত।

অঙ্গাসংস্থান বিজ্ঞান ঃ গাছপালা, জীবজন্তু ও সমাজের গঠন সংক্রান্ত।

জীবাশ্মসংক্রান্ত বিজ্ঞান ঃ জীবাশ্মের সাহায্যে পৃথিবীতে আগেকার জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান।

নমনীয় ঃ পরিবর্তনসাপেক্ষ, ছাঁচ অনুযায়ী গঠন সংক্রান্ত।

ছদ্ম ঃ নকল, মিথ্যা।

রেনেশাঁস ঃ **১৪শ-১৬শ শতাব্দে প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পের নবজীবন লাভ।**

সেমিনারী ঃ **শিক্ষালয়, ইউরোপ প্রাচীনকালে পুরোহিতদের শিক্ষা দেবার স্থান।**

৩.১০ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১ (ক)

২ (গ)

অনুশীলনী ২

১ (খ)
২ (গ)
৩ (গ)
৪ ৪.৪.৫ এবং ৪.৪.৬-এর অনুচ্ছেদগুলি পড়ুন এবং নিজের ধারণা তৈরী করুন।

অনুশীলনী ৩

১ (গ)
২ (গ)
৩ (খ)

অনুশীলনী ৪

১ ৩.৭ অনুচ্ছেদটি দেখুন
২ ৩.৭ অনুচ্ছেদটি দেখুন

একক ৪ ❑ সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তন

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা ঃ বিবর্তন, বিকাশ ও বৃদ্ধি
৪.২.১ সামাজিক পরিবর্তন
৪.২.৩ বিকাশ
৪.২.৩ বৃদ্ধি
৪.৩. সামাজিক গঠনাকৃতির পার্থক্য
৪.৩.১ সরল থেকে জটিল সমাজ
৪.৩.২ আঞ্চলিক সংস্কৃতি ঃ প্রযুক্তির অগ্রগতি ও সামাজিক পার্থক্য
৪.৪ শ্রেণি-বিভাজনের আবির্ভাব
৪.৫ মানববসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া
৪.৬ সারাংশ
৪.৭ শব্দগুচ্ছ
৪.৮ উত্তরমালা
৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এর আগে ২ নং এককে দেখান হয়েছে যে, মানুষ নতুন নতুন কৌশল ও হাতিয়ার উদ্ভাবন করে কিভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটিয়েছিল। এই এককের আলোচনায় ঐ ধরনের প্রগতির বিশেষ কয়েকটি মাত্রার উপর আলোকপাত করা হবে। যেমন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক পরিবর্তনের আলোচনা এই এককে করা হবে। এই একক পঠন-পাঠনের পর অনায়াসেই যা করতে পারবেন তা হ'ল ঃ

- সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন ও বিকাশের পার্থক্য নিরূপণ।
- সরল থেকে জটিল সমাজের অনুসন্ধান।
- মানব-বসতি প্রক্রিয়ার বিবর্তনের জ্ঞান আহরণ।

৪.১ প্রস্তাবনা

'সামাজিক পরিবর্তন' শব্দটি আমাদের অতি পরিচিত। এটা আমাদের সকলেরই জানা যে, সমাজ নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে—নৈতিকতার পরিবর্তন, মূল্যবোধ ও প্রথার পরিবর্তন সবই ঘটেছে

ব্যাপক ভাবে। কিন্তু আমরা কি কখনও ভেবে দেখি যে, সমাজের এই পরিবর্তন ঘটেছে কিভাবে? অর্থাৎ সমাজ-পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি কি? উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, যদি কোন প্রথার পরিবর্তন ঘটে, তাহলে কি আমরা জানতে চাই প্রথার পরিবর্তনের কারণটা কি? কিভাবে প্রথার পরিবর্তন ঘটল? এই পরিবর্তন কি ভালর দিকে? এই পরিবর্তন কি প্রয়োজনীয় ছিল?

এই প্রশ্নগুলি কেবল অনুসন্ধিৎসা বা ঔৎসুক্যের কারণেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানবসমাজের বিবর্তন ও বিকাশের দিক থেকেও এই প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

'সামাজিক পরিবর্তন' হচ্ছে সকল ধরনের সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। জৈব্য-সামাজিক-প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। ফলে মানবসমাজ দীর্ঘকাল ধরে পরিবেশের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে। সমাজের পরিবর্তন এনেছে সমাজের গঠনাকৃতিতে পরিবর্তন। তাই, সরল সমাজ জটিল সমাজের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এই পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দ্বারা।

ব্যাপারটা এই নয় যে, মানবসমাজ শুধু পরিবর্তিত হচ্ছে। বরং দেখা যাবে, এই পরিবর্তন হচ্ছে মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশ বা উন্নয়নকে ঘিরে। এর সঙ্গে ঘটে চলেছে বিভিন্ন ধ্যানধারণার বিকাশ বা বহিঃপ্রকাশ, সামাজিক-প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ বা উন্নয়ন, দক্ষতা ও কৌশলের বিকাশ বা উন্নতি। এখন প্রশ্ন—উন্নয়ন বা বিকাশ কি?

উন্নয়ন বা বিকাশ হচ্ছে সামাজিক-পরিবর্তনের সেই প্রক্রিয়া যার মধ্যে সমাজ একটি ইতিবাচক মূল্য সংযোজিত করে রাখে।

এই এককের আলোচনায় সরল থেকে জটিল সমাজের কাঠামো ও কার্যে উত্তরণের বিভিন্ন পার্থক্যসমূহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হবে। এই প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্তন ও কৃৎ-কৌশল বা প্রযুক্তির পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই এককে তাই সমাজে বৃত্তিগত পার্থক্যের বিকাশ এবং বৃত্তিগত পার্থক্যের থেকে উদ্ভূত শ্রেণিগত পার্থক্যও আলোচনা করা হবে।

কৃষি থেকে শিল্পসমাজে ও শহুরে সমাজে মানব-বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে ক্ষমতার আধার যেসব প্রতিষ্ঠান সে সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা থাকবে এই এককে ।

৪.২ পরিবর্তনের ধারণা ঃ বিবর্তন, বিকাশ ও বৃদ্ধি

বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় সামাজিক কাঠামোর নানা পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং অসংখ্য মানবিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তন-প্রক্রিয়া যুক্ত থাকে। জীবজগতে বিবর্তনের ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌গতি দেখা যায় না। কিন্তু সমাজ-পরিবর্তনের বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় কখন কখন পশ্চাদ্‌গতি ঘটতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, একটি গ্রাম কালক্রমে একটি শহর বা নগর পরিণত হতে পারে। আবার ঐ শহর বা নগর কালের বিবর্তনে পুনরায় গ্রামে পরিণত হতে পারে। সমাজ-বিবর্তনের এই ধরনের ঘটনাকে পশ্চাদ্‌গতি বলা হয়। কিন্তু জীবজগতের বিবর্তনধারায় কেবল এক স্তর থেকে উচ্চ স্তরে অগ্রগমন করা যায় এবং এই অগ্রগমনকে কখনই পিছু হটতে হয় না।

৪.২.১ সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা সামাজিক সম্পর্কসমূহ এবং সমাজে জনসাধারণের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। সমাজের অভ্যন্তরীণ কারণ, যেমন জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, প্রযুক্তির পরিবর্তন প্রভৃতি কিংবা সমাজের বাহ্যিক কোন কারণে সামাজিক পরিবর্তন হয়। সমাজের পরিবর্তনের বাহ্যিক কারণ হিসেবে যুদ্ধ, ব্যবসাবাণিজ্য বা বৈদেশিক লেনদেনের উল্লেখ করা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাপারটির সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের মাপকাঠি যুক্ত থাকে। এখানে ছোট অথবা বড় মাপের পরিবর্তনের উল্লেখ করা যায়। যেমন, একটি ক্লাব বা কারখানার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা অর্জন হল ক্ষুদ্রাকার এক সামাজিক পরিবর্তন। আবার সামাজিক পরিবর্তন স্বল্পকালীনও হতে পারে। যেমন, কর্মসংস্থানের হারে পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন। আবার যদি বৃত্তি-কাঠামোয় কোন পরিবর্তন ঘটে তা হবে এক দীর্ঘকালীন সামাজিক পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তন চক্রাকারেও ঘটতে পারে। সমাজে সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা চক্রাকারে পরিবর্তন লক্ষ করতে পারি। কোন একটি ফ্যাশন বা জীবনধারা যা এক সময় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কিছুদিন পর তার পুনরাবির্ভাব সমাজে ঘটতে পারে।

কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদের মতে, সময়ের প্রবাহে মানুষের সামাজিক ব্যবস্থাপনার যে প্রকাশ ঘটে তা হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন, সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনের বিশ্লেষকগণের উচিত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের গড়ন, জনসমাজের বৈশিষ্ট্য এবং সদস্যদের মধ্যে আন্তঃ-সম্পর্কের কাঠামোর এক বা একাধিক দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে মূল্যবোধ, বিশ্বাস, জ্ঞান ও বিশ্ববীক্ষার পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার এটি হল একটি বিশেষ দিক।

৪.২.২ বিকাশ

বিকাশ হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ রূপ। সমাজের সদস্যের আকাঙ্ক্ষিত পথে সামাজিক পরিবর্তনকে বিকাশ বলা হয়। এল.টি.হবহাউস তাঁর Social Development (1925) গ্রন্থে বিকাশ-এর চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—যেমন তিনি বলেছেন মাত্রা (scale), দক্ষতা (efficiency), পারস্পরিকতা (mutuality) এবং স্বাধীনতার (freedom) বৃদ্ধি হচ্ছে বিকাশ। এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটি হচ্ছে এমন একটি অবস্থা বা অবস্থান, যার দ্বারা সমাজ নিজের আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলির বৃদ্ধি ঘটাতে সমর্থ হয়।

সমাজতত্ত্বের সমসাময়িক আলোচনায় 'বিকাশ' শব্দটি প্রথমত ব্যবহৃত হয় শিল্পোন্নত সমাজের সঙ্গে নিম্ন আয়স্তরের কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য সমাজের পার্থক্য ব্যাখ্যা করার জন্য। অর্থাৎ উন্নত ও উন্নয়নশীল সমাজের পার্থক্য করার জন্য 'বিকাশ' শব্দটিকে ব্যবহার করা শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, 'বিকাশ' শব্দটি দ্বারা বোঝান হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এখন শিল্পায়ন ঘটেছে। বিকাশ সম্পর্কে এই ধারণার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে—

প্রথমত, 'বিবর্তনে'র সাধারণ কোন তত্ত্বের সাথে 'বিকাশ'-এর তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। 'বিকাশ' হচ্ছে আমাদের বর্তমানকালে এক বিশেষ ধরনের পরিবর্তন।

দ্বিতীয়ত, বলা যায় যে, 'বিকাশ' হচ্ছে প্রধানত এক অর্থনৈতিক পরিবর্তন যা কোনও না কোনওভাবে নির্দিষ্ট আকারে চিহ্নিত করা যায় ও পরিমাপ করা যায়।

সুতরাং বলা যায় যে, 'বিকাশ' হচ্ছে পূর্বে উল্লেখিতভাবে সমাজের সদস্যদের দ্বারা আকাঙিক্ষত পথে সমাজবিবর্তন সাধনের একটি কৌশল। সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক ও ভৌগলিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বিকাশের ধারণার কিছু পার্থক্য ঘটলেও 'বিকাশ'-এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রায় সর্বত্র একইরকমভাবে লক্ষ করা যায়। 'বিকাশ' বলতে বোঝায় শিক্ষা, কৃষি, শিল্পক্ষেত্রে একইসঙ্গে বৃদ্ধি ঘটানো।

বিকাশের উদ্দেশ্যসমূহও নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতির প্রেক্ষাপটে রচিত। বিকাশ হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া। একই ধরনের অর্থ বহন করে এমন একটি অতি পরিচিত শব্দ হচ্ছে 'আধুনিকীকরণ'। কিন্তু 'বিকাশ'-এর সঙ্গে 'আধুনিকীকরণ'-এর পার্থক্য হচ্ছে যে, 'আধুনিকীকরণ' শব্দটি 'প্রচীন' বা 'ঐতিহ্য' বা 'সাবেকী' শব্দটির বিপরীত ব্যবহৃত হয়।

এইভাবে 'বিকাশ' নির্দিষ্ট এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। ধারণা হিসেবে 'বিকাশ' গুরুত্ব লাভ করেছে জনকল্যাণকর রাষ্টের উদ্ভবের যুগে। কারণ জলকল্যাণকর রাষ্টের ধারণা অনুসারে মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য সমাজ পরিকল্পিতভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে সংগঠিত ও পরিচালিত করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতে 'বিকাশে'-র লক্ষ্য হচ্ছে - আধুনিকীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নতি, আত্ম-নির্ভরশীলতা ও সমতা। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আর্থিক নীতি, শিল্পনীতি ও কৃষিনীতির পরিবর্তনের দ্বারা সমাজে পরিবর্তন আনয়নের উপযুক্ত লক্ষ্য ধার্য করা হচ্ছে।

সমাজ রূপান্তরের পরিকল্পিত, আকাঙিক্ষত-অনাকাঙিক্ষত উভয় প্রকার প্রক্রিয়াই হচ্ছে সামাজিক পরির্তন। সামাজিক অভ্যুত্থান, সামাজিক বিদ্রোহ এমন কি যুদ্ধ - বিগ্রহের মাধ্যমেও সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। কিন্তু এই সফল পরিবর্তনকে কখনই 'বিকাশ' বলে আখ্যায়িত করা যায়না। 'বিকাশ' হচ্ছে সমাজ-পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পিত নির্দেশিত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সমাজ-পরিবর্তনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখিত থাকে।

৪.২.৩ বৃদ্ধি

বৃদ্ধির ধারণার মধ্যেও সামাজিক পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট রূপ ও ধাঁচ লক্ষ করা যায়। অর্থনীতির দিক থেকে বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে সমাজের উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এমনভাবে করা যার দ্বারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আকাঙিক্ষত হারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ফল লাভ করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি অথবা অর্থনৈতিক বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি যা পরিসংখ্যান দ্বারা পরিমাপ করা যায় সেই বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে, ধারণা হিসেবে 'বৃদ্ধি' হচ্ছে 'বিকাশে'র প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ; কারণ বৃদ্ধি না ঘটলে বিকাশ ঘটতে পারে না।

অনুশীলনী ১

১. 'সামাজিক পরিবর্তন' বলতে কি বোঝায় তা পাঁচলাইনে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

২. 'বিকাশ'-এর ধারণা কোন্ সময়ে গুরুত্ব লাভ করে থাকে।
নীচের জায়গায় উত্তর লিখুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৪.৩ সামাজিক গঠনাকৃতির পার্থক্যকরণ

পার্থক্যকরণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি ব্যবস্থার অঙ্কুরিত রূপ গঠনাকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অথবা জীবনের ধরন-ধারণের ক্ষেত্রে নতুন ও জটিল রূপ এই প্রক্রিয়ায় লক্ষ করা যায়। সুতরাং এই প্রক্রিয়া জৈবিক ও সামাজিক উভয়ই হতে পারে। নানা কারণে সমাজে এই প্রক্রিয়া ঘটতে পারে। যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি, অন্যান্য সম্পদ বৃদ্ধি, নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার ইত্যাদি। এই পরিবর্তনের ফলে পুরানো উৎপাদন পদ্ধতি ও পেশার পরিবর্তে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও নতুন পেশার উদ্ভব ঘটে। নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নতুন সামাজিক সংগঠনেরও আবির্ভাব ঘটে। এইভাবে দেখা যায় যে, পার্থক্যকরণ হচ্ছে সমাজপরিবর্তনের একটি বিবর্তনকারী প্রক্রিয়া।

৪.৩.১ সরল থেকে জটিল সমাজ

সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত যদি দেখা যায় যে, কিভাবে মানুষ ও মানব-সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ সরল থেকে জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে তাহলে দেখা যাবে যে, মানুষ প্রথমে ছিল অরণ্যচারী, খাদ্যসংগ্রহকারী। তার

পর ধীরে ধীরে আদিম সমাজ থেকে মানুষ গড়ে তোলে কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য সমাজ এবং সবশেষে মানুষ গড়ে তুলেছে অতি উন্নত শিল্প-সভ্যতার আধুনিক মহানগর (Metropolitan City)।

মানুষের সমাজের এই বিবর্তন ঘটেছে দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে। হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির উদ্ভবের সঙ্গে ঘটেছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভব। একেবারে গোড়ার দিকে আদি প্রস্তরযুগে মানুষ ব্যবহার করত পাথরের তৈরী হাতিয়ার ও দ্রব্যসামগ্রী। তারপর শুরু হয় পাথর ভেঙে দুটুকরো করা দ্বিমুখবিশিষ্ট পাথরের হাতিয়ার ও দ্রব্যসামগ্রী। প্রস্তরযুগের শেষে মানুষ শেখে আগুনের ব্যবহার।

তখন থেকেই মানুষ তার আশ্রয়ের জন্য তৈরী করতে থাকে বাড়ি বা ঘর। এই যুগে খাদ্য সংগ্রহ বা শিকার করে জীবনধারণ করলেও মানুষের মধ্যে সম্পত্তির কোন চেতনা ছিল না। সেই যুগে খুব ক্ষুদ্রাকারে সরাসরি দ্রব্য বিনিময় হ'ত বলা যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দেখা যে, আদিম প্রস্তরযুগের মানুষ মৃতকে সমাহিত করত এবং মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলিও প্রদান করত। সেই সময়ে জাদুবিদ্যার খুব চর্চা হত। পরবর্তীকালে এমন কিছু বিশ্বাস করত যা কালক্রমে ধর্মের আবির্ভাব ঘটায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা দলে সংগঠিত হয়ে মানুষ সেই যুগে বসবাস করত। স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদে, বয়ঃক্রমের ভেদাভেদে এবং দক্ষতার বিশেষীকরণের ভিত্তিতে কিছু পরিমানে শ্রমবিভাগে এ যুগে চালু ছিল।

আদি প্রস্তরযুগের পরে এসেছিল মধ্য প্রস্তরযুগ। এই যুগে মানুষ ব্যাপকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে পড়েছিল এবং তার ফলে মানুষ নিজেদের জীবনধারা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। হিমযুগ শেষ হয়ে গিয়ে ইউরোপে নূতন বনাঞ্চলের উদ্ভব। এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলে আধা-মরু অঞ্চলের প্রসার ইত্যাদি ঘটনার ফলে মানুষের স্থানান্তরে গমন ঘটেছিল। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তখন গড়ে তুলেছিল নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল। এইভাবে মানুষের সমাজ বিবর্তিত হতে থাকল সরল থেকে জটিল সমাজে তথা সমাজ-প্রতিষ্ঠানে।

৪.৩.২ আঞ্চলিক সংস্কৃতি ঃ প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং সামাজিক পার্থক্যকরণ

এই যুগে প্রত্যেকটি সামাজিক গোষ্ঠী নিজস্ব সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আদিম যুগে গুহামানবের ও বন্যমানবের জীবন-ধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের । খাদ্য, আশ্রয় ও হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি যা গুহামানব ব্যবহার করত তাই বন্যমানব করত না। বন্যমানবের খাদ্য ও হাতিয়ার ছিল ভিন্ন ধরনের। গুহামানব ভালো আঁকতে জানত, তা বাইরে গুহামানব যা দেখে আসত গুহাগাত্রে তা সে এঁকে রাখত। সৌভাগ্যবশত, গুহামানবদের গুহাগাত্রে আঁকা সেইসব চিত্র আমরা এখন উদ্ধার করতে পেরেছি। যেমন বাইসন ইত্যাদির ছবি (চিত্র নং ১৩)।

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেছে বিভিন্নভাবে। যেমন, এশিয়ায় একটা সময়ে যখন মানুষেরা আস্ত কাঠের গুঁড়িকে জলে ভাসানোর কাজে ব্যবহার করত তখন আফ্রিকার মানুষেরা কাঠের গুঁড়ির ভেতরটা ফাঁকা করে দিয়ে ডোঙা (ছোট নৌকা জাতীয় ভাসমান বস্তু) তৈরী করে জলে মাছ শিকারে বেরিয়ে পড়ত ।

অর্থাৎ এখানে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে যে, সব অঞ্চলে একই জাতীয় বা একই ধরনের সংস্কৃতির বিকাশ হওয়াটা প্রয়োজনীয় ছিল না। স্পেনের গুহামানবেরা চিত্র অঙ্কন-বিদ্যায় যখন পারদর্শী ছিল, তখন

হয়ত অন্যত্র গুহামানবদের চিত্র-অঙ্কনে সেই দক্ষতা অর্জিত হয়নি। ফলে, আমরা প্রথমে এক দেশের গুহামানবদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু জানতে পারলেও অন্য দেশের গুহামানবদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না।

সমাজ-বিবর্তনের পরবর্তীযুগে অর্থাৎ নব্য প্রস্তরযুগে একেবারে মৌলিক প্রযুক্তিগত বিপ্লব বা সমাজ-বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। এই বিপ্লব ছিল খাদ্যদ্রব্যের প্রধান সূত্র হিসেবে কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীলতার ফল। এই সময়েই প্রকৃতির

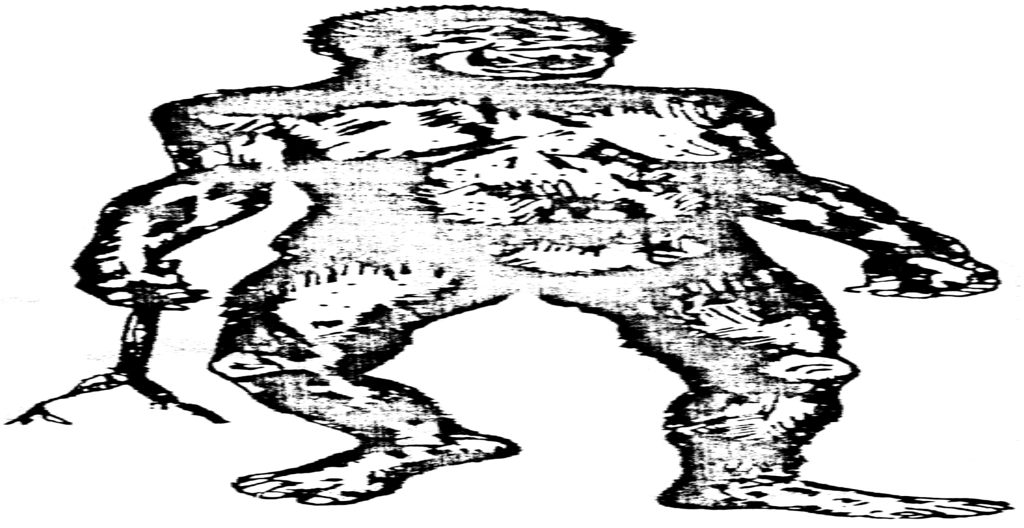

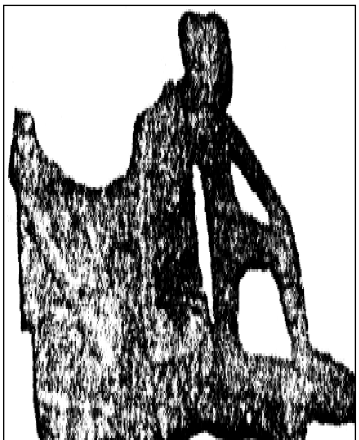

চিত্র ১৩ গুহাচিত্র ও খোদাই (আলতামিরা, স্পেন)

খেয়ালের উপর মানুষের নির্ভরতা কমে যায়। মানুষ তখন থেকেই নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করে এবং নিজের স্থায়ী আশ্রয় নিজেই নির্মাণ করতে শুরু করে।

আজ হয়ত এই ঘটনাকে আমরা ততটা গুরুত্ব দিই না। কারণ আজ সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে বিচার করলে অর্থাৎ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বছর আগে কৃষিকাজ দ্বারা খাদ্য উৎপাদন, স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন ছিল মানুষের সমাজ-সভ্যতার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব। প্রযুক্তির উন্নয়ন, উৎপাদন পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কসমূহের ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মানব-সমাজের ইতিহাস দ্বারা এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আদিম যুগে যখন মানুষ ধীরে ধীরে প্রযুক্তি আবিষ্কার শুরু করেছে ও উৎপাদন-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে তখন মানুষের সমাজ ছিল এক সরল সমাজ। এই সরল সমাজে ছিল—

- প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রারম্ভিক জ্ঞান, যেমন পাথরের তৈরী বা হাড়ের তৈরী যন্ত্রপাতি।
- কিছু প্রাথমিক বিশ্বাস, জ্ঞাতি এবং পরিবার সংগঠন।
- পারস্পরিক ভাব ও মত আদানপ্রদানের জন্য অর্থাৎ সংযোগস্থাপনের জন্য ছিল প্রতীক বা চিহ্ন, ভাবভঙ্গি ও কোনও না কোন ধরনের ভাষা (যার সম্পর্কে আমরা বস্তুত কিছুই জানি না)।

এই যুগে কোনও উদ্বৃত্ত উৎপাদন ছিল না এবং ফলত কোনও শ্রেণিবিভাজন বা স্তরবিভাজনও সমাজে ছিল না। মানুষ তখন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন বা দলবদ্ধ জীবনযাপন করত। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণ করে তখনকার মানুষ এক যাযাবর জীবনযাপন করত। তখনকার মানুষের স্থানান্তরে ভ্রমণ হত প্রধানত খাদ্যের খোঁজে।

কৃষিকাজের উদ্ভব মানুষের এই যাযবর জীবনে যবনিকাপাত ঘটায়। সমাজ-বিবর্তনে তাই কৃষিকাজের উদ্ভাবন হচ্ছে এক ঐতিহাসিক দিক্‌চিহ্ন।

কিভাবে মানুষ খাদ্যোৎপাদনের কাজ শুরু করেছিল তা নির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা এক কঠিন ব্যাপার। মনে বৃক্ষ ও লতাগুল্মাদি পর্যবেক্ষণ করে মানুষ খাদ্যোৎপাদনের কাজ শিখেছিল। যখন মানুষ স্থির করেছিল যে তারা নিজেরাই নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করবে তখন থেকেই মানুষের জীবনযাত্রার ধরন-ধারণেও এসেছিল এক বিরাট পরিবর্তন। মানুষ যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ী সমাজজীবন শুরু করেছিল। এই ঘটনা ছিল মানুষের জীবনের ইতিহাসে এর বিরাট সাফল্য—মানুষের জীবনধারায় এক বিপ্লব।

চিত্র ১৪ বীজবপন

যাযাবর জীবন থেকে স্থিতিশীল সমাজজীবনে চলে আসার ফলে মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সেইগুলি হ'ল—

- দীর্ঘস্থায়ী বাসগৃহের প্রয়োজনীয়তা থেকেই কুঁড়ে-ঘর ধরনের কাঠামো নির্মিত হয়েছিল।
- প্রথম পর্যায়ে খাদ্যোৎপাদন নিশ্চয়ই প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল না। তাই ঐ খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য শিকারের কাজও সমান্তরালভাবে চলেছিল।
- খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মানুষ তখন নানা উপায়, কৌশল ও হাতিয়ার উদ্ভাবনের জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল এবং নিত্যনতুন হাতিয়ার ও কৌশল আবিষ্কার করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, জ্যামিতিক যন্ত্রপাতির উদ্ভব যেটা হয়েছিল, সেটা ছিল খানিকটা কাস্তের মত দেখতে। প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার বছর আগে এই ধরনের আবিষ্কার ঘটেছিল। ভারতের গুজরাটে এই ধরনের ক্ষুদ্র প্রস্তর দ্বারা তৈরী হাতিয়ার পাওয়া গেছে। হাড়ের বা কাঠের টুকরো দিয়ে ঐ ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তৈরী হাতিয়ারের হাতল করা হয়েছে। এইভাবে তৈরী হাতিয়ারটি ছিল কাস্তের মত দেখতে।

চিত্র ১৫ (এক পাথুরে হাতিয়ার, গুজরাট ১০,০০০ - ৪,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

- প্রথমদিকে বীজ বপন সম্ভবত হত গর্তখননকারী দণ্ড দিয়ে। পরবর্তীকালে আবিষ্কার হয়েছিল কোদাল ও লাঙলের।
- বন্যজীবজন্তুদের বশে এনে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা শুরু হয়।

- কৃষিকাজকর্মের সূচনা থেকেই দেখা যায় যে, অধিক শ্রম নিয়োগ করে খাদ্যদ্রব্যাদির মত বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদনের বৃদ্ধির চেষ্টা হয়েছে। ফলে, দেখা দিয়েছে অতিরিক্ত উৎপাদন (অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত) এবং তা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে উদ্বৃত্ত উৎপাদনে। এই অবস্থাতেই দেখা দিয়েছিল একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায়ের দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা।
- এই পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল শ্রমবিভাগের। এই শ্রমবিভাগ হয়েছিল কেবল দক্ষতার ভিত্তিতে নয়, নারী-পুরুষ এবং বয়ঃক্রমের ভিত্তিতেও শ্রম-বিভাজন সংগঠিত হয়েছিল ।
- শ্রম-বিভাজন থেকে উদ্ভব ঘটেছিল সুস্পষ্ট সামাজিক সংগঠনসমূহের এবং প্রশাসনের কাঠামোর।
- শ্রম-বিভাগের ফলে সমাজে দেখা দিয়েছিল কৃষিতে ও বাণিজ্যে বিশেষীকৃত দক্ষতা।
- খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত হওয়ার ফলে কিছু লোক খাদ্য উৎপাদন থেকে সরে অন্য পেশায় চলে যায়।
- খাদ্য উৎপাদনে যে লোকদের প্রয়োজন ছিল না তারা চারুকলা, কারুকলা চর্চা ও অন্যান্য হাতিয়ার উদ্ভাবনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে থাকে।

প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগ ও সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমশ জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার ফলে সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশ্বাস ও সামাজিক কাঠামোর পার্থক্যকরণ প্রভৃতি দ্বারা সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়া আরও অধিক পরিমাণে ত্বরান্বিত হয়।

অনুশীলনী ২

১. কোন্ বিবৃতিটি ঠিক (✓) অথবা ভুল (X) দাগ দিন।

(ক) সারা পৃথিবীতে একই সময়ে একইভাবে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।

(খ) নব্য প্রস্তরযুগে জ্যামিতিক হাতিয়ারসমূহ ছিল ব্রোঞ্জের তৈরী।

(গ) কৃষিতে চলে যাওয়া ছিল সমাজবিবর্তন প্রক্রিয়ায় এক বিরাট সাফল্য।

(ঘ) প্রস্তরযুগের মানুষের নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ছিল।

২. স্থায়ীভাবে সমাজবদ্ধ জীবনের প্রভাব সমাজবিবর্তনের উপর কিরূপ পড়েছিল তা কিরূপ পড়েছিল তা একশ শব্দের মধ্যে লিখুন।

(পাঠকেন্দ্রের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে, এই প্রশ্নের উত্তর দিন।)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৪.৪ শ্রেণিবিভাগের উদ্ভব

ধাতবদ্রব্য আবিষ্কার ও ধাতবদ্রব্যের ব্যবহার ছিল সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক গুরুত্ব ঘটনা। প্রাক্-ইতিহাস সম্পর্কে বিদগ্ধ গবেষক অধ্যাপক ভি. গর্ডন. চাইল্ড (V. Gordon Childe) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ম্যান মেকস্ হিমসেলফ' (Man makes himself)-এ লিখেছেন যে—

"পাথরের দ্বারা নির্মিত কুঠার ছিল গৃহস্থালীতে উৎপাদিত দ্রব্য যা শিকারীরা অথবা কৃষকেরা ব্যবহার করত। এই শিকারী বা কৃষক গোষ্ঠীর বাইরে আর কারও প্রস্তর-কুঠার নির্মাণে কোন শ্রম-বিভাজনকৃত বিশেষ জ্ঞান বা ব্যবসায়িক আদানপ্রদান ছিল না। প্রস্তর-কুঠারের পরে এসছিল ধাতু-নির্মিত কুঠার বা ব্রোঞ্জ দ্বারা নির্মিত কুঠার। এই ব্রোঞ্জ-কুঠার কেবল প্রস্তর-কুঠারের তুলনায় উৎকৃষ্ট গুণগত মানসম্পন্নই ছিল না, ব্রোঞ্জ-নির্মিত কুঠার সূচনা করেছিল এক অধিকতর জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর। ধাতুর ছাঁচ তৈরীর প্রক্রিয়া হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন কাজ যা খাদ্য উৎপাদন এবং সন্তানাদি লালন-পালনের পর অবসর সময়ে করতে হত। ধাতবদ্রব্য নির্মাণ হচ্ছে একটি বিশেষীকৃত দক্ষতার কাজ। এই কাজ যে করে তার পক্ষে নিজে খাদ্য উৎপাদন বা খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ধাতবদ্রব্যাদির কারিগরকে নির্ভর হয়েছিল উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদনের উপর। উদ্বৃত্ত খাদ্য-উৎপাদন আবার নির্ভর করত কৃষিকাজে পারদর্শী বিশেষজ্ঞদের উপর।

ব্রোঞ্জযুগে বা ধাতুদ্রব্য নির্মাণের যুগে সীমিতভাবে হ'লেও ধাতবদ্রব্য দ্বারা তৈরী হ'ত অস্ত্রশস্ত্র, অন্যান্য হাতিয়ার এবং অলঙ্কারাদি। যাই হোক, লোহা আবিষ্কার এবং লোহা গলানোর পদ্ধতির আবিষ্কার মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। লোহা ছিল সব থেকে শক্ত ধাতু। ফলে লোহা দ্বারা নির্মিত দ্রব্যাদি ও হাতিয়ার (যেমন লাঙল)-এর ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

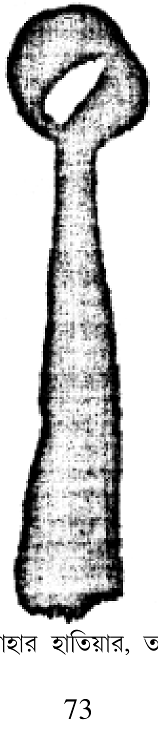

চিত্র ১৬ লোহার হাতিয়ার, তক্ষশিলা ১-৫ শতাব্দী

মানুষ জলসেচের নানান কৌশল দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবন করেছিল, যেমন, জলাধার নির্মাণ করা হয়েছিল। ফলে ধীরে ধীরে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্যের অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ততে উৎপাদন ঘটতে লাগল।

চাকার আবিষ্কার-এর ফলে ভ্রমণ ও বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটে । এখন এটা প্রমাণিত সত্য যে, ব্রোঞ্জ নির্মাতা অঞ্চলের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগ ছিল। অর্থ হিসেবে মুদ্রার প্রচলন দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়েছিল। ব্রোঞ্জযুগে ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থ্ চালু হয়েছিল। এইভাবে ব্রোঞ্জযুগে মানুষের সমাজ এক সঠিক অগ্রগতির পথে এগিয়েছিল।

সমাজে এই সকল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কেও পরিবর্তন ঘটেছিল। উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই সমাজে শ্রেণিবিভাজন স্পষ্ট হতে থাকে। একদিকে দেখা দেয় উৎপাদনের উপকরণের মালিক বা প্রভুশ্রেণি। অন্যদিকে দেখা যায় উৎপাদক বা শ্রমিকশ্রেণি যারা সর্বদায় মালিকশ্রেণির সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে।

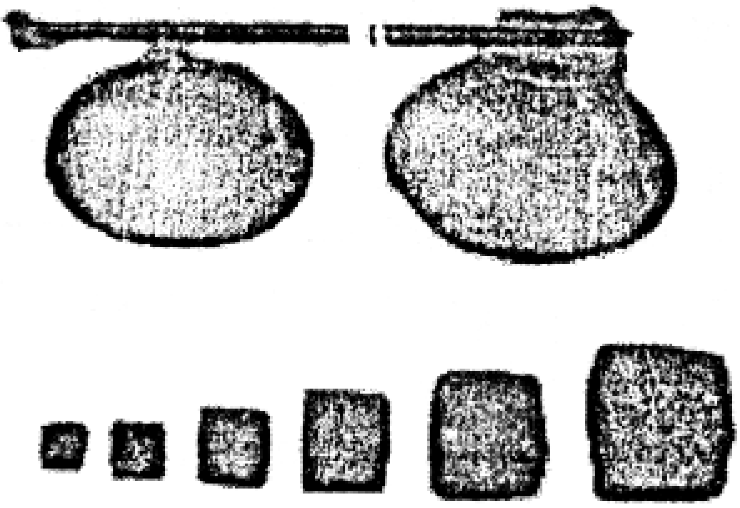

চিত্র ১৭ (ওজন ও পরিমাপ - সিন্ধুসভ্যতা, ৩৫০০ - ২৫০০ খ্রীষ্টাব্দ)

মিশর ও গ্রীসের মত প্রাচীন সমাজে দাস-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই দাস-ব্যবস্থা অতি দ্রুত এক উৎপাদন-পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করে। কৃষিকাজ ও বাড়িঘর-নির্মাণ কাজে দাসদের ক্রয়-বিক্রয় করা হত।

ইউরোপের কোন কোন অংশে ভূমিদাস-প্রথা এবং সামন্ততন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল। এ সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৫ মানববসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন এবং মানব-বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়ার যে সমস্ত উপাদান, যেমন উৎপাদন-পদ্ধতি, প্রযুক্তি, ভৌগোলিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এখন এইসব বিষয়গুলি

সম্পর্কে অন্যান্য আরও দিক আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ, এই দিকসমূহ মানববসতি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

(ক) মানববসতি স্থাপনে স্ত্রীলোকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রাক্-ইতিহাস-এর ছাত্ররা যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, ফল, শাকসব্জী ও নানা ধরণের চারাগাছ রোপণ ও আবাদে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল স্ত্রীলোকেরা। স্ত্রীলোকেরা মাটি কর্ষণ করত, গাছপালা লাগাত এবং জীবজন্তু পালন করত খাদ্য উৎপাদনের জন্য। নারী-পুরুষের বিভাজনের ভিত্তিতে, অর্থাৎ লিঙ্গভেদের ভিত্তিতে এই ধরনের শ্রম-বিভাগ সমাজে প্রথমে দেখা গিয়েছিল। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, পুরুষেরা যখন বাইরে শিকারে বেরিয়ে যেত, তখন বাড়ির স্ত্রীলোকেরা এই সমস্ত চাষাবাদের ও পশুপালনের কাজ করত।

(খ) পরিবার, জাতিগোষ্ঠী, উপজাতি গোষ্ঠী প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশ মানুষকে স্থায়ী বসতি স্থাপনে সাহায্য করেছিল। পরিবার, জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতিগোষ্ঠী থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট গ্রাম এবং আবাসস্থল। ভৌগোলিক অবস্থান, জল-সম্পদের সহজলভ্যতা এবং জলবায়ুগত পরিস্থিতি অনুসারে মানব-বসতির ধরন-ধারণে পার্থক্য ছিল। তাই সর্বত্র একই ধরণের গ্রাম-সমাজ বা আবাসস্থল ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় ভূ-পরিস্থিতি ও জলবায়ু অনুযায়ী ভিন্ন ধরনের গ্রাম ও আবাসস্থল গড়ে উঠেছিল।

(গ) জলের নিত্য প্রয়োজন মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল নদী। তাই এটা আশ্চর্য্যের কিছু নয় যে, মানুষ প্রথমে বসতি স্থাপন করেছিল নদী-অববাহিকা অঞ্চলে। পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতা, গড়ে উঠেছিল নদীতীরবর্তী অঞ্চলে।

(ঘ) মানব-বসতি স্থাপনে কৃষিকার্য পালন করেছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

(ঙ) লিঙ্গভেদের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের মধ্যে যে শ্রম-বিভাজন প্রথমে গড়ে উঠেছিল তা ক্রমে ক্রমে সময়ের সাথে সাথে বিশেষ শিল্পে দক্ষতা অর্জন দ্বারা গঠিত বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটিয়েছিল। ভারতে পেশাগত শ্রমবিভাজন কালক্রমে উত্তরাধিকার রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ, পেশা হয়ে ওঠে উত্তরাধিকার-পেশা। ভারতে উত্তরাধিকার-সূত্রে অর্থাৎ জন্মগতভাবে মানুষের পেশা নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তার ফলে কালক্রমে গড়ে ওঠে জাতপাত ব্যবস্থা।

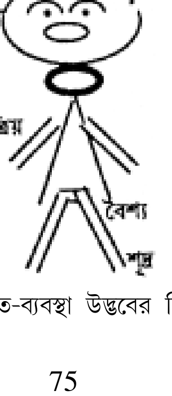

চিত্র ১৮ : জাত-ব্যবস্থা উদ্ভবের বিভিন্ন স্তর

স্তর ১ শুরুতে আর্য ও অনার্য এই দু'টি শ্রেণীবিভাগ ছিল — মোটের ওপর গাত্রবর্ণ ভিত্তিক। অনার্যদের বলা হ'ত শূদ্র। তার পরে জাতব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় পেশাগত শ্রমবিভাগ, জন্ম তখন জাত-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল না। অর্থাৎ, জাত-ব্যবস্থা ছিল পেশাগত, জন্মগত নয়। ফলে, পেশা বা বৃত্তির পরিবর্তন হ'লে জাতেরও পরিবর্তন ঘটত। সুতরাং, তখন পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা ছিল।

স্তর ২ জাত-ব্যবস্থা যখন জন্মগত অর্থাৎ উত্তরাধিকারের সূত্রে গড়ে উঠল তখন পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা থাকলেও জাতের পরিবর্তন ঘটত না। অর্থাৎ পেশার পরিবর্তনে জাতের পরিবর্তন ঘটত না। একজন শূদ্র ব্রাহ্মণের কাজ করলেও সে শূদ্র বলেই পরিচিত হ'ত। অন্যদিকে, একজন ব্রাহ্মণ শূদ্রের কাজ করলে তার জাত-পরিচয় ব্রাহ্মণই থাকত।

স্তর ৩ জাত ও পেশা উভয়ই উত্তরাধিকারসূত্রে, অর্থাৎ জন্মগত বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। জাতপাত অনুযায়ী পেশা বা বৃত্তি নির্ধারিত হ'তে লাগল।

স্তর ৪ জাত-বিভাজন আবার উপ-জাতসমূহের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

চ) সামাজিক পরিবর্তন ও মানববসতি স্থাপনের প্রক্রিয়ার বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন, গ্রাম-সভা, গ্রাম্য প্রধান, রাজা এবং তার মন্ত্রিসভা প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল, এই সকল প্রতিষ্ঠান আবার মানববসতি স্থাপনে ও বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

ছ) বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও বিশেষ দক্ষতার প্রসার মানব-বসতির রূপ পরিবর্তন করে দেয়। গড়ে ওঠে শহর ও নগর। অর্থাৎ, গড়ে উঠল শহুরে সভ্যতা বা নগরসভ্যতা। গ্রাম থেকে শহরে সমাজের রূপান্তরের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

- বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে শহরের আবির্ভাব।
- শহর হয়ে উঠল ক্ষমতার কেন্দ্র ও প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল।
- ধর্ম ও তীর্থস্থান হিসেবে কিছু শহরের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ।
- পেশাগত বা বৃত্তিগত কাঠামোকে ভিত্তি করে গ্রামীণ ও শহর জীবনের মধ্যে পার্থক্য গড়ে উঠল।
- শহরের অধিকাংশ লোক ছিল অ-কৃষিজীবী, অন্যদিকে গ্রামের অধিকাংশ লোক ছিল কৃষিজীবী।
- কৃষি থেকে শিল্প-বাণিজ্য ও পরিষেবাতে পেশা ও বৃত্তির পরিবর্তন নগর-জীবনের উদ্ভব ঘটিয়েছিল।

বর্তমান পাঠ্যসূচীর পরবর্তী অংশে এই সম্পর্কে আরও বিশদ জানা যাবে। এখানে অবশ্য উল্লেখ করতেই হয় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সমাজ-বিবর্তনের গতিকে অত্যধিক ত্বরান্বিত করেছে। আজ উন্নত শিল্প-সভ্যতার সমাজ শিল্প-বিপ্লবোত্তর সমাজের বিবর্তন পর্বে প্রবেশ করেছে।

কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর মতে এই শিল্প-বিপ্লবোত্তর সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করবে প্রযুক্তিবিদ্, বিজ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবীগণ।

মানববসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া

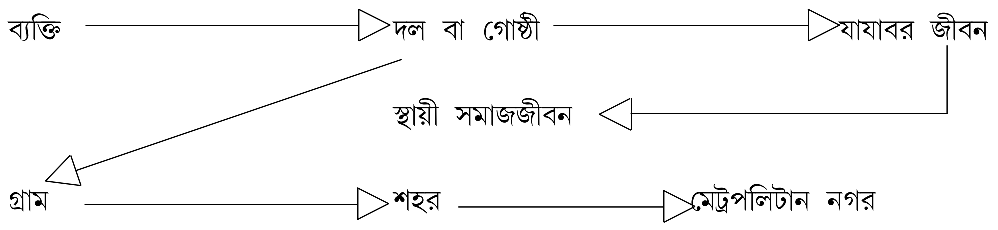

এরপর কি?
মহাকাশ-নগরী?

অনুশীলনী ৩

১. নীচের কোন্ বিবৃতি ঠিক (✓) বা ভুল (✕) (সেমত ঠিক অথবা ভুল চিহ্ন দিন)

(ক) মানবসমাজের বিকাশে ধাতুর আবিষ্কারের কোনো গুরুত্ব ছিল না।

(খ) কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতায় দাস-ব্যবস্থা ছিল উৎপাদন-পদ্ধতি।

(গ) স্ত্রীলোকেরা গাছপালা চাষ-আবাদের সূচনা করেছিল।

(ঘ) সকল মহান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল মরুভূমিতে।

২. মানব-বসতি স্থাপনে ও বিকাশে স্ত্রীলোকদের অবদান পাঁচলাইনে আলোচনা করুন।

৩. 'জাতপাত' নামক প্রতিষ্ঠানের বিকাশের চারটি স্তর কি কি? একশ শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

....

....

....

৪. গ্রামীণ ও শহুরে সমাজের মধ্যে পার্থক্য পাঁচলাইনে আলোচনা করুন।

....

....

....

....

....

....

৪.৬ সারাংশ

সকল সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া দেখা যায়। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে হলে বিবর্তন, বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা প্রয়োজন। সরল থেকে জটিল জীবনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় কখনও পশ্চাৎগতি লক্ষ্য করা যায় না। বিবর্তন প্রক্রিয়া দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন পরিচালিত হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় পশ্চাৎগতিও লক্ষ করা যায়। মানুষের পরিশ্রম ও পরিকল্পনার সাধারণ ফল হিসেবে সামাজিক পরিবর্তনের আদর্শগত দিক—বৃদ্ধি, বিকাশ ও প্রগতি দেখা যায়।

সমাজের এক রূপ থেকে অন্য আর এক রূপে সমাজের পরিবর্তন চলতে থাকে। ফলে দেখা যায় এক সমাজের সংগঠন, কাজের পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর সঙ্গে অন্য সমাজের সংগঠন, কাজের পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর পার্থক্য। এই পরিবর্তন হচ্ছে ক্রমশ সরল থেকে জটিল সমাজের দিকে পরিবর্তন। এই প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত উন্নতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন দ্বারা প্রকৃতি, উদ্বৃত্ত খাদ্য, উৎপাদন বৃদ্ধি, মানবগোষ্ঠীর স্থায়ী বসতি স্থাপনের জন্য সংগঠনের বিকাশ, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, গ্রাম থেকে শহরের উদ্ভব এবং ক্ষমতার নতুন প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন, সামাজিক শ্রেণী ও সরকারের রূপের বিবর্তনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়।

৪.৭ শব্দগুচ্ছ

ক্যানোই : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত ছোট, সরু নৌকা বা শালতি।

দ্যোতনা : কোন শব্দ বা বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ।

ব্যাপন : ছড়ান, বিকীর্ণ করা, পরিব্যাপ্ত করা।

ফিসক্যাল : সরকারী রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়।

হিমায়ন : তুষার বা বরফে পরিণত হওয়া।

গিল্ড : মধ্যযুগে পারস্পরিক সহযোগিতা, সমাজ কল্যাণ বাণিজ্য ইত্যাদির স্বার্থে গঠিত সমবায় সঙঘ।

বিষমসত্ত্বা : জন্ম অথবা সৃষ্টির বিভিন্নতার ভিত্তিতে সৃষ্ট পার্থক্য।

বৌদ্ধিক : বুদ্ধিবৃত্তিক, সাহিত্য, শিল্পকলা, ভাব, চিন্তাবিষয়ক।

জায়মান : উৎপদ্যমান, জন্ম নিচ্ছে এমন।

৪.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১. ৪.২.১ অনুচ্ছেদটি দেখুন

২. ৪.২.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন

অনুশীলনী ২

১. (ক) × (খ) × (গ) ✓ (ঘ) ✓

২. ৪.৩.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন

অনুশীলনী ৩

১. (ক) × (খ) ✓ (গ) ✓ (ঘ) ×

২. ৪.৫ অনুচ্ছেদের (ক) বিভাগটি দেখুন।

৩. ৪.৫ অনুচ্ছেদের (ঙ) বিভাগটি দেখুন।

৪. ৪.৫ অনুচ্ছেদের (জ) বিভাগটি দেখুন।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Chattopadhyaya, D. (ed.) 1982 : *Studies in the History in India* (Vol. I & II), Editorial Enterprises ; New Delhi.

Gordon Childe. 1956 : *Man Makes Himself,* 3rd Edition, London.

Kosambi, D.D. 1956 : *Introduction to the study of Indian History,* Bombay

Korovkin, F. 1981 : *History of the Ancient World,* Progress Publishers, Moscow.

Singh, Yogendra, 1973 : Modernization of Indian Tradition, Thompson Press : New Delhi.

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায়

এই পর্যায়ে পাঁচটি এককের মাধ্যমে মানবজাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিবর্তনের কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে। শস্যের চারা রোপণ ও পশুপালনের মধ্য দিয়ে মানুষ যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ী বসতি তৈরী করতে চায়। এই সময় থেকেই মানব ইতিহাসের সম্ভাবনাময় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধ্যায় শুরু হয়। পঞ্চম এককে গৃহপালিত পশু ও কৃষির সূচনা—এই শিরোনামায় আপনারা দেখবেন কিভাবে মানুষ ভেড়া ও ছাগল পালন করতে শিখল এবং গম, যব ইত্যাদি শস্যের ফলনও করতে শুরু করল। পশুপালন এবং শস্যের উৎপাদন সামাজিক জীবনের পরিবর্তন সাধনা করল। কৃষি কাজের মধ্য দিয়ে যৌথ উদ্যোগ ও স্থায়ী বসবাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। আত্মীয়তা ও গোষ্ঠী সংগঠন থেকে ক্রমশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। তাছাড়াও নানান আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সূচনাও এই সময় হয়।

কালক্রমে এইভাবে সভ্যতার বিকাশ ঘটল। ষষ্ঠ এককে নদীভিত্তিক সভ্যতাগুলি গড়ে ওঠার ইতিহাস আলোচনা করব। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সাহায্যে কিভাবে এই সভ্যতাগুলির স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে তাও আলোচনা করা হবে। নদীর উপত্যকা কৃষি, জলসেচ এবং বসতির উপযুক্ত ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরী করেছে। এই সময় যৌথ গোষ্ঠীজীবন থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নাগরিক সংস্কৃতি, ব্যবসা, বাণিজ্য এবং কারিগরী দক্ষতার বিকাশ। মেসোপটেমিয়া, মিশর, মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পা এই নদীভিত্তিক সভ্যতার প্রধান কতকগুলি কেন্দ্র।

সভ্যতা এবং কারিগরী দক্ষতার বিকাশের সাথে সাথে দাস প্রথার উদ্ভব হয় এই সময়। চাষের মাঠে, খনিতে, জাহাজে এবং গৃহজীবনে মানুষের শ্রমকে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করার ব্যবস্থাই দাসপ্রথা। দাসপ্রথা উৎপাদন ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। দাস ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত সম্পদ তৈরী করা সম্ভব হয়। সেই সম্পদ সমৃদ্ধ নাগরিক সভ্যতার বৈশিষ্টগুলি যেমন, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং কারিগরী দক্ষতা গড়ে উঠতে সাহায্য করে। কিন্তু যে সামরিক শাসকগোষ্ঠী এগুলি গড়ে তোলে তাদের শোষণমূলক নীতি এবং নিজেদের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটায়।

এছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনও শোষক সমাজের পতন আসন্ন করেছিল। দাস ব্যবস্থা ক্রমশ ভূমিদাস প্রথায় রূপান্তরিত হয়। ভূমিদাসরা কৃষি জমি এবং খামারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভূস্বামীদের সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং অধিকারের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের এই পর্বের বিবর্তনকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। সপ্তম এককে আমরা সামন্ততান্ত্রিক যুগের উদ্ভব এবং বিশেষত্বগুলির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। এর মধ্যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা বলে মনে করা হয়। ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র ছিল কিনা এই নিয়ে মতভেদ এবং বিতর্ক আছে।

ক্রমান্বয়ে প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবন, কৃষিকে ক্রমশ শিল্প পণ্যে এবং পুঁজিগত অর্থে পরিবর্তিত করল। অনেক ভূস্বামী বা কৃষকের পক্ষে সঙ্গতির অভাবে নতুন নতুন কারিগরী প্রযুক্তির প্রয়োগ করা সম্ভব হল না। এর ফলে এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণেও চতুর্দশ শতকে ইওরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘনিয়ে এল। সামন্ত প্রভুদের পরিবর্তে, শক্তিশালী, উন্নত সামরিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্রের প্রকাশ হল। রাজাকে সাহায্য করার জন্য শহরাঞ্চলে বণিক এবং নানা বৃত্তিজীবী দক্ষ কারিগরদেরও দেখা গেল। গীর্জা

বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে রাজা তার ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। গীর্জার ভেতরেও নানাধরনের সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ইওরোপের ইতিহাসে এই যুগকে বলা হয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণ এবং রিফর্মেশন বা ধর্ম সংস্কারের যুগ। অষ্টম এককে এই যুগের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের নানা দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ক্লাসিকাল অর্থাৎ গ্রীক ও রোমান আমলের কিছু বিশেষত্বের পুনরুত্থান হয় এই সময় এবং সেই সাথে মানবিকতাবোধ, উদার সহমর্মিতা, যুক্তিবাদী ও মুক্ত চিন্তা ও দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল বলে এই যুগকে নবজাগরণের যুগ বা রেনেসাঁস বলা হয়। নানাধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন যেমন, প্রতিবাদী ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন ও ইওরোপীয় শক্তিগুলির ভৌগোলিক ও ঔপনিবেশিক রাজ্যবিস্তারও এই সময় হয়।

পরিশেষে নবম এককে ইওরোপের সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস আমরা আলোচনা করব। এই সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে। শিল্প বিপ্লব শুরু হয় সূতী বস্ত্র তৈরীর নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এইভাবে যন্ত্র শিল্পের আবিষ্কার শিল্প পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয় রাতারাতি। শিল্প পণ্যের অভূতপূর্ব উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় নতুন নতুন ক্ষমতা ও শক্তির উৎস তৈরী হল। নতুন এক ধরনের শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হল। এরা দৈনন্দিন বেতনভোগী। কারখানায় শ্রমের বিনিময়ে বেতনের ওপর এই শ্রমিক শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। কারখানায় প্রস্তুত শিল্পপণ্য, পুঁজি এবং প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ, নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, নতুন মূল্যবোধ, মুক্ত চিন্তা, গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রচলন এই নতুন যুগের বিশেষ লক্ষণাবলীর অন্যতম।

ধনতন্ত্র পুঁজিবাদ, শিল্পের প্রসার, অর্থ এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের অমোঘ ও অনিবার্য ফলাফল হিসেবে এশিয়া, আফ্রিকা ও মহাদেশগুলিতে ইওরোপীয় শক্তির উপনিবেশ স্থাপন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কাঁচামাল সংগ্রহ ও প্রস্তুত পণ্যের উন্মুক্ত বাজারের জন্য এইসব দেশগুলির সম্পদ দখল করার তাগিদেই এই উপনিবেশ স্থাপন করার উদ্যোগ শুরু হয়। এই সময়টাই আধুনিক যুগের সূচনা পর্ব বলে মনে করা হয়।

একক ৫ ❒ গৃহপালিত পশু ও কৃষির সূচনা

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ মানুষ—শিকারী ও আহরণকারী

৫.৩ পশুপালন সংক্রান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন

৫.৪ পশ্চিম এশিয়ার প্রথম কৃষিজীবী মানুষ

৫.৫ ভারতবর্ষে কৃষি ও পশুপালনের উদ্ভব ও প্রসার

৫.৬ কৃষিকার্য এবং পশুপালনের ফলাফল

৫.৭ পশু শিকার এবং কৃষি সমাজের সামাজিক গঠন

৫.৮ সামাজিক জটিলতার উদ্ভব

৫.৯ সারাংশ

৫.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৫.১১ উত্তরমালা

৫.০ উদ্দেশ্য

প্রথম পর্যায়ে আপনারা মানব সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি সম্বন্ধে জেনেছেন। উৎপাদনের নতুন নতুন প্রণালীর আবিষ্কারের সঙ্গে নতুন সামাজিক ক্রিয়াকলাপের উদ্ভব এই বিবর্তনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই এককে আমরা কৃষির গুরুত্ব সম্বন্ধে জানব। এই এককের পাঠ শেষ হলে আপনারা কতকগুলি বিষয় জানতে পারবেন :

- পশুপালন, বীজবপন ও চারা রোপণের মধ্য দিয়ে আদিম মানুষ কিভাবে খাদ্য আহরণকারী অবস্থা থেকে স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হ'ল।
- জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ধারা যা এই উত্তরণকে প্রভাবিত করেছিল।
- এই বিবর্তনের সাক্ষ্য হিসাবে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের স্বরূপ।
- স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থার ফলাফল যেমন, স্থায়ী গোষ্ঠী জীবন, কৃষিজমির সঙ্গে সম্পর্ক, যৌথ কার্যকলাপ ও জটিল সামাজিক রীতিনীতির উদ্ভব ইত্যাদি এবং
- কিভাবে স্থায়ী কৃষিকার্যের বিকাশ, উন্নতমানের প্রযুক্তি এবং নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব ঘটেছিল।

৫.১ প্রস্তাবনা

প্রায় ১০,০০০ বছর আগে মানুষ ক্রমশ খাদ্য সংগ্রহকারী অবস্থা থেকে কৃষিকার্যে উত্তরণ ঘটায়। পশ্চিম এশিয়ার তুরস্ক, ইরাক্, ইরান, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে কৃষির প্রথম উদ্ভব হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে

ধান চাষ প্রথম শুরু হয় বিন্ধ্য মালভূমির বেলান উপত্যকায় এবং গম ও যব চাষ শুরু হয় আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। ধানের চাষ তুলনামূলকভাবে দেরীতে শুরু হয়। গম ও যব চাষের প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫০০-৫০০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং গাঙ্গেয় অঞ্চলে ধান চাষের প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে।

নানা ধরনের পাথরের উপাদান, মৃৎপাত্র, গৃহস্থালির উপকরণ, বীজ এবং গৃহপালিত পশুর উৎকীর্ণ মূর্তি ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি কৃষি জীবনে উত্তরণের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। পশুপালন এবং স্থায়ী কৃষিকাজ একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছিল। কৃষির বিকাশ ও প্রসার বড় রকমের সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। স্থায়ী গ্রামীণ গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এছাড়া নতুন কৃষি প্রযুক্তি যেমন, লাঙ্গল ও নিড়েনি (hoe)-র ব্যবহার আবিষ্কৃত হয় এবং মানুষের দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয়। এসবের ফলে নতুন কিছু সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠল। যেমন, যৌথ কর্মপন্থা, দলপতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক গোষ্ঠী সংগঠন এবং কিছু নতুন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস।

এইভাবে কৃষির উন্মেষ পরবর্তী সময়ের জটিল সমাজ ও সভ্যতার সূচনা পর্ব তৈরী করল।

৫.২ মানুষ—শিকারী ও আহরণকারী

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে মানুষ পৃথিবীতে রয়েছে ১.৭৫ million বছর ধরে। এই বিশাল সময়ের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ সময়ই মানুষ কাটিয়েছে খাদ্য আহরণকারী এবং শিকারী হিসাবে। মাত্র ১০,০০০ বছর আগে মানুষ কৃষি এবং পশুপালন করতে শুরু করে।

শিকারী ও আহরণকারী হিসেবে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফল, মূল, বীজ আহরণ করা ছাড়া পশু, পাখী, মাছ ইত্যাদি খাদ্যের জন্য হত্যা করত বা ধরত। এইসব তারা করত, নানা ধরনের পাথরের হাতিয়ার, তন্তুর জাল, হাড়ের তৈরী বর্শা দিয়ে বা ফাঁদ পেতে।

আদিম শিকারীর কঙ্কাল এবং পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে পূর্ব আফ্রিকার টানজানিয়া (Tanzania) এবং কেনিয়াতে (Kenya)। সহজেই অনুমেয়, পাথরের এই হাতিয়ারগুলি ছিল সাদামাটা এবং রুক্ষ ধরণের। উন্নত ধরণের হাতিয়ার তৈরী করতে মানুষের আরো কয়েকশো বছর লেগেছিল। শিকারের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দলবদ্ধভাবে ইওরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি পরে উত্তর আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতেও এই শিকারীরা দল বেঁধে হাজির হয়। এর ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ৮,০০০ সালের মধ্যে শিকারী এবং খাদ্য সংগ্রহকারী দল পৃথিবীর প্রায় সব অংশেই ছড়িয়ে যান। এইসব শিকারী ও আহরণকারী মানুষেরা যেখানে যে অঞ্চলে গিয়েছিল সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছিল এবং আঞ্চলিক উপাদান থেকেই তাদের হাতিয়ার তৈরী করতে শুরু করেছিল।

শিকারী ও আহরণকারী সমাজের সংগঠন

আদিম শিকারী ও আহরণকারী মানুষদের একটি নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থা ছিল। খাদ্যের জন্য শিকারের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গর্ভবতী নারী, শিশু, সন্তানের মা ও বালক-বালিকাদের পক্ষে শিকার করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে আহরণের কাজটি কম পরিশ্রমের ছিল এবং সকলের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এইভাবে আদিম মানুষের সমাজে ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রমের বিভাজন শুরু হয়েছিল। যেসব দলগুলি এইভাবে একটা কার্যকরী শ্রমের বিভাজন নীতি প্রয়োগ করতে শিখল তারাই টিঁকে থাকল এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল।

পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন এবং নির্জন অঞ্চলে এখনও যে কিছু শিকারী এবং আহরণকারী মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে তাদের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাদের টিকে থাকা অনেকটা নির্ভর করে আছে গতিশীলতার ওপর অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বিচরণের ওপর। শিকারের অভিযানে পুরুষদের দূরে দূরে যেতে হ'ত, কখনও একসঙ্গে অনেক দিনের জন্য। সেই সময় নারী, বৃদ্ধ ও বালক-বালিকারা ফল, গাছের মূল ইত্যাদি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকত তাদের বাসস্থানের আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে। এছাড়াও গোষ্ঠীগুলিকে আরও জরুরী কিছু ব্যাপারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হ'ত। গ্রীষ্মের আধিক্যে জলাশয়ের জল শুকিয়ে গেলে পানীয় জলের সন্ধানে অন্যত্র সরে যেতে হ'ত। বেশ কিছুকাল এক জায়গায় থাকার ফলে সেই অঞ্চলের ফলমূলের অনবরত আহরণে খাদ্যের অভাব দেখা দিত, তখন খাদ্যের অন্বেষণে অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন হ'ত। এইভাবে শিকারী ও সংগ্রহকারী মানুষরা কোন কোন ঋতুতে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে থাকত, আবার অন্য সময় বৃহৎ দলভুক্ত হয়ে থাকত। এইভাবে দল এবং গোষ্ঠী যেমন বিভক্ত হ'ত, ব্যক্তি মানুষ তার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিচরণ করত। আমরা দেখব কিভাবে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ এবং শিকার ছেড়ে স্থায়ী কৃষিজীবন বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পরিবর্তিত জীবনধারার সূচনা করলো।

প্রথমে দেখা যাক, কৃষি জীবনের দিকে আদিম মানুষ কেমনভাবে এগিয়ে গেল। কিভাবে এই পরিবর্তন ঘটল। যদি দশ হাজার বছর আগেই এই ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তা আমরা জানলাম কি করে?

৫.৩ পশুপালন সংক্রান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

খাদ্যের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী মানুষ এক সময় কিছু কিছু গাছ অথবা চারাকে বেছে নিয়েছিল। একই কারণে বিশেষ বিশেষ পশুকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে শিখল, অর্থাৎ তাদের জন্ম ও বংশ বৃদ্ধি নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী দখলে আনল। এইভাবেই কৃষি ও পশুপালনের সূচনা হ'ল। যে সমস্ত বুনো ঘাসের বীজ তাদের খেতে ভালো লাগত, মাটি তৈরী করে তাতে সেই বীজই বপন করে আদিম মানুষ নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ও সেই অঞ্চলের পরিবেশ অনুযায়ী তার থেকে চারা তৈরী করতে শিখল। একইভাবে দুধ ও মাংসের জন্য কোন কোন পশুকে তারা বেছে নিল, বিশেষ করে এমন সব পশু যাদের পোষ মানানো সহজ। এইভাবে বুনো ঘাস থেকে খাদ্যশস্যের উৎপত্তি এবং বন্য পশু থেকে পোষ-মানা পালিত পশুর উদ্ভব হয়। বুনো ঘাসের সঙ্গে অনেক পরের খাদ্যশস্যের যেমন কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না, তেমনি গৃহপালিত পোষ মানা পশুর সঙ্গে তারই বন্য রূপের কোন মিল পাওয়া যায় না।

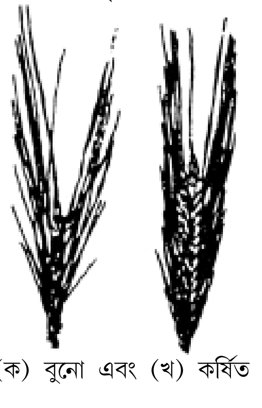

১. (ক) বুনো এবং (খ) কর্ষিত গম

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রামের ঢিবিগুলি থেকে প্রচুর হাড় পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই হাড়গুলিকে পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছেন কিছু হাড় বন্য পশুর, অন্যগুলি পোষ মানা গৃহপালিত জীবের। হাড়ের গঠন দেখেই তারা তফাৎ বুঝতে পেরেছেন। যেমন বন্য ভেড়ার হাড়, দাঁতের গঠন এবং শিং সবই গৃহপালিত ভেড়ার মত নয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঢিবিগুলিতে প্রচুর পোড়া বীজও পাওয়া গেছে। কখনও কখনও মাটির মধ্যে বীজের ছাপও পাওয়া গেছে। এইসব দেখেই প্রত্নতাত্ত্বিক বলতে পারেন কোন্ বীজ রোপিত ও চাষের ফসল আবার কোনটা বুনো।

পশুপালক মানুষ বা আদিম চাষী-মানুষ অবশ্যই কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। এগুলি তাদের গৃহস্থালির উপকরণ ছিল। শস্য গুঁড়ো করা এবং মেখে রুটি করা বা আগুনে সিদ্ধ করার জন্য পাত্রের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। এই প্রয়োজন থেকেই পাত্র বানানো শুরু হয়। পৃথিবীর প্রায় বেশীর ভাগ অঞ্চলেই শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে মৃৎশিল্প গড়ে উঠেছে।

বীজ বপনের জন্য মাটিকে পরিষ্কার করতে হত, সমান করতে হত। এর জন্য এমন সব হাতিয়ারের দরকার হ'ল, যা দিয়ে গাছ কাটা যায় বা মাটি খোঁড়া বা গর্ত করা যায়। পাথর ঘষে ঘষে শান দিয়ে গাছ কাটার কুঠার তৈরী হ'ল। একইভাবে পাথরের দুপাশে শান দিয়ে দুপাশ সমান করে আরও অন্য ধরনের হাতিয়ার তৈরী হ'ল। তাছাড়া শস্য গুঁড়ো করার যাঁতা বানানো হ'ল। আদিম মানুষের এই হাতিয়ারগুলি কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির পরিচয় বহন করে।

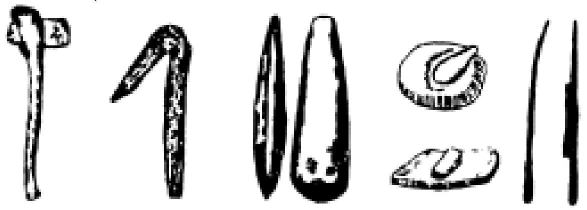

২. আদিম কৃষি-যন্ত্রপাতি

অনুশীলনী—১

১। বন্য ভেড়া থেকে গৃহপালিত ভেড়ার তফাৎ বোঝাতে নীচের কোন্ উত্তরটি সঠিক বলুন।
   (ক) এদের আকার এবং ওজন অনেক বেশী।
   (খ) এদের শিং ও দাঁত তুলনায় ছোট।
   (গ) এদের খাদ্যাভ্যাস আলাদা।
   (ঘ) এদের দেহের চামড়ায় লক্ষণীয় তফাৎ আছে।

২। শিকারী ও আহরণকারী সমাজের সংগঠনের ওপর পাঁচটি বাক্য লিখুন।

....

....

....

....

৩। পাথরের হাতিয়ার দেখে কিভাবে বোঝা যায় যে সমাজব্যবস্থা কৃষি-নির্ভর ছিল?

....

....

....

....

৫.৪ পশ্চিম এশিয়ার প্রথম কৃষিজীবী মানুষ

পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে প্রথম পশুপালন শুরু হয় পশ্চিম এশিয়া তাদের অন্যতম। ১নং মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে আধুনিক তুরস্ক, ইরাক, ইরান, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন যেখানে প্রথম কৃষিভিত্তিক গ্রাম গড়ে ওঠে। মানচিত্রে আমরা জাগ্রোস (Zagros) পর্বত দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিম থেকে শুরু হয়ে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। লেবাননের উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত পর্বতমালাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মানচিত্রে উচ্চতার মাপকাঠি (altitude key) দেখে বোঝা যায় লেবাননের পূর্বদিকে এবং জাগ্রোস (Zagros)-এর দক্ষিণ-পশ্চিমের অঞ্চল ছিল নিম্নভূমি।

মানচিত্র ১

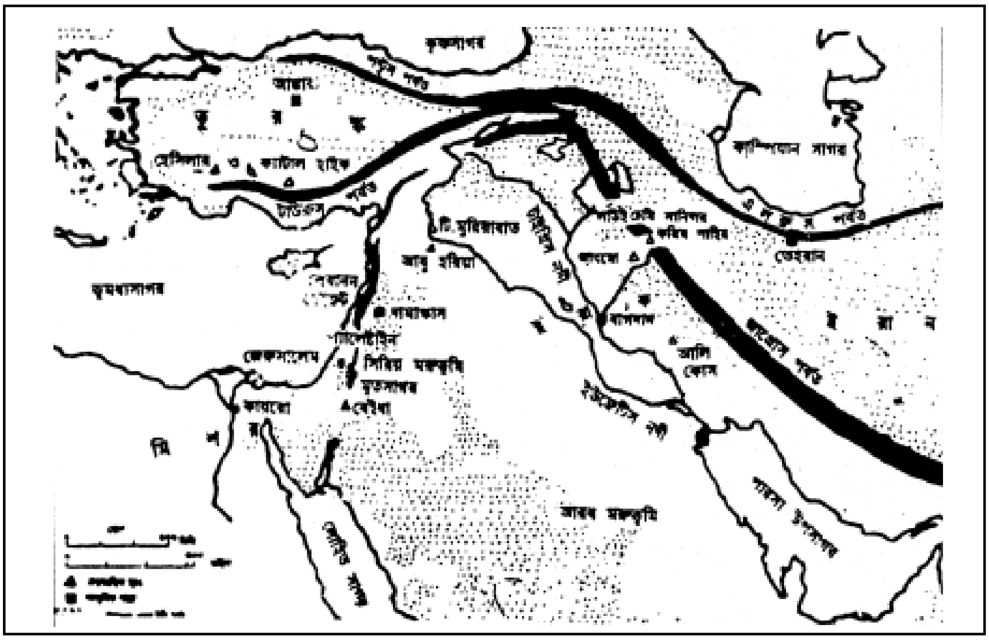

ভূমধ্যসাগর থেকে প্রবাহিত বায়ু তুলনামূলকভাবে উচ্চ অঞ্চলগুলিতে বেশী বৃষ্টি আনে। ফলে, পশ্চিমে এশিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে সবচেয়ে বেশী তুষার ও বৃষ্টিপাত হয়। পর্বতের নীচের উপত্যকায় বৃষ্টিপাত কম, মালভূমিতে আরও কম। আর টাইগ্রিস ও ইওফ্রেটিস নদীর অববাহিকা অঞ্চলে একেবারেই নয় বললেই চলে। প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের ঘনত্ব এবং বৈচিত্র্য নির্ভর করে শীতকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর। এইজন্য উঁচু পাহাড়ের ঢালু উপত্যকায় পাইন ইত্যাদি নানা ধরনের গাছ জন্মায়। অন্যদিকে মালভূমি এবং নিম্নভূমি

অঞ্চল এতই শুকনো যে গাছ জন্মাতে পারে না, ঘাসে ঢাকা থাকে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০০ থেকে ১৫০০ মিটার উচ্চের পাহাড়ী অঞ্চলে ওক্, পেস্তা ইত্যাদি গাছ হয়। এখানে গম, যব স্বাভাবিকভাবেই বুনো ঘাসের মত জন্মায়। ফলে এই অঞ্চল বন্য ভেড়া, ছাগল, গবাদি পশু ও শূকরের আবাসস্থল হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক বাসস্থানের এই এলাকা উত্তর ইরানের পাহাড়ী অঞ্চল এবং আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বন্য শস্যকে খাদ্যশস্যে এবং বন্য পশুকে গৃহপালিত পশুতে রূপান্তর এইখানেই শুরু হয়।

দেখা যাক, কিভাবে প্রত্নতাত্ত্বিকরা পশ্চিম এশিয়ার আদিম কৃষি ব্যবস্থার নমুনা খুঁজে পেয়েছেন। উত্তর ইরাকের জাওই চেমি (Zawi Chemi) শানিদার এবং করিম শাহির (Karim Shahir) ওক্ বনাঞ্চলে আদিম শিকারী মানুষের বীজ তৈরী ও বপন এবং সাময়িক বাসস্থানের নমুনা পাওয়া গেছে।

প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫০০ সালে দক্ষিণ ইরানের আলি কোশ (Ali Kosh) অঞ্চলে পশুপালক ও খাদ্য আহরণকারী আদিম মানুষের শীতকালীন বাসস্থান ছিল। আলি কোশ অঞ্চল শুষ্ক। এখানে পাহাড়ী অঞ্চলের অত্যধিক শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গরু, ভেড়া, ছাগল নিয়ে তারা নীচে নেমে আসত ঘাসে ঢাকা অঞ্চলের চমৎকার বিচরণ ক্ষেত্রে। এরা পাহাড়ী অঞ্চল থেকে যব এবং গমের বীজ নিয়ে এসে ফলন করত নিজেদের খাদ্যের জন্য। এইভাবে পশুপালনের সঙ্গে কৃষিকাজও একই সঙ্গে চলতে থাকে।

সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন অঞ্চলে একটু ভিন্নভাবে এই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। এখানে ওক্ বনের বিস্তৃত এলাকায় আদি মানুষের বসতির প্রচুর নমুনা পাওয়া গেছে। এখানে এরা প্রধানত শিকারী ও আহরণকারী হিসাবে থাকলেও বিভিন্ন ঋতুতে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছিল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১০,০০০ সালে। এর কারণ সম্ভবত এরা এই সময় চারপাশের বন্য সম্পদ ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এইসব বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পাওয়ার ফলে যাতায়াত করে খাদ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

সিরিয়ার ইওফ্রেটিস নদীর উচ্চ অববাহিকার আবু হুরেইরা (Abu Hureyra) অঞ্চলে গম এবং যবের প্রাকৃতিক এলাকার ১৫০ কিলোমিটার দূরে আদিম মানুষের বপন করা বীজ পাওয়া গেছে। উপকূল ও বনাঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলে আহারোপযোগী গুল্ম উদ্ভিদ ও প্রাণীও কম ছিল। সেইজন্যই সম্ভবত তারা খাদ্যের তাগিদে অন্য অঞ্চল থেকে বীজ এনে খাদ্য ফলানোর চেষ্টা করেছিল।

এই প্রাথমিক পর্বের পর পশ্চিম এশিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চলেই এ ধরনের কৃষিভিত্তিক গ্রাম স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে। ইরাকের জার্মো (Jarmo) অঞ্চলে এমনই একটি গ্রাম ৬৫০০ থেকে ৫৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এখানে কুড়ি থেকে তিরিশটি মাটির তৈরী বাড়ী, উঠোন, ঘর, পাথরের কুঠার এবং অন্যান্য মৃৎ-পাত্র পাওয়া গেছে।

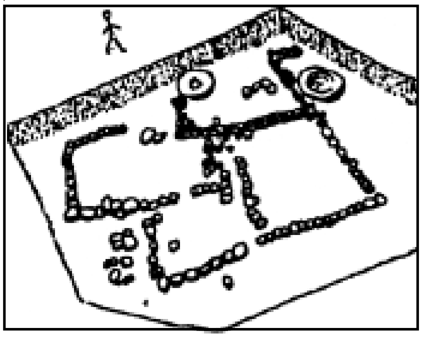

৩. বোল্ডার, জার্মোর একটি বাড়ীর ভিত

এখানকার মানুষেরা ভেড়া এবং ছাগল গৃপালিত পশু হিসাবে রাখত এবং গম ও যবের চাষ করত। প্যালেস্টাইনের জেরিকোতে (Jericho) খ্রীষ্টপূর্ব ৮৩০০ থেকে ৭৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এমন আরেকটি গ্রাম। এখানে কৃষির সুস্পষ্ট নমুনা পাওয়া ছাড়া উঁচু ও গোল ধরনের স্তম্ভবিশিষ্ট ২ মিটার চওড়া পাথরের দেওয়াল পাওয়া গিয়েছে যা আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ ও পরিখা তৈরীর তিনটি প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির অন্যতম। জেরিকোতে মাটির নিচে একটি জলের প্রস্রবণ এই শুষ্ক অঞ্চলে কৃষিকাজ সম্ভব করে তুলেছিল।

এ ধরনের সবচেয়ে বড় গ্রামের নমুনা অবশ্য দক্ষিণ তুরস্কের কাটাল হুয়ুক (Catal Huyuk) অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫০০ থেকে ৫৪০০ এই অঞ্চলে গরু, ভেড়া, ছাগল পোষ মানানো হ'ত এবং যব, গম, মটর ইত্যাদির চাষও করা হ'ত। দুই ঘরবিশিষ্ট মাটির বাড়িগুলি, একই দেওয়ালে পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে রাখার মত পাশাপাশি করে তৈরি করা হত। এর ফলে কোন গলিপথ বা রাস্তা থাকত না। বাড়ীগুলিতে ঢোকা হ'ত ছাদের ওপর দিয়ে। কেন, অবশ্য কেউ বলতে পারে না। বাসনপত্র, পাথরের কুঠার, হাড়ের তৈরী যন্ত্রপাতি, খুবই সাদামাটা পাথরের অলঙ্কার, ঝুড়ি, কাঠের গোল বাটি এইসব নানারকম জিনিষ ওখানে পাওয়া গেছে। অনেকগুলি বাড়ীতে বাসিন্দারা অদ্ভুত সব দৃশ্যও এঁকে রেখেছে। যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, শকুনি শবদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে, চিতা বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে ইত্যাদি।

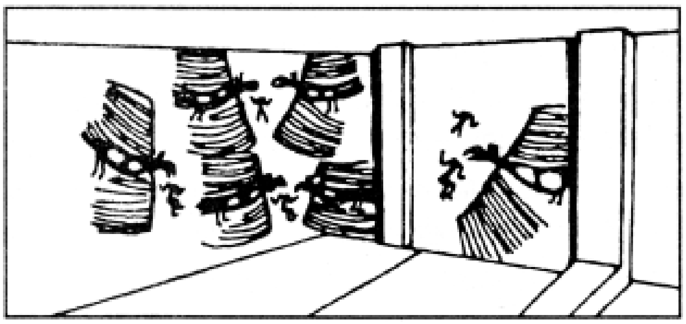

৪. কাটাল হুয়ুক-এ একটি ঘরের অভ্যন্তর (ছবিতে শকুনেরা মুণ্ডহীন মনুষ্যদেহ খাচ্ছে)

পশ্চিম এশিয়ায় এইভাবে ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি পশুপালন ও যব, গম ইত্যাদি চাষ এই দুই মিলিয়ে এক নতুন ধরনের অর্থনীতির আভাস পাওয়া যায়। কখনও কোথাও পশুপালন এবং চাষবাস একই সঙ্গে হচ্ছে, আবার কখনও অন্যত্র পশুপালন আগে, চাষবাস পরে শুরু হয়েছে।

এই সময় ভারতবর্ষে কি হচ্ছিল তা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জানতে ইচ্ছে করে।

৫.৫ ভারতবর্ষে কৃষি ও পশুপালনের উদ্ভব ও প্রসার

আমাদের এই উপমহাদেশে প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া, মাটি, চাষের ধরন সমস্ত কিছুতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এখানে যে পশুপালন পদ্ধতি গড়ে উঠল তা এক এক জায়গায় এক এক রকমভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের জীব নিয়ে। গ্রামগুলি সব জায়গায় একই রকমভাবে গড়ে ওঠেনি।

(ক) উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে শুরু করা যাক। আগেই আমরা দেখেছি, আদি মানুষের স্বাভাবিক বসতি আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। উত্তর আফগানিস্তানের পাহাড়ের গুহাগুলি সম্ভবত আদিম শিকারী ও সংগ্রহকারীদের বাসস্থান ছিল। ওখানে বুনো ভেড়া ও ছাগলের হাড়ের

অংশ বিশেষ পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০০ সালে আফগানিস্তানে ভেড়া ও ছাগলের প্রতিপালন হ'ত। উপমহাদেশের পার্বত্য পশ্চিম সীমানা অঞ্চল খুব দূরে অবস্থিত নয়। বর্তমানে পাকিস্তানে মেহেড়গড় অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ থেকে ৫০০০ সালে একটি কৃষিভিত্তিক গ্রামের নমুনা পাওয়া গেছে। এখানে চতুষ্কোণ মাটির বাড়ীর নিদর্শন দেখা যায়। এখানকার পালিত পশুগুলি পশ্চিম এশিয়ার পশুদের মতই ছিল। পরবর্তী কালের সিন্ধু সভ্যতার পালিত জীবজন্তুও এই একই ধরনের ছিল।

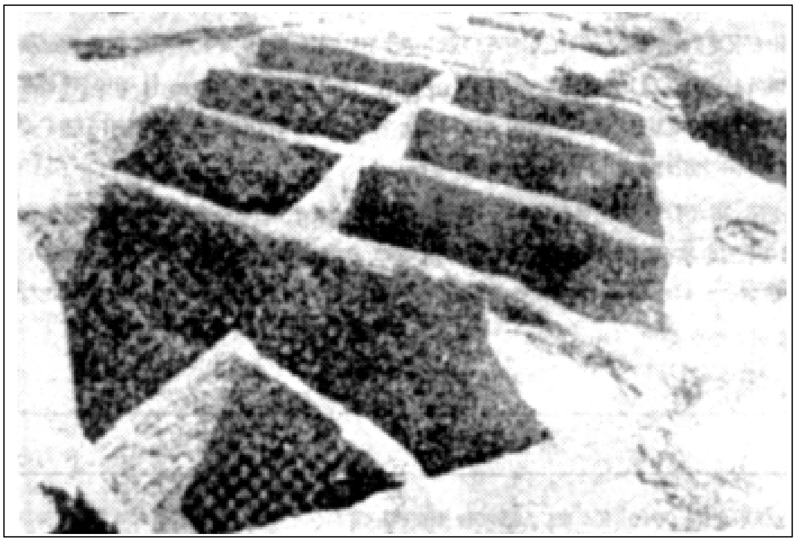

৫. নিওলিথিক যুগে মেহেরগড়ের বাড়ী

(খ) কিন্তু আমরা জানি যে এই উপমহাদেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলকেই মৌসুমী বৃষ্টিপাত এবং ধান চাষের ওপর নির্ভর করতে হয়। বেলান উপত্যকায় ধান চাষের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। বেলান নদী বিন্ধ্য পাহাড়ের ধার ঘেঁসে বয়ে টন্‌স (Tons) নদীর সঙ্গে এবং পরে এলাহাবাদের নিকট গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। একসময় এই অঞ্চলে সেগুন, বাঁশ ও ঢাক গাছের গভীর জঙ্গল ছিল এবং নীল গাই, বাঘ, চিতল এইসব বন্য পশুর বাসস্থান ছিল। বনতল ঘন ঘাসে আচ্ছন্ন থাকত। এই বন্য ঘাসের মধ্যে ধানও ছিল। আদিম শিকারীদের বসতি এবং কৃষি গ্রামের নমুনাও এই অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। চাপানি মান্ডো (Chapani Mando) এলাকায় আদিম শিকারীরা বন্য পশু শিকার করত এবং বুনো ঘাসের বীজ পাথরে গুঁড়িয়ে সাদামাটা হাতে তৈরী পাত্রে রান্না করত। কলডিহা (Koldihwa)-তে প্রত্নতাত্ত্বিকরা কাঠের খুঁটির ওপর ছাউনি দেওয়া গোলাকার বাড়ীর নমুনা পেয়েছেন। ছাউনিতে গৃহপালিত পশুর হাড় এবং চাষ করা ধানের বীজও পাওয়া গেছে।

(গ) ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গঙ্গা নদীর উপত্যকায় এবং ছোটনাগপুরের মালভূমির পূর্বদিকে কৃষি-গ্রাম গড়ে উঠতে থাকে। এই গ্রামগুলিতে ধান চাষ হ'ত। গবাদি পশু তো ছিলই এমনকি ডাল ইত্যাদি অন্যান্য নতুন শস্যেরও চাষ হ'ত। এখনও গঙ্গার উচ্চ অববাহিকায় গমই মূল শস্য, আবার এলাহাবাদের পর থেকে গমের বদলে ধানই প্রধান শস্য। এর কারণ পূর্বদিকে ক্রমাগত বেশী বৃষ্টিপাত। লৌহযুগে গাঙ্গেয় সভ্যতার চূড়ান্ত প্রকাশ হয়েছিল মগধের সমৃদ্ধশালী রাজ্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে। সেই সময়েও

এ অঞ্চলের অর্থনীতির প্রধান দুটি দিক ছিল ধান চাষ এবং গবাদি পশুর পালন। তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে ধান চাষের ওপর ভিত্তি করে এই রকম অনেক রাজ্য গড়ে উঠেছিল প্রাচীন যুগে।

(ঘ) ২৪০০ থেকে ২৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দাক্ষিণাত্যের ভিমা, কৃষ্ণা এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর শোলাপুর ও রায়চুড় দোয়াব অঞ্চলে প্রথম গ্রাম্য বসতি গড়ে উঠেছিল। এখন দাক্ষিণাত্যের মালভূমি এমনিতে শুষ্ক; কিন্তু শোলাপুর ও রায়চুড় দোয়াব অঞ্চল উর্বর এবং ফলনশীল। এই অঞ্চলের মাস্কি (Maski) তেক্‌লাকোটা (Teklakota) এবং হাল্লুর (Hallur) অঞ্চলে কাঠের তৈরী ছাউনি দেওয়া বাড়ী, শস্য সঞ্চয় করার পাত্র এবং পাথরের তৈরী যাঁতা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এখানে ভেড়া, ছাগল, মহিষ পালন করা হত। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই জীবগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। উৎনুর (Utnur), কুপগল (Kupgal), কোদেকল (Kodekal) অঞ্চলে প্রায় তিন মিটার উঁচু ছাই-এর ঢিবি পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন এই ছাই তৈরী হয়েছিল গোবর পুড়িয়ে। এভাবে ছাই তৈরী করা বোধ হয় কোন প্রচলিত রীতির অঙ্গ ছিল।

গুজরাট, রাজস্থান, মালব এবং দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের জোয়ার এখনও প্রধান শস্য। এইসব অঞ্চলে রাগিরও ফলন হয়। রাগি আমাদের দেশেই প্রথম হয়েছিল না আফ্রিকা থেকে এখানে আসে, একথা এখনও জানা যায়নি। ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকেই বাজরার চাষ শুরু হয় দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাটে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে মহারাষ্ট্র, মালব এবং রাজস্থানে জোয়ারের চাষ শুরু হয়।

অনুশীলনী—২

১। নীচের প্রতিটি পশ্চিম এশীয় দেশগুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিকদের দ্বারা আবিষ্কৃত কৃষি বসতি ও গ্রামের নাম উল্লেখ করুন।

দেশ	গ্রাম
(ক) প্যালেস্টাইন	______________________
(খ) ইরাক	______________________
(গ) তুরস্ক	______________________
(ঘ) পাকিস্তান	______________________

২) পশ্চিম এশিয়াতে যে কৃষির অবস্থান ছিল, তার কি কি সাক্ষ্য প্রমাণ প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন?

....

....

....

....

৩) ভারতে ধান চাষের প্রধান প্রধান এলাকাগুলির উল্লেখ করুন।

....

....

....

....

....

মানচিত্র ২

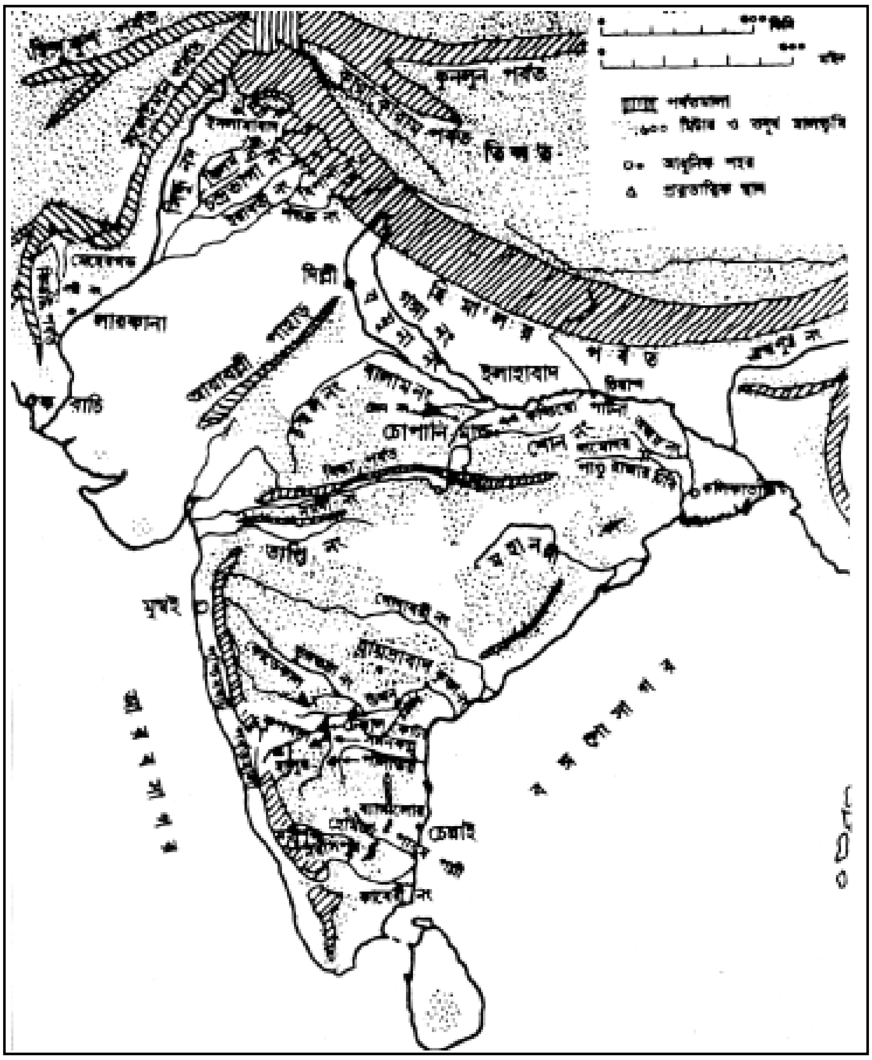

৫.৬ কৃষিকার্য এবং পশুপালনের ফলাফল

শিকারী ও সংগ্রহকারীর ভূমিকা থেকে কৃষি এবং পশুপালন পর্বে আবর্তন মানুষের সামাজিক জীবনে বিশেষ কতকগুলি পরিবর্তন আনে। এবার আমরা সেই পরিবর্তনগুলি আলোচনা করব।

(ক) পশু ও ফসল ঃ

সংগঠিত পশুপালন পৃথিবীর কোন্ কোন্ এলাকায় শুরু হয়েছিল, তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চল নিয়মিত কৃষি কাজের অযোগ্য হওয়ায় এবং প্রখর শুকনো আবহাওয়ার জন্য

পশু খাদ্য না পাওয়ার সেই সময়কার মানুষেরা স্থায়ী কৃষি কাজ ছেড়ে পুরোপুরি পশুপালক হয়ে উঠত। পশুর বিচরণ ক্ষেত্রের সন্ধানে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে তারা ঘুরে বেড়াত। এখনও পশ্চিম এশিয়া এবং পশ্চিম ভারতে এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যারা তাদের ভেড়া, ছাগলের পাল নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই উপমহাদেশের অন্যত্র এবং ইওরোপে সেই সুদূর অতীতে গ্রাম্য গোষ্ঠীগুলি একই সঙ্গে পশুপালন ও কৃষিকার্য করত।

পশুপালনের ক্ষেত্রেও গবাদি পশুর গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। গবাদি পশু শক্তিশালী হওয়ায় মাটিতে লাঙ্গল দেওয়া, মাটি গভীরভাবে খনন করে মাটির উর্বর অংশে শস্যের মূল পৌঁছে দেওয়া সম্ভপর হ'ল। ফলে আগে কুড়ুল জাতীয় যন্ত্র দিয়ে মাটিতে গর্ত করার পরিবর্তে এইভাবে লাঙ্গল দিয়ে মাটি খোঁড়ার ফলে চাষের ফলনও বেড়ে গিয়েছিল।

(খ) স্থায়ী বসবাস ঃ

চাষের জন্য গবাদি পশুর গুরুত্ব যতই হোক না কেন, কৃষিকাজ শুরু করা মানেই স্থায়ী বসতির শুরু হওয়া। পৃথিবীতে প্রথম শস্য সবই বুনো ঘাসের থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই এগুলির জন্ম, বৃদ্ধি ও ফলন বছর ঘিরে হ'ত। মানুষ যখন এই বুনো ঘাসের বীজকে বপন করে খাদ্যোপযোগী শস্যের চাষ শুরু করল, তখনও কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বাদ দেওয়া যায়নি। বছরের এক সময় বপন হ'লে পর চারার বৃদ্ধি এবং ফসল হওয়ার মধ্যে কম করে তিন/চার মাস লেগে যেত। শস্য চারার বেড়ে ওঠার সময় তাকে রক্ষা করা, জল দেওয়া, আগাছা মুক্ত করা ইত্যাদি কাজ করতে হ'ত। ধান চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে, এক জায়গা থেকে ধান চারা আরেক জায়গায় স্থানান্তর করা এবং আগাছা তোলা বিশেষভাবে শ্রম সাপেক্ষ ছিল। এইভাবে জমি মানুষের শ্রমের বস্তু হয়ে উঠল, মানুষ ক্রমশ নিজেকে জমির সঙ্গে একাত্মবোধ করতে শুরু করল। বছরে একবারই ফসল হ'লে, খাদ্যের প্রয়োজনে সেই ফসল সঞ্চয় করে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছিল। তাছাড়া পরের বছরের চাষের জন্য বীজ ধান রেখে দেওয়ারও দরকার ছিল। যাযাবর জীবনযাপনে এসব করা সম্ভবপর ছিল না। এছাড়াও কৃষিগ্রামের ভারী ভারী ফসল রাখার পাথরের পাত্র, যাঁতা নিয়ে চলাফেরাও মুশকিল ছিল। এইভাবে স্থায়ী গ্রাম ও কৃষিজীবন গড়ে উঠল। জেরিকোতে এইরকমই একটি পাথর বেষ্টিত গ্রামের সাক্ষ্য পাই।

(গ) জমির সঙ্গে সম্পর্ক ঃ

জমির ওপর মানুষ যখন তার সময়, শ্রম ও দক্ষতা আরোপ করতে শুরু করল, তখন সেই জমির ওপর তার অধিকার সহজে হাত ছাড়া করতে সে আদৌ রাজী হবে না। শুধু কায়িক বা শারীরিক সম্পর্ক নয়, জমির সঙ্গে এক ধরনের অনুভূতি ও আবেগের সম্পর্কও তৈরী হ'ল। মালিকানা অক্ষুন্ন রাখতে সে লড়াই করতেও প্রস্তুত।

(ঘ) প্রাকৃতিক বাতাবরণ ঃ

পৃথিবীর এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে প্রাণী, চারা ও বীজের স্থানান্তর মানুষই ঘটিয়েছিল। যেসব স্থানে প্রাণী ও গাছের অস্তিত্ব ছিল না সেখানে এগুলি নিয়ে এসে, মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করেছিল।

৫.৭ পশু শিকার ও কৃষি সমাজের সামাজিক গঠন

আদি যুগের কৃষকরা শিকারী বা সংগ্রহকারী মানুষদের থেকে ভালো খাদ্য পেত একথা মনে করার কোন কারণ নেই। কৃষিই খাদ্য যোগানের ক্ষেত্রে বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা একথাও ঠিক না। কারণ আদিকালের কৃষককে শস্যের মড়ক, মাটির ক্ষয়, বন্যা বা আকালের সঙ্গে যুঝতে হোত। তবুও এও ঠিক যে কৃষিকার্য সেই সময় মানুষের জীবনে নানা পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল এবং ফলে সমাজব্যবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছিল।

কৃষি জীবন স্থিতিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় একথা আমরা আগেই বলেছি। এও জেনেছি কৃষি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পরিবারভিত্তিক সম্পর্ক অনেক দৃঢ় হয় শিকারী গোষ্ঠীর থেকে। এর কারণ পরিবারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদান-প্রদান। শিকারের ক্ষেত্রে অনেক জন শিকারী একত্র হয়ে একটি বড় পশু শিকার করত ঠিকই, কিন্তু শিকার হয়ে যাবারপর ও মাংস ভাগ করে নেবার পর, তারা যে যার মত আলাদা হয়ে যেত। পরবর্তী শিকারের সময় পুরোনো মানুষের কেউ কেউ থাকলেও, অনেক নতুন মানুষও আসতো। শিকারী সমাজে পারস্পরিক যৌথ সম্পর্ক ছিল তাৎক্ষণিক। কৃষি সমাজে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা ও যৌথ কার্যের প্রয়োজন ছিল। বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার ওপর কৃষি নির্ভর করত বলে আদি কৃষিজীবিদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাটিতে লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বপন করা, জল সেচন এবং ফসল তোলা ইত্যাদি করতে হোত। এর ফলে গৃহস্থ কৃষক পরিবারগুলিকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হ'ত, নির্দিষ্ট সময়সীমা বজায় রাখার জন্য। সুতরাং শিকারী সমাজের মত গৃহবাসী কৃষিজীবীদের সম্পর্ক তাৎক্ষণিক হওয়া সম্ভব ছিল না। এর আরও কারণ শিকারের লাভ তৎক্ষণাৎ হলেও কৃষির ফসল লাভের জন্য বেশ অনেকখানি সময় অপেক্ষা করতে হ'ত। এভাবে কৃষি গোষ্ঠীতে যে সংযোগের ঐক্য তৈরী হোল তা অস্থায়ী শিকারী সমাজে সম্ভব হ'ল না।

প্রথম কৃষিজীবিরা এই সহযোগিতা পারিবারিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রকাশ করত। এই কারণে এদের সমাজকে বলা হোত গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ। এই গোষ্ঠীর সকল মানুষই কোনও না কোনওভাবে অতীতের একজন মানুষের বংশধর বলে নিজেদের মনে করত এবং সেইজন্যই তারা পরস্পরের আত্মীয় ছিল। গোষ্ঠীর সকল মানুষ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ বলে কৃষির জমিগুলি তারা গোষ্ঠীর জমি বলে মনে করত। মালিকানা ছিল যৌথ।

গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবাদের মীমাংসা করত, বিবাহ নির্ধারণ এবং জমির ফসল কিভাবে বন্টন হ'বে সদস্যদের মধ্যে, তার ব্যবস্থা করত। গোষ্ঠী সমাজে তাদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ হলেও তারা কখনই কিন্তু বেশী জমি পেত না। গোষ্ঠীজীবন ছিল সহজ, সরল এবং বৃত্তির কারিগরী দক্ষতা ছিল কম। সকল মানুষই একত্রিত হয়ে কাজ করত, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যেমন ভূমি, পানীয় জলের অধিকার এবং গৃহপালিত প্রাণীর মালিকানা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল।

৫.৮ সামাজিক জটিলতার উদ্ভব

কৃষি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তনও আসতে থাকে। প্রথম কৃষি গ্রামগুলি এমন জায়গায় বেছে তৈরী হয়েছিল, যেখানে মাটির নীচেকার জল ওপরের মাটিকে ভিজিয়ে রাখত

এবং চাষ করাও এর ফলে সুবিধাজনক ছিল। জেরিকোতে চাষের কাজ নির্ভর করত মাটির নীচে জলের প্রস্রবণ থেকে জল টেনে এনে। অন্য গ্রামগুলি কাছাকাছি ঝরণা বা জলধারার ওপর নির্ভর করত। এইসব জায়গায়, বলা বাহুল্য, যে জমিগুলি জলের কাছাকাছি, সেখানেই ভাল চাষ হ'ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও কৃষি নির্ভরতা বেড়ে যাওয়ার ফলে গোষ্ঠীর কিছু মানুষ দূরের অপেক্ষাকৃত কম উর্বর অঞ্চলে চাষ করতে বাধ্য হয়। যারা ভাল জমিতে চাষ করত, তাদের ফলনও বেশী হ'ত এবং ফসল তোলার পর অন্যদের ভোজ দিতে পারত তারা! এইভাবে এই সব মানুষ গোষ্ঠীর মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব পেতে শুরু করল এবং বাকী অন্যদের অনুগত করে সক্ষম হ'ল। আদিম মানুষের মনে হ'ত সম্পদ, দেবতা ও পূর্বপুরুষদের দান। সেই যুক্তিতে যার সবচেয়ে বেশী সম্পদ এবং যার প্রতিবারই উৎকৃষ্ট ফলন লাভ হ'ত তাকেই পূর্বপুরুষ এবং দেবতাদের সব চাইতে কাছের মানুষ বলে মনে করা হ'ত। এইভাবে গোষ্ঠী প্রধানরা এক ধরনের নতুন ক্ষমতার অধিকারী হ'তে শুরু করল। এর আগে গোষ্ঠীর সকলের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে তারা গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারগুলির বিপদে সাহায্য এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গের আয়োজন করত। নতুন ক্ষমতা তাদের সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করা, জমি বণ্টন করা, গোষ্ঠীর দেবতার উপাসনার ব্যবস্থা করা এবং সকল মানুষকে কাজের জন্য একত্রিত করার অধিকার দিল। গোষ্ঠীর যাতে মঙ্গল হয় তা' দেখার দায়িত্বও তাদের ওপর ন্যস্ত হ'ল। জেরিকোর চারধারের পাথরের দেওয়াল বানানো সম্ভবই হ'ত না যদি না আদেশ করার, কাজ সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করার একজন প্রধান ব্যক্তি না থাকত।

৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মেহেরগড়ে পাথর খোদাই এবং ঝিনুক কাটার শিল্পের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। সাধারণ বাড়ীঘরের সঙ্গে দুটি বড় শস্য রাখার গোলাঘরও পাওয়া গেছে। যৌথ শস্যের গোলা একথাই প্রমাণ করে যে একজন প্রধান দলনেতা নিশ্চয়ই ছিল যে শস্য সংগ্রহ নিয়ন্ত্রিত করত।

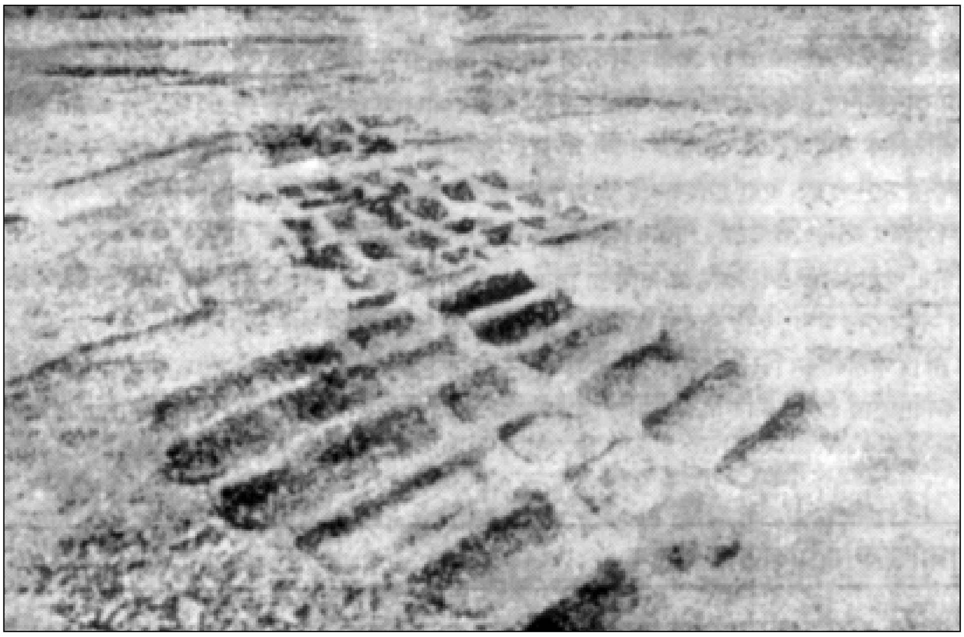

৬. মেহেরগড়ে শস্যভাণ্ডার

অনুশীলনী—৩

১। নিম্নলিখিত কোন্ কারণের জন্য কৃষি স্থায়ী জনবসতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে?
(ক) কৃষিতে কষ্টের পরিশ্রমের প্রয়োজন।
(খ) কৃষিতে উন্নতমানের প্রযুক্তির ব্যবহার দরকার।
(গ) শস্যচারা বেড়ে উঠতে সময় লাগে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ দরকার।
(ঘ) কৃষি উন্নতমানের জীবনধারার সহায়ক।

২। নিম্নলিখিত কোন্ কারণের জন্য শিকারী সমাজের সমবায় ব্যবস্থা কৃষি সমাজের ব্যবস্থা থেকে আলাদা?
(ক) শিকারী সমাজের সমবায় ব্যবস্থা ছিল আবেগপূর্ণ।
(খ) শিকারী সমাজের সমবায় ব্যবস্থা হ'ল সাময়িক।
(গ) শিকারী সমাজের সমবায় ব্যবস্থা হ'ল আংশিক।
(ঘ) শিকারী সমাজের সমবায় ব্যবস্থায় ধর্মীয় চমক ছিল।

৩। আদি গোষ্ঠী সমাজে দলপতিদের সামাজিক মর্যাদার ওপর টীকা লিখুন।

....

....

....

....

....

....

৫.৯ সারাংশ

বন্য চারা বা ঘাসকে খাদ্যে রূপান্দরিত করা এবং বন্য প্রাণীকে পোষ মানানোর ভিতর দিয়ে আহরণকারী ও শিকারী মানুষ স্থিতিশীল কৃষি জীবনে উন্নীত হয়েছিল।

পশ্চিম এশিয়ার পাহাড়ী উপত্যকা বা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, যেখানে আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ গম এবং যব চাষের অনুকূল ছিল, সেইসব অঞ্চলেই প্রথম কৃষিজীবী মানুষকে দেখা গিয়েছিল। ভেড়া এবং ছাগল গৃহপালিত পশুতে রূপান্তরিত হ'ল। বিবর্তনের এই ধারা লক্ষ্য করা যায় তুরস্ক, ইরাক, প্যালেস্টাইন, ইরান, পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষে পাওয়া এই ধরনের বসতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং আবহাওয়ার বৈচিত্র্যের জন্য ভারতবর্ষের শস্য উৎপাদনও এক এক জায়গায় এক এক রকম হয়েছিল। কৃষির উদ্ভব ও প্রসার স্থিতিশীল জীবনযাত্রার সূচনা করল। ভূমি এবং সম্পদের সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। তাৎক্ষণিক ও সাময়িক যোগাযোগের পরিবর্তে স্থায়ী সম্পর্ক ও ঐক্য তৈরী হ'ল। নতুন ধরনের গোষ্ঠীবন্ধতা গড়ে ওঠা এবং দলপতি ও পারিবারিক গোষ্ঠী সম্পর্ক—স্থায়ী কৃষিজীবী সমাজে এই নতুন পরিবর্তন সাধন করল। মানুষের আবাসস্থল যেমন নিয়মিত পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি

গৃহপালিত প্রাণী ও কৃষিজ পণ্যের পরিবর্তন ঘটেছে এবং একই সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদান ও চিন্তাধারায় পরিবর্তন এসেছে—এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সব পরিবর্তনের ফলে জটিল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হ'ল যা কালক্রমে সভ্যতার বিকাশ ঘটাল।

৫.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

প্রত্নতত্ত্ব	:	প্রাচীনযুগের মুদ্রা, লিপি, স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি বিচার করে ইতিহাস উদ্ধারের বিজ্ঞানসম্মত পাঠ।
গৃহপালন	:	বন্যজীবন থেকে এনে গৃহ-পরিবেশে অভ্যস্ত করা।
Habitat	:	প্রাকৃতিক বাস-পরিবেশ।
গোষ্ঠী সম্পর্ক	:	জন্ম এবং বিবাহ সূত্রে সম্পর্ক।
আত্মীয়	:	একই পরিবার ও বংশের গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ।
যাঁতা	:	শস্যের দানা গুঁড়ো করার পাথরের তৈরী পাত্র।
স্থিতিশীলতা	:	স্থায়ী জীবনযাত্রা, যাযাবর বৃত্তির বিপরীত।
প্রজাতি	:	একই বিশেষত্বযুক্ত প্রাণীসমূহ।

৫.১১ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১) (খ)
২) ৫.২ অংশ দেখুন।
৩) ৫.২ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী—২

১) ৫.৪ অংশ দেখুন।
২) ৫.৪ অংশ দেখুন।
৩) ৫.৫ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী—৩

১) (গ)
২) (খ)
৩) ৫.৭ ও ৫.৮ অংশ দেখুন।

একক ৬ ❒ নদীভিত্তিক সভ্যতা

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ প্রাচীন সভ্যতার বিকাশের কারণসমূহ

৬.৩ তিনটি প্রধান নদীভিত্তিক সভ্যতার চিত্র

৬.৪ নিম্ন মেসোপটেমিয়ার নগরবাসী মানুষ

৬.৪.১ সুমেরীয় সভ্যতা

৬.৪.২ রাজার ক্ষমতার উৎস

তালিকা—১ মেসোপটেমিয়ার সময়ানুক্রম

৬.৫ মিশর

৬.৫.১ মিশরীয় সংস্কৃতি

৬.৫.২ শাসনব্যবস্থা

তালিকা—২ মিশরের সময়ানুক্রম

৬.৬ হরপ্পার নগর সভ্যতা

তালিকা—৩ উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সময়ানুক্রম

৬.৭ সারাংশ

৬.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৬.৯ উত্তরমালা

৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককে আদি কৃষিজীবী সমাজ কিভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার পর্বে পৌঁছল তাই আলোচনা করা হবে। সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতর সমাজব্যবস্থা, নগর উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিকাশ ঘটে।

এই এককের আলোচনা শেষ হ'লে জানা যাবে :

- প্রধান নদীভিত্তিক সভ্যতাগুলি, যেমন—মেসোপটেমিয়া, মিশর, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সম্বন্ধে।
- এইসব সভ্যতাগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং এদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বিশিষ্টতা।
- এইসব নদীভিত্তিক সভ্যতাগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সময়ানুক্রমিক ইতিহাস এবং
- রাজনৈতিক সংগঠন, নগরকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক রূপরেখার মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্রের স্বরূপ।

৬.১ প্রস্তাবনা

কৃষিজীবী সমাজ থেকে নদীভিত্তিক সমাজ ছিল নিঃসন্দেহে উন্নত। এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছতে অনেক সময় লেগেছিল। ফলে সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল ২৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। সাধারণ কৃষি সমাজে সভ্যতার

বিকাশ ঘটেনি কারণ এই বিকাশ নির্ভর করে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ওপর যেমন, গোষ্ঠী দলপতির পরিবর্তে সুগঠিত রাজ্য, নগরকেন্দ্র, পৌর কর্মচারী সাংস্কৃতিক বিশারদ, লিখিত নথি, বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। এগুলি কৃষি সমাজে অনুপস্থিত।

প্রধান নদীভিত্তিক সভ্যতাগুলি মেসোপটেমিয়া, মিশর, মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। টাইগ্রিস, ইওফ্রেটিস, নীল এবং সিন্ধুনদের অববাহিকায় এই সভ্যতাগুলি গড়ে ওঠে। নদীগুলির দুপাশের সমতল ভূমিতে নিয়মিত প্লাবনে পলিমাটি সঞ্চিত হ'ত। উর্বর পলিমাটিতে কৃষিকার্যের ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল। অর্থনীতিও এর ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নগর সভ্যতাকে কেন্দ্র করে শিল্প, কারিগরী নৈপুণ্য, বাণিজ্য এবং জটিল সংগঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। হাজার বছর ধরে বিশাল এই সামাজিক রূপান্তরের ফলে নতুন যানবাহন ব্যবস্থা, নূতন নৌচালন পদ্ধতি, উন্নত স্থাপত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠল।

৬.২ প্রাচীন সভ্যতার বিকাশের কারণসমূহ

এখন দেখা যাক কি কি কারণে নতুন সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল। মানচিত্রগুলি এক নজর দেখলে পর বোঝা যায় যে, সভ্যতাগুলি যেখানে প্রথম কৃষি উৎপাদন শুরু হয়, সেখানে গড়ে ওঠেনি। কৃষি যে সভ্যতা গড়ে ওঠার একমাত্র কারণ নয় একথা সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে কৃষি শুরু হয়েছিল আনুমানিক ৫০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। অথচ, সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব হয় খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০০ সালে অর্থাৎ আরো চব্বিশ শতাব্দী পরে। এছাড়াও দেখা গেছে প্রাথমিক এবং পরের অনেক কৃষি সমাজই উন্নততর সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়নি।

তবে একথাও ঠিক যে, যাযাবর, শিকারী এবং আহরণকারী সমাজে সভ্যতার জন্ম সম্ভব ছিল না। কারণ, স্থিতিশীলতা, স্থায়ী সংগঠিত গোষ্ঠী সমাজ এবং খাদ্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা ছাড়া সভ্যতার বিকাশ ঘটে না।

সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে খাদ্য সঞ্চয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ আছে একথা কিছু পরে আমরা আলোচনা করব। আমরা সবাই জানি ফল বা মাংস বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায় না; কিন্তু ধান বা গম একাধিক বছর ধরে রাখা যায়।

গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাকে অতিক্রম করেই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। সভ্যতার শুরু তখনই যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত হ'ল। এই বিবর্তন সম্ভব হয়েছিল একজন কেন্দ্রীয় শাসকের দ্বারা, যার শাসন কার্যকরী করত কর্মচারীরা এবং সকলেই সেই শাসন মেনে চলত। এই ব্যবস্থা আত্মীয়তার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা গোষ্ঠী জীবনের কাঠামো থেকে একেবারে আলাদা। আমরা এখানে শাসক বা রাজতন্ত্রের উদ্ভবের বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করছি না। যেটুকু বলা দরকার তা হ'ল, শাসক বা রাজার রাজনৈতিক কার্যকলাপের একটা প্রভাব তৈরী হ'ত কারণ তার পেছনে সামাজিক স্বীকৃতির জোর থাকত। সাধারণ মানুষ রাজার জন্য প্রাসাদ তৈরী করত বা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিত বা ফসলের ওপর খাজানা দিত তখনই যখন তাদের এ করা ছাড়া আর কোন অন্য উপায় থাকত না অথবা, নিজেরাই এ ব্যাপারে একমত হয়ে এটা মেনে নিয়েছিল। সুতরাং বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা, সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা অথবা কারিগরী শিল্পকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে শাসকদের ক্ষমতা থাকত।

কারিগরী শিল্প, বাণিজ্য ও সৈন্যবাহিনী গড়ে ওঠা উপলক্ষ্য করে শাসকের রাজ্যে বহু মানুষ ও পণ্যের চলাচল ঘটত। এর ফলে নীলনদ, টাইগ্রিস, ইওফ্রেটিস এবং সিন্ধুনদের অববাহিকায় শহর গড়ে উঠতে থাকে। শহরগুলিতে এমন মানুষেরও অবস্থান হ'ত যারা খাদ্য-উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকত না। এরা অন্য ধরনের কাজ করত যেমন শাসনকার্য, কারিগরী, বাণিজ্য, লেখার কাজ অথবা পৌরোহিত্য ইত্যাদি। সীলমোহর খোদাই বা লেখার কাজ করত যারা তারা খাদ্য জোগান না দিলেও খাদ্য উদরস্থ করত। এইসব মানুষদের খাদ্য জোগানের দায়িত্ব ছিল গ্রামগুলির।

এইরকম সমাজে শাসক শাসন করতে পারবে না এবং শহরও টিকে থাকবে না যদি খাদ্যবস্তু সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে যাতায়াতের ব্যয় কম হওয়ার দরকার ছিল। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি গ্রাম থেকে একটি শহরে ১০০০ কেজি শস্য ছটি গাধা বা ষাঁড় নিয়ে আসে এবং যাতায়াতের পথে এই ষাঁড় বা গাধা এবং এদের চালকদের খাওয়াতে ১০০৫ কেজি খাদ্য লেগে যায়, তাহ'লে শহরের অর্থনীতির পক্ষে তা খুবই ক্ষতিকারক হবে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সভ্যতা কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না যদি না (ক) একটি নির্ভরযোগ্য কৃষি ব্যবস্থা থাকে এবং (খ) সহজে যাতায়াতের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থাকে। মানচিত্রগুলিতে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখা যাবে যে তিনটি সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা অলোচনা করব যেগুলি নদীবাহিত সমতল ভূমিতে গড়ে উঠেছে। প্রাচীনকালে স্থলপথের থেকে জলপথের যাতায়াত অনেক সস্তা ছিল। নৌকা হাওয়ার বেগে বা নদীর স্রোতে সহজেই দ্রুত চলত। স্থলপথে ভারবাহী পশুর গতিও ধীর ছিল, খাওয়ানোর খরচও ছিল। তবে চাকার আবিষ্কার পশুর শ্রম অনেকখানি লাঘব করেছিল। যে তিনটি সভ্যতার ইতিহাস আমরা আলোচনা করছি যেখানে নৌকা এবং চক্রযান সভ্যতার উন্মেষের অনেক আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এই তিন সভ্যতাতেই পাথর, তামা এবং ব্রোঞ্জের তৈরী হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হ'ত। নীলনদ, ইওফ্রেটিস বা সিন্ধু অঞ্চলে ধাতু এবং মূল্যবান রত্ন পাথর পাওয়া যেত না। বাণিজ্যের মাধ্যমে, অথবা দূর-দূরান্তের অভিযান প্রেরণ করে এগুলি নিয়ে আসা হ'ত। অনেক সময় যেখানে এগুলি পাওয়া যেত তার কাছাকাছি অঞ্চলে বসতি তৈরী করে এগুলি সংগ্রহ করা হ'ত। এই তিন অববাহিকা অঞ্চলই ছিল বিস্তৃত এবং উর্বর। মূলত রুক্ষ ও শুষ্ক এই অঞ্চলগুলি নদীর জলধারায় পুষ্ট হ'ত। সুদূর পর্বত থেকে প্রবাহিত নদীগুলি বাৎসরিক প্লাবনের দ্বারা পলিমাটি সঞ্চয় করত। গম এবং যব সব জায়গাতেই প্রধান শস্য ছিল এবং ভেড়া, ছাগল এবং গবাদি পশু পালন করা হ'ত।

৬.২ তিনটি প্রধান নদীভিত্তিক সভ্যতার চিত্র

কিন্তু এখানেই তিন সভ্যতার মধ্যে সাদৃশ্যের শেষ। তিনটি নদীর মধ্যে নীলনদ (পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী) সব চাইতে নির্ভরযোগ্য এবং নিয়ন্ত্রণে আনার পক্ষে সহজ ছিল। নীলনদ আসোয়ানের কাছে এসে মিশরে ঢুকে সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে। এখানে পূর্ব এবং পশ্চিমে দুই পাশের মরুভূমি। কায়রোর কাছে নীলনদের বিস্তৃত বদ্বীপ তৈরী হয়। এই বদ্বীপে চাষযোগ্য ভূমি রয়েছে। প্রাচীনকালে এই বদ্বীপ বা মোহনার মুখেই মিশরের সর্বাধিক জনবসতি ছিল। প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ নীলনদ দুধার প্লাবিত করে একটি বিশাল হ্রদের আকার নেয়। দুপাশের গ্রামগুলিকে তখন মনে হয় ভাসমান দ্বীপের মত।

অক্টোবরের শেষাশেষি বন্যার জল থিতিয়ে যায়; ততদিনে সঙ্কীর্ণ উপত্যকার দুপাশের নদীর জলে ভেজা পলিমাটি উর্বর হয়ে ওঠে। এই সময় মিশরের চাষী জমিতে লাঙ্গল দেয়। চাষের শুরু হয়। মিশরে বৃষ্টিপাত একেবারে হয় না বললেই চলে। কিন্তু নদীর দুকূল ছাপানো বাৎসরিক প্লাবনের ফলে সেচের জন্য খাল খননের আর প্রয়োজন হয় না।

দুটি বড় নদী, টাইগ্রিস এবং ইওফ্রেটিসের জলে মেসোপটেমিয়া পুষ্ট। এখানে ইওফ্রেটিস নদীর ধারে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তুলনামূলকভাবে টাইগ্রিসের গতি ক্ষিপ্র এবং আকস্মিক বন্যার ভয়ও এই নদীতে বেশী। সুমেরে প্রবেশ করার পর ইওফ্রেটিসের গতি ধীর এবং নানা ধারায় বিভক্ত হয়। মিশরে বন্যা হয় শস্য রোপণের আগে। ইওফ্রেটিসের জল বাড়তে থাকে ডিসেম্বর মাসে। এপ্রিল মাসে নদীর জল সবচেয়ে উঁচুতে ওঠে। এখানে বৃষ্টিপাত চাষের পক্ষে মোটেও পর্যাপ্ত নয়। অন্যদিকে চাষের সময়ে নদীর জলস্ফীতি ও প্লাবন হয়। সে কারণে সুমেরে চাষের কাজের জন্য ইওফ্রেটিসের শাখা নদী বা খাল খনন করে চাষের মাঠে জল সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। মেসোপটেমিয়ার জলসেচের জন্য খাল কাটা এবং সেগুলি মাটির আস্তরণ থেকে পরিষ্কার রাখা বিশেষ শ্রমসাপেক্ষ ছিল।

নীলনদের মত সিন্ধুনদেও চাষ শুরু হওয়ার আগে প্লাবন আসে, সাধারণত আগস্ট মাসে। কিন্তু নীলনদের তুলনায় সিন্ধুর নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী কঠিন ব্যাপার। সিন্ধুতে জলস্ফীতি নীলনদের থেকে দ্বিগুণ বেশী হয়, স্রোতের গতিও অনেক তীব্র। এখানে বন্যার জল একেবারে মাঠ ঘাট ভাসিয়ে দেয় না। এখানে বন্যার জল পূর্ব নারা এবং পশ্চিম নারার মত দুকূল ছাপানো বড় বড় নদীর খাতে বয়ে যায়। সিন্ধুর মতই এই নদীগুলি আবার তাদের গতি পরিবর্তন করে। এর ফলে সিন্ধুর বিস্তৃত অববাহিকা অঞ্চলে চাষের আগে সব জায়গাতেই একরকম জল পায় না। নদীর উর্বরতা এই কারণে সব জায়গায় একরকম নয়। কিছু অঞ্চল বন্যার জলে ধৌত হয়ে উর্বর হয়ে ওঠে। কিছু এলাকা শুকনো ও রুক্ষ থেকে যায়। জায়গাগুলিরও বছর বছর পরিবর্তন হয়। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের কাছে সম্ভবত এই কারণেই কৃষিকার্য ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

এই তিন নদীর অববাহিকা অঞ্চলের দৃশ্যপট এবং তাদের ভৌগোলিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করার পর এবার আমরা এই তিন সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করব। প্রত্যেক সভ্যতাই এককভাবে অভিনব এবং বিস্তৃতভাবে আলোচনার যোগ্য।

৬.৪ নিম্ন মেসোপটেমিয়ার নগরবাসী মানুষ

তথ্যের দিক থেকে মেসোপটেমিয়ার ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে মেসোপটেমিয়ার বিশেষ স্থান আছে। এখানেই প্রথম শহর ও রাষ্ট্র তৈরী হয়, অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি কৃষি অর্থনীতি গড়ে ওঠে; গণিত, সাহিত্য এবং জ্যোতির্বিদ্যাতেও প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার অনবদ্য অবদান রয়েছে। সঙ্গের তালিকা ১-এ আমরা সময়ানুক্রমিক ইতিহাসের একটি রেখাচিত্র তুলে ধরেছি। তৃতীয় সহস্রাব্দে মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রথম পর্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসের এতসব খুঁটিনাটি কিভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত হ'ল? বহু দশক ধরে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে খনন কার্য চালিয়ে এসেছেন। এর ফলে, মৃৎপাত্রে ভাস্কর্যের নমুনা, মূর্তি, সীলমোহর, ধাতুর তৈরী জিনিষপত্র, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, নক্শা, সমাধিক্ষেত্র এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লিপি খোদাই করা মাটির tablet পাওয়া গেছে।

মেসোপটেমিয়াবাসীরা নরম ভিজে মাটির চৌকো টুকরোর ওপর কাঠের তৈরী তীক্ষ্ণ মুখযুক্ত কলম দিয়ে লিখত। লেখার পর এই চৌকো, বা আয়ত মাপের টুকরোগুলি রোদে শুকানো বা আগুনে পোড়ানো হ'ত। কাগজ, গাছের ছাল বা কাঠের টুকরার চাইতে পোড়ামাটি অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী; শতাব্দীর পর শতাব্দী মাটির তলায় থাকলেও এর কিছু ক্ষতি হয় না। মাটির এই টুকরোগুলির খোদিত লিপি থেকে আমরা মেসোপটেমিয়ার দেবদেবীর কাহিনী, পৃথিবী সৃষ্টির নানান গল্প, উপকথা, রাজার তৈরী আইনবিধি, রাজকর্মচারীদের উদ্দেশ্যে রাজার নির্দেশ এবং শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। মেসোপটেমিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র তিনজন রাজাই পড়তে লিখতে জানতেন। কিন্তু ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে সমস্ত রাজকার্যের ব্যাপারে লেখালেখি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কর্মচারীদের রাজা যে নির্দেশ পাঠাতেন তার একাধিক লিখিত অনুলিপি করা হ'ত। কর্মচারীদের পাঠানো বিবরণ ও উত্তর ঐ অনুলিপিগুলির সঙ্গে একত্র করে মহাফেজখানায় বাক্সের মধ্যে বা তাকের ওপর রাখা থাকত। এছাড়া বণিকদের তৈরী করা আমদানি-রপ্তানি পণ্যের তালিকাও পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রীয় গোশালার গবাদি পশুর সংখ্যা অথবা মন্দির সংলগ্ন কারখানাগুলিতে সুতো তৈরী এবং কাপড় বোনার শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিবরণও পাওয়া গেছে। মন্দিরের জমিতে কি কি কাজ হতো তা সমস্তই লিপিতে খোদিত করা আছে। জমিতে চাষ করার জন্য লাঙ্গল এবং বীজ দেওয়া, জমির মাপ, ফসলের পরিমাণ ইত্যাদি যাবতীয় খবর এইরকম tablet-এর খোদিত লিপি থেকে জানা গেছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি এভাবে পাওয়া যায়।

৬.৪.১ সুমেরীয় সভ্যতা

পৃথিবীর প্রথম নাগরিক বা শহুরে মানুষেরা যে ভাষা ব্যবহার করত তাকে বলা হয় সুমেরীয়। সেই কারণে আমরা এই সভ্যতাকে সুমেরীয় সভ্যতা বলব। এখনকার আধুনিক বর্ণমালার এক একটি চিহ্ন স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতীক; কিন্তু সুমেরীয় ভাষার ঠিক সেরকম ছিল না। এই ভাষায় প্রতিটি লিখিত চিহ্ন এবং নামও আমরা জানতে পেরেছি। সেই সঙ্গে ঐ ভাষা ব্যবহারের সময়কালও জানা গেছে। যেহেতু দুটি ভাষাই কোণাচে আকারে লেখা হ'ত, সেই কারণে এই লিপিকে বলা হয় Cuneiform.

৭ Cuneiform বর্ণমালায় রচিত আক্কাডিয়ান লিপি

সুমেরীয় সভ্যতা শুরু হয়েছিল ছোটখাটো গ্রামবসতি দিয়ে। সময়ানুক্রম তালিকার পাশাপাশি লেখা দেখুন) খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালে গ্রামগুলি ক্রমশ শহরে পরিণত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক পরিমাপ ও গবেষণায় দেখা গেছে যে এই শহরগুলি সমসাময়িক সিন্ধু সভ্যতার বা মিশরের শহরগুলি থেকে অনেক বড় ছিল। মন্দিরের গাত্রে খোদিত লিপি থেকে কৃষিকার্যের বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে জমির উৎপাদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী ছিল; প্রাচীন বা মধ্যযুগেও বোধহয় এত বেশী ছিল না। বলা বাহুল্য, উৎপাদন এত বেশী ছিল যে শহরের মানুষের খাদ্য জোগানের ক্ষেত্রে কোন সমস্যাই হ'ত না।

প্রতিটি শহর রাষ্ট্রের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। সুমেরে এরকম বহু নগর রাষ্ট্র ছিল এবং প্রায়ই এদের মধ্যে যুদ্ধ হ'ত। চারপাশের গ্রাম, কৃষিজমি, ভেড়া-ছাগলের বিচরণ ক্ষেত্র, মাছের ভেড়ী এই সব নিয়ে নগর-রাষ্ট্র গঠিত ছিল। শহরের সবচেয়ে বড় এবং জমকালো বাড়ী হ'ল রাজার প্রসাদ ও প্রধান দেবতার মন্দির।

দেবতারা স্বর্গে বাস করলেও তাঁদের সম্পত্তি ছিল পৃথিবীতে। মন্দিরগুলি ছিল তাদের পৃথিবীর বাসগৃহ। এখানে দেবতাদের নিয়মিত আহার, মহার্ঘ পরিচ্ছদ ও অলংকার নিবেদন করা হ'ত। মন্দিরের সংলগ্ন কৃষিজমি, মাছের ভেড়ী, ছাগল, ভেড়া, গবাদি পশু এবং কারখানা এইসব ছিল দেবতার সম্পত্তি। মেসোপটেমিয়ার মানুষেরা বিশ্বাস করত, পৃথিবীতে তাদের জন্ম হয়েছে দেবতাদের সেবা করার জন্য। মন্দিরের পুরোহিতরা সঙ্গীত ও মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট রাখত। সাধারণ মানুষ আহার-সামগ্রী উৎসর্গ করত; কারিগর, শিল্পীরা বস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম তৈরী করত; এবং মন্দিরে নিয়মিত পশুবলিও হ'ত।

কিছু কিছু মন্দিরের কৃষিজমি প্রজাদের দেওয়া হ'ত চাষের জন্য। ফসলের ১০ শতাংশ খাজনা হিসেবে দিতে হ'ত তাদের। এই খাজনার একটা অংশ পুরোহিতদের বেতন হিসেবে দেওয়া হ'ত। মন্দিরের ভৃত্যরা ভেড়ার লোম থেকে পশমের কাপড় তৈরী করত। এই কাজের জন্য তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য, তেল এবং বস্ত্র পেত জীবিকানির্বাহের জন্য। দেখা যাচ্ছে গোষ্ঠী সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে যেখানে এক শ্রেণীর মানুষের নিজস্ব কোন সম্পদ থাকছে না। তারা কায়িক শ্রমের বিনিময়ে সামান্যই অর্জন করেছে জীবনধারণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। এইসবের মধ্যে রাজার ভূমিকা খুব স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ছিল না। কোন কোন খোদিত লিপিতে দেখা যাচ্ছে রাজারা ঘোষণা করছে যে তাদের নির্বাচন করছেন দেবতারা, যাতে তারা সম্পদ আহরণ করে দেবতাদের খুশী করতে পারে। সুতরাং রাজারাই দেবতাদের প্রধান সেবক ছিল, নিজেদের কখনও তারা দেবতা বা ঈশ্বর বলে মনে করত না। মন্দির নির্মাণ করতে রাজারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করত; কিন্তু আচার অনুষ্ঠান বা মন্দিরের বা কার্য-নির্বাহের দায়িত্ব তাদের ছিল না। মন্দির নির্মাণ করা ছাড়াও রাজারা ছিল আইন প্রণয়নকারী, প্রধান শাসক, বাণিজ্যের প্রধান সংগঠক। রাজাদের নিজস্ব বিশাল জমি থাকত। রাজার প্রাসাদ মন্দিরগুলি থেকে অনেক বড় এবং সুরক্ষিত ছিল। বহু লোক রাজার প্রাসাদে বা জমিতে কাজ করত।

রাজাদের শুধু যে ধর্মীয় ভূমিকাই ছিল একথা মনে করা ভুল হবে। সুমেরীয় রাজারা প্রধানত ছিল সামরিক নেতা। এরা মন্দির তৈরী করত এবং শাসনও করত সাধারণ মানুষের কাছে তাদের ক্ষমতাকে আইনসঙ্গত ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য এবং সর্বোপরি মন্দিরের সম্পত্তির ওপর দখল প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। পূর্বতন রাজবংশের আমলে মন্দিরগুলি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। আদতে এই সম্পত্তি এবং জমিগুলি সাধারণ মানুষের ছিল। কিন্তু সুমেরীয় রাজারা এগুলি তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত ব্যবহার করত এবং সেরকম ক্ষমতাও তাদের ছিল। প্রথম দিকে রাজবংশের লিখিত তথ্যগুলিতে রাজাদেরই মন্দির সম্পত্তির মালিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে—দেবতাদের নয়।

৬.৪.২ রাজার ক্ষমতার উৎস

মন্দিরের পুরোহিতদের ক্ষমতা খর্ব করার মত শক্তি রাজারা কিভাবে লাভ করল—এটা খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রত্নতাত্ত্বিকরা উর শহরে খনন কার্য করতে গিয়ে একটি বিশাল সমাধিস্থল আবিষ্কার করে। শত শত সাধারণ মানুষের কবর সেখানে পাওয়া গেছে—স্বল্প মৃৎপাত্র এবং অলংকারসহ। এছাড়া ষোলটি বিশেষ ধরণের সমাধিও পাওয়া গেছে। এগুলি মাটির তলায় বড় বড় ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ঘরের মত। এই সমাধিগুলি রাজা এবং রাণীদের ছিল। সমাধি কক্ষে রত্ন অলংকার, বাদ্যযন্ত্র, সোনা-রূপোর তৈরী আনুষ্ঠানিক অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেছে। কোন কোন রাজকীয় সমাধিকক্ষে রাজা ও রাণীর সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক সভাসদ ও প্রহরীদের সমাধি, বলদ টানা শকট এবং শকট চালকের সমাধি পাওয়া গেছে। সমাধিকক্ষের অভ্যন্তরে বিপুল সম্পদ আরও বিস্ময়সূচক এই কারণে যে সুমেরে কোন মূল্যবান ধাতু বা রত্ন পাথর পাওয়া যেত না। এগুলি আসত জাগ্রোস (Zagros) অথবা সিরিয়া (Syria), তুরস্ক (Turkey) বা ভারতবর্ষ থেকে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে সুদূর দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চলত। এইসব মূল্যবান জিনিষের পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে শস্য, তেল, সূতীবস্ত্র রপ্তানি পণ্য হিসেবে ঐ দেশগুলিতে পাঠানো হ'ত। রাজারা এই বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। লিখিত লিপির পাঠোদ্ধার করে জানা গেছে যে বণিক, সওদাগররা রাজার প্রতিনিধি হিসেবে দূর দেশে বাণিজ্য করতে যেত এবং প্রচুর সম্পদ নিয়ে ফিরত। মন্দিরের খোদিত লেখাগুলিতেও দেখা যাচ্ছে রাজারা তাদের বাণিজ্যিক সাফল্যের কথা সগর্বে উল্লেখ করত। সম্পদ সঞ্চয় এবং সামরিক শক্তির ব্যবহার একই সঙ্গে চলত। তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম দিকে সুমেরে অনবরত যুদ্ধ হ'ত। যদিও এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর ছিল। জলসেচের খালগুলিতে মাটির আস্তরণ পড়ে শুকিয়ে যেত। ফলে, সেচের জলের জন্য অথবা কৃষিজমির জন্য অধিবাসীদের নিরন্তর সংগ্রাম করতে হ'ত।

সকল সামরিক নেতারা যুদ্ধ বন্দীদের দ্বারা সৈন্যবাহিনীর বৃদ্ধি ঘটিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠত। তারা বিজিত অঞ্চল থেকে আনা নানা সম্পদেরও অধিকারী হ'ত। যে রাজা অস্ত্র তৈরীর জন্য যত বেশী তামা ও ব্রোঞ্জ আমদানী করতে পারত তত বেশী যুদ্ধে তারা জয়লাভ করত।

সুমেরীয় একটি প্রবাদ অনুযায়ী সুমেরের মানুষদের মধ্যে দরিদ্ররাই ছিল নিশ্চুপ। সাধারণ চাষী বা কুমোরদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। সাধারণ মানুষ নিয়মিত পূজার উপাচার নিয়ে মন্দিরে যেত, রাজার প্রাসাদে শ্রমিকের কাজ করত অথবা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করত। কিছু কিছু লেখায় রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই অভিযোগগুলি খাজনা বা কর সংক্রান্ত নয়। অভিযোগগুলি সাধারণত ছিল অত্যধিক কাজের বিরুদ্ধে—মন্দির নির্মাণ করতে বা নগরের প্রাচীর তৈরী করতে যে অত্যধিক শ্রম করতে হ'ত তার বিরুদ্ধে। কখনও কখনও সুদূর অভিযানে প্রেরণের বিরুদ্ধেও তাদের অভিযোগ থাকত। এইসব দেখে মনে হয় সাধারণ মানুষদের ফসলের খাজনা বা কৃষি কর থেকে রেহাই দেওয়া হ'ত। মন্দির এবং রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত এলাকা থেকেই রাষ্ট্রের যথেষ্ট উপার্জন হ'ত। বাধ্যতামূলক শ্রম এবং বৈদেশিক বাণিজ্যও অর্থাগমের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল।

এই সময়ের কতকগুলি আইনী চুক্তি থেকে দেখা যাচ্ছে যে কৃষকরা, বোধ করি দারিদ্র্যের কারণে অথবা দুরবস্থায় পড়ে, তাদের জমি রাজপরিবারের লোকদের কাছে বিক্রী করে দিচ্ছে। রাজা বা রাজপুরুষের পক্ষে অন্তত এটুকু বলা যায় তারা জমিগুলি জবরদখল না করে সেগুলির মোটামুটি উচিত মূল্য দিচ্ছে শস্য, রুটি, মাছ, তেল বা তামার বিনিময়ে।

তালিকা—১ : মেসোপটেমিয়ার সময়ানুক্রম

৪৫০০ থেকে ২৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	উবেইদ উরুক এবং জামদাত নাসর যুগ	নিম্ন ইওফ্রেটিস অঞ্চলে জেলে এবং চাষীরা বাস করত। বাকী অংশে ধীরে ধীরে বসতি হয়। ছোট ছোট মন্দির গড়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্বে তামা এবং ব্রোঞ্জের শিল্প দিয়ে শুরু হয়ে পরে খুবই উন্নত মানের কারিগরী শিল্পে পৌঁছয়। পরবর্তী সময়ে লিপির উদ্ভব হয়। পরে বেলনাকার (cylindrical) সীলমোহরের ব্যবহার শুরু হয়। মন্দিরগুলি আকারে বিশাল এবং সুদৃশ্য অলংকরণে ভূষিত হ'ল।
২৯০০ থেকে ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	প্রাচীন রাজবংশের যুগ	সুমেরীয় নগর রাষ্ট্রের এবং প্রথম সভ্যতার সূচনা। বই দেখুন।
২৩০০ থেকে ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	আক্কাড এবং উত্তরের তৃতীয় রাজবংশ	সুমেরীয় ভাষার পরিবর্তে সরকারী এবং ঘরোয়া ভাষার প্রচলন। বিদ্যালয়ে সুমেরীয় ভাষা শেখানো হ'ত। লিপি একই ছিল। আক্কাডের রাজা সারগন আসিরিয়া এবং সিরিয়া জয় করে পৃথিবীর প্রথম সম্রাট হন। উরের তৃতীয় রাজবংশ সমগ্র সুমেরে শাসন প্রতিষ্ঠা করে।
২০০০ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	প্রাচীন ব্যাবিলনের যুগ	নতুন নতুন মানুষ এই সময় মেসোপটেমিয়া এসে বসতি শুরু করে। কিন্তু তারা আক্কাডিয়া ভাষাই ব্যবহার করত। বিভিন্ন রাজারা ক্ষমতা দখলের লড়াই করত। এদের মধ্যে অন্যতম ব্যাবিলনের হামুরাবি লিপিকাররা অসংখ্য লেখা খোদাই করতে শুরু করে।
১৬০০ থেকে ১১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	ক্যাসাইট যুগ	জাগ্রোস (Zagros)-এর লোকেরা ব্যবিলনের সিংহাসন দখল করে এবং মেসোপটেমীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে। সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় আক্কাডিয় ভাষাই আন্তর্জাতিক কূটনীতির ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হ'তে থাকে।
	ছোট ছোট রাজবংশগুলি	লোহার যুগের শুরু। উট নতুন একটি গৃহপালিত পশু।
১০০০ থেকে ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	আসিরিয় যুগ	৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে আসিরিয়া সুবিশাল সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দক্ষিণ সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। প্যালেস্টাইন এবং জাগ্রোসের পার্বত্য অঞ্চলও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আসিরিয় রাজারা পৃথিবীর প্রথম চিড়িয়াখানা ও গ্রন্থাগার তৈরী করে। খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২ সালে আসিরিয় রাজধানী নিনেভ এবং মিডিস ব্যবিলনীয়দের হাতে চলে যায়।
৬২৫ থেকে ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	নতুন ব্যবিলনের যুগ	আসিরিয়ার চিরশত্রু ব্যবিলন এখন মেসোপটেমিয়ার সবচাইতে ক্ষমতাশালী শক্তি। ব্যবিলন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহর।

		ব্যবিলনের সম্পদ এবং বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতির খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভবত 'শূন্যের' আবিষ্কার এই সময়ই হয়েছিল। ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন দখল করে নেয় পারস্যের আকিমিনিয় রাজারা।
৫৩৯ থেকে ৩৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	আকিমিনিয় শাসন	ব্যবিলন একাধারে পারস্য সাম্রজ্যের শস্যাগার ও সম্রাটদের শীতকালীন বাসস্থান।
৩৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ	পারস্য সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আলেকজান্ডার ব্যবিলনের সমৃদ্ধি এবং সভ্যতার আন্তর্জাতিক মান দেখে মুগ্ধ এবং বিস্মিত। কিন্তু এটিকে নিজের এশিয় সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।
৩১১ থেকে ১২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	সেলুকিডস	ছোটখাটো গ্রীকরাজারা মেসোপটেমিয়া সাহিত্য ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় উৎসাহিত হতেন। ৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পর আক্কাডিয়া ভাষা এবং কোণাকার লিপির ব্যবহার বন্ধ হ'ল। একদা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ব্যবিলনের পতন ঘনিয়ে এল।

অনুশীলনী—১

১) সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করুন।

....

....

....

....

১) মেসোপটিমেয়ার সভ্যতা নিম্নলিখিত কোন্ নদীর উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল?

(ক) সিন্ধু

(খ) গঙ্গা

(গ) টাইগ্রিস ও ইওফ্রেটিস

(ঘ) নীল

৩) নিম্নলিখিত কোন্ সালে মেসোপটেমিয়াতে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য লিখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল?

(ক) ৫০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

(খ) ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

(গ) ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

(ঘ) ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

৪) সুমেরীয় সভ্যতার ধর্মের ভূমিকার ওপরে টীকা লিখুন।

....

....

....

....

৫) সুমেরীয় সভ্যতার পুরোহিতদের ওপর রাজার কর্তৃত্বের সাক্ষ্য নিম্নলিখিত কোন্ প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে?

(ক) ইওফ্রেটিস

(খ) নিনেভ

(গ) উর

(ঘ) ব্যাবিলন

মানচিত্র ৩

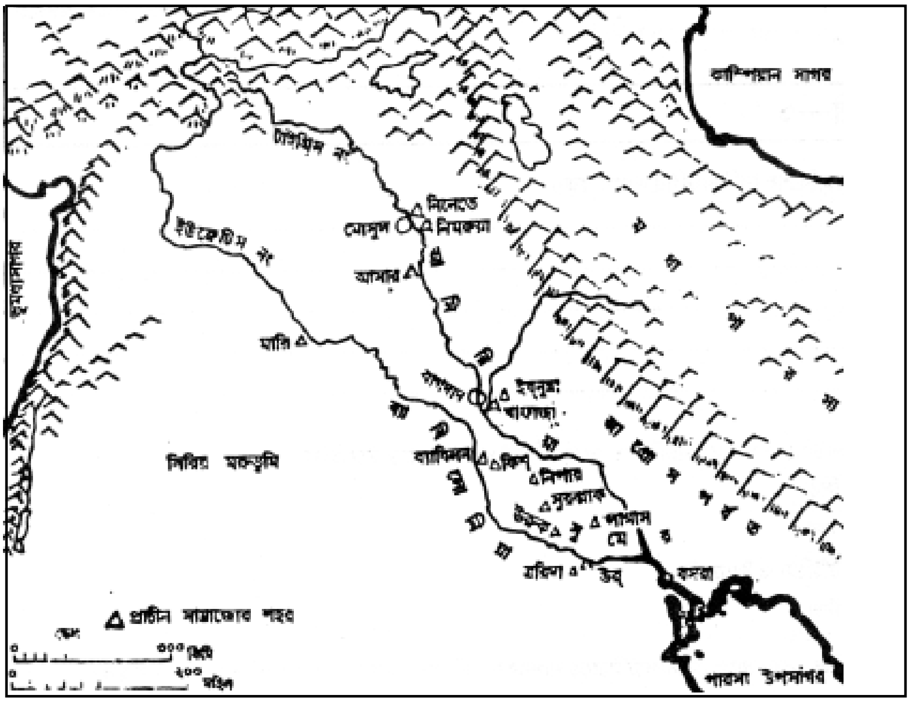

৬.৫ মিশর

এবার আমরা প্রাচীন মিশরের সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করব। তালিকা ২-এ মিশরের সময়ানুক্রমিক ইতিহাসের বিবরণীতে মিশরের ধারাবাহিক অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। মিশরের প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি বিশেষ রীতি ছিল ফ্যারাও (Pharaoh) বা রাজাদের নাম বংশানুক্রমে ধরে রাখা। প্রচলিত এই রীতি অনুযায়ী ফ্যারাওদের নাম এবং তাদের শাসনকালের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি মন্দিরের গায়ে বা সমাধির দেওয়ালে খোদাই করে রাখা হ'ত। রাজকীয় পূর্বপুরুষদের সম্মান প্রদর্শন করা ফ্যারাওদের রীতি ছিল। অনেক সময় একই সঙ্গে ষাট থেকে পঁচাত্তর জন মৃত ফ্যারাওর উদ্দেশ্যে মন্দিরে পূজোপাচার উৎসর্গ করা হ'ত। সেই সময় এই মৃত ফ্যারাওদের প্রত্যেকের নাম ঐ মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা হ'ত। অতএব বলা যায়

যে, মিশরের ফ্যারাওদের বংশানুক্রমিক ইতিহাস রচনার একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান হ'ল এই খোদিত লেখাগুলি।

আশ্চর্যের ব্যাপার যে মিশরের ইতিহাস রচনার ব্যাপারে প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকা নিতান্তই সীমিত। একথা সত্যি মিশরের রুক্ষ এবং অত্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া প্রাচীন স্থাপত্যকে রক্ষা করেছে। এমন কি 'মমি' করে রাখা মাটির নীচের শবদেহগুলিও বিকৃত হয়নি। কিন্তু মরুভূমির শুকনো মাটিতে শুধু মন্দির এবং সমাধির নিদর্শনই পাওয়া গেছে, অন্য কিছু নয়। প্রাচীন মিশরের শহর এবং গ্রামগুলি নীলনদের সমতল ভূমির কৃষি অঞ্চলে ছিল। এই সঙ্কীর্ণ সমভূমি বাৎসরিক বন্যায় প্লাবিত হ'ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী মিশরের মানুষ এখানেই বসবাস করেছে। ফলে প্রাচীন বসতির ওপরে মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক বাসস্থান গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। প্রাচীন কালের শহর বা গ্রামের বাড়িঘর হয় বন্যায় ধ্বংস হয়ে গেছে বা ভিজে মাটির নীচে চাপা পড়েছে অথবা তারই ওপর মধ্যযুগ এবং আধুনিক কালের বাড়িঘর গড়ে উঠেছে। সাধারণ কৃষক বা প্রাচীন শহরবাসীর আবাস বা তাদের জীবনযাত্রা কিরকম ছিল এ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।

৬.৫.১ মিশরীয় সংস্কৃতি

ভাগ্যক্রমে, মিশরের ইতিহাস শুধুমাত্র ফ্যারাওদের নাম বা যুদ্ধের তালিকা মাত্র নয়। মন্দিরের এবং সমাধির দেওয়ালে আঁকা জীবন্ত সব ছবি সেই সময়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুস্পষ্ট ধারণা এনে দেয়। কৃষক মাটিতে লাঙ্গল দিচ্ছে, ছুতোর মিস্ত্রি কাঠের কাজ করছে, লিপিকার লিখছে, বাঁদর তার রক্ষককে কামড়াতে যাচ্ছে—এই দৃশ্যগুলি সাধারণ মানুষের জীবনধারার পরিচয় বহন করছে। এছাড়া লিখিত উপাদানও আছে—সমাধির দেওয়ালে খোদিত মৃত ব্যক্তির জীবনী, প্যাপিরাসের ওপর লেখা চিঠিপত্র এবং নানা কাহিনী।

মিশরীয় লেখাকে বলা হয় hieroglyphic বা চিত্রলিপি। একটি ছবি, যা দেখা যাচ্ছে তাই বোঝাচ্ছে যেমন বাড়ির ছবি—বাড়িকেই বোঝাচ্ছে। আবার কখনও ছবির মাধ্যমে কোন চিহ্ন তুলে ধরা হচ্ছে। কখনও কোন ধ্বনির চিহ্ন বোঝাচ্ছে। যেমন 'ন' বা 'ড' ধ্বনির বিশেষ চিহ্ন। অনুভূতিসূচক চিহ্নও রয়েছে। মিশরীয়রা যখন প্যাপিরাসের ওপর লিখত (Paper কথাটি এই থেকে এসেছে) তখন চিহ্নগুলি যুক্ত হয়ে আর ঠিক ছবির মত দেখাত না।

প্যাপিরাস মিশরের নলখাগড়ার মত একজাতীয় উদ্ভিদ। এর সবুজ কাণ্ড খুব পাতলা এবং সরু করে ফালি করা হ'ত। ফালিগুলি এরপর পাশাপাশি ও কোনাকুনি একটার ওপর আরেকটা রেখে দলাইমলাই করে পেষা হ'ত। এইভাবে একটা আস্তরণের মত তৈরী হ'ত। এই আস্তরণটি চেপে রাখার পর রোদে শুকানো হ'ত। এইভাবে প্যাপিরাস লেখার জন্য তৈরী হ'ত। কালি ও অন্যান্য রঙের শুকনো টুকরো বা বড়িকে ভেজা তুলি দিয়ে ভিজিয়ে লেখা হ'ত। মিশরের লিপি নানা রঙে লেখা হ'ত এবং তা নয়নমধুর ছবির মত হ'ত।

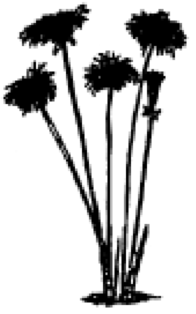

৮. প্যাপিরাসের চারা

মিশরের পিরামিড আজকের পর্যটকদের কাছে মস্ত আকর্ষণ। বিশাল আকারের পিরামিডগুলি আসলে পাথরের তৈরী সমাধিসৌধ। নীচের দিকে চৌকো ভিত্তি থেকে মোটা চারটি ত্রিকোণাকৃতি চূড়াতে শেষ হয়েছে। প্রত্যেকটি পিরামিড ছিল নীলনদের ধারে বিশাল মন্দিরচত্বরের অংশবিশেষ যা নীলনদ ও সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত।

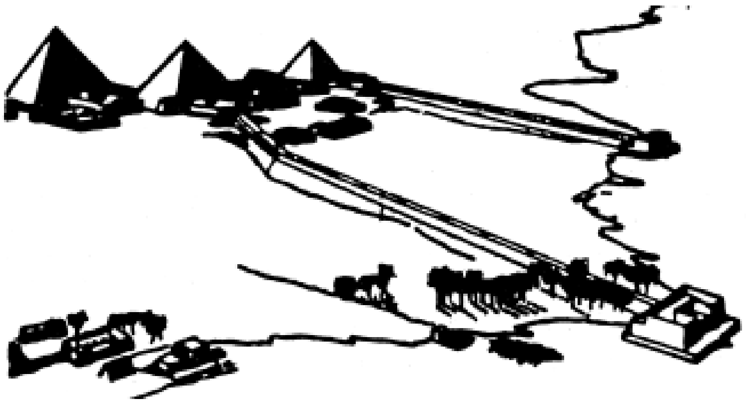

৯. উপত্যকা, মন্দির এবং পথসহ একটি পিরামিড

একজন ফ্যারাওর মৃত্যু হ'লে তার শবদেহ কাঠের নৌকো করে প্রথমে মন্দিরে আনা হ'ত, পরে সেখান থেকে সমাধিক্ষেত্রের পিরামিডে নিয়ে যাওয়া হ'ত। অনেক সময় পিরামিডের ধারে একটি বিশাল নৌকো মাটির তলায় পুঁতে রাখা অবস্থায় পাওয়া গেছে। মিশরীয়রা পরলোককে ইহজীবনের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবির মত মনে করত। অর্থাৎ এ জীবনে যা যা প্রয়োজন, বা ভোগের বস্তু, মৃত্যুর পরেও তার প্রয়োজন ফুরোয় না। এই মনে করে ফ্যারাওদের শবদেহকে শুধু যে মহার্ঘ পোশাকে আচ্ছাদিত করত তাই নয়, খাদ্য, আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র সবই সঙ্গে দেওয়া হ'ত।

১০. (ক) নিম্ন মিশর অঞ্চলের লোহিত মুকুট

১০. (খ) উচ্চ মিশর অঞ্চলের ধবল মুকুট

পিরামিডগুলি ফ্যারাওদের শক্তির প্রতীক ছিল। বিশাল আকারের এই সমাধি সৌধগুলি ফ্যারাওদের দর্প বা অহঙ্কারের বস্তু ছিল, তা কিন্তু নয়। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে ফ্যারাও ছিল একজন দৈব মানুষ— কোন একজন দেবতার দ্বারা সৃষ্ট এবং শুধু সেই দেবতার হোরাস-এর অবতার। বিশ্বচরাচর ফ্যারাওর নিয়ন্ত্রণাধীন, সমস্ত মন্দিরের তিনিই প্রধান পুরোহিত। সুমেরীয় রাজাদের থেকে অনেক বেশী দৈবশক্তির অধিকারী ফ্যারাওরা কিন্তু রাষ্ট্রেরও প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিষেকের সময় ফ্যারাওদের নানান

আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পবিত্র ও শুদ্ধ করা হ'ত এবং এরপর উচ্চ ও নিম্ন মিশরের রাজমুকুট লাভ করত তারা। ফ্যারাওরা জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করত এবং মিশরের শাসনকার্য পরিচালনা করত। প্রতি দুবছর অন্তর সমস্ত রাজ্য ফ্যারাওদের পরিভ্রমণ করতে হ'ত। এর আগেই আমরা ফ্যারাওদের মৃত পূর্বপুরুষদের প্রতি সম্মান জানানোর উল্লেখ করেছি। এর ব্যয়ভার বহন করবার জন্য প্রতিটি পিরামিডে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছিল। যে সব পুরোহিতরা এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করত, তাদের একখণ্ড জমি দান করা হ'ত। জমির উপার্জন থেকে উৎসবের এবং কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচা মেটানো হ'ত।

১১. মিশরীয় বর্ণমালা

৬.৫.২ শাসনব্যবস্থা

সাধারণত রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব ছিল প্রাসাদের। কিন্তু পঞ্চম শাসক বংশের রাজারা একটি নতুন প্রথা চালু করল। কর্মচারীদের বিস্তৃত জমি দান করার রীতি শুরু হ'ল। রাজার অনুমতি সাপেক্ষে কর্মচারীর পুত্ররা এই জমি উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করতে পারত।

এইভাবে ভূমির অধিকার লাভ করার ফলে প্রাদেশিক রাজপুরুষরা বিশেষ করে উচ্চ মিশর অঞ্চলের কর্মচারীরা ক্রমশ নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করতে শুরু করে। তখন পঞ্চম শাসক বংশ কর্মচারীদের এই স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করার জন্য 'উচ্চ মিশর অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা' নামে একটি পদ সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। এরকম একজন কর্মচারী যিনি উচ্চ মিশরের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হয়েছিল তার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। তার সমাধির ওপর পাথরের খোদিত জীবনকাহিনী পাওয়া গেছে।

ষষ্ঠ শাসক বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় ওয়েনি নামে এই মানুষটি খুবই সামান্য অবস্থা থেকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সে লিখছে, 'আমি যখন সামান্য জেলার শাসক ছিলাম (Magistrate), মহামান্য রাজা আমাকে তাঁর বন্ধু ও প্রাসাদ পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করেন। এই সময় ওখানে নিযুক্ত চারজন পরিদর্শককে আমি সরিয়ে দিই। রাজার রক্ষণাবেক্ষণের তদারকি, রাজার পথ তৈরী এবং সভাসদ হিসাবে রাজার মনোমত কাজ করে আমি তাঁর প্রভূত প্রশংসা অর্জন করি। অন্তঃপুরে কোন সমস্যা দেখা দিলে

রাজা একমাত্র আমাকেই বিশ্বাস করতেন বলে সমস্ত ঘটনা বলতেন। এ ব্যাপারে আমার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। এর আগে কিন্তু আমার মত একজন সাধারণ প্রাসাদ পরিদর্শক রাজ অন্তঃপুরের গোপন সব কথা এভাবে শোনার অধিকারী হয়নি।

'এশিয়ার (প্যালেস্টাইনের অধিবাসী) মানুষদের এবং মরুবাসীদের (সিনাই মরুভূমির বাসিন্দা) শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজা উচ্চ এবং নিম্ন মিশরের থেকে অনেক বাছাই করে দশ হাজার মানুষের সৈন্যবাহিনী তৈরী করলেন। এই বাহিনীকে তিনি পাঠালেন আমার নেতৃত্বে এবং এতে ছিল রাজার বন্ধুরা, রাজার সীলমোহর বাহকেরা, নগর অধিকর্তারা সরকারী অনুবাদকরা ও মন্দিরের প্রজাদের পরিদর্শকরা। সামান্য প্রাসাদ পরিদর্শক হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকেই এই কাজের ভার দিলেন কারণ, একমাত্র আমিই পারস্পরিক বিবাদ বন্ধ করতে, সাধারণ পথিককে ছিনতাইকারীর হাত থেকে ও গ্রামের মানুষদের চুরি ডাকাতি থেকে রক্ষা করতে পারতাম।'

'মরুভূমির বাসিন্দাদের দেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, হাজার হাজার শত্রু নিধন করে এবং অনেককে বন্দী করে সৈন্যবাহিনী শান্তিতে ফিরে এল। মহামান্য রাজা আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।'

ওয়েনি এরকম আরো অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত উচ্চ মিশরের প্রাদেশিক শাসক নিযুক্ত হয়েছিল। কর আদায় এবং শ্রমিক নিয়োগের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল। ওয়েনি বলেছে সে এই কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করে। পদমর্যাদাসম্পন্ন যে কোন মানুষের মতই ওয়েনির একটি বিরাট ও সুন্দর সমাধিতে সমাহিত হওয়ার আকাঙক্ষা ছিল এবং এ ব্যাপারে সে ফ্যারাওর সাহায্য চেয়েছিল। 'মহামান্য রাজাই নীলনদের ওপারে তুরা থেকে আমার জন্য চুণাপাথর আনবার জন্য নাবিক এবং একজন সীলমোহর বাহককে পাঠিয়েছিলেন। তারা একটি শবাধার, ঢাকনা, দরজা ও টেবিল নিয়ে এল। এভাবে কোন ভৃত্যের জন্য এতখানি কখনও করা হয়নি।'

মিশরের দক্ষিণ সীমান্তে প্রাদেশিক শাসক হিসেবে ওয়েনিকে পাঠানো হয়। এই অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে ফসল তোলার খাজনা আদায় এবং ফ্যারাওর খাস জমি থেকে কৃষিসম্পদ আহরণ করা হ'ত। ভালো কাঠ, পাথর এবং ধাতুরও প্রয়োজন ছিল। মিশরের দক্ষিণে নুবিয়াতে এই সব প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যেত। ষষ্ঠ শাসক বংশের হারকুফ নামধারী একজন রাজপুত্র আসোয়ানে তাঁর সমাধিতে লিখছে : 'মহামান্য রাজা আমাকে আমার বাবা, অভিনব বন্ধু ও একজন পুরোহিতের সঙ্গে নুবিয়াতে পাঠালেন, এই অঞ্চলে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত করার জন্য। সাত মাসের মধ্যেই এই কাজ সমাপ্ত করে আমরা ফিরে আসি এবং সঙ্গে নানা সামগ্রীও নিয়ে আসি।' তৃতীয় অভিযানে হারকুফ 'তিনশোটি গাধার পিঠে বোঝাই করা সুগন্ধি ধূপ, মেহগনি কাঠ তেল, চিতাবাঘের চামড়া, হাতির দাঁত এবং দূরে নিক্ষেপ করার লাঠি নিয়ে আসে।' একই সমাধিতে হারকুফকে লেখা ফ্যারাও-এর চিঠি থেকে জানা যায় যে হারকুফ মিশরে একজন বামন (ক্ষুদে মানুষ)-কে নিয়ে এসেছিল। সে অদ্ভুত সব নাচ জানত। ফ্যারাও লিখছেন : 'তুমি লিখেছ দিগন্ত অধিবাসীদের দেশ (আফ্রিকার মধ্য দেশ) থেকে একটি দেবতার নাচ জানা ডেঙ্গ (বামন) নিয়ে এসেছ। এরকম একজনকে অনেক বছর আগে একজন নিয়ে এসেছিল। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি এই ডেঙ্গকে নিয়ে উত্তরের প্রাসাদে এখনি উপস্থিত হও। তোমার এবং তোমার পুত্র, পৌত্রদের যাতে ভালো হয় আমি দেখব। বলশালী লোকদের পাহারায় নৌকায় ডেঙ্গকে শীঘ্র নিয়ে এস। দেখো সে যেন জলে পড়ে না যায়। দূর দেশের সমস্ত উপঢৌকনের চাইতেও আমি এই ডেঙ্গকে দেখতে চাই।'

মিশর অন্য দেশগুলি থেকেও পণ্য আমদানি করত। সিনাই মরুভূমি (মরু বাসিন্দার দেশ) থেকে তামা এবং নীল রত্ন পাথর (turquosie) আনত। এইসব খনির কাছে প্রাচীন ফ্যারাও রাজ্যের শিলালেখ পাওয়া গেছে। লেবাননের পাহাড় থেকে মিশর সিডার গাছের কাঠ আনত। বাইব্লসের বন্দরে ফ্যারাওদের

নাম খোদাই করা প্রচুর জিনিস পাওয়া গেছে। পূর্ব মরুভূমি অঞ্চলেও প্রচুর ধাতু পাওয়া যেত। চকচকে অ্যালবাস্টার পাথর, সোনার এবং তামার মজুত ছিল এইসব অঞ্চলে।

আবার পিরামিডের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। গীজার পিরামিড তৈরী করতে প্রতিটি ৩.৫ টন ওজনের কুড়ি লক্ষ গ্রানাইট পাথরের বড় বড় খণ্ড লেগেছিল। আটজন লোক লাগত এক একটি পাথরের খণ্ড তুলতে। উপর মিশরের পাথরের খনি থেকে এগুলি কাটা হ'ত। তারপর সাতশো মাইল নীলনদ পথে বহন করে আনা হ'ত। পুরো প্রকল্পটিতে হাজার হাজার শ্রমিক বিশ বছর ধরে কাজ করেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে পুরো সময় রাষ্ট্রকেই এই শ্রমিকদের খাদ্য জোগাতে হয়েছিল। সুতরাং পিরামিড তৈরীতেই প্রাচীন মিশরীয় রাজ্যের সমস্ত সম্পদ শেষ হয়ে গিয়েছিল একথা বলা যায়। প্রথম অন্তর্বর্তী সময়ে রাজারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং এশিয়ার দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছিল, রক্তপাত ঘটেছিল এবং অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। পরে মধ্য রাজ্যের ফ্যারাওদের ওপর শাসনব্যবস্থাকে আবার নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই যুগ আর ফিরে এল না। এরপর আর কখনও মিশরের এই ধরনের বিশাল স্থাপত্য এত চমৎকার কারুশৈলী এবং জ্যামিতিক উৎকর্ষে তৈরী হয়নি।

তালিকা—২ : মিশরের সময়ানুক্রম

মানচিত্র ৪

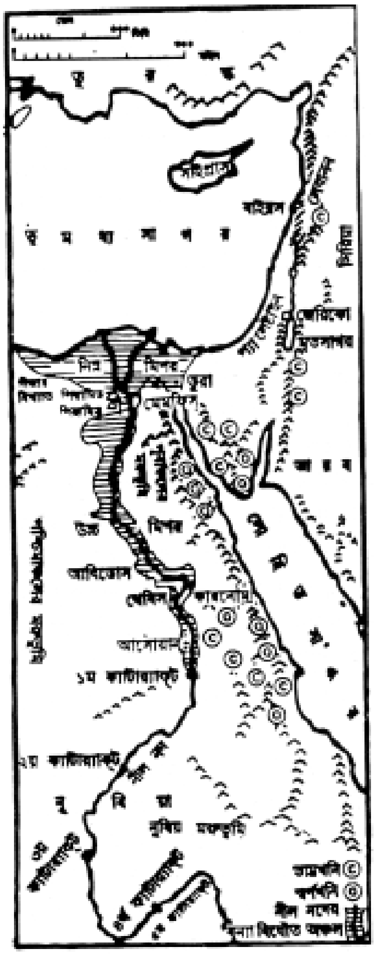

৩১০০ থেকে ২৬৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	প্রাক্-ইতিহাস যুগ প্রথম এবং দ্বিতীয় রাজবংশ	এই সময় বহু কৃষিগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হল। সোনা আমদানি করা হত। কারুশিল্পের এবং লিখিত লিপির উদ্ভব হল। কিংবদন্তীর রাজারা যুদ্ধের মাধ্যমে মিশরের বহু অংশকে যুক্ত করেন।
২৬৮৬ থেকে ২১৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	প্রাচীন রাজ্য তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ রাজবংশ	বই দেখুন ফ্যারাওরা পিরামিড তৈরী করছে।
	প্রথম অন্তর্বর্তী যুগ।	মেমফিস্ রাজধানী আক্রমণ ও সঙ্কটের কাল।
২০৫০ থেকে ১৬৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	মধ্য রাজ্য একাদশ থেকে ত্রয়োদশ রাজবংশ	থিবিস নতুন রাজধানী। শাসন ব্যবস্থা আবার দক্ষ এবং কার্যকরী। লিবিয়া, সিনাই, নুবিয়া ও প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান। বহু সাহিত্য রচনার সৃষ্টি।
	দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী যুগ	এশিয়া থেকে হাইকসসের মিশর আক্রমণ।
১৫৫৯ থেকে ১০৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	নতুন রাজ্য অষ্টাদশ থেকে একবিংশ রাজবংশ	মিশরে ঘোড়ার আমদানি। কার্ণাকে থিবিস, এ্যাবিডসে মন্দির তৈরী হ'ল। রানী হাটশেপসুটের উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা অভিযান ও বেবুন, হাতির দাঁত, সোনা ও মেহগনি কাঠ নিয়ে প্রত্যাবর্তন। পুরো অভিযানের

		ছবি রানী হাটশেপসুটের সমাধি কক্ষের দেওয়ালে আঁকা। মিশরের প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া বিজয়। ফ্যারাওরা এশীয় রাজকন্যাদের বিবাহ করে। ফ্যারাও টুটেনখামেন যিনি আজকের জগতে বিখ্যাত— সোনার মুখোশ এবং প্রচুর ধনরেত্নসহ তাঁর মমি আবিষ্কার।
	তৃতীয় মধ্যবর্তী সময়	লোহার যুগের সূচনা।
৬৬৪ থেকে	পরবর্তী যুগ	রাজশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে।
৩৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ		৬৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আসিরীয়দের আক্রমণ। এরপর আকিমিনিয়ার আক্রমণ ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মুদ্রার প্রচলন।
৩৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ		আলেকজান্ডারের আক্রমণ।
৩৩২ থেকে	টলেমির যুগ	মিশরে গ্রীক শাসন প্রতিষ্ঠিত। বহু
৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ		পর্যটক এবং বণিক সওদাগরদের আক্রমণ। এশিয়া এবং গ্রীসের পন্ডিতদের মিশর সম্বন্ধে আগ্রহ। গ্রীক ভাষায় মিশরের ধর্ম ও ইতিহাসের কাহিনী রচনা। খ্রীষ্টধর্মের প্রসার।
৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ	রোমান এবং বাইজানটাইন যুগ	সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যে মিশরের প্যাপিরাস সরবরাহ হ'ত। ৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হিয়ারোগ্লিফিক লিপির আর ব্যবহার হ১য় না। ইসলামের আবির্ভাব।

৬.৬ হরপ্পার নগর সভ্যতা

সাধারণ মানুষের বসতি সংক্রান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সীমিত বলে মিশরের ইতিহাস রচনায় লিখিত উপাদান এবং স্থাপত্য নিদর্শনই মূল আধারের কাজ করে। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সভ্যতার ইতিহাস রচনায় কিন্তু পুরোটাই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ওপর নির্ভর করতে হয়। হরপ্পার মানুষ লিখতে জানত, কিন্তু সেই লেখার পাঠোদ্ধার আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সুমেরীয়, মিশরীয় এবং আক্কাডীয় লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে দুটি ভাষায় রচিত লিপির মাধ্যমে। এর মধ্যে একটি ভাষা আধুনিক পন্ডিতের জানা, ফলে তারই

মাধ্যমে অজানা লিপিটির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। হরপ্পার ক্ষেত্রে এরকম দুটি ভাষায় লেখা কোন লিপি পাওয়া যায়নি। ফলে হরপ্পার ভাষার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয়নি। যা কিছু লিপি পাওয়া গেছে, সেগুলি ছোট ছোট সীলমোহর, মৃৎপাত্র বা তামার পাতের ওপর লেখা।

মেসোপটেমিয়া বা মিশরের সঙ্গে আরেকটি পার্থক্য হ'ল যে হরপ্পার অঞ্চলগুলিতে কোন বড় মন্দির বা বিশাল সমাধিসৌধ পাওয়া যায়নি। অনুমান করা যেতে পারে যে, হরপ্পা সংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠানগুলি কোন নির্দিষ্ট মন্দির বা গৃহের মধ্যে হ'ত না। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রাচীন হিন্দু ধর্মেও পূজা বা ধর্মীয় যজ্ঞানুষ্ঠান গুপ্ত যুগ পর্যন্ত কোন মন্দিরগৃহে অনুষ্ঠিত হ'ত না। মৃত্যু সম্বন্ধে হরপ্পাবাসীদের ভিন্ন চিন্তাধারার ফলে কোন মৃত রাজার জন্য সমাধি সৌধ গড়ে উঠেনি।

হরপ্পার সমাজব্যবস্থায় রাজার কোন অস্তিত্ব ছিল কি? এই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবে মনে আসতে পারে। অনুমান করা যেতে পারে রাজা বা ঐ ধরনের নেতৃস্থানীয় নিশ্চয় কেউ ছিল। আগে শহর এবং সভ্যতা গড়ে ওঠার সূচনায় অর্থনীতির জটিল বৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে। হরপ্পায় প্রকৃত অর্থেই শহর গড়ে ওঠে। (যেখানে কারিগররা সীলমোহর, ধাতুর জিনিসপত্র, ঝিনুকের বালা ও পুঁতির মালা তৈরী করত।) হরপ্পায় একটি উন্নত মানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগস্বরূপ ছিল (প্রমাণ—হরপ্পায় সর্বত্র একই মাপের ওজন ব্যবস্থার অস্তিত্ব)। এই ধরনের সুগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রাখা দক্ষ শাসক ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু হরপ্পায় শাসকদের উপস্থিতি প্রমাণ করে এমন কোন রাজকীয় সমাধিসৌধের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পায় কোন বাড়ির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি—যা পাওয়া গেছে তা হ'ল দুটি বিশাল অঞ্চল যা রাজপ্রাসাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

তবু হরপ্পার কিছু কিছু অঞ্চলে এমন একটি বিশেষত্ব দেখা গেছে যা সুমের বা মিশরে নেই।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা এবং আরো কিছু কিছু স্থানে একটি বিশেষ এলাকা ছিল যা কৃত্রিমভাবে তৈরী করে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা ছিল এবং বাড়িঘরগুলি আবাসগৃহের মত ছিল না। এই অংশগুলিকে বলা হয়েছে দুর্গ। মহেঞ্জোদারোতে স্নানাগার, শস্যাগার এবং স্তম্ভবিশিষ্ট সভাগৃহ এই নগরদুর্গের এলাকায় রয়েছে। লোথালে দুর্গের এলাকার ভিতর একটি বড় গুদামঘরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কালিবঙ্গানের দুর্গ এলাকায় বড় একটি আচার-অনুষ্ঠান পালনের প্রাঙ্গণ পাওয়া গেছে। অতএব মনে করা যেতে পারে হরপ্পার এই নগর-দুর্গগুলি সুমেরের সুরক্ষিত প্রাসাদগুলির সমতুল্য যেখানে রাষ্ট্রীয় উৎসব এবং আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালিত হ'ত। একটি সমস্যা কিন্তু থেকেই যায়। হরপ্পার শাসকরা নিজেদের বাসস্থান ও শাসন কেন্দ্রকে সুরক্ষিত করে শহরের অন্য বাসিন্দাদের থেকে আলাদা করে রাখত কেন? এ প্রশ্নের সঠিক এখনও পাওয়া যায়নি। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন শাসকরা হয়ত বিদেশী ছিল, এবং সেই কারণে তারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য পৃথক এবং স্বতন্ত্র করে রাখত। অন্যদের মতে নগরের দুর্গ এলাকাগুলি যুদ্ধের সময় সহজেই প্রতিরক্ষাব্যূহ হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত।

মানচিত্র ৫

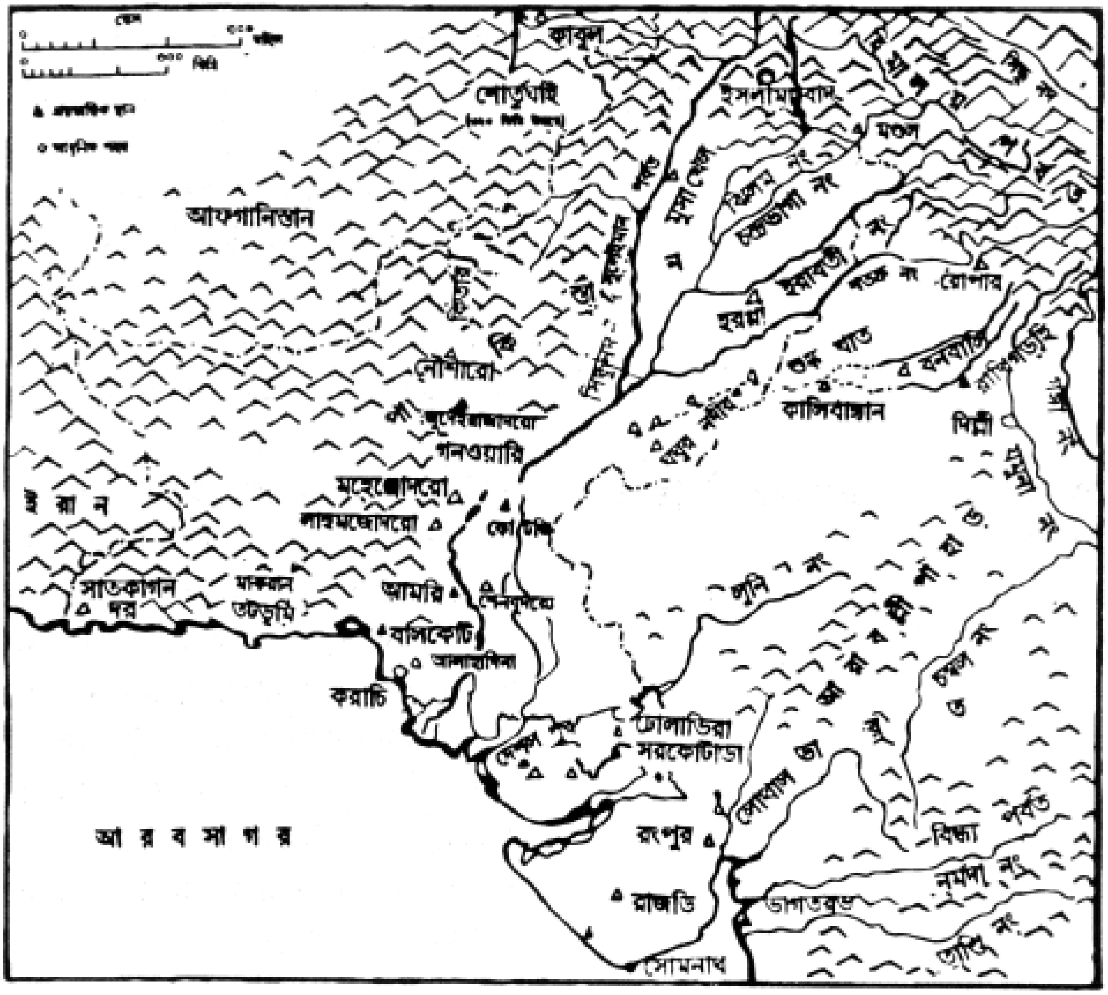

মানচিত্রে আমরা দুটি বড় শহর এলাকা দেখতে পাই। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা। এছাড়া আছে গানওরিওয়ালা। এই এলাকাটি প্রায় হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর মত বড়, কিন্তু এখানে খনন শুরু হয়নি। গানওরিওয়ালার চারপাশে ঘন বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। মানচিত্র দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে হরপ্পার কেন্দ্র-বিন্দু ছিল সরস্বতী নদীর অববাহিকা অঞ্চল। তৃতীয় সহস্রাব্দে সরস্বতী সিন্ধুনদের একটি প্রধান উপনদী ছিল। আরেকটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করি যে পাঞ্জাবের তুলনায় সিন্ধুপ্রদেশে এবং কাথিয়াবাড়ের তুলনায় কচ্ছে বেশী বসতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। দূরের এলাকাগুলির মধ্যে মাক্‌রান, দক্ষিণ গুজরাটের উপকূলের সমতল অঞ্চল, উচ্চ চেনাব, শতদ্রু নদীর অববাহিকা, বেলুচিস্তান এবং উত্তর আফগানিস্তানে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

তালিকা—৩ : উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সময়ানুক্রম

৫৫০০ থেকে ৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	নিওলিথিক যুগ	মেহেরগড় থেকে শুরু হয়ে বেলুচিস্তানে এবং সিন্ধু অববাহিকায় কৃষি এবং পশুপালন বৃত্তির সূচনা। গম, যব, খেজুর, তুলোর চাষ ও গরু, ছাগল, ভেড়ার পালন। (একক ৫ দেখুন) মাটির বাড়ি, পাথরের ধার দেওয়া কুঠার, মৃৎপাত্র, শস্য পেষার জাঁতা এবং হাড়ের তৈরী জিনিসপত্রের ব্যবহার। মৃৎপাত্রের প্রচুর নিদর্শন—ঝিনুক, টারকোয়াজি, লাপিস লাজুলি—এইসবপাথরের অলঙ্কার পাওয়া গেছে মেহেরগড়ে।
৩৫০০ থেকে ২৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	সিন্ধু সভ্যতার আদিযুগ	পার্বত্য এবং সমতল অঞ্চলে বসতির নিদর্শন। তামার ব্যবহারের শুরু। চাকা এবং লাঙ্গলের প্রথম ব্যবহার শুরু হয়। কিছু সীলমোহর পাওয়া যায়। সম্ভবত আদান-প্রদান বা মালিকানার চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। মেহেরগড়ে গোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য শস্যাগার। বসতিগুলি প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করা হ'ত। মেহেরগড় এবং রহমান ডেরায় অন্য জায়গা থেকে আমদানিকৃত জিনিসপত্র পাওয়া গেছে।
২৬০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	উন্নত হরপ্পা সংস্কৃতির যুগ	একই ধরনের তামা, ব্রোঞ্জ এবং পালিশ করা পাথরের যন্ত্রপাতির উদ্ভব। ৪:২:১ মাপের বড় আকারের ইঁট, পাথরের ওজন, সীলমোহর, শাঁখের তৈরী বালা, কার্নেলিয়ান রত্নপাথরের মালা, মূর্তি, নগরদুর্গ, পরিকল্পিত নগর, পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শন। (বই দেখুন) এইসব নমুনার নিদর্শন পাওয়া গেছে সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে সিন্ধু প্রদেশে, শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে, কচ্ছ, কাথিওয়াড়, দক্ষিণ গুজরাটের উপকূল অঞ্চলে, চেনাব নদীর উচ্চ অববাহিকায়, আফগানিস্তান এবং মাক্রান উপকূলে।
১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে	আঞ্চলিক সংস্কৃতিসমূহ	হরপ্পার বহু এলাকা এইসময় পরিত্যক্ত হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক আদান-প্রদানও কমে আসছে। তুলনামূলকভাবে অনুন্নত, আঞ্চলিক সংস্কৃতির নমুনা দেখা যায় সিন্ধু প্রদেশে, নিম্ন পাঞ্জাবে, শতদ্রু যমুনা বিভাজন অঞ্চলে এবং গুজরাটে। লিখিত লিপি ও নগরজীবন পরিত্যক্ত। সীলমোহর ও ওজনের ব্যবহার কম। তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার ছিল। স্বল্প ও নিম্নমানের কারুশিল্প।

হরপ্পার অধিবাসীরা এতদূর এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল কেন? এর কারণ সম্ভবত অর্থনৈতিক। যেমন, শরতুঘাই-এর বসতি সিন্ধুনদ থেকে বহুদূরে। এশিয়ার যে সব অঞ্চলে লাপিস লাজুলি (নীলরত্ন পাথর) পাওয়া যেত সেই অঞ্চলের কাছাকাছি ছিল। শতদ্রু এবং চেনাব নদী যেখানে নাব্য সেখানে মাণ্ডা ও রোপার অবস্থিত। সম্ভবত উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে ভাল কাঠ এইসব নদীপথে মধ্য সিন্ধু অঞ্চলে নিয়ে আসা হ'ত। ভগতরভ পশ্চিমঘাট পর্বতের সেগুন গাছের জঙ্গলের কাছে অবস্থিত। অনুর্বর মাক্‌রান উপকূল অঞ্চলে দুটি বন্দর তৈরী হয়েছিল শুধু এই কারণে যে সেখানে পশ্চিম ভারত এবং সিন্ধু অঞ্চলের মত মৌসুমী ঝড় জল এবং সমুদ্রের তীব্র স্রোত ছিল না।

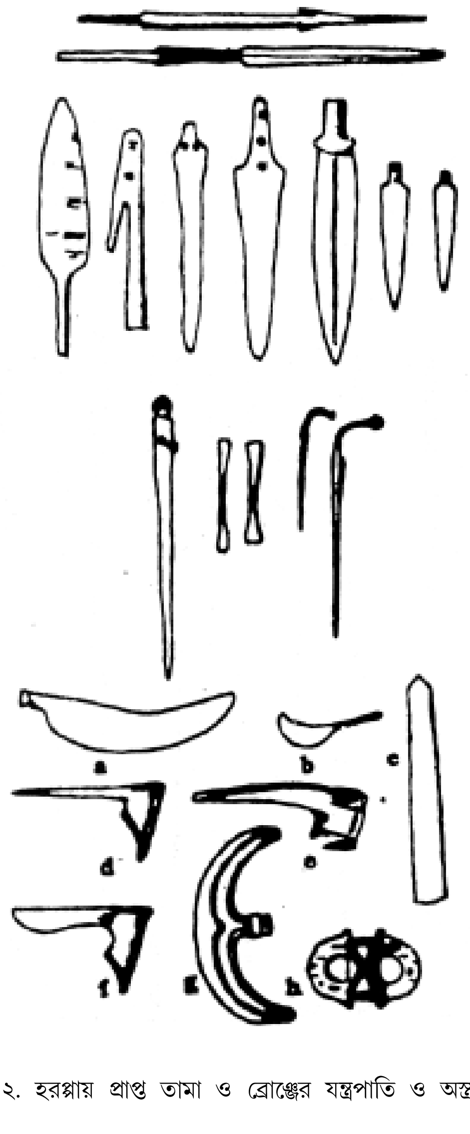

১২. হরপ্পায় প্রাপ্ত তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র

হরপ্পার মানুষদের মানুষদের বন্দরের প্রয়োজন ছিল। মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে তাদের নিয়মিত এবং ব্যস্ত বাণিজ্য ছিল। মেসোপটেমিয়ার লিখিত বিবরণে 'মেলুহুয়া'র নৌকার উল্লেখ আছে। 'মেলুহুয়া' ছিল কৃষ্ণকায়দের দেশ, এখানে ময়ূর, সোনা, লাপিস লাজুলি এবং ভাল কাঠ পাওয়া যেত। ২৬০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে সুমেরে বহু এলাকায় শাঁখের তৈরী জিনিস, হরপ্পার সীলমোহর, ওজন, পাথরের মালা, যেগুলি একমাত্র হরপ্পাতেই তৈরী হ'ত, পাওয়া গেছে। শাঁখ, ঝিনুক ভারতীয় উপকূলেই পাওয়া যায়। সুমেরে পাওয়া কিছু কিছু বাণিজ্য সংক্রান্ত লিপিতে সমুদ্রের ওপার থেকে নিয়ে আসা বাণিজ্যিক পণ্যের কথা বলা হয়েছে। সুমের থেকে রপ্তানি হ'ত, প্রধানত শস্য, তেল, সূতীর কাপড় এবং রুপো। মহেঞ্জোদারোতে প্রচুর পরিমাণে রুপোর বাসনপত্র পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয় সুমের থেকে রুপো আমদানি হ'ত। সুমেরীয়রা আবার তুরস্ক থেকে রুপো এনে সেই রুপো রপ্তানি করত।

হরপ্পার শহরগুলি সুমেরের শহরের মত অত বড় ছিল না। সুমেরের শহরগুলি কোন পরিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠেনি। হরপ্পার শহরগুলি কিন্তু নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছিল। এখানে আবাসগৃহগুলি চওড়া ও সরু রাস্তার সংযোগস্থলে আয়তক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

মহেঞ্জোদারোতে বহু শতাব্দী ধরে মানুষের বসবাস ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে নগর পরিকল্পনার কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়নি। একেবারে শহরের অন্তিম সময়ে পরিবর্তন আসে, তার আগে নয়। আরেকটি জিনিস লক্ষণীয় যে শহরের সমস্ত বাড়ি তৈরীতে একই মাপের ইঁট ব্যবহৃত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, বাড়ির মালিকরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে নিজের বাড়ির জন্য ইঁট তৈরী করত না; ইঁট তৈরীর বিশাল সুগঠিত কারখানা ছিল। মহেঞ্জোদারোতে চমৎকার পয়ঃপ্রণালীর নমুনা পাওয়া গেছে। নগর পরিকল্পনা, রাস্তার নর্দমা, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি প্রমাণ করে যে শহরবাসী শহুরে জীবনের ন্যূনতম সুযোগসুবিধার অধিকারী ছিল।

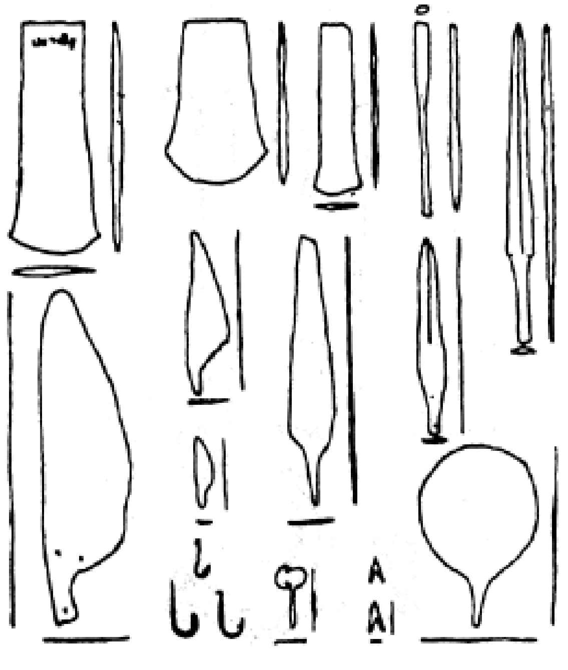

১৩. মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র

হরপ্পার প্রায় সর্বত্র সাধারণ অথচ বহুল প্রচলিত প্রযুক্তির নমুনা পাওয়া গেছে যেমন, লম্বা পাথরের ছুরি বা তলোয়ারের ফলা (কেবলমাত্র সিন্ধু অঞ্চলে পাওয়া একরকম বিশেষ পাথরের তৈরী), খুব সাধারণ তামার বা ব্রোঞ্জের তৈরী কুঠার, মাছ ধরার বঁড়শি, পাথর কাটার যন্ত্রপাতি, চাকাওয়ালা গাড়ি এবং খুবই শক্তপোক্ত, ভারী ও বিভিন্ন ধরনের মাটির বাসনপত্র। এইসব দেখে মনে হয় হরপ্পার অধিবাসীরা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বড় কিছু উদ্ভাবক ছিল না। (তাদের তৈরী ধাতুর জিনিসপত্র সুমেরীয় ধাতুর জিনিসপত্রের থেকে অনেক নিকৃষ্ট)। কিন্তু একটি অত্যন্ত দক্ষ, কার্যকরী, শ্রম ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এদের ছিল। যার ফলে যন্ত্রপাতি, অলঙ্কার, গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যাই হোক না কেন, মাত্র নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় তৈরী হয়ে সেগুলি সর্বত্র—শহর এবং গ্রামে (এমন কি সুদূর গুজরাটে যেখানে আদি কৃষি ব্যবস্থার কোন চিহ্ন ছিল না, তামা বা ব্রোঞ্জ শিল্প বা নগরজীবন তো দূরের কথা) পৌঁছে দেওয়া হ'ত।

সুমেরীয় এবং মিশরীয় সভ্যতা শাসকবংশগুলির উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে প্রায় ২০০০ বছর টিকে ছিল; হরপ্পা সভ্যতা কিন্তু মাত্র ৬০০ বছরের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়। শহরে এবং গ্রাম এলাকায় বহু বসতি পরিত্যক্ত হয়। লেখার কাজ বিস্মৃত হয়। ধাতুশিল্প, সীলমোহর খোদাই, পুঁতির মালা তৈরীর অবসান ঘটে। কিছু মানুষ সম্ভবত সরস্বতী নদীর দিকে এগিয়ে নতুন গ্রামবসতি স্থাপন করেছিল। সিন্ধু অঞ্চলে হরপ্পার আদি বসতিগুলিতে অন্য ধরনের মানুষেরা এসে বসবাস শুরু করে। গুজরাটের বসতিগুলি বজায় থাকলেও বৈদেশিক বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। ওজন ব্যবস্থার কথাও লোকে ভুলে যায়। শহরগুলিতেও আর কোন মানুষ থাকে না।

এই অবক্ষয় রহস্যজনক—কেন হয়েছিল কেউ জানে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় কি অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও জনহীনতার কারণ হয়েছিল? অথবা কৃষি কি এতই অনুন্নত ও অনগ্রসর ছিল যে শুধুমাত্র বাণিজ্য দিয়ে অর্থনীতিকে ধরে রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। এ কথা বলা যায় কি যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ওপর অত্যধিক নির্ভরতাই পতনের কারণ? শাসকশ্রেণীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পতনও আসন্ন হয়ে উঠেছিল। নগর শাসনব্যবস্থা, বাণিজ্যিক বিস্তার, প্রযুক্তি শিল্প সবই ভেঙ্গে পড়েছিল।

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখনও গবেষকরা খুঁজছেন।

অনুশীলনী—২

১) প্রাচীন মিশরীয়দের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের ওপর পিরামিড কি আলোকপাত করেছে? টীকা লিখুন।

....

....

....

....

....

....

....

২) হরপ্পায় নগরসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

৬.৭ সারাংশ

মেসোপটেমিয়া, মিশর, মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার নদীভিত্তিক সভ্যতার সূচনা হয় কৃষির উদ্ভবের সঙ্গে, স্থায়ী বসতি শুরু হওয়ার ফলে। এমনিতে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের উদ্ভব, রাজনৈতিক সংগঠন, গোষ্ঠী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং নগরসংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এছাড়া বাণিজ্যের প্রসার, অধিক মাত্রায় লেখার ব্যবহার, কারুশিল্প, ধর্ম, সংস্কৃতি, শাসনব্যবস্থা এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের আবির্ভাব হয়েছিল। এইসব লক্ষণগুলিই মেসোপটেমিয়া, মিশর এবং হরপ্পায় দেখা যায়। শিল্প, স্থাপত্য, সংস্কৃতিতে এই সভ্যতাগুলির অবদান অসীম। সুমেরের রাজাদের বিশাল মন্দির এবং প্রাসাদ, ফ্যারাওদের পিরামিড এবং হরপ্পা সংস্কৃতির নগরদুর্গগুলি এর প্রমাণ। লেখা, হিসাব রাখা এবং প্রেরণের ক্ষেত্রে নূতন প্রযুক্তির উদ্ভব হয়। অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নদীর অববাহিকাগুলি প্রাকৃতিক কতকগুলি সুবিধা এনেছিল যেমন, জলসেচ, নদীপথে সহজ যাতায়াত, কৃষি ও বাণিজ্যের প্রসার। এর ফলে সম্পদ গড়ে উঠে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয় এবং উন্নত মানের সভ্যতার বিকাশ ঘটে। কিছুকাল পরে সভ্যতাগুলি বিলুপ্ত হয় এবং এই বিলুপ্তির কারণ আজও অনুমেয়।

৬.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

শিল্প সামগ্রী ঃ মানুষের হাতে তৈরী জিনিস।

লুণ্ঠিত সম্পদ ঃ যুদ্ধে জয়লাভের পর বিজিত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত সম্পদ।

সময়ানুক্রম ঃ সময়প্রবাহের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পর পর সাজানো।

নগরদুর্গ ঃ সমতল থেকে উঁচু জায়গায় তৈরী দুর্গ।

আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন ঃ জাতিকেন্দ্রিক অহমিকা, আঞ্চলিকতা ও গোঁড়ামিমুক্ত।

ভূসম্পত্তি ঃ মালিকানাভিত্তিক কৃষিজমি বা বাড়ি।

চিত্রলিপি ঃ চিত্রের মাধ্যমে অক্ষর লিপিমালা।

প্রাচীন লিপি	ঃ	দেওয়াল বা স্তম্ভের ওপর খোদিত লেখা।
বৈধকরণ	ঃ	ন্যায্য হিসেবে স্বীকৃতি।
সহস্রাব্দ	ঃ	এক হাজার বছর।
বিস্তৃত প্লাবন	ঃ	পৃথিবী পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়া বন্যার জল।

৬.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১) ৬.২ অংশ দেখুন।
২) (গ)
৩) (খ)
৪) ৬.৪.১ অংশ দেখুন।
৫) (গ)

অনুশীলনী—২

১) ৬.৫.১ অংশ দেখুন।
২) ৬.৬ অংশ দেখুন।

একক ৭ ❐ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ প্রস্তাবনা

৭.২ দাসপ্রথা

- ৭.২.১ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দাসপ্রথা
- ৭.২.২ দাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা ও কৃষক সমাজ

৭.৩ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উত্তরণ

- ৭.৩.১ সামন্তপ্রথা সম্পর্কে হেনরী পিরেনের মত
- ৭.৩.২ মার্ক ব্লকের মত
- ৭.৩.৩ সামন্তপ্রথা সম্পর্কে পেরি এ্যান্ডারসনের মত

৭.৪ সামন্তপ্রথার বিকাশ

- ৭.৪.১ সামন্তপ্রথায় শ্রমের রূপ
- ৭.৪.২ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা
- ৭.৪.৩ ভূস্বামী শ্রেণি

৭.৫ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির গতিশীলতা

- ৭.৫.১ জনসংখ্যার বৃদ্ধি
- ৭.৫.২ বাণিজ্য ও নগরায়ণ
- ৭.৫.৩ নতুন অর্থনীতির বিকাশ

৭.৬ সামন্তপ্রথার অবক্ষয়

- ৭.৬.১ শ্রমিকের অভাব
- ৭.৬.২ কৃষক বিদ্রোহ

৭.৭ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সামন্তপ্রথা

৭.৮ সারাংশ

৭.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৭.১০ উত্তরমালা

৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা দাসপ্রথা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা তৈরী করব। পরে আমরা ইউরোপ ও ভারতে সামন্তব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব। এই একক পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- দাসপ্রথা কি এবং এই প্রথার বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।
- ইউরোপে সামন্তপ্রথার উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।
- সামন্তপ্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য।

- এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি এবং তারা কিভাবে এই সমাজকে গতি দিয়েছিল; এই ব্যবস্থার অবক্ষয়ের কারণসমূহ এবং
- ভারতে সামন্তব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি।

৭.১ প্রস্তাবনা

আসিরীয়, মিশরীয়, ব্যবিলনীয় এবং সিন্ধু সভ্যতা দাস-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার ওপরে নির্ভরশীল ছিল না; কারণ ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কে তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

প্রাচীন গ্রীসেই প্রথম দাসব্যবস্থাকে একটি যথাযথ উৎপাদনের ভিত্তিতে পরিণত করা হয়েছিল। রোমের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। অন্য ধরনের শোষণের তুলনায় তুলনায় উদ্বৃত্ত আহরণের পদ্ধতি হিসেবে দাসব্যবস্থা অনেক বেশী কার্যকর ছিল। দাস শ্রমের একটি বড় সুবিধা ছিল যে দাসেরা সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি পেত। দাসপ্রথার তিনটি মূল উপাদান ছিল ঃ

(১) দাসকে সম্পত্তি রূপে গণ্য করা।

(২) দাসের ওপরে প্রভুর সার্বিক আধিপত্য,

(৩) দাসের আত্মীয়পরিজন না থাকা।

যুদ্ধ এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে গ্রীস ও রোম দাস জোগাড় করত। দাসপ্রথা বেশ কিছুদিন ধরে বজায় ছিল, যদিও মাঝে মধ্যেই বিদ্রোহ হ'ত। এছাড়া সংস্কারের কিছু প্রচেষ্টাও হয়েছিল। এর পরে দাস-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। বড়-বড় যুদ্ধ এবং রাজ্যজয় বন্ধ হলে, দাস সংগ্রহের উপায় বন্ধ হয়ে যায়। দাসেরা ক্রমশ ভূমিদাস অথবা গৃহভৃত্যে রূপান্তরিত হয়। পুরনো ব্যবস্থার স্থলে উদ্ভব হয় সামন্তপ্রথার।

ঐতিহাসিকেরা পশ্চিম ইউরোপে যে সমাজকে সামন্ততান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করেছেন, তার উদ্ভব হয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে। 'ফিউডাল' কথাটি অবশ্য ব্যবহৃত হতে শুরু করে নবম শতকে। উল্লেখযোগ্য, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বিষয়ে যথাযথ চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে।

পণ্ডিতেরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্বেরও উপস্থাপনা করা হয়েছে।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অর্থনীতি ক্রমশই গ্রামভিত্তিক হয়ে পড়ে। কৃষিতে নূতন প্রযুক্তি ব্যবস্থাও শুরু হয় এবং ভূমিদাস নামে এক নতুন শ্রেণির উৎপত্তি হয়। ভূমিদাসের অবস্থা প্রাচীন যুগের 'দাস'দের থেকে আলাদা ছিল। তারা দাসদের মত উৎপাদনের উপাদানসমূহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল; আবার উৎপাদনের উপায়গুলির ওপরে তাদের সম্পূর্ণ মালিকানাও ছিল না। প্রাচীন যুগের 'দাস' ও শিল্পভিত্তিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুক্ত মজুরী শ্রমিকের ছিল ভূমিদাসের অবস্থান। সামন্তপ্রভুর সঙ্গে ভূমিদাসরা বাঁধা ছিল। 'প্রভু' ও 'ভূমিদাস'দের সম্পর্ক পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত হ'ত।

ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নিজস্ব গতি ছিল। কৃষির সম্প্রসারণের ফলে খাদ্যোৎপাদন বেড়েছিল। এই প্রক্রিয়া একদিকে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল, তেমনি অন্যদিকে 'উইন্ডমিল' (যা হাওয়ায় চলে) বা ওয়াটারহুইল (যা জলে চলে)-এর মত নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারেও উৎসাহ জুগিয়েছিল। উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা ইউরোপের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে জঙ্গল পরিষ্কার ও বিপুল পরিমাণ জমিকে চাষযোগ্য করা সম্ভব হয়েছিল। ক্ষুদ্র কৃষকেরা এবিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সামন্তপ্রভুরাও কিছু অর্থের

বিনিময়ে ভূমিদাসদের মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিল। এই পদ্ধতিকে 'কমিউটেশন' বলা হ'ত। মুক্ত ভূমিদাসেরা এভাবে কৃষকে রূপান্তরিত হ'ল। কিন্তু কৃষি ব্যবস্থা মূলধন-নির্ভর ছিল বলে অল্পসংখ্যক কৃষকই স্বাধীন কৃষক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। বেশির ভাগ মানুষই তাদের ধার করা মূলধনও ব্যয় করে ফেলত। এই প্রক্রিয়া সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অপরিচিত ছিল এবং এর ফলে ক্রমশ ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

ভারতের ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা ইতিহাসের একটি যুগকে সামন্ততান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করেছেন। এ সময়ে বাণিজ্যের অবনতি হয়েছিল এবং মুদ্রা সংকট দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় রাষ্ট্র ব্রাহ্মণদের এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ভূমিদান করতে উৎসাহিত হ'ত যাতে অর্থনীতির সম্প্রসারণ সম্ভব হয়। এই শ্রেণির মানুষ কৃষকদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন করতেন এবং এভাবে সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে। অবশ্য প্রকৃতার্থে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভারতবর্ষে ছিল কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

৭.২ দাসপ্রথা

সামন্তপ্রথা সম্পর্কে আলোচনার আগে দাসপ্রথা এবং দাস-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে আর একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। তবেই দাসপ্রথা থেকে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাসপ্রথায় রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সম্যক বোঝা যাবে। বলা বাহুল্য এই প্রক্রিয়া বেশ কিছু সময় ধরে ঘটেছিল।

দাসব্যবস্থার সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে—এটি এমন এক ব্যবস্থা যেখানে একজন মানুষ আর একজন মানুষের ক্ষমতার সম্পূর্ণ অধীন এবং এই ব্যবস্থা স্বভাবতই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। এটা বোঝা প্রয়োজন যে দাস বস্তুত প্রভুর ব্যক্তিগত 'সম্পত্তি' হিসেবেই গ্রাহ্য হ'ত। এর ফলে দাস-ভিত্তিক সমাজে দাসকে একটি পণ্য হিসেবেই গণ্য করা হ'ত। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল দাসকে 'হৃদয়কে সম্পত্তি' বলে অভিহিত করেছিলেন। দাস ও তার প্রভুর সম্পর্ক আত্মীয়তা বা কোনও নির্দিষ্ট চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত হ'ত না। জন্মসূত্রে ঋণপ্রাপ্তি বা দাসত্বের অন্যান্য শর্তের ভিত্তিতেই দাস ও প্রভুর সম্পর্ক নিরূপিত হ'ত। দাসেদের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। তাদের নিজেদের পছন্দমত কর্মের বিষয়েও কোন স্বাধীনতা ছিল না।

সমস্ত মানবসমাজেই একটা সময়ে কোনও না কোন ভাবে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দাস-শ্রমের তাৎপর্য এবং দাসেদের সংখ্যা সর্বাধিক ছিল গ্রীস ও রোমের সমাজে। এই সমাজগুলিতে দাসপ্রথা প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে পড়েছিল যার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে দাসদের শ্রমিকরূপে নিয়োগ করা হ'ত। দাস-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাই এই সভ্যতাগুলির অভ্যুদয়ের ভিত্তি তৈরী করেছিল। এবং এই ব্যবস্থার বিকাশ ও পরবর্তী অবক্ষয়ই নির্ধারণ করেছিল এই সভ্যতাগুলির বিকাশ ও পতনকে। এই সমাজগুলি দাস-ভিত্তিক সমাজরূপে পরিচিত ছিল, দাস-শ্রমের ওপরে তাদের প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরতার জন্য।

দাসদের সংগ্রহ করা ও তাদের ব্যবহার :

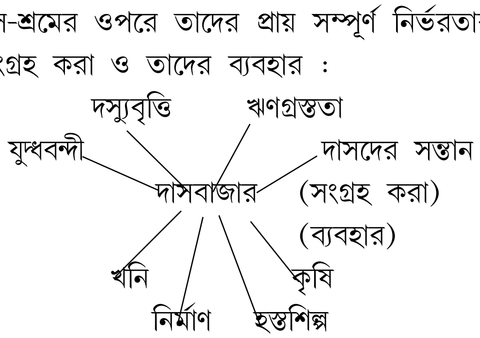

দাস-শ্রমের তাৎপর্য নিহিত ছিল দুটি পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্যে :

(ক) এই ব্যবস্থায় শ্রমকে এমন নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যে মানুষকে উৎপাদনের একটি নিছক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হ'ত, অন্যান্য নির্জীব জিনিসের মতই। দাসেদের কোনও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে রোমের আইনে কৃষিতে নিযুক্ত দাসকে ইন্সট্রুমেন্টাল ভোকাল অর্থাৎ কথা বলে এমন যন্ত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রম আদায়ের সব থেকে নির্মম উপায় হিসেবেই দাসপ্রথা বিকশিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় একজন মানুষ তার শ্রম বিক্রয় করত না বরং সে নিজেই হয়ে যেত একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য। তাকে বাজারে কেনা-বেচা করা হ'ত এবং তার প্রভু তাকে বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিয়োগ করত। সাধারণভাবে, দাস-শ্রম ব্যবহার করা হত পরিবহনে, খনিতে, নির্মাণকার্যে এবং কৃষিকাজে।

(খ) দাস-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বেশ বড় রকমের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে শাসক শ্রেণি বিলাসবহুল জীবনযাপনে সক্ষম হয়েছিল এবং তাদের প্রচুর অবসরও ছিল। অন্যদিকে দাসেরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করত। দাসেরা কখনও কখনও এই অমানবিক ব্যবহারের বিরোধিতা করত। প্রায়শই দেখা যেত যে এই জীবন থেকে দাসেরা পালিয়ে যেত বা প্রভুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। এরকম ঘটলে তাদের ওপর নির্মম শাস্তির বিধান হ'ত।

৭.২.১ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দাসপ্রথা

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে দাসপ্রথা ছিল। সংগ্রহের পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের দাস ছিল। যেমন অনেকেই জন্মসূত্রে দাস হ'ত, কারণ তারা দাসের সন্তান ছিল।

দাসরা মূলত গৃহভৃত্য বা কৃষি-শ্রমিকরূপে নিযুক্ত হ'ত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা দাসপ্রথার স্বীকৃতি দেখতে পাই। কিন্তু একই সঙ্গে কৌটিল্য দাসের কাজের শর্ত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং দাসেদের মুক্তির শর্তও বর্ণনা করেছেন। যেমন কোনও মহিলা দাস প্রভুর সন্তানের জন্ম দিলে, সেই সন্তান মুক্ত মানুষরূপে গণ্য হবে। আবার, কোনও দাস অতিরিক্ত শ্রমদান করে কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারত এবং কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাধীনতা ক্রয় করতে পারত। কিন্তু দাসপ্রথা ভারতে দাস-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিণত হয়নি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় সেলুকাসের দূত মেগাস্থিনিস লিখেছিলেন যে 'কোনও ভারতীয়ই দাস নয়' এর কারণ এই যে ভারতে প্রচলিত দাসপ্রথা ইউরোপীয় দাসপ্রথা থেকে এতই পৃথক ছিল যে মেগাস্থিনিস ভারতে প্রচলিত ব্যবস্থাকে চিনতে পারেননি।

৭.২.২ দাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা ও কৃষক সমাজ

দাসপ্রথা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তির আধিপত্যের অধীনস্থ হয় এবং অধীনস্থ ব্যক্তি তার সমস্ত স্বাধীনতা ও অধিকার হারায়। ভূমিদাসপ্রথা প্রাচীন যুগের দাসপ্রথা ও শিল্পভিত্তিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুক্ত মজুর-শ্রমিকের মধ্যবর্তী স্তর। কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষিকাজই বেশীর ভাগ মানুষের জীবনধারণের মূল উপায় ছিল। এই সমাজে ছোট মাপের জমিই স্বাভাবিক। পরিবার ছিল শ্রমের উৎস এবং পরিবারই উদ্বৃত্তের ভোক্তা।

'দাসপ্রথা' ও 'ভূমিদাসপ্রথা' দুটি পৃথক সামাজিক গঠন নয়। সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের দুটি পর্যায়। দাসপ্রথা চূড়ান্ত পর্বে দাস-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিণত হয় কিন্তু ভূমিদাসপ্রথা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অঙ্গ এবং সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অঙ্গ। ঐতিহাসিক বিবর্তনে প্রথমটি পূর্ববর্তী ও দ্বিতীয়টি পরবর্তী পর্যায়।

দাসপ্রথা থেকে সামন্তপ্রথায় রূপান্তর ধীর গতিতেই হয়েছিল। রোমে রাজ্যজয় বন্ধ হলে নতুন দাস সংগ্রহের সম্ভাবনাও বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে সমাজে বর্তমান দাসদের অবস্থার উন্নতি হয়। অভ্যন্তরীণ বাজারে দাস কেনাবেচা বন্ধ হয়ে যায় কারণ দাসের মালিক সমস্ত পরিবারই তাদের অধিকারভুক্ত বংশানুক্রমিক দাসেদের রেখে দিতে বিশেষ আগ্রহী ছিল। এর ফলে দাসেরাও প্রভুর গৃহ বা জমিতে আগের চেয়ে বেশী করে আটকে পড়ে। দাসের জোগান কমে যাওয়ার ফলে মুক্ত শ্রমও পুনর্বাসিত হ'ল। সমাজে মুক্ত মানুষ সব সময়ে কারিগর, সরকারী কর্মচারী ইত্যাদি হিসেবে অবস্থান করত। এরা কখনও কখনও ভাড়াটে শ্রমিক হিসেবে জমিতেও কাজ করত।

রাষ্ট্রের পুনর্গঠন এমনভাবে হয়েছিল যে এতে পেশা ও সামাজিক মর্যাদা নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যেত। এটা অনেকটা ভারতীয় জাতি-ব্যবস্থার মতোই ছিল। এই পরিবর্তনের ফলে মুক্ত মানুষেরা নিজেদের পেশা বা ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। এর ফলে দাস ও মুক্ত শ্রমিকের মধ্যে ব্যবধান কমে আসে। আস্তে আস্তে দাস এবং গৃহভৃত্য বা কর্মশালার শ্রমিকের মতো মুক্ত মানুষ একসঙ্গে ভূমিদাসে পরিণত হয়। অতএব, দাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা ও কৃষিভিত্তিক সমাজ বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার সামাজিক-ঐতিহাসিক সমাজেরই বৈশিষ্ট্য।

অনুশীলনী—১

১) দাসপ্রথা ও দাস-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে প্রভেদ কিভাবে করবেন? পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন।

....
....
....
....
....

২) কিভাবে দাসপ্রথা সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাসে রূপান্তরিত হলো আলোচনা করুন। পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন।

....
....
....
....

৭.৩ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উত্তরণ

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ঐতিহাসিক ব্রুনার (Brunner) সামন্তপ্রথার সামরিক দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এর উৎপত্তি হয়েছিল ঘোড়ায় চড়া রেকাব (Stirrup) থেকে। ৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের (প্রাচীন নাম গল) রাজা চার্লস মার্টেল প্যারী শহরের নিকট ও পইটিয়ার্সের কাছে টুরসের (Tours) যুদ্ধে আরবদের হারিয়ে দেন। কিন্তু তিনি আরবদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারেননি, কারণ তাঁর বাহিনী ছিল মূলত পদাতিক। অন্যদিকে অশ্বারোহী আরবরা খুব তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। মার্টেল অনুধাবন করলেন যে তাঁর সামরিক বাহিনীকে আরো গতিশীল করতে হলে একটি বড়-সড় অশ্বারোহী বাহিনীর প্রয়োজন। কিন্তু পদাতিক বাহিনীর তুলনায় অশ্বারোহী বাহিনীর ভরণপোষণ অনেক বেশী ব্যয়সাপেক্ষ। এর জন্য প্রয়োজন আরো সম্পদের। প্রাক্-আধুনিক যুগে সম্পদের সব থেকে বড় সূত্র ছিল জমি। সুতরাং মার্টেল যাদের হাতে অনেক জমি ছিল তাদের থেকে জমি অধিগ্রহণ করলেন যেমন, চার্চের জমি। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ করেও তাঁর সমস্যার সমাধান হ'ল না। মধ্যযুগের ইওরোপে মুদ্রার অভাব দেখা দিয়েছিল, কারণ বাণিজ্যের অবক্ষয়। সম্পদের অবশ্য অভাব ছিল না। তাই তিনি চার্চ বা ভূম্যধিকারীদের থেকে জমি অধিগ্রহণ করেন। মার্টেল তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে নগদ মুদ্রায় বেতন দিতে সক্ষম হননি, কারণ মুদ্রার অভাব। ফলত, তিনি সৈনিকদের নগদ বেতনের পরিবর্তে জমি বেতন হিসেবে দিতে শুরু করলেন। ব্রুনারের মতে এভাবেই সামন্তপ্রথার উদ্ভব ঘটে।

দীর্ঘদিন ধরে ব্রুনারের এই মতবাদ ঐতিহাসিকদের সমর্থন ও বিরোধিতা লাভ করে। তাঁর যুক্তির সব থেকে দুর্বলতা যে তিনি হাজার বছর ধরে ঘটা একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে একটি মাত্র ছোট কারণ, ঘোড়ায় রেকাব (Stirrup) দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

৭.৩.১ সামন্তপ্রথা সম্পর্কে হেনরী পিরেনের মত

ইতিমধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে ধারণা ক্রমশ আরো পরিণত হয় এবং সামরিক দিক ছাড়াও আরও নানান বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিকদের চোখে ধরা পড়ে। বিংশ শতাব্দীর ২০ ও ৩০-এর দশকে বেলজিয়ামের ঐতিহাসিক হেনরী পিরেন অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে প্রাচীন যুগে ইউরোপের নগরভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ হয়েছিল এবং এর ভিত্তি ছিল দূরপাল্লার বাণিজ্য। এই বাণিজ্য আবার নির্ভরশীল ছিল ভূমধ্যসাগরে সস্তা নৌ-পরিবহনের ওপর। কিন্তু সপ্তম শতকের শেষে এবং অষ্টম শতকের গোড়ায় আরবরা ইউরোপ আক্রমণ করে এবং ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে ছিল পশ্চিমের প্রবেশপথ জিব্রল্টার, সাগরের মধ্যস্থলে সারদিনিয়া এবং পূর্বের প্রবেশপথ আলেকজান্দ্রিয়া (যা তারা ইতিপূর্বেই দখল করে নিয়েছিল)। নৌ-চলাচলের প্রধান কেন্দ্রগুলি বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার ফলে, দূরপাল্লার বাণিজ্য ব্যাহত হয়। অর্থনীতি এর ফলে স্থানীয় বাণিজ্য-ভিত্তিক হয়ে পড়ে এবং অন্তর্মুখী হয়ে গ্রাম-নির্ভর হয়ে পড়ে। পিরেন একেই বদ্ধ অর্থনীতি বলেছেন। একাদশ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ধর্মযোদ্ধারা আরবদের জিব্রল্টার ও সারদিনিয়া থেকে বিতাড়িত করে। এর ফলে আবার দূরপাল্লার বাণিজ্যের নতুন করে বিকাশ ঘটে এবং তার সঙ্গে নগরভিত্তিক অর্থনীতিরও। এবং এর ফলে সামন্তপ্রথারও ধীরে ধীরে অবসান ঘটে। এভাবে পিরেন সামন্তপ্রথা

ও বাণিজ্যের মধ্যে একটি পারস্পরিক ও বিরোধী সম্পর্ক দেখেছিলেন। এই ধারণা সবাই মেনে নেননি এবং তাঁর মত ইউরোপের ইতিহাস চর্চায় এখন আর গ্রাহ্য নয়। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল যেমন, ভারতে ঐতিহাসিকদের ওপরে তাঁর মতের প্রভাব এখনও প্রবল।

৭.৩.২ মার্ক ব্লকের মত

বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর আলোচনায় এই সমাজব্যবস্থার তিনটি দিকই এর স্পর্শ করা হয়েছে—অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক-প্রশাসনিক। তিনি দেখালেন যে পশ্চিম ইউরোপে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণকারীরা এসেছিল। পঞ্চম শতকে জার্মান উপজাতিরা অনেক দূর প্রান্ত থেকে এই অঞ্চলে আসে এবং তাদের আক্রমণের চাপে রোম সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হয়। তাদের পরে আসে আরবরা। এর পরে মগেয়ার এবং দশম শতকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার আক্রমণকারীরা। এই সমস্ত আক্রমণের ফলে সমাজে নিরাপত্তার অভাব ভীষণভাবে অনুভূত হয় এবং অর্থনীতিও বিপর্যস্ত হয়। ফলে মধ্যযুগের ইউরোপে সমাজের প্রায় সব ব্যক্তিই নিরাপত্তা এবং জীবনধারণের সুরক্ষা সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ে। নিরাপত্তা ও জীবনধারণের উপায়ের অন্বেষণ থেকেই তৈরী হয়, মার্ক ব্লক যাকে বলেছেন, পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক। সমাজের সমস্ত অংশই এই ধরনের সম্পর্ক তৈরী করে। কৃষকেরা তাদের জমি স্থানীয় ভূস্বামীকে দিয়ে দেয় নিরাপত্তা ও জীবনধারণের উপায় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে। ভূস্বামী কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেয় এই শর্তে যে তারা প্রভুর জমি বিনা পারিশ্রমিকে চাষ করবে। স্থানীয় ভূস্বামী আবার অনুরূপভাবে তাঁর থেকে ক্ষমতাবান প্রভুর কাছে নিরাপত্তার সন্ধানে নিজের জমি ইত্যাদি সমর্পণ করে। ইনিও স্থানীয় প্রভুর জমি ইত্যাদি তাঁকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু পরিবর্তে স্থানীয় ভূস্বামীকে সামরিক বাহিনীর জন্য লোক জোগাড় করার দায়িত্ব নিতে হয়। এভাবে ছোট ভূস্বামী বা প্রভু বড় প্রভুর (Vassal) সামন্ত হলেন। এভাবেই দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে যতক্ষণ না সমাজে সবাই একজন না একজনের প্রভু বা একজনের সামন্তে পরিণত হয়। কেবল সবার ওপরে ছিলেন রাজা তিনি কারও সামন্ত নন, আর কৃষক কখনই কারো প্রভু ছিল না। এই ভাবেই পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক সৃষ্ট হয় এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও তৈরী হয়।

এই মতগুলিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উদ্ভবের জন্য কোন না কোন নাটকীয় ঘটনাকেই দায়ী করা হয়েছে।

৭.৩.৩ সামন্তপ্রথা সম্পর্কে পেরি এ্যাণ্ডারসনের মত

পেরি এ্যাণ্ডারসনই সামন্তপ্রথাকে সমাজের ভেতরে ঘটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল মনে করেন। তাঁপ মতে সামন্তপ্রথা দুটি বিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থার সংঘাতের ফল। দাস-শ্রমের নির্ভরশীল ইওরোপের প্রাচীন সমাজে ক্রমশই উৎপাদন ব্যবস্থার সংকট দেখা দেয় কারণ ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হচ্ছিল। এর মূল কারণ ছিল দাস-শ্রমের সীমাবদ্ধতা। উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম এমন উদ্ভাবন যা নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে সম্ভব তাতে দাস-শ্রমিকদের অনীহা ছিল। সুতরাং প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতা সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে, জার্মান উপাজাতিগুলির সামাজিক সংগঠন অন্য ধরনের সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল।

সমান অধিকার-ভিত্তিক উপজাতীয় সামাজিক কাঠামো এখানে দুটি কারণে চাপের মধ্যে ছিল—সমাজে স্তরবিভেদ সৃষ্টি হওয়া এবং উন্নত রোমাক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ্য এই দুয়ের সংঘাতের ফলে পঞ্চম শতকে দুই ব্যবস্থারই বিপর্যয় ঘটে এবং সৃষ্ট হয় নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—সামন্তপ্রথা। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, সামন্তপ্রথা সমাজের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জটিল ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। এই প্রক্রিয়া সমাজের সকল স্তরেই দেখা গিয়েছিল। সুতরাং সামন্তপ্রথার উদ্ভব দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল, কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়।

৭.৪ সামন্তপ্রথার বিকাশ

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সামন্তপ্রথা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দাস-সমাজ ও আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যবর্তী স্তর। এবারে আমরা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করব।

৭.৪.১ সামন্তপ্রথায় শ্রমের রূপ

দাস সমাজে প্রভুর জমিতে দাস কাজ করত। দাস কোনও মজুরী পেত না বা জমিতে তার কোনও স্বত্ব থাকত না। জমির ফসল বা নিজের শ্রমের ফসলের ওপরেও তার কোনও অধিকার ছিল না। এমনকি তার নিজের কোনও পরিবারও ছিল না, কারণ তার স্ত্রী বা সন্তানদের আলাদাভাবে বিক্রয় করা যেত। দাসকে কথাবলা যন্ত্র হিসেবেই গণ্য করা হত। প্রায় সরব যন্ত্র (ষাঁড়) বা নীরব যন্ত্র (লাঙল) থেকে তার পার্থক্য ছিল শুধু এই কথা বলতে পারাটাই উৎপাদনের উপাদান, যথা—জমি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ওপরে, বলা বাহুল্য, তার কোনও অধিকারই ছিল না।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও শ্রমিকের উৎপাদনের উপাদানসমূহ, যথা—কারখানা, যন্ত্রপাতি বা কাঁচামালের ওপরে কোনও স্বত্ব থাকে না। যা নিয়ে সে কাজ করে, তার থেকে সে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু শ্রমের বিনিময়ে মজুরী পাবার সে অধিকারী এবং একজন মালিকের পরিবর্তে অন্য মালিক খুঁজে নেবার স্বাধীনতাও তার থাকে। এখানেই এই শ্রমিক প্রাচীন যুগের দাস থেকে আলাদা।

এই দুই অবস্থানের মাঝখানে ছিল মধ্যযুগের ভূমিদাস। ভূমিদাস উৎপাদনের উপায় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল না, আবার এগুলির ওপরে সম্পূর্ণ মালিকানাও তার ছিল না। দাস ছিল সম্পত্তি; তাকে অবাধে বেচা-কেনা করা যেত। কিন্তু ভূমিদাসকে তার জমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিক্রয় করা যেত না। অর্থাৎ, সামন্ত প্রভু যদি জমি কাউকে বেচে দিতেন, তাহলে সেই জমি চাষ করে এমন ভূমিদাসও জমির সঙ্গে হস্তান্তরিত হত। প্রভুর দেওয়া জমিতে ভূমিদাসদের উত্তরাধিকার সূত্রে দখলদারি বা ভোগস্বত্ব থাকত, কিন্তু মালিকানা স্বত্ব থাকত না। এই ভোগস্বত্ব মধ্যযুগীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক উক্তি থেকে বোঝা যায়—কৃষক জমির সঙ্গে বাঁধা থাকে। এই আখ্যার দুটি অর্থ আছে—কৃষক প্রভুর জমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারত না, অন্যদিকে প্রভুও জমি থেকে কৃষককে বিতাড়িত করতে পারত না। তাই, প্রভু জমি বিক্রয় করে দিলেও, কৃষককে সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত না; জমির সঙ্গে ভূমিদাসও নতুন মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হত।

ভূমিদাসদের দায়িত্ব

জমি প্রভুর হলেও, জমির উৎপাদন, নিজের ও তার পরিবারের শ্রমের ফসলের ওপরে কৃষক বা ভূমিদাসের অধিকার ছিল। এবং তার নিজের পরিবারও ছিল। কিন্তু প্রভুর দেওয়া জমি ভোগদখলের পরিবর্তে, ভূমিদাস প্রভুর জমিতে চাষ করতে বাধ্য থাকত। এই জমির ফসল প্রভুর ঘরে যেত এবং এর পরিবর্তে কোন মজুরীও ভূমিদাস পেত না। বলা যায় যে প্রভুর জমি ভোগ করার খাজনা ভূমিদাস এভাবে শ্রমের মাধ্যমেই দিত। এই ব্যবস্থা সেক্ষেত্রেও চালু ছিল, যেক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য কৃষক নিজেই প্রভুর কাছে জমি সমর্পণ করেছিল (যে প্রক্রিয়া আমরা আগে আলোচনা করেছি)। এ ধরনের শ্রমদান তার মোট শ্রমের অর্ধেক ছিল বলে মনে করা যায়।

প্রভু কোন কৃষকদের শ্রম আদায়ের ওপরে জোর দিত, তা আদি মধ্যযুগের পশ্চিম ইওরোপের উৎপাদন ব্যবস্থা আলোচনা করলে আরো ভাল বোঝা যাবে।

৭.৪.২ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা

প্রায় দশম শতক পর্যন্ত পশ্চিম ইওরোপে জমির উর্বরতা বেশ কম ছিল। পণ্ডিতেরা যে আনুমানিক হিসেব করেছেন তাতে দেখা যায় যে বীজ ও উৎপাদনের অনুপাত ছিল ১ : ১ : ৬ বা খুব বেশী হলে ১ : ২ : ৫। এবং প্রত্যেক বছর কৃষিযোগ্য জমির অনেকাংশে চাষ করা হত। বাকী অর্ধেক পতিত হয়ে পড়ে থাকত। এর কারণ, ইওরোপীয় কৃষিতে সারের প্রয়োগ একটি প্রধান অন্তরায় ছিল, যতদিন না রাসায়নিক সারের উদ্ভব হয়।

প্রাকৃতিক কম উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যথেষ্ট কার্যকর প্রযুক্তির অভাব। আদি মধ্যযুগের কৃষক যে ধরনের লাঙল ব্যবহার করত তাতে ভূপৃষ্ঠের শুধু উপর অংশই কর্ষিত হত, গভীরে যেত না। এজন্য একে বলা হত আঁচড় দেওয়া লাঙল। বলদ ব্যবহারের জন্য জোয়ালের যথাযথ ব্যবহার করা যেত না। লাঙল বলদের শিঙে লাগানো হত, তার ফলে জমি গভীরভাবে কর্ষিত হত না। একাজে ঘোড়ার ব্যবহারও বিরল ছিল, কারণ, অপটু জোয়ালের ব্যবস্থা। লাঙলটি ঘোড়ার বুকে আড়াআড়িভাবে লাগানো চামড়ার ব্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকত। ফলে ঘোড়া জোরে টানলে তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হত। অন্যান্য যন্ত্রপাতিও প্রধানত কাঠের তৈরী ছিল এবং সেই কারণে খুব কার্যকর ছিল না।

এর ফলে, জমির ভেতরকার উর্বর মাটি ব্যবহার করা যেত না; বীজ মাটির খুব গভীরে শিকড় গাড়তে পারত না, জমির উপরিভাগেই সীমাবদ্ধ থাকত। এই জন্য বীজ বপনের জন্য দুই সারির বীজের মাঝখানে অনেকটা জমি ফাঁকা রাখা হত যাতে সহজেই শিকড় মাটিতে প্রবেশ করতে পারে। এর ফলে অনেকটা জমি ব্যবহারের প্রয়োজন হত; কিন্তু উৎপাদন হত সেই তুলনায় কম। অনুমান করা হয় যে দশম শতক পর্যন্ত একটি কৃষক পরিবারের নিছক জীবনধারনের জন্যই অন্তত ১০০ একর জমির প্রয়োজন হত। একজন ভূস্বামীর জমিদারির গড় আয়তন ছিল ৪০০০ একর।

এ পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে না যে মধ্যযুগের ইওরোপে কৃষিকার্য ছিল বিশেষ করে শ্রম-নির্ভর।

আবহাওয়ার প্রভাব

এই শ্রম-নির্ভরতার আর একটি দিকও ছিল।

পশ্চিম ইওরোপে সূর্যের আলো পাওয়া যেত চার মাসের মত। এর মধ্যে বীজ বপন, ফসল তোলা, এমনকি শস্য মজুত করা সবই শেষ করতে হত তিন-চার মাসের মধ্যে। অতএব কৃষিকাজের জন্য মোট সময় পাওয়া যেত ১২০ দিন। এজন্যই শ্রমের প্রয়োজন সব থেকে তীব্রভাবে অনুভূত হত এই চার মাস এবং শ্রমকেই খাজনা হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা দেখা দিত। এজন্যই সামন্তপ্রথার সব থেকে বড় বোঝা চাপানো হয়েছিল তাদের ওপরে যাদের শ্রম ছাড়া আর দেবার কিছু ছিল না।

অনুশীলনী—২

১। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের সামরিক ব্যাখ্যা যিনি দিয়েছিলেন তিনি হলেন—(সঠিক উত্তরে দাগ দিন)
(ক) মার্ক ব্লক
(খ) পেরি এ্যান্ডারসন
(গ) ব্রুনার
(ঘ) হেনরী পিরেন

২। সামন্তপ্রভুর জমিদারির গড় আয়তন ছিল—(সঠিক উত্তরে দাগ দিন)
(ক) ১০০০ একর
(খ) ২০০০ একর
(গ) ৩০০০ একর
(ঘ) ৪০০০ একর

৩। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদন কেন কম ছিল?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৭.৪.৩ ভূস্বামী শ্রেণী

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল অল্পসংখ্যক ভূস্বামী প্রভুদের জন্য বিলাসবহুল জীবনের ব্যবস্থা করা। অবশ্যই ভূস্বামী শ্রেণীও কয়েকটি স্তরে বিভক্ত ছিল :

(ক) সব থেকে নীচে ছিল যাদের নাইট (Knight) বলা হত। তাদের সামরিক কাজের পরিবর্তে জমি দেওয়া হত। এই জমি (fief) প্রথমে শুধু সামরিক কর্তব্য করার সময়ের জন্যই দেওয়া হ'ত; পরে অবশ্য এগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করা জমির মতই হয়ে যায়। জমির মালিক জমি চাষ করার জন্য বেগার শ্রম, মজুরী-ভিত্তিক শ্রম বা ভাগচাষী ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতেন।

(খ) ভূস্বামী শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রধান ছিলেন ম্যানরের প্রভু। ম্যানর (Manor) বা ভূস্বামীর জমিদারির গড় আয়তন ছিল ৪০০০ একর। মোট এলাকা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল—ডিমিন (demeane) বা খাস-জমি; টেনেমেন্ট (tenement) বা ভূমিদাসদের ব্যবহারের জমি এবং ওয়েষ্ট (waste) বা পতিত জমি। খাস-জমি ও টেনেমেন্ট চাষ করা হ'ত এবং পতিত জমিতে থাকত বনাঞ্চল বা চারণভূমি, যাতে সমস্ত মানুষেরই অধিকার থাকত। খাস-জমির উৎপাদন যেত প্রভুর বাড়ীতে এবং টেনেমেন্টের ফসল পেত ভূমিদাসেরা। খাস-জমি ও টেনেমেন্ট পুরো জমিদারি জুড়ে ছোট ছোট ভাগে ছড়িয়ে থাকত।

(গ) স্তর বিভক্ত কাঠামোর ওপরে ছিল এমন প্রভু যাদের ক্ষমতা আসত জমির ওপরে নিয়ন্ত্রণ থেকে। তাঁদের ক্ষমতার চৌহদ্দির মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের ওপরে তারা ইচ্ছামত অতিরিক্ত অর্থও দাবী করতে পারত। ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যে এঁদের নিয়ন্ত্রণই ছিল সব থেকে বেশী সম্পদ।

প্রথা অনুযায়ী কৃষকদের ওপর আরোপিত দায়িত্ব থেকেই কৃষকের ওপরে প্রভুদের ক্ষমতা নির্ধারিত হত। বিচার ব্যবস্থা বা সামাজিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করত আইনের পরিবর্তে প্রথার ওপরে। কিন্তু প্রথা এবং দায়িত্ব সম্পর্কিত ধারণা ছিল শিথিল এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার ওপরে নির্ভর করত। দশম শতক থেকে উচ্চ শ্রেণীর ভূস্বামী প্রভুরা বিচারের দায়িত্ব ক্রমশ নিজেদের হাতে নিয়ে নেন এবং এর ফলে তাঁদের কাছে কৃষকের অধীনতা প্রায় সম্পূর্ণ হয়। অন্য দিকে প্রথা সম্পর্কিত ধারণার শিথিলতার জন্য কৃষকেরাও তাদের ওপরে, প্রথাগত নয়, এমন নতুন 'দায়িত্ব' চাপানো হলে তার বিরোধিতা করত। অবশ্যই তাদের এই দাবী সফল হত যদি এর পেছনে কৃষকদের যৌথ প্রচেষ্টা থাকত।

আমরা এবার সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আবার দেখব। এই ব্যবস্থায় কৃষকদের শ্রমের ওপরে ভিত্তি করে স্বল্পসংখ্যক ভূস্বামী প্রভু বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল কৃষি-নির্ভর, যেখানে কৃষিকাজের জন্য বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হত এবং এই শ্রমের প্রয়োজনই কৃষককে জমির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। জমি ছেড়ে চলে যাবার অধিকার কৃষকের ছিল না। কিন্তু নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ এবং জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি তার কাছে ছিল। অন্তত দশম শতকের শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এরকমই ছিল।

স্পষ্টতই এই সমাজে বিরোধের সম্ভাবনা সব সময়েই উপস্থিত ছিল। সমস্যা দেখা দিত কৃষিকাজের জন্য নির্দিষ্ট চার মাসে যখন শ্রমিকের চাহিদা হ'ত প্রচুর এবং প্রায়শই ঘাটতি দেখা যেত। আবার বছরের অন্য সময়ে এই চাহিদা কমে গিয়ে শ্রমিক হ'ত উদ্বৃত্ত। সমাজের নিম্নবর্গের মধ্যে এ্ই সঙ্গে খাদ্যের চাহিদার তুলনায় যোগান থাকত কম। ফল ছিল 'দুর্ভিক্ষ'। সমাজের বিকাশের জন্য এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন ছিল।

৭.৫ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির গতিশীলতা

মোটামুটি এগারো শতক থেকে পশ্চিম ইওরোপে শুরু হয়, মার্ক ব্লক যাকে বলেছেন 'দ্বিতীয় সামন্ততান্ত্রিক যুগ'। কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এ যুগের বৈশিষ্ট্য। পুরনো 'আঁচড় কাটা লাঙল'-এর পরিবর্তে আরও ভারী লাঙলের ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে জমি গভীরভাবে কর্ষণ করে তার ভেতরকার উর্বরতা শক্তি কৃষি উৎপাদনে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এই লাঙল ব্যবহার করে জমির পুষ্টিও সমানভাবে বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। জোয়াল ব্যবহার সম্পর্কেও ধারণার উন্নতি হওয়ায় বলদকে আরও ভালভাবে কৃষিকাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। ঘোড়ার ব্যবহারও আগের তুলনায় বেশী কার্যকর হয়। ঘোড়ার বুকে আড়াআড়িভাবে লাগানো চামড়ার ব্যান্ডের বদলে গলায় গোল লোহার বেড়ি পরিয়ে তার সঙ্গে লাঙলকে যুক্ত করা হ'ল। ঘোড়ার খুরে নাল লাগানোর ব্যবস্থা করার ফলে শক্ত জমিতেও ঘোড়াকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হ'ল। ওট (oat) চাষের সম্প্রসারণ থেকে অনুমান করা হয় যে এসময়ে কৃষিকাজে ও অন্যত্র ঘোড়ার ব্যবহার অনেক বেড়েছিল।

এসময়ে কৃষিতে অন্য পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়। নতুন শস্য, যেমন—বিন, ডাল ও শুঁটিজাতীয় সব্জী লাগানো শুরু হয়। শুঁটি উৎপাদনের কিছু বিশেষ সুবিধা ছিল।

(১) কৃষকদের খাদ্যে এখন ভেজিটেবল প্রোটিনও যুক্ত হয়। এর আগে তাদের খাদ্য-তালিকায় ছিল কার্বহাইড্রেটস (carbohydrates) ও যখন বন্যপ্রাণী শিকার করা হ'ত তখন মাংস;
(২) শুঁটিজাতীয় বীজের শিকড় জমির অনেক ভেতর পর্যন্ত যেত যা শস্য-চারার ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না;
(৩) বৃদ্ধির সময়েও এজাতীয় চারা জমিতে নাইট্রোজেনের যোগান দিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করত;
(৪) নতুন শস্য/সব্জী ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে উন্নততর শস্য-চক্র প্রবর্তন করা সহজ হয়। এখন প্রতি বছরে মোট জমির দুই-তৃতীয়াংশে চাষ করা হত এবং এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখা হত। আগে অর্ধেক জমিই অনাবাদী পড়ে থাকত। অর্থাৎ জমিকে দুই ভাগ করে চক্রাকারে ব্যবহারের ফলে এখন প্রবর্তিত হল জমিকে তিন ভাগ করে চক্রাকারে ব্যবহারের পদ্ধতি।

এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে বীজ ও উৎপাদনের অনুপাত ১ : ২ : ৫ থেকে বেড়ে ১ : ৪-এ দাঁড়ায়। পুরনো অনুপাতে ২.৫ উৎপাদন হলে তার ১ ভাগ রাখতে হ'ত বীজ হিসেবে, বাকী ১.৫ খাদ্য হিসেবে পাওয়া যেত। বর্দ্ধিত অনুপাতে ৩ ভাগ পাওয়া যেত খাদ্য হিসেবে। এর ফলে খালি হাত শ্রমিকের চাহিদা কমে যায়। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এখন ২৫ থেকে ৩০ একর জমি থাকলেই একটি কৃষক পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন হত। আগে এই পরিমান ছিল অন্তত ১০০ একর। অতএব অনেক বেশী চাষ করতে যে শ্রমের অপব্যয় হত তাও বন্ধ হল।

৭.৫.১ জনসংখ্যার বৃদ্ধি

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উন্নত মানের খাদ্য লভ্য হওয়ার ফলে সমাজের নিম্নস্তরেও জনসংখ্যার অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হয়। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের আগের সাড়ে-তিনশ বছরে জনসংখ্যা ১০০ শতাংশ বেড়েছিল, কিন্তু পরের সাড়ে-তিনশ বছরে বেড়েছিল ১৭০ শতাংশ। জনসংখ্যা ২ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৫৪ কোটি। যখন জমির আয়তন ছোট হবার ফলে কৃষিতে শ্রমিকের প্রয়োজন কম ছিল, জনসংখ্যাও সেই সময়ে আগের তুলনায় অনেক বেশী বেড়েছিল।

আর একটি প্রযুক্তগত উন্নতিও এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছিল। ইওরোপে জল ও হাওয়া-চালিত মিল চালু হওয়ায় অনেক কাজ মানুষের হাতের বদলে এই যন্ত্র দিয়েই করা যেত—যেমন, শস্য পেষাই। ফলে কৃষির জন্য আরো শ্রমিক পাওয়া যেত।

৭.৫.২ বাণিজ্য ও নগরায়ণ

একাদশ ও দ্বাদশ শতকের প্রযুক্তিগত ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন পশ্চিম ইওরোপের চেহারা বদলে দিয়েছিল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ইওরোপের জনহীন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে এবং জঙ্গল কেটে অনেক জমি কৃষির অধীনে নিয়ে আসে। চারণভূমিতেও কৃষিকার্য শুরু হয়। পতিত জমি উদ্ধারের ক্ষেত্রে দ্বাদশ শতক ইওরোপে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যক্তিগত প্রয়াসেই এই বিরাট কাজ শুরু হয়। ভূস্বামী প্রভুরা পরে যোগ দেন এবং এই প্রয়াস আরও সংগঠিত হয়। শ্রমের চাহিদা কমে যাওয়ায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভূমিদাস জমিতে বাঁধা থাকার অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। মুক্তির শর্ত হিসেবে ভূমিদাস ভূস্বামীকে মুক্তিপণ স্বরূপ নগদ অর্থ দেয়; এবং ভূস্বামী এই অর্থ ব্যবহার করেন মজুরী-ভিত্তিক শ্রমিক সংগ্রহ করতে। শ্রমিকের সংখ্যা বেশী হওয়ায় মজুরী এ সময়ে কমে যাচ্ছিল। অনুমান করা হয় যে মালিক ভূমিদাসকে মুক্তি দেবার শর্ত হিসেবে দেয় শ্রমের মূল্যের চারগুণ অর্থ নিতেন। মজুরী-ভিত্তিক শ্রম বেগার শ্রমের থেকে স্বভাবতই বেশী উৎপাদনশীল ছিল।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা এবং সেই উৎপাদন বৃদ্ধি বাণিজ্যের প্রসারে এবং নগরায়ণেও সাহায্য করেছিল। গ্রামাঞ্চলে এখন বিক্রয়যোগ্য পণ্য অনেক বেশী উৎপাদন হ'ত, এর ফলে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য শহরাঞ্চলে অনেক বেশী মানুষের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারত। বাণিজ্য কোনও সময়েই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল না; এখন তা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেল। কৃষি উৎপাদন ক্রমশই বেশী করে মুনাফা নির্ভর হয়ে পড়ছিল এবং এর ফলে গ্রামীণ ও শহুরে বণিক উভয়েই ক্রমশ কৃষির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল।

৭.৫.৩ নতুন অর্থনীতির বিকাশ

আমরা দেখলাম যে কৃষির এই বিকাশ যতটা শ্রম-নির্ভর ছিল, তার থেকে বেশী নির্ভরশীল ছিল মূলধনের ওপরে। এই মূলধন ব্যয় করা হ'ত নতুন ভারী লাঙল, জোয়াল, ঘোড়া ইত্যাদি কিনতে। সুতরাং যে অল্পসংখ্যক কৃষক এধরনের মূলধন বিনিয়োগ করতে পারত, তারাই নতুন ব্যবস্থায় উপকৃত হয়েছিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র কৃষকেরা, যারা সংখ্যায় অনেক বেশী, ঋণ করে জমিতে মূলধন বিনিয়োগের চেষ্টা করে। কিন্তু একবার ফসল হানি হলে বা পণ্যের দাম পড়ে গেলে, এই কৃষকদের দুরবস্থার অন্ত থাকত না। তাদের জমি, লাঙল ইত্যাদি সবই হারাতে হ'ত এবং এই ক্ষুদ্র কৃষকেরা ক্রমবর্ধমান ভূমিহীন কৃষি-মজুরের দলে যোগ দিত। অন্যদিকে ছোট ভূস্বামীরা, যাদের নিয়ন্ত্রণে আর ভূমিদাসদের বেগার শ্রম ছিল না, বা বণিকেরা মুনাফার জন্য কৃষিতে বিনিয়োগ শুরু করে। সুতরাং তারা এমন পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করতে যাতে বেশী মুনাফা করা যায়; এবং তারা দিনমজুর নিয়োগ করত কৃষিকাজের জন্য।

এই অর্থনীতি ছিল নতুন ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিচিত। এই অর্থনীতিকে পরিচালনা করত ধনতান্ত্রিক কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষি-মজুর। এই মজুরদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে

চলে যাওয়ার, বেশী মজুরীর সন্ধানে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় উচ্চবর্গের মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার বদলে এক নতুন মানসিকতাও লক্ষ্য করা যায়। মুনাফার অর্থ আবার নতুন করে বিনিয়োগ করা হয় যাতে উৎপাদনের মাত্রা সম্প্রসারিত হতে পারে এবং আরও মুনাফা লাভ করা যায়।

অনুশীলনী—৩

১। ডিমিন, টেনেমেন্ট ও পতিত জমির মধ্যে কিভাবে তফাৎ করবেন?

....

....

....

....

....

....

২। 'কমিউটেশন ফি' বা 'মুক্তিপণ' কি? পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন।

....

....

....

....

....

....

....

৩। শুধু ধনী কৃষকরাই কেন 'কৃষির বিকাশ'-এর ফলে উপকৃত হয়েছিল?

....

....

....

....

....

....

....

....

৭.৬ সামন্তপ্রথার অবক্ষয়

কৃষির বিকাশের ধারা অবশ্য চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে আসে। পশ্চিম ইওরোপের পরবর্তী ইতিহাসের ওপরে এর বেশ বড় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কৃষির বিকাশ স্তিমিত হয়ে আসার অন্যান্য প্রধান কারণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে বিরাট আকারে জমি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে, মানুষ জঙ্গল কেটে ও চারণভূমিতে কৃষিকাজ শুরু করেছিল। এত দ্রুত এই কাজ করা হচ্ছিল যে এর ফলে কৃষিযোগ্য জমি এবং জঙ্গল ও চারণভূমির যে পরিবেশগত ভারসাম্য ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। জঙ্গল সাফ হয়ে যাওয়ার ফলে পশ্চিম ইওরোপে যে পরিবেশগত পরিবর্তন দেখা যায় তা হ'ল নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি। ১৩১৫ এবং ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে সূর্যের মুখ প্রায় দেখাই যায়নি; এর ফলে শস্যের উৎপাদন খুবই কম হয় এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে জনসংখ্যার প্রায় এক-দশমাংশ মারা যায়। অন্যদিকে, চারণভূমি কমে যাওয়ার ফলে গৃহপালিত পশুর খাদ্যের টান পড়ে। তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং সংখ্যাও কমতে থাকে। এর ফলে কৃষিও ব্যাহত হয়, কারণ গোবরই ছিল কৃষিতে সারের প্রধান যোগান এবং এই যোগানও কমে যায়। ফলত জমির উর্বরতাও কমে যায় এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ওপরেও এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে।

গোটা চতুর্দশ শতক ধরেই বহু ছোট-বড় দুর্ভিক্ষের আর্বিভাব ঘটেছিল। এর ফলে সাধারণভাবে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। অন্যদিকে দেখা যায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব এবং মহামারীতেও প্রচুর জীবনহানি ঘটে। এই মহামারীর সব থেকে বড় ঘটনাকে বলা হয় ব্ল্যাক ডেথ (Black Death) ১৩৪৮-৫১। প্লেগের প্রাদুর্ভাবের জন্য এই নাম দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ইওরোপের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ থেকে অর্ধেকের মত মানুষ মারা যায়। এক-চতুর্থাংশ ধরলেও দেখা যায় যে চতুর্দশ শতকের জনসংখ্যা ঐ শতকের প্রারম্ভের সময়ের তুলনায় ৪০ শতাংশ কমে গিয়েছিল।

৭.৬.১ শ্রমিকের অভাব

স্বভাবতই জনসংখ্যার এই বিশাল ক্ষয় ইওরোপের সমাজকে আলোড়িত করেছিল। এর প্রত্যক্ষ ফল হ'ল যথেষ্ট শ্রমিকের অভাব এবং মজুরীর বৃদ্ধি। কিন্তু বিপুল জনসংখ্যা কম হওয়ায় খাদ্যের চাহিদাও কমে যায় এবং এর ফলে কৃষি পণ্যের দামও পড়ে যায়। কম উর্বর জমি ছেড়ে শুধু বেশী উর্বর জমিতে চাষ করার প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। চাহিদা যখন কমে যাচ্ছে, তখন উৎপাদন-বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। দিনমজুররা এই পরিস্থিতিতে দুভাবে লাভবান হয়—মজুরী বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যের দাম কমে যায়। কিন্তু ভূস্বামীরাই প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষিকাজে উৎপাদনের ব্যয় মজুরী বৃদ্ধির ফলে বেড়ে যায়, কিন্তু কৃষি থেকে আয় যথেষ্ট কমে আসে। উপরন্তু বিলাস সামগ্রীর দাম বেশ বৃদ্ধি পায় কারণ হস্তশিল্পী ও কারিগরেরাও অনেকে দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল এবং এর ফলে এধরনের সামগ্রীর উৎপাদনও কমে গিয়েছিল। ভূস্বামীরা এই অবস্থায় উভয়সংকটে পড়ে—তারা কি আয় কমে যাওয়া ও বিলাস সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যস্ত বিলাসবহুল জীবনযাত্রা বর্জন করবে, না কৃষকদের আরও বেশী শোষণ করে উদ্বৃত্তের যতটা সম্ভব আত্মসাৎ করে নিজেদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা বজায় রাখবে? শেষ পর্যন্ত, অবশ্য তাঁরা শেষোক্ত পন্থাটিই বেছে নেয়। কিন্তু এই শোষণের জন্য ব্যক্তিগত চেষ্টা না করে তাঁরা রাষ্ট্রীয়

প্রতিষ্ঠানকে বেছে নিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা গৌণ ছিল কারণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা সামন্তপ্রভুদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এখন এই পুরনো সামন্তপ্রভুদের সাহায্যার্থে রাষ্ট্র আবার একটি শক্তিমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল।

সর্বত্রই কৃষকদের অবাধ যাতায়াতের ওপরে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হল। এর ফলে তারা যেখানে মজুরী বেশী সেখানে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা হারাল। ব্ল্যাক মহামারীর (Black Death) আগের মজুরীই স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা হ'ল।

৭.৬.২ কৃষক বিদ্রোহ

কৃষকেরা এর প্রতিবাদ জানাল এবং নিজেদের জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ প্রায় গোটা মহাদেশ জুড়েই দেখা দিয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে ফ্রান্স ও ইংলন্ডে, এবং পরে স্পেন ও জার্মানীতে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহগুলি শেষ পর্যন্ত দমন করা হয়েছিল বটে কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা জোর করে বজায় রাখার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। রাষ্ট্র সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ম-কানুন কৃষকদের ওপরে জোর করে চাপানোর চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি। কারণ, তখন আর্থ-সামাজিক অবস্থা কৃষকের অনুকূলেই ছিল।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সংকট সামন্তপ্রথার অবসানের সূচনা করে এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। পঞ্চদশ শতকের পর থেকে ইওরোপীয় অর্থনীতি আবার ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে উঠতে থাকে; কিন্তু অর্থনীতির এই পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়ছিল পুরনো এবং পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিহার করে। সামন্তপ্রথার অবসানের বীজ কয়েক শতক ধরে গড়া ওঠা এই ব্যবস্থার ভেতরেই ছিল। সামন্তপ্রথার অবক্ষয় ইওরোপের সর্বত্র সমানভাবে ঘটেনি। যেমন, ইংলন্ডের তুলনায় ফ্রান্সে এই প্রথার অবসান অনেক পরেই হয়েছিল। যখন পূর্ব ইওরোপে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে এই ব্যবস্থা পুরোপুরি বজায় ছিল তখন পশ্চিম ইওরোপে এই ব্যবস্থা অপসৃত হয়ে ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

৭.৭ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সামন্তপ্রথা

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে ইওরোপের ঐতিহাসিকেরা ইওরোপের সামন্তপ্রথা সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরী করেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের প্রাক-আধুনিক যুগের ইতিহাস বুঝতে ও ধারণা প্রয়োগ করেন। এভাবে চীন, জাপান, পশ্চিম এশিয়া বা ভারতের সমাজেও এই ধারণা প্রযুক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষে কর্ণেল জেমস টড ১৮২০-র দশকে রাজস্থানে ইওরোপীয় সামন্তপ্রথার অনুরূপ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সামন্তপ্রথার ধারণাটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল ইওরোপীয়রা এই সব অঞ্চল জয় করার ফলে বা এই অঞ্চলের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে। এর ফলে ইওরোপীয় প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমাজ বা তাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা সহজ হয়েছিল। আবার 'সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা'র ধারণা প্রয়োগ করে নানান সামাজিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা সহজেই করা সম্ভব হ'ত। ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা পরে এই পদ্ধতি

গ্রহণ করেন। এঁরা অবশ্য এর অর্থকে আরও প্রসারিত করেন।

ভারতবর্ষের 'ভারতীয় সামন্তপ্রথা' এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ছবি তুলে ধরে যেখানে বাণিজ্যের অবক্ষয় ঘটে, ফলে মুদ্রার প্রচলনে সংকট দেখা দেয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্র বাধ্য হয় ব্রাহ্মণদের এবং কিছুটা কর্মচারীদের জমি দান করতে। এঁরা আবার কৃষকদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে ও সামন্তপ্রথা প্রতিষ্ঠা করে। একাদশ শতকে আবার বাণিজ্যের প্রসার শুরু হয়; কৃষকেরা নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করে এবং সামন্তপ্রথার অবসানের সূচনা হয়।

ভারতীয় সামন্তপ্রথা সম্পর্কে বিতর্ক :

সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস চর্চায় 'ভারতীয় সামন্তপ্রথা' সম্পর্কিত ধারণাটি সমালোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে এই ধারণার বাণিজ্য ও সামন্তপ্রথার মধ্যে একটি বিরোধকে ধরে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই ধারণায় ইউরোপ থেকে ধার করা বিশ্লেষণ ও তার পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন—ম্যানর, ভূমিদাস, কমিউটেশন ইত্যাদি। সমালোচকরা বলেন যে ভারতীয় পরিবেশ, প্রযুক্তি ও সামাজিক ব্যবস্থা ইওরোপ থেকে মূলত আলাদা। সুতরাং ভারতবর্ষে বা অন্যত্র প্রাক্-আধুনিক যুগের ইতিহাস ও সমাজ বুঝতে হলে ঐ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই তা বুঝতে হবে। ইওরোপ থেকে ধার করা ধারণার মাধ্যমে নয়।

সমালোচনা সত্ত্বেও সামন্তপ্রথা সম্পর্কিত ধারণা জনপ্রিয় সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তকেও বহু ব্যবহৃত। এর একটা কারণ এই যে ওই ধারণার অস্পষ্টতার ফলে সাধারণভাবে নানান অবস্থা বুঝতে এটা প্রয়োগ করা যায়। আবার কেউ কেউ একটু অন্যভাবেও কথাটা ব্যবহার করেন, যেমন-আধা-সামন্ততান্ত্রিক বা প্রোটো-সামন্ততন্ত্র বা সামন্তপ্রথা (উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে)।

অনুশীলনী—৪

১। ইওরোপে চতুর্দশ শতকে অনেকগুলি দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, কারণ (সঠিক উত্তরে দাগ দিন) :

(ক) উন্নত প্রযুক্তির অভাব

(খ) কৃষকদের উৎসাহের অভাব

(গ) আবহাওয়ার বিপর্যয়

(ঘ) জনসংখ্যার বৃদ্ধি

২। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের কৃষক-বিদ্রোহগুলির কারণ কি?

....

....

....

....

....

....

....

৩। কর্ণেল জেমস্ টড মনে করতেন যে ইওরোপীয় ধাঁচের সামন্তপ্রথা ভারতে ছিল (সঠিক উত্তরে দিন) :

(ক) উত্তর প্রদেশে

(খ) গুজরাটে

(গ) বিহারে

(ঘ) রাজস্থানে

৭.৮ সারাংশ

দাসপ্রথা প্রাচীন সমাজগুলিতে উপস্থিত ছিল এবং কোথাও কোথাও এই প্রথা 'উৎপাদনের ভিত্তি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে যে দাসপ্রথা ছিল তা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দাসপ্রথা থেকে পৃথক ছিল। 'দাস সমাজ' থেকে 'সামন্ততান্ত্রিক সমাজে' রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্রুনার সামরিক ও প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পিরেনের মতে বাণিজ্যে অবক্ষয় ও অর্থনীতির গ্রামমুখী হওয়ার ফলে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ইওরোপে দেখা যায়, সেই পরিবর্তনই সামন্তপ্রথার উদ্ভবের জন্য দায়ী। মার্ক ব্লকের ব্যাখ্যায় আরও সামগ্রিক একটি ছবি ফুটে ওঠে। তাঁর মতে পঞ্চম শতকে পশ্চিম ইওরোপে ব্যাপক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের থেকে সামন্তপ্রথার জন্ম হয়। বিভিন্ন উপজাতির আক্রমণ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব ও জীবনযাত্রার নিম্নমান পশ্চিম ইওরোপের সমাজকে বিপর্যস্ত করেছিল। এ সময়ে প্রয়োজন হয় নতুন 'পরস্পর নির্ভরতার সম্পর্ক তৈরী করার। সামন্তপ্রভু, সামন্ত ও ভূমিদাসদের মধ্যে এই সম্পর্ক তৈরী হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে সামন্তপ্রথার মধ্যেই গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। কৃষি-প্রযুক্তি বা উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু উদ্ভাবন ঘটে। 'ভূমিদাস' হয় নতুন শ্রমের যোগনদার শ্রেণী। তাদের অবস্থান প্রাচীন যুগের 'দাস' ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 'মুক্ত মজুরী-ভিত্তিক শ্রমিকের মধ্যবর্তী।' সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার গতিশীলতার ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যোৎপাদন, জনসংখ্যার ও অধিক শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষিকাজ মূলধন-নির্ভর ছিল। আগের যুগের মত শ্রম-নির্ভর ছিল না। উন্নত বীজ, লাঙল, শস্য-চক্র প্রবর্তনের ফলে অনেক কম জমিতে অনেক বেশী উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছিল। কৃষক এবং ভূস্বামী যাদের হাতে মূলধন যথেষ্ট ছিল না, তারা পতিত জমি উদ্ধারের চেষ্টা করে। এর ফলে বনাঞ্চল কেটে ফেলা ও পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ায় চতুর্দশ শতকে অনেক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কৃষক-বিদ্রোহ শুরু হয় এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এক সার্বিক সংকট দেখা দেয়। এর ফলে এই প্রথার অবসান ঘনিয়ে আসে।

ভারতবর্ষে সামন্তপ্রথা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক আলোচনা প্রথম দিকে ইওরোপীয় ইতিহাস চর্চার ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। বাণিজ্যের অবক্ষয় ও মুদ্রার সংকটের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। বাণিজ্যের অবক্ষয় ও মুদ্রার সংকটের ওপরেই এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সংকটের জন্যই রাষ্ট্র ব্রাহ্মণের ভূমি দান করে যাতে ভূমি থেকে যথেষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়। এই উচ্চবর্গের সামন্তপ্রভুরা কৃষক-ভূমিদাসদের কৃষিকাজের জন্য নিয়োগ করে। এভাবেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ হয়। কিন্তু এই তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক এখনও বজায় আছে।

৭.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

ব্ল্যাক ডেথ (Black Death)	ঃ	ইংলন্ডে ১৩৪৮-এ যে প্লেগ মহামারীতে গণমৃত্যু
কমিউটেশন (Commutation)	ঃ	ভূমিদাসদের মুক্তির জন্য যে নগদ অর্থ দিতে হত
ডিমিন (Demeane)	ঃ	প্রভুর খাস-জমি; ম্যানর হাউসের সংলগ্ন; এই জমির ফসল সামন্তপ্রভুর ভাণ্ডারে জমা পড়ত।
ফিউডাম (Feudam)	ঃ	সামরিক দায়িত্ব পালনের শর্তে যে জমি পাওয়া যেত
হারনেস (Harness)	ঃ	কৃষিতে ব্যবহৃত পশুকে নিয়ন্ত্রিত রাখা
লেগুম (Legume)	ঃ	শুঁটিজাতীয় শস্য
ম্যানর (Manor)	ঃ	অভিজাতদের খামার
টেনেমেন্ট (Tenement)	ঃ	যে জমির ফসল ভূমিদাসরা পেত
পতিত জমি (Wasteland)	ঃ	সামন্তপ্রভুর যে জমিতে চাষবাস হত না
জোয়াল (Yoke)	ঃ	দুই বলদের ঘাড়ে জোড়া দেবার কাঠের তৈরী যন্ত্র
বনাঞ্চল কাটা (Deforestation)	ঃ	বনাঞ্চলের মোট জমির বিলোপ

৭.১০ উত্তরমালা

(১) ৭.২ অংশ পড়ুন ও উত্তর লিখুন।

(২) ৭.২২ অংশ দেখুন।

একক ৮ নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য
৮.১ প্রস্তাবনা
৮.২ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা
৮.৩ নবজাগরণ
    ৮.৩.১ মানবতাবাদ
    ৮.৩.২ ধর্ম-নিরপেক্ষতা
৮.৪ নবজাগরণের সাহিত্য
৮.৫ শিল্প ও স্থাপত্য
৮.৬ দর্শন
৮.৭ বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা
৮.৮ রাজনৈতিক তত্ত্ব
৮.৯ ধর্ম-সংস্কার
    ৮.৯.১ গীর্জা ও ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বিতর্ক
    ৮.৯.২ প্রতিবাদী ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন
    ৮.৯.৩ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন
৮.১০ জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান
৮.১১ ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উপনিবেশ স্থাপন
৮.১২ সারাংশ
৮.১৩ প্রধান শব্দগুচ্ছ
৮.১৪ উত্তরমালা

৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককে ইওরোপীয় ইতিহাসের একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যুগের ইতিহাস আলোচিত হবে। এই যুগে শুধু অর্থনীতি, সমাজ বা রাজনীতিতেই প্রভূত পরিবর্তনের সূচনা হয়নি, সমাজ, প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীও বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছিল। এই একক পড়ার পরে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন :

- নবজাগরণ বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পশ্চাতে কী ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল।
- নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কারের সঙ্গে জড়িত ধারণা, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- এ যুগের শিল্প ও সংস্কৃতি।
- যে প্রক্রিয়ায় ইওরোপে আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল এবং
- ইওরোপীয় দেশগুলির ইওরোপের বাইরে ক্ষমতার সম্প্রসারণ ও উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা।

৮.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা মানব-সভ্যতার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ইতিহাস জানব যখন আধুনিক জগতের ভিত্তিগুলির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল যাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। ইওরোপের এ যুগের ইতিহাসের প্রভাব গোটা পৃথিবীর ওপরেই পড়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হয়েছিল, আবার কোনও ক্ষেত্রে এই প্রভাব বোঝা গিয়েছিল অনেক পরে।

'নবজাগরণ' ও 'ধর্মসংস্কার' এই শব্দ দুটি এই রূপান্তরের পর্বকে বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়। আক্ষরিক অর্থে 'রেনেসাঁস' বলতে বোঝায় নবজন্ম বা নবজাগরণ; প্রাচীন গ্রীস ও রোমের শিক্ষা ও সভ্যতা সম্পর্কে নতুন আগ্রহ বোঝাতেই এটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এটি শুধু প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার নব বিকাশ নয়; এ সময়ে শিল্প, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও বিজ্ঞানে নতুন ধারণার উদ্ভব হয়, যার সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যের খুব কম মিলই ছিল। সময় সময় এইসব ধারণা ক্যাথলিক গীর্জা বা পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেও গিয়েছিল। এর ফলেই ষোড়শ শতকে প্রথমে প্রোটেস্টান্ট বা প্রতিবাদী ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও পরে ক্যাথলিক ধর্মসংস্কার আন্দোলন (যাকে প্রতিধর্মসংস্কার আন্দোলনও বলা হয়) ঘটেছিল।

ইওরোপের ইতিহাসে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাব শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সমাজের বিভিন্ন দিককেই স্পর্শ করেছিল। নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কারের পেছনে একই ধরনের আর্থ-সামাজিক কারণ কাজ করেছিল। এদের যৌথ প্রভাবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। সমাজ ও অর্থনীতিতে পরিবর্তনের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। বিশ্ব-প্রকৃতি এবং তার আঙ্গিকে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। ঈশ্বর থেকে মানুষের সম্পর্কে আলোচনাচর আগ্রহ অনেক বেড়ে যায় এবং মানুষের সৃজন সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস তৈরী হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। জাতীয়-রাষ্ট্র স্থাপনের সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতি-সম্পর্কিত তত্ত্বেরও জন্ম হয়েছিল। এই যুগ ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগ; নতুন নতুন দেশে ইওরোপীয়রা পৌঁছে যায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগের সূচনা হয়।

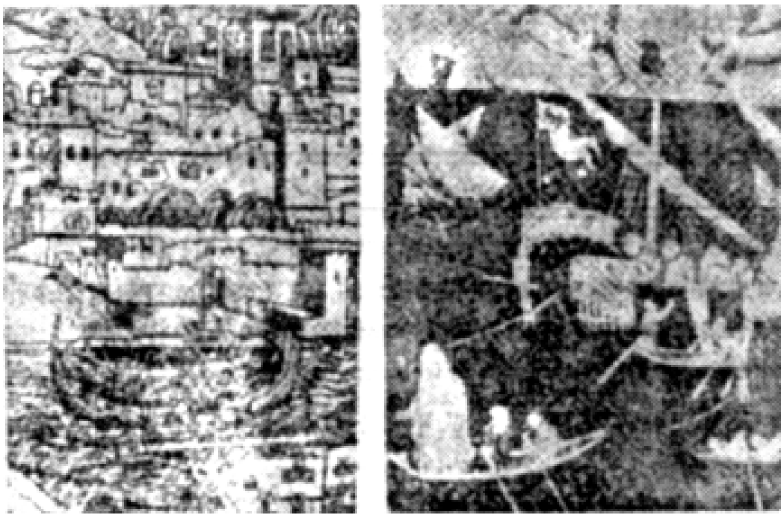

১৪. সে যুগের জাহাজ

এই সমস্ত ঘটনাকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখেই দেখা প্রয়োজন। প্রথমে এই সব পরিবর্তনের সাধারণ ও অর্থনৈতিক পটভূমি আলোচনা করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

৮.২ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা

আমরা আগে পড়েছি ইওরোপের সমাজে কিভাবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল ও কিভাবেই বা তার আবার পতন হয়েছিল। বাণিজ্যের বিকাশ নতুন ভাবে শুরু হলে শহর গড়ে উঠতে থাকে। পুরানো শহরের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন শহরেরও পত্তন হয়। এই নতুন শহরগুলি পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। শহরগুলি সুরক্ষার প্রয়োজনে প্রায়শই প্রাচীরে ঘেরা থাকত। তারা ক্রমশ সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের মুক্ত করে। শহরের নিজস্ব সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরী হয়। রাজকর্মচারীরা শহরের বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। তাদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ও বিচারালয়ও ছিল। সামন্ততন্ত্রের যুগের ভূমিদাসদের গতিবিধির ওপরে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল শহরের বাসিন্দাদের ওপরে সেরকম কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তারা নিজেদের ইচ্ছেমত যাতায়াত করতে ও সম্পত্তি কেনা-বেচা করতে পারত। মধ্যযুগের একটি প্রবাদ ছিল যে 'শহুরে হাওয়া মানুষকে মুক্তি দেয়'। এমনকি সামন্তপ্রভুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভূমিদাসেরা পালিয়ে শহরে গিয়ে আশ্রয় নিত। পণ্য উৎপাদনের জন্য শহরগুলি বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের চাষের ওপর গুরুত্ব দিত এবং চাষীরা নগদে তাদের প্রাপ্য পেত। এর ফলে কৃষকেরা শ্রমের পরিবর্তে নগদ অর্থে প্রভুকে খাজনা দিতে পারত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অর্থের ভূমিকা গৌণ ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ম্যানরগুলি মোটামুটি স্বনির্ভর ছিল। সামান্যই কেনা-বেচা হ'ত এবং বিনিময় সাধারণতঃ পণ্য দিয়েই হ'ত। বাণিজ্যের প্রসারের ফলে মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পেল এবং এর ফল হ'ল সুদূরপ্রসারী।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি

সেই যুগের উচ্চবিত্ত মানুষের হাতে সোনা ও রূপো ছিল, কিন্তু এই প্রকার অর্থ ছিল অচল। এই সম্পদ ব্যবহার করে আরও টাকা বানানো যেত না। পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির রূপান্তর ঘটে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে। নতুন অর্থনীতিতে সম্পদের বিকাশ সম্ভব হ'ত মুনাফার মাধ্যমে এবং এই বিকাশের উৎস ছিল অর্থ। ব্যবসায়, বাণিজ্যে ও শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করা যেত। আবার এই মুনাফা নতুন করে বিনিয়োগ করা হ'ত আরও মুনাফার জন্য। এই ধরনের সম্পদ বা অর্থকেই মূলধন বলা হয়। এভাবে অর্থই শেষ পর্যন্ত একজন মানুষের সম্পদের পরিমাণে পরিণত হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু ছাড়াও তিন শ্রেণীর লোক ছিল। যাজক, যারা প্রার্থনা করত; নাইট বা সৈনিক, যারা যুদ্ধ করত এবং কৃষক, যারা শ্রম দিয়ে পূর্বোক্ত শ্রেণীর হয়ে কাজ করত। বাণিজ্যের প্রসারের ফলে আর একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হ'ল—মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীর সদস্য ছিল মূলত বণিকেরা। সংখ্যায় কম হলেও, তাদের বিত্তের জন্য তারা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

গোড়ার দিকে প্রাচ্য থেকে আনা বিলাস সামগ্রীই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল পণ্য ছিল। এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত ভেনিস, জেনোয়া ও পিসা প্রমুখ ইতালির শহর এবং দক্ষিণ জার্মানীর কিছু শহর। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আমেরিকা মহাদেশ ও প্রাচ্যের নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কারের ফলে এই বাণিজ্যের চেহারা পাল্টে যায়। প্রথম দিকে এই বাণিজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে স্পেন ও পর্তুগাল, পরে এই আধিপত্য চলে যায় ব্রিটেন ও হল্যান্ডের হাতে।

একই সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায়। মধ্যযুগের প্রথম দিকে কৃষকদের অ-কৃষি পণ্যের প্রয়োজন মিটত কৃষকদের পারিবারিক উৎপাদনের মাধ্যমে। সামন্তপ্রভুদের এ ধরনের প্রয়োজন মেটাত বিশেষ বিশেষ হস্তশিল্পে দক্ষ ভূমিদাসেরা। এই ভূমিদাসেরা আবার বিভিন্ন হস্তশিল্পের জন্য নিজেদের সংঘ বা গিল্ড সংগঠিত করত। এভাবে, রুটি তৈরীর, কাপড় বোনার বা কাপড় রঙ করার হস্তশিল্পীদের আলাদা আলাদা গিল্ড বা সংঘ ছিল। প্রত্যেক গিল্ডের একজন প্রধান, কিছু শিক্ষানবিশ ও দক্ষ কারিগর (Journey-man) থাকত। কোনও হস্তশিল্প বা পেশা শিক্ষার জন্য একজন সংঘ-প্রদানের কাছে শিক্ষানবিশরূপে যোগ দিতে হ'ত। শিক্ষালাভের পরে সে একজন দক্ষ কারিগর হিসেবে মজুরীর বিনিময়ে কাজ করত। সেই পেশায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করলে এই কর্মীই পরে সংঘ-প্রধান হতে পারত।

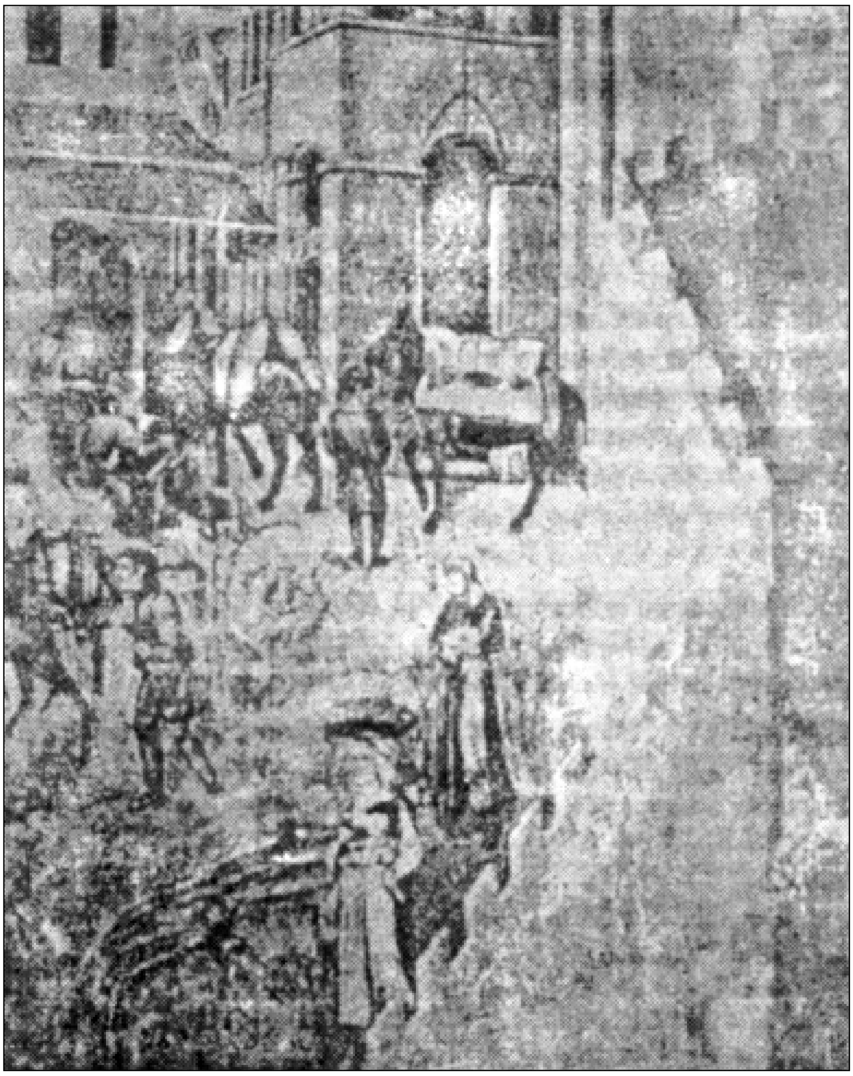

একটি বাজারের দৃশ্য

উৎপাদনের এককগুলি ছিল খুবই ছোট— তিন বা চারজনে মিলে কাজ করত। এবং প্রত্যেক এককেরই নিজের পণ্য বিক্রয় করার দোকান থাকত। সংঘের এককের ভেতরে বা বিভিন্ন এককগুলির মধ্যে কোনও অসাম্য ছিল না। সংঘগুলি প্রতিযোগীদের একধরনের পণ্য উৎপাদন থেকে বিরত রাখত; কিন্তু একই সঙ্গে এটা দেখত যে, সৎ ব্যবসা-পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান ও ন্যায্য দাম বজায় আছে।

১৬. রেড ইন্ডিয়ানদের দ্বারা কলম্বাসকে বাধাদানের দৃশ্য

কিন্তু এই গিল্ড-ব্যবস্থা খুব বেশী চাহিদার যোগান দিতে সক্ষম ছিল না। তার জন্য প্রয়োজন হ'ত আরও বড় আকারের উৎপাদন-ব্যবস্থার। ফলে এই ব্যবস্থার ক্রমশ অবসান ঘটে এবং এর স্থলে উদ্ভব হয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার। গিল্ড-ব্যবস্থার মধ্যে অসাম্য দেখা দেয়; সংঘ-প্রধানরা কর্মীদের আর প্রধান হতে দিচ্ছিলেন না এবং তাদের মজুরীও কমিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু Putting-out ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে সংঘ-প্রধানদের স্বাধীনতা কমে যাচ্ছিল। এই নতুন ব্যবস্থায় বণিকেরা প্রধান হস্তশিল্পীদের কাঁচামাল সরবরাহ করত। এর পরে যে বণিকেরা কাঁচামাল সরবরাহ করত তারাই এই পণ্য নিয়ে যেত। অতএব, আগের মত উৎপাদিত পণ্যের ওপর হস্তশিল্পীর মালিকানা আর থাকল না। এরা ক্রমেই মজুরী-শ্রমিকে পরিণত হ'ল, ব্যতিক্রম শুধু সংগৃহে নিজের যন্ত্রপাতি দিয়েই কাজ করত।

পরবর্তী সময়ে এই ব্যবস্থার পরিবর্তে শুরু হল ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা, যেখানে মূলধনের মালিকের বাড়ীতে তারই যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত হ'ত। শ্রমিকেরা নিছক মজুরীর জন্য কাজ করত, কোন কিছুর মালিকানাই তাদের আর ছিল না। কিছু শিল্প, যেমন—খনি বা ধাতু-শিল্পেও বৃহৎ মূলধনের প্রয়োজন হ'ত। এখানেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা আগে শুরু হয়। এই ব্যবস্থায় কিছু লোকের হাতে কাঁচামাল, সমস্ত যন্ত্রপাতি ও উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বেশ বেড়ে গিয়েছিল। একই সঙ্গে শহরাঞ্চলে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। সামন্ততন্ত্রের পতনের যুগে যেমন বিভিন্ন স্থানে কৃষক-বিদ্রোহ ঘটেছিল, তেমনি, ধনতন্ত্রের বিকাশের প্রথম যুগেও শহরাঞ্চলে দরিদ্র মানুষ মাঝে-মধ্যেই বিদ্রোহী হয়েছিল।

৮.৩ নবজাগরণ

'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ কথাটির আক্ষরিক অর্থ পুনর্জন্ম। অর্থাৎ, সংকীর্ণ অর্থে এই শব্দের অর্থ প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতার প্রতি নতুন আগ্রহ যা ইওরোপের মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু ব্যাপক অর্থে 'রেনেসাঁস' প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতা সম্পর্কে নতুন আগ্রহই শুধু নয় এই আন্দোলন ইওরোপে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল।

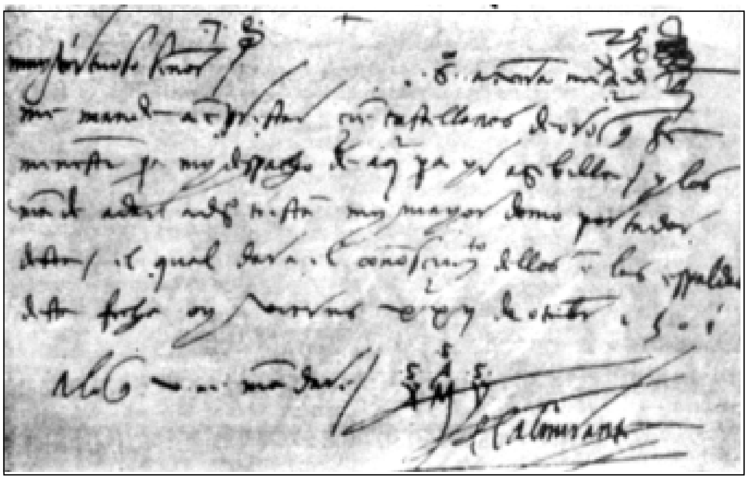

১৭. কলম্বাসকে প্রদত্ত ভারত অভিযানের রাজকীয় অনুমতিপত্র

বহু শতক ধরে ক্যাথলিক গীর্জা ইওরোপের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। 'নবজাগরণ'-এর ফলে এই আধিপত্যের অবসান হয়। বস্তুত, প্রাক্-খ্রিস্টীয় যুগের শিক্ষা ও বিদ্যার পুনর্বিকাশ এবং রোম ও গ্রীসের সংস্কৃতির প্রতি নতুন আগ্রহ গীর্জার এই আধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। অবশ্যই নবজাগরণ আন্দোলন নিছক পুনর্জাগরণ ছিল না। এই আন্দোলনের ফলে নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল।

৮.৩.১ মানবতাবাদ

নবজাগরণের চিন্তার ক্ষেত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মানবতাবাদ। মূলত, এর অর্থ হ'ল ঐশ্বরিক বিষয়বস্তুর পরিবর্তে মানুষকে ও মানবসমাজকে বৌদ্ধিক আগ্রহের কেন্দ্রে স্থাপন করা। নতুন চিন্তা মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসে। এখন জোর দিয়ে বলা হয় যে মানুষ অসীম সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী। একই সঙ্গে উচ্চারিত হয় ব্যক্তির স্বাধীনতা ও তার অবিচ্ছেদ্য অধিকারের প্রসঙ্গ। মানুষ ও তার সমাজ নিয়ে এই নতুন চিন্তার প্রধান ঝোঁক ছিল বাহ্য জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ। মানুষের কমনা, বাসনা, ঐহিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধান এবং মানব-শরীর ও তার সৌন্দর্য স্বীকৃতি পায়। ধর্মীয় নির্লিপ্ততায় বিরোধিতা করা হয়। মানবের মহিমা এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রাধান্য পায়। ক্যাথলিক গীর্জার ধারণা পাপের মধ্যে মানবের জন্ম এবং সেই কারণে তা কলুষিত পরিত্যক্ত হয়। মানবতাবাদীরা মানব শরীরে অসাড়তা ও পরলোকে যাত্রা—গীর্জার এই ধারণাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ও বর্জন করে। তাদের মতে গীর্জা বর্ণিত পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে চিন্তা না করে ঐহিক সুখের সন্ধান করাই কর্তব্য। তারা তাদের লেখায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলত যে সক্রিয় মন ও সুস্থ দেহের অধিকারী মানুষ জগৎ সম্বন্ধে জানতে ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম; নিজের সুখের সন্ধান করতেও মানুষ সক্ষম। এই নতুন চিন্তার ফলে সমাজে দৈব আধিপত্য সংকুচিত হয় এবং মানব আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

পঞ্চদশ শতকের ইতালির মানবতাবাদী পিকো দেলা মিরানডোলা (Pico della Mirandola) বহু স্থান ভ্রমণ করে এবং বহু দর্শন পাঠ করে ৯০০ মতের একটি তালিকা তৈরী করেছিলেন। মানুষের ক্ষমতার অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে নবজাগরণের ফলে যে ধারণা তৈরী হয়েছিল নিম্নে প্রদত্ত তাঁর লেখার অংশ বিশেষে সেই ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়—

'মানুষের থেকে আশ্চর্যের ও আনন্দের আর কিছুই নেই।' আরবদের কিছু নথিতে আমি এরকম লেখা পড়েছি। একজন বিখ্যাত গ্রীক পন্ডিত লিখেছিলেন, 'মানুষ একটি অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি'—এ ধরনের উক্তির কারণ কি? ঈশ্বর ও ঈশ্বরের অধীন দেবদূত ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রাণীর রাজা হ'ল মানুষ। কারণ তার বুদ্ধি এবং যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই কারণগুলি যথেষ্ট নয়।

'মানুষ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সব থেকে ভাগ্যবান।' কিন্তু কেন? কারণ অন্য সমস্ত প্রাণীর মত মানুষের ক্ষমতার ওপরে ঈশ্বর কোনও সীমারেখা টানেননি। একমাত্র মানুষেরই পছন্দের স্বাধীনতা আছে। তারা নিজেদের শক্তি এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি তাদের প্রতিকূল অবস্থায়ও বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। আবার নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করে মানুষ ঐশ্বরিক উচ্চ পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করতে পারে।

প্রাচীন ব্যাবিলনের অধিবাসীরা বলত, 'মানুষের বিভিন্ন সত্তা আছে। আমরা কেন এর ওপরে জোর দিই? কারণ আমরা মানুষেরা যা চাই; তাই হতে পারি।'

'নিজেকে জান।' এই নীতি আমাদের সত্তা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে উদ্বুদ্ধ করে। যে মানুষ নিজেকে জানে সে সবকিছুই জানে।"

৮.৩.২ ধর্ম-নিরপেক্ষতা

আধুনিক বিশ্ববীক্ষণের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বিশ্ববীক্ষণের তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ধর্মীয় 'পারলৌকিক জগৎ' সম্পর্কে মধ্যযুগীয় বিশেষ আগ্রহের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় মানবতাবাদীদের সৃষ্ট 'ঐহিক জগৎ' সম্পর্কে আগ্রহ। ঈশ্বর, দেবদূত বা অসুরের চেয়েও মানবতাবাদী নিজের পারিপার্শ্বিক জগৎ বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে বেশী আগ্রহী। মধ্যযুগের মানুষ বেশী আগ্রহী ছিল ঈশ্বর, দেবদূত ও অসুর সম্বন্ধে। মানবতাবাদী এই জগতে সংক্ষিপ্ত জীবন থেকে যতটা সম্ভব আনন্দ আহরণের আগ্রহী। মধ্যযুগের মানুষ মনে করত এই কষ্টকর জীবন সুখী পারলৌকিক জীবনের প্রস্তুতি মাত্র। নবজাগরণের ফলে এই রূপান্তরকেই ধর্ম-নির্ভর চিন্তা থেকে ধর্ম-নিরপেক্ষ চিন্তায় পরিবর্তন বলে অভিহিত করা যায়। নবজাগরণের ফলে সৃষ্ট শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশ গীর্জার সর্বস্তরের যাজক বিশেষ করে ওপর তলার বিত্তবান যাজকদেরও প্রভাবিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে দশম লিও, যিনি ১৫১৩ থেকে ১৫২১ পর্যন্ত পোপ ছিলেন, বলেছিলেন 'এস আমরা ঈশ্বরের দান স্বরূপ পোপতন্ত্রকে উপভোগ করি'।

অনুশীলনী—১

১। ইওরোপে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের জন্য দায়ী কারণগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

....

....

....

....

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি ঠিক না ভুল বলুন (ঠিক হলে ✓ চিহ্ন দিন, ভুল হলে × চিহ্ন দিন) :

(ক) নবজাগরণের যুগে ইওরোপের নাগরিকদের ওপরে কঠোর বিধিনিষেধ চাপানো হয়েছিল।

(খ) সামন্ততান্ত্রিক সমাজ শ্রেণীহীন সমাজ ছিল।

(গ) নবজাগরণের একটি বিরাট দান হলো মানবতাবাদের জন্ম।

(ঘ) নবজাগরণের ফলে ধর্ম-নিরপেক্ষ ধারণার বিকাশ হয়েছিল।

৩। 'মানবতাবাদ' বলতে কি বোঝেন তা পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

৮.৪ নবজাগরণের সাহিত্য

নবজাগরণের মানবতাবাদী ধারণার নান্দনিক প্রকাশ ঘটে সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে। নবজাগরণের যুগের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকারদের মধ্যে ছিলেন ইতালীর পেত্রার্ক এবং বোকাচ্চিও, ফ্রান্সের রাবলে, হল্যান্ডের ইরাসমাস, জার্মানীর ভন হুটেন, স্পেনের সারভান্টেস ও ইংল্যান্ডের শেক্সপিয়র। তাঁদের লেখার বিষয়বস্তু ছিল যাজক বিরোধী; ধর্ম, ঈশ্বরে ভক্তি ও সন্ন্যাস জীবনের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল না।

নবজাগরণ সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল বিভিন্ন দেশের নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য রচনা করা। চর্তুদশ শতকের আগে ইওরোপের কোথাও এই সব ভাষায়, যেমন—ইতালিয়ান, ফরাসী, স্পেনীয়, জার্মান বা ইংরাজীতে, খুব কম রচনাই পাওয়া যেত। বহু শতক ধরে বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যের ভাষা ছিল লাতিন। এই ভাষা জানতেন সামান্যসংখ্যক শিক্ষিত মানুষ। নবজাগরণের ফলেই প্রকৃতার্থে বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষায় সাহিত্য রচনার সূচনা হয়। বলা বাহুল্য, এই ভাষাগুলির বিকাশের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। কিছুদিনের মধ্যেই লাতিনের স্থলে এই ইওরোপীয় ভাষাগুলিই কবিতা, গল্প, নাটক রচনার প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়। অবশ্য, দর্শন বা বিজ্ঞানচর্চার ভাষা হিসেবে লাতিনেরপ্রচলন আরও কিছুদিন বজায় ছিল।

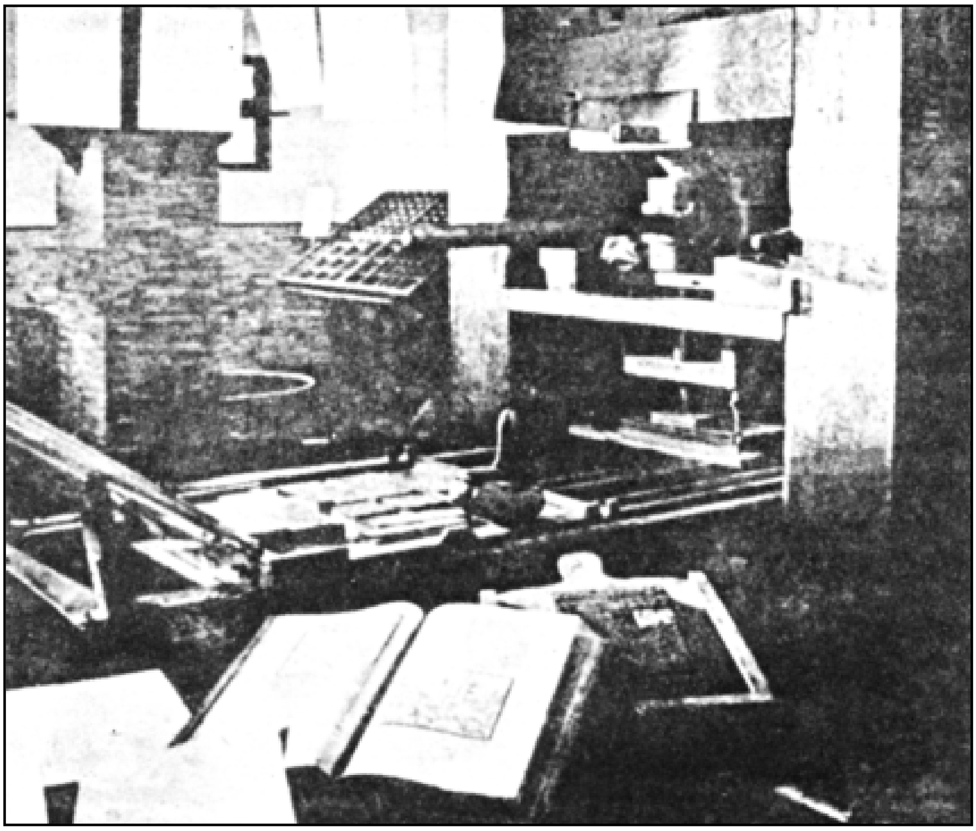

১৮. একটি প্রাচীন ছাপাখানা

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগেও ইওরোপে প্রচলিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে মুদ্রণের আর্বিভাবের ফলে। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ, গুটেনবার্গের বাইবেল ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মুদ্রণের আগের যুগের গ্রন্থ ছিল পুঁথি যা হাতে লেখা হ'ত। পুঁথি লেখকরা গ্রন্থগুলির অনুলিপি করতেন এবং এইসব অনুলিপি প্রধানত পাওয়া যেত বিভিন্ন ধর্মীয় মঠের গ্রন্থাগারে। ফলে, পড়তে জানত এমন মানুষের কাছেও গ্রন্থ সহজলভ্য ছিল না। আবার বেশীর ভাগ মানুষই লিখতে-পড়তে জানত না। হিসেব করে দেখা গেছে যে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে ইওরোপে প্রায় লক্ষ পুঁথি ছিল। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পরে প্রায় ৯ কোটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। বলা বাহল্য, এই ঘটনা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এর সম্পূর্ণ প্রভাব অনুভূত হতে বেশ সময় লেগেছিল। ছাপানো বই-এর দাম ছিল বেশী এবং শুধু ধনী ব্যক্তিরাই বই কিনতে পারতেন। যদিও লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা তখনও কম ছিল, মুদ্রণ ব্যবস্থা ভবিষ্যৎকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় করে তোলে। সমাজে এর গভীর প্রভাবও ছিল অবশ্যম্ভাবী।

আধুনিক ইওরোপীয় ভাষায় রচিত নবজাগরণ সাহিত্য বিষয়বস্তু ও শৈলীর দিক থেকেও ছিল অনবদ্য। প্রথম দিকে লাতিন সাহিত্যরীতি ও শৈলীর অনুকরণই ছিল স্বাভাবিক প্রবণতা। নতুন প্রভাব প্রথম পরিলক্ষিত হয় পদ্য রচনায়। সভাকবিদের অনুকরণ বর্জন করে পদ্য রচনায় নতুন ছন্দ ও ধর্ম-নিরপেক্ষ বিষয়বস্তুর আর্বিভাব ঘটল। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচনা জনপ্রিয় হয়। গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। আগে শুধু বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার মাধ্যম হিসেবেই গদ্য ব্যবহৃত হ'ত। গল্প বলা হ'ত পদ্যে। এখন গদ্য সাহিত্যে গল্প রচনা আরম্ভ হ'ল। বোকাচ্চিওর বিদগ্ধ রচনা, ডেকামেরন, ইতালিয়ান ভাষায় লেখা গল্পের সংকলন, সমগ্র ইওরোপে নবজাগরণপ্রসূত গদ্য রচনাকে প্রভাবিত করেছিল।

৮.৫ শিল্প ও স্থাপত্য

নবজাগরণ যুগের সব থেকে উল্লেখযোগ্য কীর্তির সাক্ষ্য পাওয়া যায় সে যুগের চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে। নবজাগরণ যুগের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অপূর্ব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এই সব শিল্পক্ষেত্রে। এই যুগের শিল্পীরা বাইবেল থেকে তাঁদের ছবির বিষয়বস্তুর বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে প্রথাগত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কোন মিলই ছিল না। শিল্পচর্চা একটি পৃথক ও স্বাধীন বৃত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। মধ্যযুগে অবস্থা আদপেই এরকম ছিল না। মধ্যযুগের শিল্পচর্চার উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক মানের প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয় শিক্ষাদান। ছবিতে আঁকা মানব-মানবী রক্ত-মাংসের মানব-মানবীর মত ছিল না। চিত্রকরেরা বেশির ভাগই ছিলেন সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ। তাঁরা যৌথভাবে কারিগরদের রীতিতে কাজ করতেন; তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল না। নবজাগরণ যুগের শিল্পীরা নিজেদের অনবদ্য ব্যক্তিত্ব ও শৈলীর মাধ্যমে সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য ধনী বণিক, শাসক ও গীর্জার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান থেকে শিল্পকলা মুক্ত হয়। শিল্পকর্মের কদর শুরু হয় তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধের জন্য। শিল্প হয়ে ওঠে শিল্পীর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নিদর্শন।

১৯. (ক) লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অঙ্কিত মোনালিসা

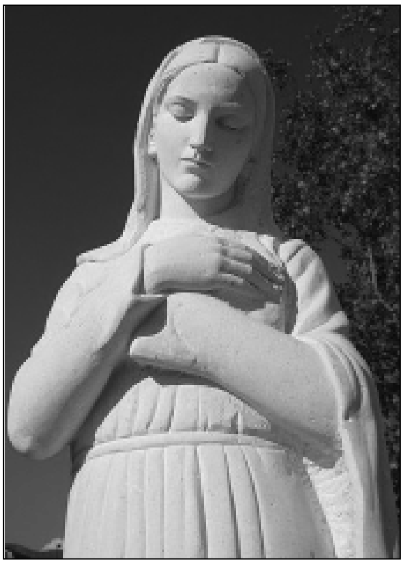

১৯. (খ) রাফায়েল অঙ্কিত ম্যাডোনা

শিল্প সৃষ্টির বিভিন্ন ধারার মধ্যে নবজাগরণ যুগের সব থেকে বড় সৃষ্টি চিত্রাঙ্কনের মধ্যে দেখা যায়। এই যুগের শিল্পীরা শিল্পকে জীবনের প্রতিফলন বলে মনে করতেন। তাই তাঁর প্রকৃতি ও মানুষ, পাহাড়, গাছ, জীবজন্তু ও মানবদেহ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এছাড়াও শিল্পীরা জ্যামিতি ও আলোকবিদ্যা বিশেষ করে অধ্যায়ন করেছিলেন যাতে নভস্তলসহ পরিপ্রেক্ষিত তাঁদের চিত্রাঙ্কনে ঠিকমত পরিস্ফুট হয়। তাঁরা মানবশরীর নিয়েও চর্চা করেছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের পরিচালনা ও প্রকাশভঙ্গীর পশ্চাতে শরীর কিভাবে কাজ করে তা বোঝা। উদাহরণস্বরূপ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির নাম উল্লেখ করা যায়। লিওনার্দো চিত্রাঙ্কনকে বিজ্ঞান বলেই মনে করতেন।

নবজাগরণ যুগে চিত্রাঙ্কনের বৈশিষ্ট্য ও মধ্যযুগীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি থেকে তার তফাৎ অনুধাবন করতে হলে সচিত্র পুস্তকে প্রদত্ত এই দুই যুগের বিভিন্ন চিত্রাঙ্কনের অনুলিপি নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন। এখানে আমরা কোনও বিশেষ শিল্পী বা তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে বিশদ আলোচনা করছি না। পাঠকেরা অন্তত কয়েকটি ছবির মুদ্রণ দেখার চেষ্টা করতে পারেন। বিত্তিচেলির 'এ্যালেগরি অফ স্প্রিং' ও 'ভেনাসের জন্ম'; লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'ভারজিন অফ দা রক্স', 'লাস্ট সাপার' ও 'মোনালিসা'; রাফায়েল-এর 'স্কুল অফ এথেন্স', 'সিস্টিন' ও 'ম্যাডোনা' এবং রোমের সিস্টিন গীর্জার ছাদে আঁকা মাইকেল এঞ্জেলোর দেওয়াল চিত্র বা ফ্রেস্কো।

নবজাগরণ যুগের ভাস্কর্যের বিকাশও চিত্রকলার মতই হয়েছিল। মধ্যযুগের ভাস্কররা প্রধানত সাধু-সন্তদের মূর্তি নিয়েই কাজ করতেন এবং স্থাপত্যের অঙ্গ হিসেবে ধর্মীয় বিষয়বস্তুই খোদাই করতেন। একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হ'ল স্বাধীন ভাস্কর্যের বিকাশ। চিত্রকলার মতই মানবদেহ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা ও সৌন্দর্যের নতুন মান ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছিল। স্থাপত্য তার ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পৃথক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯. (গ) সিস্টিন চ্যাপেলে মাইকেল-এঞ্জেলো অঙ্কিত ফ্রেস্কো

গথিক (Gothic) স্থাপত্য যা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গীর্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছিল তার অবসানের সূচনা হ'ল নবজাগরণ যুগে। মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—খিলানযুক্ত ছাদ, চোখা অর্ধ-গোলাকৃতি খিলান, উঁচু গম্বুজ ও জানালার রঙিন কাচের ওপর পৌরাণিক জীবজন্তুর অনুলিপি। নবজাগরণ যুগের স্থপতিরা এগুলিকে বর্বরোচিত বলে মনে করত। প্রথম ইটালীতে ও পরে ইওরোপের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীন রোমান স্থাপত্যের অনুকরণে নতুন ধরনের স্থাপত্যের সূচনা হ'ল। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ—রোমে সেন্ট্ পিটারের গীর্জা। নূতন-স্থাপত্য রীতিতে তৈরী বাড়ীগুলির (যার বেশীর ভাগই গীর্জা) গঠনশৈলীতে ধর্ম-নিরপেক্ষতা, ইহজীবনে আনন্দ ও মানুষের বীরোচিত কার্যের গৌরব ফুটে উঠেছিল।

২০. মাইকেল-এঞ্জেলো খোদিত মার্বেলের উপর সেন্টুরের যুদ্ধ, ১৪৯২

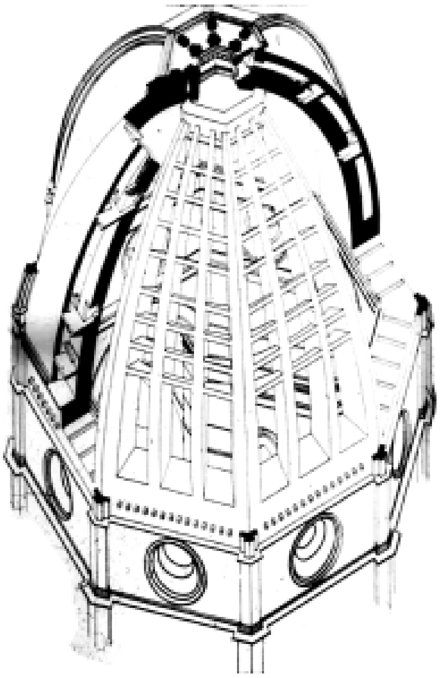

২১. (ক) ফ্লোরেন্সের গীর্জার চূড়া (১৪২০-৩৬) ২১. (খ) ফ্লোরেন্সের গীর্জার চূড়ার গঠনের ডায়াগ্রাম

৮.৬ দর্শন

প্রাক্-নবজাগরণ যুগে মধ্যযুগীয় ইওরোপে দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে মূল ধারা ছিল পাণ্ডিত্য (Scholasticism)। এই চর্চার একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা। এটা করা হ'ত ধর্মতত্ত্বের স্বার্থেই। আলোচনার ভিত্তি ছিল তর্কশাস্ত্র; বাহ্যিক অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বাতিল করা হয়েছিল। এই দার্শনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন বস্তু সম্বন্ধে বাহ্যিক জ্ঞান আহরণ সম্ভব ছিল; কিন্তু এর প্রকৃত বাস্তব রূপ উৎঘাটিত হ'ত না, এর জন্য ইন্দ্রিয় বর্জিত যুক্ত প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল। এই দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টীয় তত্ত্বের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা করে তার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধকে দূর করা। এর জন্য শুধু যুক্তি যথেষ্ট ছিল না। আর একটি মাপকাঠি ছিল—শাস্ত্রের বিধান। কোন তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের মিলই যথেষ্ট ছিল না, প্রয়োজন হ'ত শাস্ত্রীয় অনুমোদন বা কর্তৃত্ব বিধায়ক ব্যক্তির অনুমোদন। অবশ্য কিছু সংখ্যক পণ্ডিত সত্যান্বেষণের জন্য সন্দেহ ও অবিরত অনুসন্ধানের গুরুত্ব এবং বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তির ওপরে বেশী জোর দিয়েছিলেন। নবজাগরণ যুগে দার্শনিকেরা মধ্যযুগীয় এই পাণ্ডিত্যের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁদের মতে এদের দর্শন ছিল বদ্ধ চিন্তার ফসল; তাদের যুক্তি নিজের সৃষ্ট বৃত্তের মধ্যেই ঘুরত এবং তা ছিল বাস্তববর্জিত। তারা বলতেন ঘর থেকে বেরিয়ে জ্ঞান আহরণের শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল প্রকৃতির কাছে পাঠ নেওয়া। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি জ্ঞান আহরণের জন্য বিধিসংগত কর্তৃত্বের ওপরে নির্ভরতার নিন্দা করেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে আরোহী পদ্ধতিতে পক্ষপাতী ছিলেন।

মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যের অনুধ্যান পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া রূপে জন্ম হয় পরীক্ষামূলক পদ্ধতির

(Empiricism)। শেষোক্ত মতকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আহরিত অভিজ্ঞতাই সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র উৎস। সমস্ত জ্ঞান এভাবেই অর্জন করা সম্ভব। পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রবক্তা ফ্রান্সিস বেকন অনুধ্যান পদ্ধতির চেয়ে আরোহী পদ্ধতির ওপর জোর দেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য এই পদ্ধতি নির্ভরশীল ছিল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, তথ্য সংগ্রহ ও সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের জন্য তথ্যের বিন্যাসের ওপর। এর জন্য সমস্ত পূর্ব-ধারণা, ব্যক্তিগত সংস্কার ও ভ্রান্তি বর্জন করতে হবে। দীর্ঘ প্রচলিত কোনও ধারণাকেই চিরন্তন সত্য মানা যাবে না। বস্তুত বেকনের চিন্তার প্রভাবেই ইংলন্ডে কার্যকরী বিজ্ঞানচর্চার প্রথম সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়—রয়াল সোসাইটি। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে। মনে করা হ'ত যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভেতরে এক প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে যা মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য আবিষ্কার ও ব্যবহার করা যেতে পারে। একইভাবে মানব সংসারকে বোঝা যেতে পারে।

ডেকার্টসের দর্শনও মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্য এবং এ ব্যাপারে গীর্জার আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে বিজ্ঞানের বিকাশে সাহায্য করেছিল। ডেকার্টস্ বলেছিলেন যে চিন্তার স্বচ্ছতা থাকলে যুক্তিগ্রাহ্য সমস্ত জ্ঞানই অর্জন করা সম্ভব। এ ব্যাপারে তিনি অবরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে অনুসন্ধানের ওপরে জোর দেন। অবরোহী পদ্ধতি হ'ল কিছু যুক্তিনির্ভর পূর্বানুমান তৈরী করা এবং তারপরে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে ঐসব পূর্বানুমানগুলির যাথার্থ্য যাচাই করা। তাঁর দর্শনের উদ্দেশ্য ও বেকনের উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল অভিন্ন। তাঁর সিদ্ধান্তগুলির প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন :

'এর থেকে আমি শিখলাম যে এভাবে জীবনের উপযোগী জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব। বিদ্যালয়ে যেভাবে দূর কল্পনাভিত্তিক দর্শন পড়ানো হয়, তার পরিবর্তে আমরা একটি ব্যবহারিক দর্শন তৈরী করতে পারি। আমরা জানার চেষ্টা করব কিভাবে আগুন, জল, বায়ু, নক্ষত্রমণ্ডলী বা আকাশ কাজ করে, তাদের পেছনে কি শক্তি আছে। এটা ঠিক যেমন আমরা বিভিন্ন কারিগরদের শিল্প সম্পর্কে জানতে পারি তার মতন। এরপর আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারি। এভাবে আমরা প্রকৃতির ওপরে প্রভুত্ব করতে সক্ষম হ'ব।

৮.৭ বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা

নবজাগরণ যুগেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম। এর ফল প্রথম প্রত্যক্ষ করা যায় জ্যোতির্বিদ্যার চর্চায়। কোপারনিকাস অক্ষের ওপরে পৃথিবীর ঘূর্ণন এবং সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের কথা বলেন। এর ফলে প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ছেদ ঘটে। হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে মনে করা হ'ত যে পৃথিবীই এই জগতের কেন্দ্র। মধ্যযুগের দার্শনিকের কাছে এই ধারণা ছিল অভ্রান্ত। এই ধারণাকে অস্বীকার করার অর্থ হ'ল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে পুরনো ধর্মতাত্ত্বিক ধারণার ওপরে আক্রমণ। সুতরাং প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী বলে এই মত নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য। কোপারনিকাসের গ্রন্থ 'অন দ্য রেভোলিউশন অফ্ দ্যা শেলেস্টিয়াল অর্বস' ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ বছরেই কোপারনিকাসের মৃত্যু হয়। গীর্জার বিরোধিতার ভয়ে তিনি এই বই প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। পরে গ্যালিলিও কর্তৃক এই মত সমর্থিত হওয়ার আগে মুক্ত বিশ্বজগতে পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র—এই মতবাদ, ঈশ্বর সৃষ্ট ও রক্ষিত বদ্ধ বিশ্বজগত সম্বন্ধীয় ধর্মীয় মতবাদের ওপর তীব্র আঘাত করে। অর্ধশতক পরে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে গিওরদানো ব্রুনোর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ধারণা ধর্মবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়।

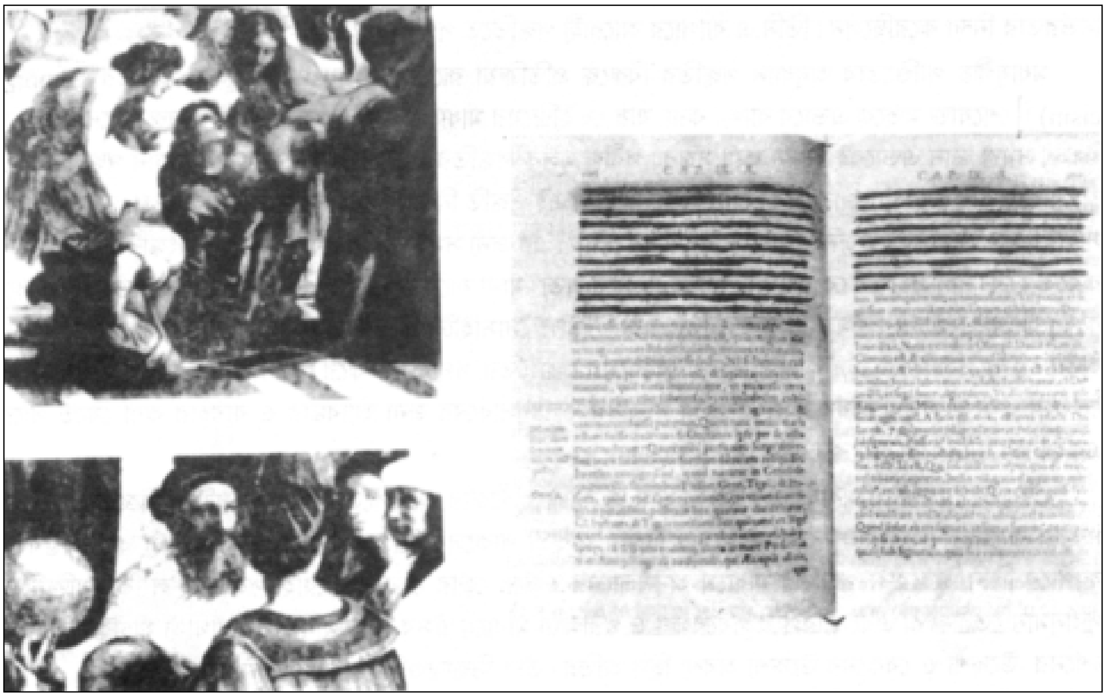

২২. (ক) এথেন্সের কয়েকজন ভূবিদ্যাবিশারদ। ২২. (খ) এথেন্সের কয়েকজন জোতির্বিদ।
২২. (গ) নৌবিদ্যা সংক্রান্ত একটি বই যেখানে চার্চের নিষেধাজ্ঞায় কোপারনিকাসের মদতে কালো কালিতে মুছে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নতুন ধারণা যাচাই করার সুযোগ মেলে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে। এই যন্ত্রই সে যুগের আবিষ্কৃত সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। কোপারনিকাসের মৃত্যুর এগারো বছর পরে গ্যালিলিওর জন্ম। তিনি এই যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করে কোপারনিকাসের তত্ত্বের প্রমাণ দাখিল করেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে বিচার ও নিন্দাবাদের সম্মুখীন হয়ে নিজের এই মত প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়। তাঁকে নামমাত্র দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় এবং জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় এমন বৈজ্ঞানিক কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়। গ্যালিলিওর বিচারের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি যুগের অবসান হয়। গ্যালিলিওর এই ভর্ৎসনা জনপ্রিয় হয়নি; তাই বিশ্বজগত সম্বন্ধে পুরনো তত্ত্ব জোর করে চাপানোর চেষ্টা ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়।

মানবদেহ ও রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কেও নতুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে পুরনো কুসংস্কার বর্জন করা সম্ভব হয়। নবজাগরণ যুগের শিল্পীদের মানব-শরীর সম্পর্কে আগ্রহের কথা আমরা আগেই বলেছি। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (যে বছর কোপারনিকাসের বই প্রকাশিত হয়) বেলজিয়মের ভেসালিয়স বহু চিত্রিত 'দ্য হিউমানি করপোরিস্ ফেব্রিকা' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। মানবশরীরের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালব্ধ তাঁর এই বইটি শারীরস্থানের ওপর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত প্রথম বই। স্পেনের সেরভেটুস রক্ত-সঞ্চালনের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গীর্জার ত্রিত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাস প্রকাশ করায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। হৃৎপিণ্ড থেকে সমস্ত শরীরে রক্তসঞ্চালন এবং আবার ফিরে যাওয়া সম্পর্কিত বিশদ তথ্য প্রথম

পেশ করেন একজন ইংরেজ—হার্ভে, ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লেখা 'মুভমেন্ট অফ্ হার্ট', রচনায়। এযুগে বিজ্ঞানে আরও অনেক দিক্পালের আর্বিভাব হয়েছিল এবং বড় ধরনের আবিষ্কারও হয়েছিল।

২৩. (ক) লিওনার্দো দা ভিঞ্চি অঙ্কিত হাড় ও পেশীর পর্যালোচনা

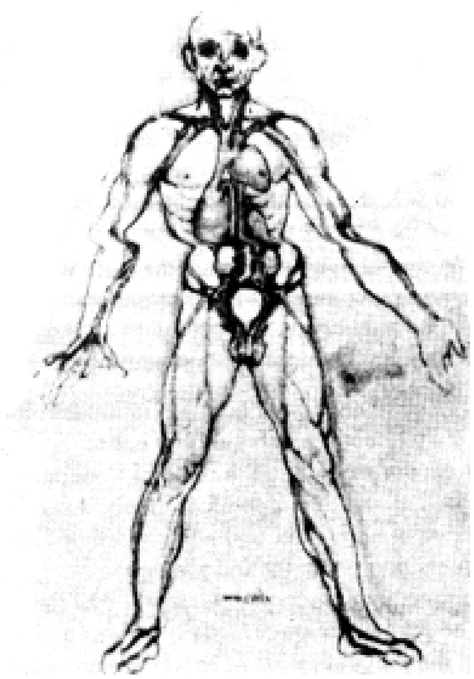

২৩. (খ) মানব শারীরবৃত্তের পর্যালোচনা (১৪৯০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ)

অনুশীলনী—২

(১) আনুমানিক ১০০ শব্দের মধ্যে নবজাগরণের যুগে শিল্প ও স্থাপত্যোর ওপরে মানবতাবাদের প্রভাব সম্বন্ধে লিখুন। পাঠকেন্দ্রের Counsellor-এর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করুন।

(২) নিম্নলিখিত কোন্ বাক্যটি সঠিক? (✓ অথবা × চিহ্ন দিন) :

(ক) স্থানীয় ভাষায় ব্যবহার নবজাগরণের যুগে জনপ্রিয় হয়েছিল।

(খ) নবজাগরণের যুগে শিল্পের মাধ্যমে ধর্মীয় ধারণা প্রচার করা হ'ত।

(গ) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের পথ খুলে দিয়েছিল।

(ঘ) তাঁর আবিষ্কারের জন্য গ্যালিলিওকে গীর্জা সম্মান জানিয়েছিল।

৩। নবজাগরণের যুগে আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের একটি তালিকা তৈরী করুন।

....
....
....
....
....
....
....
....
....

৮.৮ রাজনৈতিক তত্ত্ব

মধ্যযুগের প্রথম দিকে গীর্জা সমর্থিত একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব চালু ছিল যে রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি। সুতরাং শাসক স্বৈরাচারী হলেও তার প্রতি জনতার আনুগত্য প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। পরবর্তী সময়ে স্বৈরাচারী শাসককে হত্যা করার অধিকার নিয়ে দার্শনিকেরা বিতর্ক করেছিলেন। চতুর্দশ শতকে ও পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু গণবিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর ফলে ইওরোপে একটা বৈপ্লবিক মনোভাব তৈরী হয়েছিল। বিদ্রোহগুলির নেতাদের মধ্যে অনেকেই ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের কাজকর্ম ও আদর্শের মাধ্যমে আরও উন্নত একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার আশা সঞ্জীবিত হয়েছিল। স্বৈরতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি দীর্ঘদিন ধরেই আলোচিত হচ্ছিল। পৃথিবীতে শাসক যেহেতু ঈশ্বরের প্রতিনিধি তাই খ্রীষ্টান প্রজারা শাসকদের প্রতি অনুগত থাকবে এই ধারণা প্রবল ছিল। মধ্যযুগের দার্শনিকরা সাধারণভাবে মনে করতেন যে গোটা পশ্চিম ইওরোপ একজন সম্রাটের অধীনে থাকবে। তাঁর অধীনে অন্যান্য রাজা থাকতে পারে। এই সম্রাটরা হবেন পোপ বা পবিত্র রোমান সম্রাট।

মধ্যযুগে রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা মনে করতেন যে প্রত্যেক শাসকের ক্ষমতাই সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের কোন ধারণাই ছিল না। শাসক তাঁর ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করতেন না, প্রচলিত আইন শুধু প্রয়োগ করতেন। অবশ্য গণতন্ত্র বা জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা 'নৈতিক' বা ধর্মীয় ধারণার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এ যুগের সব থেকে বড় চিন্তাবিদ ছিলেন মেকিয়াভেলি। তিনি প্রচলিত ভণ্ডামি থেকে মুক্ত, বাস্তবমুখী, মৌলিক ও দৃঢ় রাজনৈতিক দর্শন উপস্থাপন করেন। 'মেকিয়াভেলির মত' এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে—'রাজনৈতিক কাজকর্ম অন্যান্য কাজের মতই; রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য যে কোনও উপায়ই, অসাধু হলেও, অবলম্বন করা যায়।' মেকিয়াভেলির মত ছিল তদানীন্তন রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর 'চিন্তা-

প্রসূত প্রতিক্রিয়া'। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্যা প্রিন্স'-এর উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন যে তাঁর যুগের শিল্পী ছবির বিষয়বস্তু ভালভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য যে দৃশ্যপটের অবতারণা করত, তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই কাজ করতে চান। অর্থাৎ, যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত থেকে রাজনৈতিক দৃশ্য অবলোকন করা, যার দ্বারা দৃশ্যটি যথাযথ ফুটিয়ে তোলা যায়। মেকিয়াভেলি মনে করতেন যে রাষ্ট্রই শেষ কথা। তিনি মনে করতেন যে শাসকের স্বৈরাচারী ক্ষমতা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজন। তিনি শাসকের ক্ষমতার ওপরে কোনও সীমাবদ্ধতা আরোপ করার বিরোধী ছিলেন। শাসকের প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের শক্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা এবং যে কোনও উপায়েই তাঁর এই দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন।

ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারের যুগ

এই যুগ তাই ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী শাসনের যুগ। এর ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারা এই প্রবণতার বিরোধিতাও করেছিল। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে রাজাকে সমর্থন করলেও, শাসকের অবিসম্বাদী ক্ষমতার বিরোধিতাও করেছিল। যে দেশে পার্লামেন্ট বা সংসদের মত প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই ছিল, সেখানে সংসদের সদস্য উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা তাদের বিশেষ অধিকার ও দাবী প্রতিষ্ঠা করতে কিছুটা সক্ষম হয়েছিল। চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রচার করেন পদুয়া'র মারসিলিও। তাঁর মতে সার্বভৌমত্ব ঈশ্বরের কাছ থেকে জনগণের হাতে আসে এবং তাদের কাছ থেকে সরকারের হাতে যায়। অতএব সরকারের উচিত জনগণের কাছে দায়িত্বশীল থাকা। 'জনগণ' বলতে উচ্চবর্গের মানুষকেই বোঝাত এবং রাজার ক্ষমতার ওপরে কোনও সীমাবদ্ধতা থাকলে, তা উচ্চবর্গের জন্য এবং তাদের দ্বারাই আরোপিত হ'ত। 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' বলতে গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রকে বোঝাত না। ইতালিতে, জার্মানীতে, হল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডে বহু প্রজাতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু কোথাও সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হ'ত না। একমাত্র চেকোস্লোভাকিয়ার বোহেমিয়াতে জন হাসের অনুগামীরা কিছুদিনের জন্য প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ আরও অনেক পরে হয়েছিল।

৮.৯ ধর্ম-সংস্কার

নবজাগরণ যুগের শেষ পর্যায়ে ধর্মসংস্কার ইওরোপের ইতিহাসে দুটি প্রধান ঘটনার বিকাশ ঘটিয়েছিল। প্রথম, প্রতিবাদী বা প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের আবির্ভাব যার ফলে খ্রীষ্টধর্ম বিভক্ত হয়েছিল; দ্বিতীয়, বেশ কিছু দেশ রোমের ক্যাথলিক গীর্জার মধ্যেও সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এবং এই সংস্কার আন্দোলনকে ক্যাথলিক বা প্রতি-ধর্মসংস্কার আন্দোলন বলা হয়। কিন্তু ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন নিছক ধর্মীয় আন্দোলনই ছিল না। সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে (যার ফলে মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনা হয়) এর নিবিড় যোগ ছিল। নবজাগরণ আন্দোলনের মতো ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনও ইওরোপে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করতে হবে।

মধ্যযুগের প্রথম দিকে ক্যাথলিক গীর্জা, ধর্মগুরু পোপের অধীন একটি বিশাল স্তরবিন্যস্ত সংগঠন হিসেবে বিরাজ করত। পুরো সংগঠনের ওপরে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ছিল পোপের এবং তিনি নিজেই প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সরাসরি প্রয়োগ করতেন। এজন্য পোপের এই অবস্থানকে প্রায়শই 'পোপের রাজতন্ত্র' বলে উল্লেখ করা হ'ত। উচ্চ-নীচভেদে সকলের ওপরে গীর্জার আধিপত্য প্রসারের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করা হ'ত।

বছরে অন্তত একবার গীর্জার কোন্‌ও যাজকের কাছে পোপের স্বীকারোক্তি করা এবং তার জন্য শাস্তি মেনে নেওয়া প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। যাঁরা এর প্রতিবাদ করতেন তাদের ধর্মাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হ’ত। মনে করা হ’ত যে যাকে বঞ্চিত করা হ’ল সে সাময়িকভাবে নরকে নির্বাসিত হ’ল। সে মারা গেলে যথাযথ আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাকে সমাহিত করা যেত না। অন্যান্য খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তার মেলামেশাও নিষেধ ছিল।

৮.৯.১ গীর্জা ও ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বিতর্ক

গীর্জা প্রায় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ ছিল। এ ধরনের মতের অমিল বহু শতক ধরে বজায়ও ছিল। ত্রয়োদশ শতকে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত কিছু বিতর্ক দার্শনিক আলোচনার আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। এগুলি বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হ’ত। ক্যাথলিক গীর্জার গুরুত্বপূর্ণ এরকম একটি তত্ত্ব ছিল স্যাক্রামেন্ট (Sacrament)-এর মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের নির্দেশ মানুষের কাছে পৌঁছায়। এ ধরনের সাতটি ‘স্যাক্রামেন্ট’ অনুমোদিত ছিল, যেমন—Baptism, Confirmation, Penance, Eucharist, এবং Lord’s Supper, Marriage, Ordination ও Extreme unction.

এগুলি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবার জন্য অপরিহার্য ছিল এবং এগুলি ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের উপায় ছিল না। স্যাক্রামেন্ট তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত ছিল পুরোহিত তত্ত্ব। মনে করা হ’ত, বিশপ (যার নিয়োগ পোপ সমর্থন করেছেন) কর্তৃক নিযুক্ত পুরোহিত খ্রীষ্টান সেন্ট পিটার প্রদত্ত ক্ষমতার একটি অংশের উত্তরাধিকারী (পোপেরা সেন্ট পিটারের নিকট থেকে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন)। সাধারণ মানুষের কাছে সব থেকে প্রয়োজনীয় তিনটি ‘স্যাক্রামেন্ট’ ছিল—Baptism, Penance এবং The Eucharist.

এই তত্ত্ব অনুযায়ী পুরোহিতরা কিছু অলৌকিক ঘটনার জন্য এবং পাপীদের পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারতেন। এছাড়া খ্রীষ্ট ও অন্যান্য যীশুখ্রীষ্ট ও সন্তদের স্মৃতিচিহ্ন পূজার প্রচলনও ছিল। কিন্তু প্রায়শই এগুলি নকল বলে গণ্য হ’ত। মানব আত্মার পবিত্রীকৃতি এবং পুরোহিতদের কৌমার্যব্রত অবলম্বনও চালু ছিল।

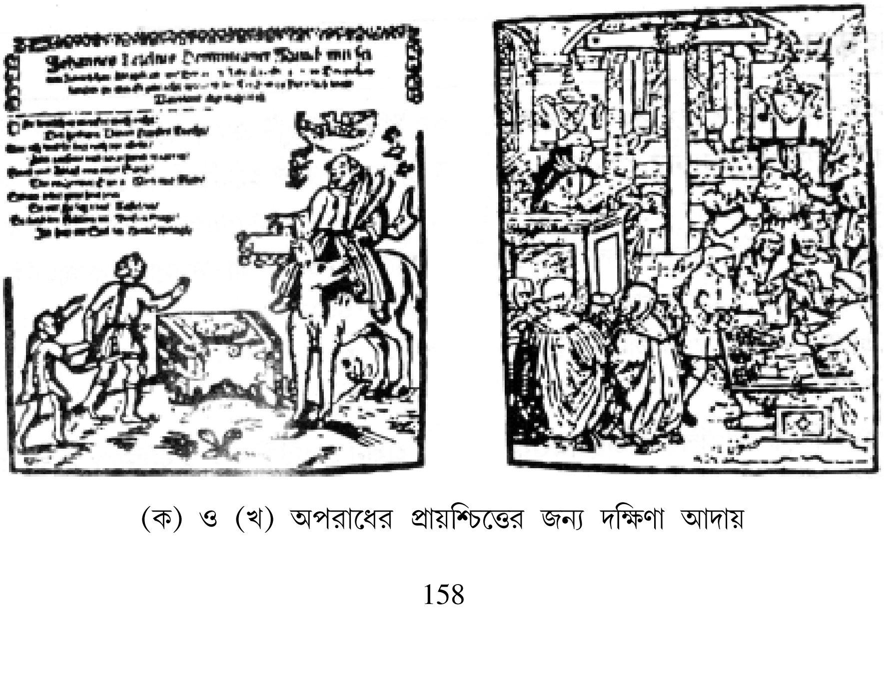

(ক) ও (খ) অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দক্ষিণা আদায়

গীর্জা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের আত্মার পরিত্রাণ। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে গীর্জা শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রতিবাদী ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনকে প্রায়শই ক্যাথলিক গীর্জায় বেড়ে-ওঠা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলে বর্ণনা করা হয়। গীর্জার কিছু পুরোহিত ও কর্মচারী এ ব্যাপারে নিতান্তই অজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা অনৈতিক ও বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন; অনেকেই জুয়ার আড্ডা চালাতেন; অনেকেরই উপপত্নী ছিল। অনেকেই সর্বোচ্চ অর্থের বিনিময়ে এই সব পদ ক্রয় করতেন। বলা বাহুল্য, নিয়োগের পরে এই বাড়তি অর্থ তাঁরা সংগ্রহ করতেন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জন্য মোটা অর্থ আদায় করে। বিবাহ বা প্রায়শ্চিত্তসংক্রান্ত কিছু বিষয়ে অর্থের বিনিময়ে দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা যেত। পোপ ও উচ্চ যাজকেরা শাসকদের মতোই জীবনযাপন করতেন। নতুন একটি দুর্নীতি ছিল ইনডাল্‌জেন্স বা মুক্তিপত্র বিক্রয়। এই পত্র ক্রয় করলে ঐহিক জীবনে এবং নরকে শাস্তির থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে বলে প্রচার করা হ'ত। এই পত্র কিনলে স্বর্গের দ্বারও উন্মুক্ত হবে বলে মনে করা হ'ত। এটিকে প্রতিবাদী ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রত্যক্ষ কারণ বলে মনে করা হয়।

গীর্জা অনুমোদিত বিধি বা তত্ত্বের বিরোধী যে-কোনো মতকে ধর্মদ্রোহিতা বলে মনে করা হ'ত এবং এই মতের প্রবক্তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হ'ত। ধর্মদ্রোহিতা বন্ধ করার জন্য গীর্জা একটি বিশদ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ইনকুইজিশন নামে একটি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মদ্রোহীদেরা খুঁজে বের করে শাস্তি দেবার জন্য। গীর্জা অনুমোদিত নীতি বা তত্ত্ব থেকে সকল বিচ্যুতির এবং গীর্জার দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রোধ করা হ'ত এবং ধর্মদ্রোহীরূপে পুড়িয়ে মারা হ'ত। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে সন্ন্যাসিনীদের দুটি সংঘ ডোমিনিকান ও ফ্রান্সিসকান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংঘের পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা শীঘ্রই গুপ্তচরবৃত্তি বা মিথ্যা ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইনকুইসিটর বা আদালতের বিচারক মাথা-ঢাকা কালো টুপি ও কালো পোষাক পরে অনুচরদের নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করতেন এবং গ্রামবাসীদের আদেশ দিতেন ধর্মদ্রোহীদের চিহ্নিত করার জন্য। এই সুযোগে অনেকেই পুরনো ব্যক্তিগত ঝগড়ার জেরে শত্রুদের মিথ্যা অপবাদ দিত।

চতুর্দশ শতক থেকে গীর্জার কিছু তত্ত্ব সম্পর্কে ভিন্ন মতের প্রকাশ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধীরে ধীরে শুরু হয়। ক্যাথলিক গীর্জার ওপর নির্ভর না করে প্রথম যুগের খ্রীষ্টান ধর্ম এবং বাইবেলকে আঁকড়ে ধরার কথা অনেকে বলেন। ইংলন্ডে জন ওয়াইক্লিফ বাইবেলের সর্ব্বোচ্চ কর্তৃত্বের কথা বলেন। ক্যাথলিক গীর্জার ব্যবহারের ভাষায় পাওয়া যেতনা। লাতিন, হিব্রু এবং গ্রীক এই তিনটি ভাষাকেই পবিত্র মনে করা হ'ত। অন্য ভাষায় বাইবেল অনুদিত হলে ধর্মের পবিত্র আধার হিসাবে বাইবেলের পবিত্রতাও ক্ষুণ্ণ হবে। সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য বাইবেল পাঠ প্রয়োজন। কিন্তু এ প্রয়োজন মেটাতে হলে বাইবেল সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় অনূদিত হওয়া দরকার। ওয়াইক্লিফের অনুপ্রেরণায় বাইবেলের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ হয়। তিনি পোপকে শয়তানের বাহিনীর অধিনায়ক বলে বর্ণনা করেন। তিনি যাজকদের নিন্দা করেন ও ইন্‌ডালজেন্স বা মুক্তিপত্র বিক্রয়কে দুর্নীতি বলে অভিহিত করেন। তিনি Educharist স্যাক্রামেন্টের গুরুত্ব অস্বীকার করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে বাইবেলের বাণী প্রচার করার জন্য তিনি প্রচারক (দরিদ্র প্রচারক নামে খ্যাত) নিযুক্ত করেন। ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগামীরা অনেকেই তাঁকে ছাড়িয়ে যান ও আরো অনেক তত্ত্বের ও তাদের প্রয়োগের বিরোধিতা করেন।

৮.৯২ প্রতিবাদী ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন

মনে করা হয় এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন সেন্ট-অগস্টাইন সংঘের সন্ন্যাসী মার্টিন লুথার জার্মানীর উইটেনবার্গের গীর্জার দরজায় তাঁর ৯৫টি বক্তব্য টাঙিয়ে দেন। এতে তিনি মুক্তিপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেন। তিনি প্রতিপক্ষকে তাঁর বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক করার জন্য আহ্বান জানান ও এর অনুলিপি বিভিন্ন শহরে বন্ধুদের কাছে পাঠান। তাঁর বক্তব্যগুলির মধ্যে ছিল—

'অতএব মুক্তিপত্রের প্রচারকেরা ভ্রান্ত, কেননা তারা বলে যে পোপের দেওয়া মুক্তিপত্রের দ্বারা একজন সমস্ত শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে.....

তারা প্রচার করে যে মুহূর্তে মুক্তিপত্র ক্রয়ের টাকা দানপত্রে বাজতে থাকে তখনই আত্মা নরক ছেড়ে উড়ে যেতে পারে....

এটা সুনিশ্চিত যে, যখন দানপত্রের টাকা বাজতে থাকে লোভ করে, আর্থিক লাভ হয়, কিন্তু গীর্জার অনুমোদন নির্ভর করে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর....

খ্রীষ্টানদের এটাই শেখানো উচিত যে পোপের কর্তব্য প্রয়োজনবোধ সন্ত পিটারের বেসিলিকাও বিক্রয় করা উচিত এবং নিজের অর্থও দান করা উচিত তাদের, যাদের নিকট থেকে ক্ষমা প্রদর্শনকারী প্রচারকেরা অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় করছে।'

এর পরের দু বছর ধরে লুথার বেশ কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করে নিজের তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ক্যাথলিক গীর্জার নীতি ও তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর নিজের তত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। সুতরাং ক্যাথলিক গীর্জার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা ছাড়া তাঁর সামনে অন্য কোন বিকল্প নেই। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ তাঁকে ৬০ দিনের মধ্যে তাঁর প্রচারিত মত প্রত্যাহার করতে বলেন, নচেৎ তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হবে। তিনি পোপের এই পত্রটি প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলেন। এসময় তাঁর বন্ধু স্যাক্সনির শাসক তাঁকে আশ্রয় দেন ও তাঁকে রক্ষা করেন। জার্মানীতে অনেক শাসকই গীর্জার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন; ফলে লুথার যখন ধর্মাধিকার থেকে বঞ্চিত, তখন তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। পরের ২৫ বছর ধরে তিনি একটি স্বাধীন জার্মান গীর্জা গড়ে তুলতে ও নিজের তত্ত্বকে আরো সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। তিনি ক্যাথলিক গীর্জার স্তরবিন্যাস সংগঠনকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন। তাঁদের অন্যান্য সংস্কারের মধ্যে ছিল গীর্জার উপাসনায় জার্মান ভাষার ব্যবহার, ধর্মীয় সংঘগুলি ভেঙ্গে দেওয়া, পুরোহিতদের বিবাহের অধিকার প্রদান। এছাড়া তিনি অস্বীকার করেন যে পুরোহিতরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং এজন্য তাদের বিশেষ মর্যাদা আছে। তিনি Baptism ও The Eucharist ব্যতীত অন্য স্যাক্রামেন্টগুলিকে বাদ দেন। ভাল কাজের চেয়ে তিনি বিশ্বাসের ওপর জোর দেন, এমনকি তীর্থযাত্রা বা স্মৃতিচিহ্ন পূজার ওপরেও নয়। তিনি বাইবেলের পূর্ণ কর্তৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যের তত্ত্বকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের ওপরে ক্যাথলিক গীর্জার কর্তৃত্বের মতবাদ তিনি পরিহার করেন।

ক্যাথলিক গীর্জা ফলত ভাগ হয়ে যায় এবং শুরু হয় বিদ্রোহ। প্রথমে এর নেতৃত্বে দেয় নাইটার। পরে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা, প্রধানত, কৃষকেরা। এই বিদ্রোহ, একদিকে লুথারের বিরুদ্ধে বিরোধিতার অবসান করে; অন্যদিকে, চরম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে লুথারের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়। কৃষক-বিদ্রোহ দমনে লুথার শাসক ও সামন্ত প্রভুদের পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি বিদ্রোহীদের 'ক্ষ্যাপা কুকুরের' মত দমন করার বিধান দেন। এই বিদ্রোহীদের দলে ছিল চরমপন্থী সংস্কারক বলে পরিচিত

‘এন্যাবাপ্টিস্ট’ নামে একটি গোষ্ঠী। এরা গীর্জাকে রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করার পক্ষপাতী ছিল। তারা পুরোহিতদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করত, সম্পদ সঞ্চয়ের বিরোধিতা করত, যাজকদের স্তরবিন্যাসের নিন্দা করত এবং পরস্পরের সঙ্গে সবকিছু ভাগ করে নেওয়া প্রত্যেক ধার্মিক খ্রীষ্টানদের কর্তব্য বলে মনে করত। তাদের নিন্দা করে লুথার বলতেন—

“কিছু ধর্মবিদ্রোহীদের মতে কারও কোনও কর্তৃত্ব স্বীকার করা উচিত নয়...কারুর কোনও জিনিষে মালিকানা থাকা উচিত নয়....বাড়ী ঘর ছেড়ে সকলের উচিত সবকিছু যৌথভাবে ভোগ করা। এরা শুধু ধর্মদ্রোহী নয়, এরা বিদ্রোহীও এবং নিঃসন্দেহে এদের শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।”

৮.৯.৩ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন

গীর্জার নৈতিক অবক্ষয় ও তত্ত্বগত বিরোধ ছাড়াও প্রতিবাদী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পেছনে সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনেরও প্রভাব ছিল। এই সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একধরনের জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয় যে তারা একই অঞ্চলের মানুষ ও অন্য জাতির থেকে পৃথক, সুতরাং বিদেশী শাসকের অধীনে তাদের থাকা উচিত নয়। তাদের নিজস্ব শাসক ও সরকার থাকা উচিত, যারা ওপরের ও বাইরের (বিশেষ করে গীর্জার) কোনও আধিপত্য থাকবে না। মধ্যযুগে যা ঘটেনি, এখন এই নতুন চেতনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয়-রাষ্ট্রের গঠন শুরু হয়।

যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বণিকশ্রেণী ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তা এই প্রক্রিয়াকেও শক্তিশালী করেছিল। রোমান ক্যাথলিক গীর্জা সমস্ত জাতির ওপরেই সব বিষয়ে নিজের আধিপত্য চাপানোর চেষ্টা করেছিল, এমন কি রাজাদের নির্বাচন বা তাদের সরানোর ওপরেও এর কর্তৃত্ব ছিল। অতএব, জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও গীর্জার প্রাধান্যের মধ্যে একটি অন্তর্গত বিরোধ শুরু হ’ল। গীর্জার ক্ষমতা খর্ব না করে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্ভব হবে না।

নবজাগরণের যুগের রাজনৈতিক দর্শন আলোচনা করার সময়ে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভবের কথা বলেছি। নিজেদের রাজ্যের সীমানার মধ্যে এই শাসকেরা সম্পূর্ণ অধিকার দাবী করেছিলেন। তাঁদের শাসনের অধিকারকে তাঁরা দৈবস্বত্ব বলেও দাবী করেছিলেন। এই শাসকেরা শুধুমাত্র যে পার্থিব সব ব্যাপার শাসনের সম্পূর্ণ অধিকার দাবী করেছিলেন (পোপও এই দাবী করেছিলেন) তাই নয়, তাঁরা নিজ রাজ্যে গীর্জা ও যাজকদের ওপরেও নিয়ন্ত্রণ দাবী করেছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণ ছিল। গীর্জার অধীন একটি বিশাল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যও ছিল। পোপের অধীন গীর্জা ও ধর্মীয় সংঘগুলির হাতে প্রচুর সম্পদ ও জমি ছিল। গীর্জা করও সংগ্রহ করত যেমন, পির্টাস, পেন্স ও টাইদ। এ ধরণের সম্পদ বিভিন্ন দেশ থেকে আহরিত হয়ে রোমে পৌঁছত। অনুরূপভাবে, মুক্তিপত্র বিক্রয়ের অর্থও চলে যেত রোমে।

সাধারণ মানুষ এভাবে তাদের সম্পদের একটা বড় অংশ রোমে চলে যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই অপছন্দ করত। কিন্তু, শাসকেরা দেখলেন যে গীর্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে তাঁরা বিপুল সম্পদের অধিকার হাতে পাবেন। এই অর্থের সাহায্যে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ও অন্যান্য খরচ মেটানো যাবে। গীর্জার সম্পত্তি কর থেকে মুক্ত ছিল, ফলে করের বোঝা পড়ল বণিক ও উদীয়মান ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর ওপরে। ধর্মীয় কলহ মেটানো গেলেও মৌলিক দ্বন্দ্বগুলির সমাধান সহজ ছিল না। প্রতিবাদী ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, পোপের অধীন ক্যাথলিক গীর্জার মত কোন একজনের অধীন বিশ্বজনীন প্রতিবাদী গীর্জা করতে চায়নি। তা সম্ভবও ছিল না। এই

আন্দোলনে তাই রাষ্ট্রের অধীনে জাতীয় গীর্জা প্রতিষ্ঠার দিকেই এগিয়েছিল।

জার্মানিতে লুথারের সাফল্যের পরে, প্রতিবাদী ধর্মসংস্কার আন্দোলন অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য প্রতিবাদী আন্দোলনের তত্ত্ব সর্বত্র সমান ছিল না। সুইটজারল্যান্ডে প্রতিবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জুইংলি ও কলভিন। বস্তুত, লুথারের তুলনায় কলভিনের মতাদর্শই ইউরোপের বিভিন্ন অংশে অনেক বেশী সমর্থন লাভ করেছিল। ইংলন্ডে রাজা অষ্টম হেনরিকে গীর্জার প্রধান করা হয় এবং ইংলন্ডের গীর্জাকে রাজার অধীন একটি স্বাধীন জাতীয় গীর্জা বলে ঘোষণা করা হয়।

প্রতিবাদী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রচারের পরে পোপ, যাজকবৃন্দ, ক্যাথলিক রাজারা এবং পণ্ডিতেরা বুঝলেন যে এই মতের প্রসার আর দমন করা বা রাজনৈতিক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করা যাবে না। প্রয়োজন ছিল গীর্জা ও পোপতন্ত্রের নৈতিক পুনরুজ্জীবন। ষোড়শ শতকে এই উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সংস্কারের প্রবর্তন করা হয়।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে পশ্চিমী খ্রিষ্টান জগতে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছিল এবং একই সঙ্গে ধর্মীয় বিরোধ ও যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। ১৫৬০-এর দশক থেকে পঁচিশ বছর ধরে ফ্রান্সে আটটি ধর্মীয় যুদ্ধ দেখা গিয়েছিল। ধর্মপ্রচারকদের পুনরুত্থান ও প্রতিযোগী গীর্জাগুলির ধর্মোন্মাদনা ফলে নবজাগরণ যুগের অনেক সুফল স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপার থেকে মানবিক ব্যাপারে আগ্রহ। ডাইনি সন্দেহে হত্যার ইতিহাসে ১৫৬০ থেকে ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ—এই সময়টা ছিল ভয়াবহ। এটা উন্মাদের পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

অনুশীলনী—৩

১) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। (✓ অথবা চিহ্ন × দিন) :

(ক) মধ্যযুগে গণতন্ত্রই ছিল প্রধান রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

(খ) পদুয়ার মার্সিলিও জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন।

(গ) দীক্ষাদান, প্রায়শ্চিত্ত ও Eucharist গুরুত্বপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠান ছিল।

(ঘ) লুথার কৃষক-বিদ্রোহ সমর্থন করেছিলেন।

(ঙ) ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে জাতীয় গীর্জার আবির্ভাব ঘটেছিল।

২) ইউরোপে সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণে গীর্জা যে ব্যাবস্থা নিয়েছিল তার ওপরে দশটি বাক্য লিখুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩) প্রতিবাদী ধর্মসংস্কার আন্দোলন বলতে কি বোঝেন? পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন।

....

....

....

....

....

....

৪) পাঁচটি বাক্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কিছু প্রধান ফলাফল সম্বন্ধে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

৮.১০ জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান

ত্রয়োদশ শতকের ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে আধুনিক ইউরোপের অল্প কিছু জাতীয় রাষ্ট্রকে আমরা চিনতে পারব যা এক সময় হাজার হাজার প্রভুর অধীন ছিল। এই সব সামন্ত-শাসকদের ক্ষমতা ও অবস্থান সম্বন্ধে আমরা আগেই পড়েছি। রাজা থাকলেও তাঁদের ক্ষমতা খুব কম ছিল। অন্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে তাদের সামন্ত প্রভুদের পাঠানো সৈন্যদের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হ'ত। এক রাজ্যের অধিবাসীদের অন্য রাজ্যের অধিবাসীদের থেকে আলাদা করার কোনও সুস্পষ্ট জাতিসত্তার ধারণা ছিল না।

দ্বাদশ শতকে পবিত্র রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্রাজ্যের দাবী ছিল এটা বিশ্বজনীন সাম্রাজ্য

(যেমন ক্যাথলিক গীর্জা দাবী করত যে এটা বিশ্বজনীন গীর্জা) যদিও এই সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল মূলত জার্মানী ও ইতালি, সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ এখানেও সীমাবদ্ধ ছিল। নবজাগরণ ও ধর্ম-সংস্কারের যুগেই নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। যার ফলে আধুনিক কালের স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়। জাতীয় চেতনার উন্মেষের মাধ্যমেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই চেতনার অর্থ এই যে, একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বসবাসকারী মানুষের একটা পৃথক সত্তা আছে। জাতীয় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মধ্যেই এই চেতনার প্রকাশ ঘটে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে।

রাজারা সামন্ত প্রভুদের ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন এবং এর ফলে দুদলের মধ্যে সংঘর্ষ বহুদিন বজায় ছিল। এ ব্যাপারে রাজা, বণিক ও অন্যান্য শহুরে বাসিন্দাদের সাহায্য পেয়েছিলেন। ইতোমধ্যেই বাণিজ্যের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি এবং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই শহরগুলির প্রয়োজন ছিল একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব যা রাজা সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। একমাত্র শক্তিশালী রাজাই সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতা ও বাণিজ্যের ওপর বিধিনিষেধ দূর করে বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া আছে রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন ও আইনশৃঙ্খলা বজায়। নিজের দেশের বণিকদের অন্য দেশের বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকেও রাজারা রক্ষা করে বাণিজ্যের প্রসার প্রশস্ত করতে পারতেন। আবার প্রয়োজনবোধে তাদের প্রতিপক্ষের সাহায্যে রাজা নিজের অধীনে আলাদা সৈন্যবাহিনী, বিচারালয় ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। আগে রাজারা ক্ষমতাহীন ছিলেন; সামন্ত প্রভুদের ওপরে নির্ভরশীল ছিলেন সৈন্যসামন্তর জন্য। এখন সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতার বিলোপ শুরু হ'ল। এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হ'ল ইউরোপে বারুদ আবিষ্কারের ফলে। এর বিরুদ্ধে সামন্তপ্রভুদের দুর্গগুলি আর প্রতিরক্ষার ব্যূহ হয়ে থাকতে পারল না।

বিভিন্ন জাতীয় ভাষার উৎপত্তিও জাতীয় চেতনার বিকাশে সাহায্য করেছিল। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হ'ল নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার ও উপনিবেশ স্থাপন।

জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে মধ্যযুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যার বৈশিষ্ট্য ছিল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ-এর স্থলে এল নতুন জাতীয় রাষ্ট্র যেখানে রাজা তাঁর স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। পরবর্তী শতকগুলিতে জাতীয়তাবাদ ও সংহতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। একই সঙ্গে শুরু হ'ল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম।

এই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলী পরিষ্কার বুঝতে হলে কয়েকটি দেশের, যেমন, ইংলন্ড ও ফ্রান্স, রাজনৈতিক বিকাশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। মনে রাখা প্রয়োজন যে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে দীর্ঘদিন লেগেছিল এবং কিছু ইউরোপীয় দেশ বিংশ শতকেই স্বাধীন হয়েছিল।

৮.১১ ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উপনিবেশ স্থাপন

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বাণিজ্য ও শহরের বিকাশের সঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের সূচনা হয় এবং শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনেরও পালা শুরু হয়। প্রাচ্যের সঙ্গে লাভজনক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত ইতালিয়ানরা, বিশেষ করে ভেনিসের অধিবাসীরা। এই বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হয় প্রথমে পর্তুগাল ও স্পেন এবং পরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড। এর ফলে পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে ভৌগোলিক আবিষ্কার, ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়।

২৫. (ক) কলম্বাসের অভিযান শুরু

পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পর্কে কিছুই জানত না। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আফ্রিকা ও এশিয়ার বৃহৎ অংশ সম্পর্কে এই এলাকাগুলির বাইরে মানুষ কিছুই জানত না। বিশাল অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়া অজানা ছিল এবং মহাসাগরের ওপারে যে একটি বিশাল ভূখণ্ড থাকতে পারে তার সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। আফ্রিকার চারদিকে সমুদ্রপথে প্রদক্ষিণ করার সম্ভাবনা ছিল কল্পনাতীত। যদিও অনেকেই মনে করতেন যে পৃথিবী একটি গোলক, তবুও অনেকেরই আশঙ্কা ছিল যে নাবিকদের মহাসাগরে পাড়ি দেওয়া কোনদিনই শেষ হবে না যদি শেষ হয় তবে পৃথিবী থেকে নীচে পড়ে যাবে। শেষ হয়ে গেল পৃথিবী থেকে পতনও ঘটতে পরে।

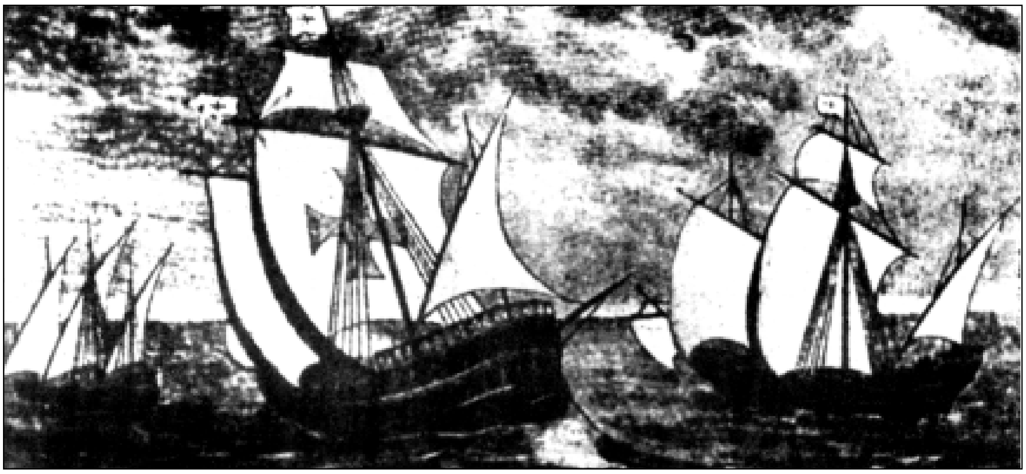

২৫. কলম্বাসের অভিযাত্রী নৌবহর

ভৌগোলিক আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করেন যে নাবিকেরা তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পর্তুগাল ও স্পেনের শাসকেরা। প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করা ও ভেনিসের অধিবাসীদের লাভজনক বাণিজ্যের অংশীদার হওয়া। ইতিমধ্যেই কম্পাস বা এস্ট্রোলেবের মতো সমুদ্র যাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত তালিকা রচনা ও মানচিত্র তৈরীর কৌশল দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল।

১৪৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বারথোলোমিউ দিয়াজ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে যাত্রা করে উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে পৌঁছান। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্যে যাবার নতুন পথ আবিষ্কারের জন্য পশ্চিমে যাত্রা করেন এবং আমেরিকা মহাদেশে উপনীত হন। এর পরে আরও তিনটি সফল সমুদ্র যাত্রার পরেও কলম্বাস-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এই বিখ্যাত তাৎপর্য জানতে পারেননি। ১৪৮৯-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে পৌঁছানোর সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন।

মাগোলান্ (১৫১৯-২২) প্রথম সমুদ্রপথে ভূ-প্রদক্ষিণ করেন। তাঁর জাহাজ অতলান্তিক পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে এবং তারপর ভারত মহাসাগর পেরিয়ে মাত্র কয়েক জন নাবিক নিয়ে স্পেনে ফিরে আসে। যদিও, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া অনেকটা এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর বেশীরভাগই অজানা রইল, এইসব সমুদ্র যাত্রার ফলে পৃথিবীর ভূগোল সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এইসব ভৌগলিক আবিষ্কারের পরে এই প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

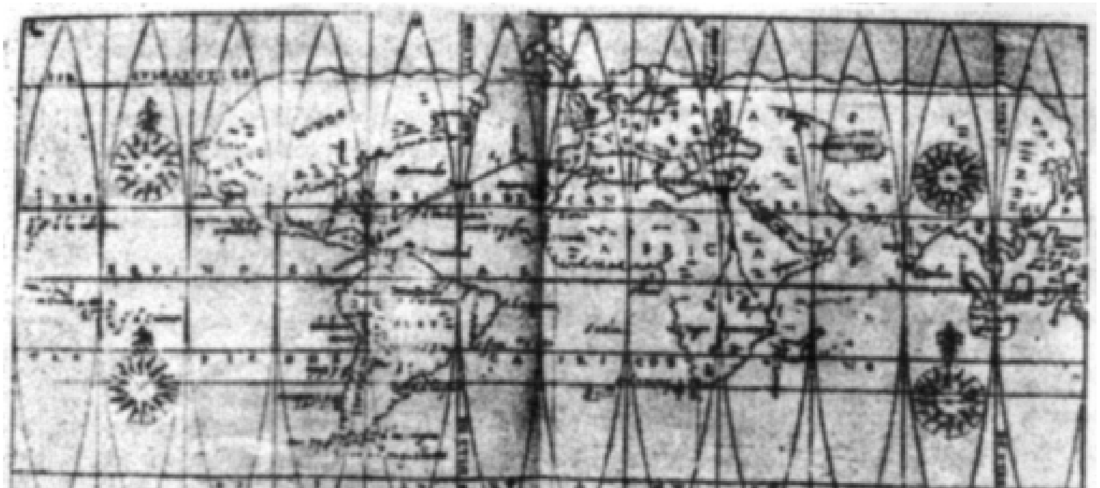

গোটা পৃথিবীর পক্ষেই ভৌগলিক আবিষ্কারের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ভারতবর্ষে যাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের ফলে প্রাচ্যের বাণিজ্যের ওপরে ভেনিসের অধিবাসীদের একাধিপত্যের অবসান ঘটে এবং ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্তুগালের একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপিত হয়। পরে অবশ্য পর্তুগালের আধিপত্যের পরিবর্তে আসে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদের আধিপত্য। বাণিজ্যে সামগ্রিক আকার এবং পণ্যের প্রচুর বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে এশিয়াতে উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা হয়। পরবর্তী কয়েক

শতকে সমগ্র এশিয়া ইউরোপীয় দেশগুলির অধিনস্থ হয়। আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন মূলত উপকূল এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আফ্রিকায় বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের বড় ধরনের উপনিবেশ স্থাপন কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটেছিল। আমেরিকায় কয়েক দশকের মধ্যেই প্রাচীন ইন্‌কা ও আজটেক সভ্যতা ধ্বংস হয় এবং অল্প সংখ্যক ইউরোপীয় ঐ অঞ্চলের বিরাট সংখ্যক অধিবাসীদের অধীনস্থ করতে সক্ষম হয়। ইন্‌কা ও আজটেক অধিবাসীদের সোনা-রূপা ইউরোপীয়রা লুণ্ঠন করে এবং মূল্যবান ধাতুর সন্ধানে পেরু, মেক্সিকো ও বলিভিয়ার খনিগুলি দখল করে। এ সবের ফলে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা ইউরোপে পৌঁছায়।

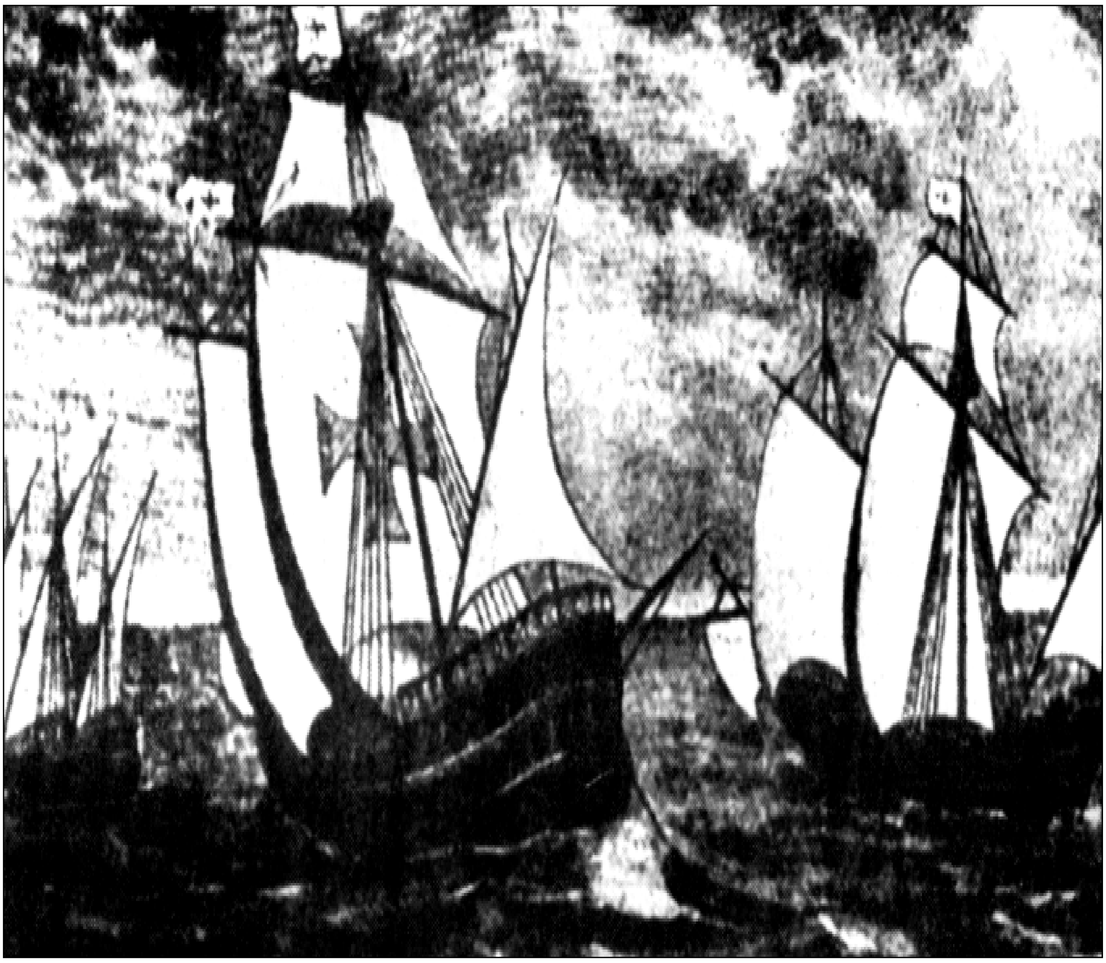

২৭. আমেরিকার একটি বন্দরে ব্যবসায়ীরা

তামাক, আলু বা ভুট্টার মত অপরিচিত পণ্য ইউরোপে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এছাড়া ইউরোপীয়দের স্বার্থে চাল, চিনি, তুলো ও কফি উৎপাদনের জন্য আমেরিকায় বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা হয়।

আমেরিকায় ইওরোপীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হ'ল প্রধানত আখ, তামাক ও তুলো উৎপাদনের জন্য উত্তর আমেরিকায়, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও ব্রাজিলে বাগিচাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন। বাগিচাগুলিতে উৎপাদনের জন্য আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাসদের আনা হ'ত। এরকমভাবে তীব্র শোষণের মাধ্যমে ইওরোপ ও আমেরিকাতে যুক্ত হ'ল। আমেরিকার আদি অধিবাসীরা (যাদের এখন 'আমেরিকান ইন্ডিয়ান' বলা হয়) ইওরোপীয় প্রভুদের জমিতে ভূমিদাসের মত চাষবাস করত, আর বাগিচাগুলিতে কাজ করত আফ্রিকার ক্রীতদাসরা।

পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে কিছু বণিক, নাবিক ও জলদস্যুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে দাস-ব্যবসা শুরু হয়; কিন্তু ষোড়শ শতক শেষ হওয়ার আগেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন দাস-ব্যবসার কোম্পানি এই ব্যবসা হাতে নেয়। প্রায় তিনশ বছর ধরে আফ্রিকার উপকূল অঞ্চল ও পরে অভ্যন্তর থেকে এই ব্যবসায়ীরা দাসদের ধরে এনে অতলান্তিক মহাসাগর পার করে নিয়ে গিয়ে বাগিচার শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য বিক্রয় করত। লক্ষ লক্ষ আফ্রিকাবাসীদের এভাবে ধরে চালান দেওয়া হত। বহু লক্ষ মানুষ জাহাজের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যাত্রাপথেই মারা যেত। অনুমান করা হয় যে, শুধু পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতেই একশ বছরে ২০ লক্ষ দাস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমেরিকায় ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সমৃদ্ধি এভাবে আমেরিকার আদিম অধিবাসী এবং আফ্রিকার দাসদের শ্রমের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল।

স্বভাবজাত ইউরোপেও এর বেশ প্রভাব পড়েছিল, বিশেষ করে যেসব ইওরোপীয় দেশ উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রণী ছিল বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যাদের প্রভাব ছিল। ধনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

আমরা আগেই বলেছি যে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে যেমন জানা গেল, তেমনি বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগও স্থাপিত হ'ল। কিন্তু এই যোগাযোগ পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে নির্মম শোষণের সাথে যুক্ত হয়েছিল।

অনুশীলনী—৪

১) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক কোনটি ভুল (✓ অথবা × চিহ্ন দিন) :

(ক) ইউরোপে খুব অল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল।

(খ) ১৪৯২ সালে বারথোলোমিউ দিয়াজ আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন।

(গ) আফ্রিকার লোকেদের আমেরিকাতে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হ'ত।

(ঘ) দূরত্ব মাপবার জন্য কম্পাস ব্যবহার হয়।

২) দশটি বাক্যে ভৌগোলিক আবিষ্কারের কিছু প্রধান ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৮.১২ সারাংশ

নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে ধর্ম, সমাজ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী ছিল বেশ কিছু আর্থ-সামাজিক কারণ যেমন, শহারঞ্চলে নাগরিক মুক্তির উন্মেষ, পেশাভিত্তিক সংঘের প্রতিষ্ঠা, সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিকাশ, ভৌগোলিক আবিষ্কার ইত্যাদি। নবজাগরণের ফলে মানবতাবাদের বিকাশ হয়; দৃষ্টিভঙ্গী ঈশ্বর-কেন্দ্রিক থেকে মানব-কেন্দ্রিক হয়। মানবদেহ আর পাপের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হ'ত না। মানবদেহ এখন সৌন্দর্য, মর্যাদা ও সুখের প্রতীক। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে জন্ম হয় নতুন সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের । মূল লক্ষ্য এখন সৌন্দর্য ও নান্দনিক উৎকর্ষের দিকে অবশ্যই, মানবসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে।

ধর্ম-নিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী চিন্তার উদ্ভবের ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ সম্ভব হয়। গীর্জা ও বিজ্ঞানের বিরোধে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানেরই জয় হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তার প্রতিষ্ঠার জন্য গীর্জার অনুমোদন আর প্রয়োজন হ'ত না। ধর্মসংস্কারের সময়ে গীর্জার কর্তৃত্বের অপব্যবহারকে আক্রমণ করা হয়। এভাবে শুধু জাতীয় গীর্জার প্রতিষ্ঠাই হয়নি, ক্যাথলিক গীর্জাও প্রতি-ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সংস্কারের চেষ্টা করে। এ সময়ে ইউরোপে জাতীয় গীর্জার প্রতিষ্ঠা হয় ও নতুন রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব হয়। বণিক ও অন্যান্য মানুষ রাজতন্ত্রের অধীনে রাজনৈতিক সংহতির সমর্থন করেন। উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার পেছনে এদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

৮.১৩ প্রধান শব্দগুচ্ছ

স্বৈরতন্ত্র (Absolutism)	:	স্বৈরাচারী সরকার, যেখানে শাসকের হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকে।
এ্যানাবাপ্টিস্ট	:	ষোড়শ শতকে সুইটজারল্যান্ডের প্রতিরাষ্ট্রীয় ধর্ম-সম্প্রদায়।
ব্যাপ্টিজম্ / দীক্ষাদান	:	গায়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাদান অনুষ্ঠান।
ধনতন্ত্র	:	একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে মুনাফার জন্য উৎপাদন করা হয়।
আরোহী	:	যুক্তিসম্মত চিন্তার দ্বারা সিদ্ধান্তে আসা।
এম্পিরিসিজম্ / ব্যবহারিকবাদ	:	প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণ সিদ্ধ করা।

ফ্রেসকো	:	প্লাস্টার শুকানোর আগেই দেওয়ালে জল-রঙ দিয়ে ছবি আঁকার পদ্ধতি।
গথিক	:	স্থাপত্যের রীতি।
গিল্ড বা সংঘ	:	মধ্যযুগে কারিগরদের পেশাদার সংঘ/সমিতি।
ধর্মদ্রোহী	:	গীর্জার অনুমোদিত তত্ত্বের বিরোধী ধারণা পোষণ বা সমর্থন করত।
মানবতাবাদ	:	যে চিন্তাধারায় মানুষকে নীতিবাদী মনে করা হয় ও মর্যাদা দেওয়া হয়।
দক্ষ শ্রমিক	:	যারা শিক্ষানবিশীর পর একটি পেশায় কাজ করত।
সাক্রামেন্ট	:	খ্রীষ্টানরা যে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মানুষ্ঠান করতে বাধ্য থাকত যীশুর নির্দেশে।
স্কলাস্টিসিজম্	:	মধ্যযুগে প্রচলিত পাণ্ডিত্য বা দর্শন; এই দর্শনের ভিত্তি ছিল এ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্র।
টাইদ্	:	জমির আয়ের এক-দশমাংশ যা গীর্জাকে দিতে হ'ত।

৮. ১৪ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১) ৮.২ অংশ দেখুন।
২) ক) × খ) × গ) ✓ ঘ) ✓
৩) ৮.৩১ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী—২

১) ৮.৫ অংশ দেখুন।
২) ক) ✓ খ) ✓ ঘ) ✓ ঘ) ✓
৩) ৮.৭ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী—৩

১) ক) × খ) ✓ ঘ) ✓ ঘ) ✓
২) ৮.৯.১ অংশ দেখুন।
৩) ৮.৯.২ অংশ দেখুন।
৪) ৮.৯.৩ে অংশ দেখুন।

অনুশীলনী—৪

১) ক) × খ) × ঘ) ✓ ঘ) ×
৩) ৮.১১ অংশ দেখুন

একক ৯ ❒ শিল্প বিপ্লব

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য

৯.১ প্রস্তাবনা

৯.২ শিল্প-বিপ্লব

৯.২.১ বাণিজ্যিক মূলধন

৯.২.২ মজুর শ্রমিকের উদ্ভব

৯.২.৩ পুটিং-আউট ব্যবস্থা (Putting-out System)

৯.২.৪ বেষ্টন ব্যবস্থা (The Enclosure Movement)

৯.৩ বাজার ও কৃষিক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদন

৯.৩.১ কৃষি-বিপ্লব

৯.৩.২ কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক

৯.৪ কারখানা ও যন্ত্র

৯.৪.১ নতুন প্রযুক্তি

৯.৪.২ কারখানা ব্যাবাস্থা, শ্রমিক ও আইন

৯.৫ মূলধনের সঞ্চয় এবং মুনাফার প্রবর্তন

৯.৫.১ মূলধন সংঘটনের পরিবর্তন

৯.৫.২ বিকাশের চক্রাধার ধারা

৯.৬ ধনতন্ত্রের প্রসার

৯.৭ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব

৯.৮ বিশ্বের বিভাজন ও উপনিবেশ স্থাপন

৯.৯ সারাংশ

৯.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৯.১১ উত্তরমালা

৯.০ উদ্দেশ্য

আধুনিক পৃথিবীতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গঠনের পশ্চাতে শিল্প-বিপ্লবের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই একক পাঠ করে আমরা জানব—

- শিল্প-বিপ্লব কিভাবে হ'ল;
- কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি ও কৃষির প্রসার কিভাবে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হতে সাহায্য করেছিল;
- শিল্প-বিপ্লবে নতুন প্রযুক্তি ও শ্রমের ভূমিকা;
- শিল্প-বিপ্লব কিভাবে রাজনৈতিক কাঠামোকে প্রভাবিত করেছিল, এবং
- কিভাবে শিল্প-বিপ্লব উপনিবেশ স্থাপনের বীজ বপন করেছিল।

৯.১ প্রস্তাবনা

আমরা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তফাৎ লক্ষ্য করি। কোথাও কল-কারখানা বা খনি অঞ্চল দেখা যায়; আবার কোথাও শুধু কৃষিজমি। অনুরূপভাবে আমরা যদি বিদেশ ভ্রমণ করি তো শিল্পোন্নত দেশ ও শিল্পে অনগ্রসর দেশের মধ্যে তফাৎ লক্ষ্য করব। শেষোক্ত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের খুব সামান্য অংশই শিল্প থেকে আসে। অতলান্তিক মহাসাগরের পাশেই ইওরোপের উত্তরাঞ্চল ও আমেরিকা এবং পরে বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া ও জাপান শিল্পোন্নত দেশের পর্যায়ে পড়ে।

অন্যদিকে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় বহু দেশ শিল্পের ক্ষেত্রে অনুন্নত ও মূলত কৃষিভিত্তিক দেশের পর্যায়ে পড়ে। প্রযুক্তির জন্য তারা বিভিন্নভাবে শিল্পোন্নত দেশের ওপর নির্ভরশীল। এ ধরনের পশ্চাৎপদ বেশীর ভাগ দেশই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড বা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশ হিসাবে ছিল। এই প্রাক্তন উপনিবেশগুলির অনেক দেশই এখনও অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলির ওপরে নির্ভরশীল এবং দরিদ্র। এজন্যই এই দেশগুলিকে অনুন্নত দেশ বলা হয়।

৯.২ শিল্প-বিপ্লব

আজকের এই উন্নত ও অনুন্নত দেশ বা ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য শিল্প-বিপ্লবেরই পরোক্ষ ফল। আধুনিক যুগে ইংলণ্ড প্রথম শিল্পসমৃদ্ধ দেশরূপে আবির্ভূত হয় এবং বিভিন্ন কারণে ইংলণ্ডের এই পরিবর্তনকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের পদ্ধতিতে বা কারবারের সংগঠনে ধীর গতিতে পরিবর্তন প্রায় সব সময়েই ঘটে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই পরিবর্তনের গতি এত দ্রুত ছিল যে স্বাভাবিকভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তনের সঙ্গে তফাৎ বোঝাতে একে বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সর্বোপরি, শিল্পের এই দ্রুত বিকাশকে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে রূপান্তরের শেষ পর্যায় বলা যায়। এবারে আমরা শিল্প-বিপ্লবের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে পারি। শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের অর্থ—

- শ্রেণী-সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন; মূলধনের মালিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব;
- নতুন যন্ত্র ও কারখানায় বর্দ্ধিত উৎপাদন শক্তি;
- উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজার গড়ে তোলা;
- ইউরোপে নতুন আবির্ভুত বুর্জোয়া শ্রেণীর সংস্কৃতি;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংযুক্তি এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপরে নতুন শ্রেণী-সম্পর্কের প্রভাব, এবং
- বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব।

এই বৈশিষ্ট্যগুলিই ইংলণ্ডে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং এজন্যই শিল্প-বিপ্লব নামক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ধীরে ধীরে এবং বিভিন্নভাবে এই পরিবর্তন ইওরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। তবুও, শিল্প-বিপ্লবের মূল কেন্দ্র ছিল ইংলণ্ড এবং আমরা ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রতিই বিশেষ নজর দেব।

৯.২.১ বাণিজ্যিক মূলধন

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব শুরু হওয়ার দুই শতক আগে বাণিজ্যিক মূলধনের অধীন প্রাথমিক সঞ্চয় শুরু হয়। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য এশীয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে এবং এই সময়ে অন্য দেশ থেকে সম্পদ লুণ্ঠন করার ফলে ইউরোপে সম্পদ ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। এই ঘটনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার, আজটেক ও ইনকা অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা ইউরোপে এনে মজুত করা। মূল্যবান ধাতু নিয়ে আসার ফলে বাণিজ্যিক মূলধন তৈরীর পথ প্রসস্ত হয়। উপরন্তু, বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতির (মার্কেন্টাইল ইকনমি) ফলে ইংলণ্ডে টিউডর শাসকরা ও ফ্রান্সে বুরবুঁ শাসকরা নিজ নিজ দেশে মূল্যবান ধাতু আমদানিতে উৎসাহ প্রদান করেন এবং সোনা-রূপার বাটের নির্গমনের ওপরেও বিধিনিষেধ আরোপ করেন। সম্ভবত, প্রতিবাদী ধর্মসংস্কার আন্দোলনও শহরে উঠতি মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে মূলধন সংগ্রহের মানসিকতা তৈরী করতে সাহায্য করে। কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে এমনকি ইংলণ্ডে (যেখানে রাজনৈতিক দিক দিয়ে তখনও অভিজাত জমিদার শ্রেণী যথেষ্ট ক্ষমতাবান) এই শ্রেণী আধিপত্য বিস্তার করতেও সক্ষম হয়। পাশাপাশি, বণিক ও অন্যান্য মধ্যশ্রেণীর মানুষ রাজনৈতিক ব্যাপারে কিছু ক্ষমতার অধিকারী হয়।

৯.২.২ মজুর শ্রমিকের উদ্ভব

সামন্ততান্ত্রিক যুগের কারিগরও একজন শিল্প শ্রমিকই ছিল; কিন্তু তার অবস্থা মজুর শ্রমিকের মত ছিল না। মধ্যযুগের কারিগররা সাধারণত নিজেদের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করত। তাকে কাজ করার জন্য কোন কারখানায় যেতে হত না, সে নিজের বাড়ীতে বসে কাজ করত বা তার সংঘের অন্য কারিগরদের সঙ্গে কোনও কর্মশালায় কাজ করত। তার উৎপাদিত পণ্যের জন্য সে একটি দাম পেত বা উৎপাদিত পণ্য অনুযায়ী পণ্য প্রতি দাম পেত। দিন বা ঘণ্টা অনুযায়ী কাজের জন্য সে কোন মজুরী পেত না, কিন্তু এই অবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীন কারিগরিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনে নতুন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

৯.২.৩ পুটিং-আউট ব্যবস্থা (Putting-out System)

Putting-out ব্যবস্থায় একজন বণিক বিভিন্ন কারিগরের মধ্যে মধ্যস্থতার বা সংযোগ রক্ষার কাজ করত। এই বণিক কারিগরদের কাঁচামাল সরবরাহ করত এবং কাঁচামালের ওপর কাজ করার পর তা একজন কারিগরের কাছ থেকে আর একজন কারিগরের কাছে পৌঁছে দিত শিল্পোৎপাদনের পরবর্তী স্তরের জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে একজন বণিক সূতো কাটা, বস্ত্র-বয়ন, কাপড় রঙ করা ইত্যাদি উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করত। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই ব্যবস্থা বেশ কার্যকরী ছিল। কারিগরেরা কাঁচামালের জন্য এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট মানুষের ওপরে নির্ভর করতে পারত। একই ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রক্রিয়ার শ্রম বিভাজন বা শ্রমের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বহুলাংশে কাজের দক্ষতা বাড়ত। শ্রমের বিকেন্দ্রীকরণ এবং উন্নত সংগঠনের ফলে বড় আকারের উৎপাদনও সম্ভব হত এবং এর ফলে কোন বিশেষ পণ্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত অঞ্চলকে সেই পণ্য

উৎপাদনের জন্য ব্যবহারও করা যেত। একদিক থেকে দেখলে কারিগরদের পণ্য উৎপাদনের জন্য কারখানায় যেতে হয় না; তারা মজুরীর পরিবর্তে পণ্য প্রতি দাম পেত। কিন্তু আর একদিক থেকে দেখলে এই ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন দেখা দিল তা উল্লেখযোগ্য : কারিগরদের স্বাধীনতা কমে গেল, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি এবং পণ্য বাজারজাত করার জন্য সে এই সংযোগকারী ব্যক্তির ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। সংযোগকারী বা মধ্যবর্তী ব্যক্তির পক্ষে বেশী অনায়াসে এই মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করতে পারত। অনেকে মনে করেন যে এই ব্যবস্থার মধ্যেই শিল্প-বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল।

শিল্প-বিপ্লব ঘটার সময় এ ধরনের বেশ কিছু কারিগর ছোট ছোট কারখানায় বিশেষ কাজে নিযুক্ত ছিল। আবার অনেকেই ক্রমশ পণ্য উৎপাদন থেকে পণ্য বাজারজাত করার ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক বণিকদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রানাধীন হয়ে পড়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নতুন যন্ত্রে আবিষ্কারের ফলে কারিগরেরা আরো বেশী করে মূলধনের মালিকদের নিয়ন্ত্রাণাধীন হয়েছিল। এর কারণ কেবল অর্থবান মানুষই নতুন দামী যন্ত্র কিনতে সমর্থ ছিল। অবশ্য নতুন যন্ত্র চালানোর শ্রমিকের জন্য মালিককে দক্ষ শ্রমিকের ওপর নির্ভর করেত হত না। শিল্পপতি নতুন শ্রমিক গড়ে তুলতে পারত। এর পেছনে অনেক কারণ ছিল, যেমন ইংলণ্ডের বেষ্টন ব্যবস্থা।

৯.২.৪ বেষ্টন ব্যবস্থা (The Enclosure Movement)

ইংলণ্ডে বেষ্টন ব্যবস্থার ফলে শিল্পে প্রাপ্য মজুরীভিত্তিক শ্রমিকের উদ্ভব হয়। জমি বেষ্টন করার ফলে বহু কৃষক জমি থেকে উৎখাত হয়। এভাবে কৃষিকাজ থেকে উৎখাত হওয়া দরিদ্র কৃষকেরা শহরাঞ্চলে গিয়ে কাজ পাওয়ার জন্যে ভীড় করেছিল। এই ঘেরাও বা বেষ্টন ব্যবস্থা দুটি পর্যায়ে দেখা দিয়েছিল :

(ক) প্রথম পর্যায়—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে জমিদারেরা বেশী পশম পাওয়া ও বিক্রীর আশায় ভেড়া পালনের জন্য জমি ঘিরে ফেলেন। এই জমি ঘেরার ফলে বহু ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রজাদের জমি থেকে উৎখাত করা হ'ল।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়—অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে জমিদারগণ ভিন্ন কারণে জমিকে ঘেরাও করেন; যথা, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে জমির উন্নয়ন ও চাষ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কৃষকদের উৎখাত করার জন্য জমিদারগণ রাজার বিশেষ অনুমতিও পেয়েছিলেন। এছাড়া পার্লামেট বা সংসদের দ্বারা রচিত আইনও তাদের উৎখাতের অনুমতি দিয়েছিল। ১৭০০ থেকে ১৮৪৪-এর মধ্যে এ ধরনের ২৭০০ আইন পাশ করা হয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে বেশীর ভাগ জমি অল্পসংখ্যক জমিদারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ১.৪ শতাংশ মানুষের হাতে ছিল ৭৩.৯ শতাংশ জমির মালিকানা। এর ফলে উন্নতি কেন্দ্রীভূত হয়। ১.৪ শতাংশ মানুষের হাতে ছিল ৭৩.৯ শতাংশ জমির মালিকানা। এর ফলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ পরিচালনা করা সম্ভব হ'ল। আবার এই ফলে তৈরী হ'ল ভূমিহীন শ্রমিকের যারা তখন একটা উপায়েই গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারত নিজেদের শ্রম বিক্রয় করে।

কিছুদিন আগে মনে করা হ'ত যে এ ধরনের মানুষ বিপুল সংখ্যায় শহরে চলে গিয়েছিল শিল্প শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এ তত্ত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ কার হয়েছে। বলা

হয়েছে যে, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষি-বিপ্লবের জন্যও এধরনের শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত, শিল্পে ও কৃষিকাজে, উভয়ক্ষেত্রেই এ ধরনের শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হ'ত।

অনুশীলনী—১

১) শিল্পবিপ্লবের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২) বেষ্টন ব্যবস্থায় দুটি পর্যায় কি ছিল?

(ক)..

....

....

....

....

....

(খ)..

....

....

....

....

....

৩) সঠিক উত্তরে দাগ দিন :

(ক) ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডে জমিদারগণ বড় বড় জমিকে ঘিরে ফেলতেন—

(i) শস্য উৎপাদনের জন্য

(ii) কারখানা তৈরীর জন্য

(iii) ভেড়া পালন করার জন্য

(iv) বনাঞ্চল সৃষ্টির জন্য

(খ) ১৭০০ থেকে ১৮৪৪-এর মধ্যে ইংলণ্ডে বহু মানুষ গ্রামাঞ্চল থেকে শহর চলে গিয়েছিল, কারণ—

(i) গ্রামে জীবন অনেক বেশী আরামদায়ক ছিল

(ii) ইংলণ্ডে খরা হয়েছিল

(iii) অবিরত যুদ্ধ হয়েছিল

(iv) তাদের জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল

৯.৩ বাজার ও কৃষিক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদন

মজুরীর বিনিময়ে শ্রমদান বা যাকে বলা হয় ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক (শ্রমিক এবং উৎপাদনের উপাদানের মালিকের মধ্যে) বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের কৃষি বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই কৃষি বিপ্লবই শিল্পবিপ্লবের আগের স্তর এবং একই সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবের সাথে জড়িত। এই বিপ্লবের ফলে প্রযুক্তির ব্যবহারে এবং কৃষির উৎপাদনশীলতায় গুণগত পরিবর্তন আসে। কৃষিতে উৎপাদন সম্পর্ক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় আসে।

এটা অতিশয়োক্তি নয় যে কৃষি বিপ্লব ছাড়া শিল্প সম্ভব হ'ত না। কিন্তু কেন? শিল্পায়নের অর্থ ছিল কৃষি থেকে শিল্পে মানবশক্তির ব্যাপক বদলি। প্রাক্-শিল্পায়ন যুগের ইংলণ্ডে এ ধরনের মানবশক্তির বণ্টন সম্পর্কে ধারণা আমরা ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেগরি কিং-এর পরিসংখ্যান থেকে করতে পারি; ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষিতে এবং ২০ শতাংশ মানুষ কৃষি ছাড়া অন্য কার্যে নিযুক্ত ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪০, কিন্তু ১৯০১- এই সংখ্যা নেমে যায় ৮.৫ শতাংশে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কৃষিতে শ্রমিকের ব্যবহার কতটাই কমে গিয়েছিল। সুতরাং শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট না বাড়লে কৃষি উৎপাদনে একটা বিরাট ঘাটতি দেখা দিত।

বলা যায় যে, ১৮৫০-এর দশক পর্যন্ত ব্রিটেন খাদ্যশস্যের মোটের ওপর স্বনির্ভর ছিল। আবার শিল্পের বিকাশের ফলে নগরায়ণও হয়েছিল। ফলে খাদ্যশস্যের জন্য গ্রামাঞ্চলের ওপরে শহরের নির্ভরতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। শস্যের ঘাটতি শহরে সমস্যার সৃষ্টি করত, বিশেষ করে অস্থায়ী শিল্প শ্রমিকশ্রেণী (Proletariat) এবং যাদের নিয়মিত কর্মসংস্থান হ'ত না তাদের ক্ষেত্রে। আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, আভ্যন্তরীণ বাজারে কৃষি এবং শিল্প উৎপাদনের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতার উদ্ভব। শিল্পে বিনিয়োগ করা মূলধনের একটা অংশ আসত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে। এগুলি শহরের ব্যাঙ্ক থেকে পৃথক ছিল, এই শহরের ব্যাঙ্কগুলি বৈদেশিক বাণিজ্য, হুন্ডি, বিনিময় ইত্যাদি কাজ করত। কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রমিক শিল্পে নিযুক্ত হ'ত। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী এবং ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করা কৃষিক্ষেত্রেও এধরনের শ্রমিকের খুব চাহিদা ছিল। এছাড়া নতুন গড়ে ওঠা শিল্প-শহরগুলিতে কৃষি পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদাও ছিল।

৯.৩.১ কৃষি-বিপ্লব

এবারে আমরা বিশ্লেষণ করব কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তনকে আমরা বৈপ্লবিক বলব। এই পরিবর্তনের মধ্যে ছিল কৃষি-উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং কৃষি-উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সম্পর্ক। দুধরনের পরিবর্তনই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আমরা শুধু আলোচনার সুবিধার জন্যই দুটিকে আলাদা করে দেখব। যেমন, কৃষিক্ষেত্রে বড় যন্ত্র কিনতে বা শিল্পোৎপন্ন সার কিনতে বড় ধরনের মূলধন বিনিয়োগ করতে হ'ত। সুতরাং খুব বড় মাপের জমিতে চাষ না করলে কৃষিকাজ লাভজনক হ'ত না। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র কৃষকের জমি ধনী কৃষকের হাতে চলে যেত এবং যেহেতু তাদের হাতে প্রচুর অর্থ ছিল তারা তাদের বড় বড় জমিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য অর্থবিনিয়োগ করতে পারত।

কৃষিতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ছিল বেশ ব্যপক। নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(ক) পতিত জমি উদ্ধারের ফলে চাষের যোগ্য জমির পরিমাণ অনেক বেড়েছিল। জলা জমি থেকে আধুনিক পাম্পের সাহায্যে জল নিষ্কাশন করে ১৮০০ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ একর বাড়তি কৃষিজমি পাওয়া গিয়েছিল।

(খ) নিবিড় চাষ এবং উন্নত শস্য-চক্র প্রবর্তনের ফলে একর প্রতি উৎপাদনশীলতা অনেক বেড়েছিল।

(গ) বেশ কিছু আধুনিকীকরণও হয়েছিল। যেমন, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মত ছোট দেশে ফসল বপনের জন্য ৪০,০০০ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়; এটা ফ্রান্স এবং জার্মানীতে ব্যবহৃত মোট যন্ত্রের থেকেও বেশী।

পরিবর্তনের সামগ্রিক ফল হ'ল ইংলণ্ডে কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দকে ভিত্তি বছর (অর্থাৎ = ১০০) ধরলে উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৭৫০-এ ১১১ এবং ১৮০০ তে ১৪৩-এ দাঁড়ায়। এর পর থেকে ১৮৫০-এর দশক পর্যন্ত উৎপাদন গড়ে বার্ষিক ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৯.৩.২ কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক

কৃষি বিপ্লবের অন্য দিকটি ছিল কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ। এই প্রবণতা ইওরোপে সাধারণভাবে দেখা গেলেও, বিভিন্ন দেশে এর রূপ বিভিন্ন ছিল। একটা পদ্ধতি ছিল বড় ভূ-স্বামীরা প্রায়শই রাষ্ট্রের সাহায্যে ছোট কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করে নিজেদের জমির আয়তন বৃদ্ধি করত। আমরা আগেই দেখেছি যে ইংলণ্ডের অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বেষ্টন ব্যবস্থা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। জমির আয়তন বৃদ্ধির অন্য কৌশলগুলি ছিল—যৌথ চারণভূমি অধিগ্রহণ, পতিত জমি উদ্ধার এবং নিকটবর্তী জমির সঙ্গে দূরের জমি বিনিময়। স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলিতে প্রথম ঐচ্ছিক বিনিময়ের মাধ্যমে (১৭৪৯-এর আইনানুসারে) এবং পরে (১৭৮৩, ১৮০৭ ও ১৮২৭-এর আইনানুযায়ী) কিছুটা বাধ্যতামূলকভাবেই জমির পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য জমি একত্র করে বৃহৎ খামার গড়ে তোলা। ফ্রান্সে ভিন্ন পদ্ধতি দেখা যায়; ১৭৮৯-এর বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে ক্ষুদ্র কৃষক, মালিক ও ভাগচাষীর প্রাধান্য ছিল। জার্মানির পশ্চিমাংশে ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যাই বেশী ছিল; কিন্তু পূর্বদিকে যুন্‌কার (Junker) নামে বড় ভূম্যধিকারী গ্রামাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

রাশিয়াতে ১৮৬১ ও ১৮৬৩ সালে ভূমিদাসদের মুক্তি আইন চালু করার পর বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত কৃষক সমাজের উদ্ভব হয় রাশিয়াতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে লেখা বইতে লেনিন তিনটি এরকম স্তর চিহ্নিত করেছিলেন। এগুলি হ'ল ঃ (ক) কুলাক শ্রেণী, যাদের মালিকানায় বড় খামার ছিল। এই খামারে বাণিজ্যিক কৃষিকাজ করা হ'ত এবং মুনাফার একটি অংশ টাকা ধার দেওয়া ও সুদের কারবারে বিনিয়োগ করা হ'ত; (খ) মধ্য শ্রেণীর কৃষক যারা বাণিজ্যিক কৃষিকাজ ছোট জমিতে করতে পারত না, ফলে অর্থ ধার নেওয়ার জন্য মহাজন ও কুলাকদের কাছে বাঁধা পড়ত, এবং (গ) গ্রামীণ ভূমিহীন শ্রমিক যারা বিংশ শতকের প্রারম্ভে ছিল মোট কৃষকের সংখ্যার অন্তত অর্ধেক। তাদের হয় জমি থাকত না বা থাকলেও তার আয়তন এত ছোট হত যে জীবনধারণের জন্য তাদের শ্রম বিক্রয় করতে হ'ত মজুরীর বিনিময়ে।
এই পরিস্থিতিতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ধনী কৃষকের হাতে সমস্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং পূর্বে জমির মালিক ছিল এমন কৃষকদের মজুরী-শ্রমিকে রূপান্তরিত হওয়া। ইংলণ্ডের মতো অন্যত্রও এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফল হল কৃষির বাণিজ্যকরণ (অর্থাৎ বাজারের জন্য কৃষিপণ্য উৎপাদন) এবং কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ।

৯.৪ কারখানা ও যন্ত্র

কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল দুটি শ্রেণীর মধ্যে ঃ ১) কৃষি উৎপাদনের উপাদানের মালিক, যার হাতে ছিল জমি এবং কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, অর্থাৎ লাঙল, যন্ত্র, গবাদি পশু কেনার অর্থ এবং ২) কৃষি-শ্রমিক যাদের হাতে উৎপাদনের উপাদান ছিল যৎসামান্য বা ছিল না এবং যারা নিজের শ্রম-বিক্রয়ের ওপরে নির্ভর করত। শিল্পের ক্ষেত্রেও, কৃষির মত, এ ধরনের ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের উদ্ভব হ'ল। এখানে দুটি শ্রেণী হ'লঃ ১) কারখানা, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের মালিক এবং ২) এই মালিকের ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শ্রমিক। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে নিছক উৎপাদনের উপাদান মালিকের কাছে অর্থহীন। তার প্রয়োজন ছিল শ্রমিকের-এই উপাদান কাজে লাগিয়ে বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন করতে।

উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং মালিক ও শ্রমিকের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার দ্বারা উৎপাদনের উপাদান মূলধনে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যখন একটা যন্ত্র অচল থাকে তখন তা নিছক একটি সম্পত্তির মত; কিন্তু যখন শ্রমিক এই যন্ত্রের পণ্য উৎপাদন করে, তখন তা মূলধনে রূপান্তরিত হয়। উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পণ্যের যে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয় তা আত্মসাৎ করে মালিক পক্ষ এবং শ্রমিকদের জন্য থাকা শুধু মজুরী। সুতরাং, নতুন কারখানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বৃহৎ ও আরও উন্নত যন্ত্র মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করাই সব নয়। পুরো প্রক্রিয়া বুঝতে হবে দুই শ্রেণীর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কিভাবে মূলধনের মালিক ও শিল্প-শ্রমিকের আবির্ভাব হ'ল তার মাধ্যমে।

৯.৪.১ নতুন প্রযুক্তি

নতুন কারখানাগুলিতে বৃহত্তর ও আরও উন্নত যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এটা সম্ভভ হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বিজ্ঞানের দান প্রযুক্ত হওয়ার ফলে। এ ধরনের কিছু উল্লেখযোগ্য দান হ'ল।

- লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে 'রোলিং মিলে'র প্রচলন (১৭৫৪) এবং হারগ্রিভসের 'স্পিনিং জেনি' (১৭৬৯) যার সাহায্যে একসঙ্গে ৮ থেকে ১২০ টি সূতা কাটা যেত।
- সূতীবস্ত্র শিল্পে বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার (১৭৮৫)
- কাটারাইটের শক্তি-চালিত তাঁত (১৭৮৭)
- বুলটন ও ওয়াটের যৌথ প্রচেষ্টায় বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও বাষ্প-চালিত নৌকা তৈরী (১৮০০-১৮০২) এবং
- বেশ কিছু আবিষ্কার যার ফলে সাধারণভাবে সূতীবস্ত্র, লৌহ-ইস্পাত এবং কারিগরী শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে এবং ইংলণ্ড প্রথম শিল্প-বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করে।

অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে একটি নিছক আবিষ্কার এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা তার প্রয়োগ। এবং এজন্যই শিল্প-বিপ্লবকে বোঝার জন্য তার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই পারিপার্শ্বিক বিষয়ের ক্ষেত্রে খুব তাৎপর্যপূর্ণ হ'ল মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী যা বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রয়োগে বিশেষ সাহায্য করেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস পাওয়া যাবে ইউরোপে নবজাগরণের যুগে।

৯.৪.২ কারখানা ব্যবস্থা, শ্রমিক ও আইন

শ্রমিক-শ্রেণী বা মজুরী-শ্রমিকদের কাছে নতুন যন্ত্র-যুগ বা কারখানা ব্যবস্থার গুরুত্ব কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে পাওয়া যাবে যদি আমরা মধ্যযুগে বা শিল্প-বিপ্লবের যুগের Putting-out ব্যবস্থায় কারিগরদের অবস্থার কথা স্মরণ করি। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় শিল্প শ্রমিকরা আরও বেশী করে মূলধনের অধীনস্থ হন এবং তার কারণ হ'ল ঃ

(ক) ধনতান্ত্রিক-ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের ব্যবহারের পরিকল্পনা, সংগঠন ও তত্ত্বাবধান করত মালিক বা তার প্রতিনিধি কর্মচারী (Putting-out ব্যবস্থায় বণিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে থাকত)।

(খ) কারখানায় যন্ত্র চালাতে বাষ্পীয় শক্তি ও পরে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ঊনবিংশ শতকে কারখানা ব্যবস্থায় কাজের গতি নির্ধারিত হ'ত যন্ত্রের দ্বারা এবং সেইমত শ্রমিককে যন্ত্রেরই অংশ হয়ে কাজ করতে হ'ত।

(গ) কারখানা-ব্যবস্থায় উৎপাদনের বিক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। একই ছাদের নীচে অনেক শ্রমিক কাজ করত। ফলে উৎপাদনের প্রক্রিয়ার যৌথ কাজের একটা নমুনা তৈরী হ'ত। আবার এর ফলে বহু সংখ্যক শ্রমিক শিল্প-শহরগুলিতে একত্রিত হ'ল। এভাবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আলাদা শ্রেণী হিসেবে যৌথ স্বার্থ সম্পর্কে একটা চেতনাও ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

সুতরাং, আমরা দেখি যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে কারখানা-ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল; কিন্তু একই সঙ্গে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান দাসত্ব চোখে পড়ে। এর ফলে শিল্পায়নের প্রথম যুগে শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য নিম্নবর্গের জীবনযাত্রার গুণমান ও বিশেষ নীচু ছিল। চার্লস ডিকেন্সের লেখায় এই দৈন্যের স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাস অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের-প্রসূত সামাজিক অবস্থার বিবরণে আমরা সেই সময়ের অন্ধকার দিকগুলি দেখতে পাই। অনুরূপভাবে, অন্যান্য বহু কবি ও পণ্ডিত উনিশ শতকের শিল্পায়নের অবস্থাকে 'অন্ধকার শয়তানের কারখানা' বলে অভিহিত করেছেন।

শহরাঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষের শোচনীয় অবস্থা ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মজুরী-শ্রমিকের নির্মম শোষণ বহু মানব-দরদীর সহানুভূতি অর্জন করেছিল। তদুপরি, ধনতান্ত্রিক শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থায় যাদের স্বার্থ জড়িত ছিল এবং যারা ক্ষুব্ধ মানুষদের অসন্তোষের বিরুদ্ধে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, তারা অতিরিক্ত শোষণের বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তন করার পক্ষপাতি ছিলেন। এজন্যই সরকার কারখানায় কাজের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে, শিশু-শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করতে ও মহিলাদের এবং পরে পুরুষদের, কাজের সময় কমাতে আইন প্রণয়ন করেছিল। প্রথম দিকের আইনগুলি (যেমন, রবার্ট পিলের ১৮০২-এর কারখানা আইন) বিশেষ কার্যকর হয়নি। কিন্তু ১৮৩৩, ১৮৪৪ ও ১৮৪৭-এর আইনগুলি কিছু উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছিল। এই কারখানা আইনগুলির ফলে ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে কারখানা পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদনগুলি সঙ্কলিত হয়। কার্ল মার্কস্ ও ফ্রিডরিক্ এঙ্গেলস ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অবস্থা বিশ্লেষণ করার সময়ে এগুলি ব্যবহার করেছিলেন।

১৭৪০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের ক্রমাবনতি ঘটেছিল। ১৮৫০-এর পরে মজুরীর পরিমাণ এবং ভোগের মান ধীরে ধীরে কিছুটা উন্নত হয়েছিল। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী শহরের সাধারণ শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী ১৮৬০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে ৬০ শতাংশ বেড়েছিল। শ্রমিকদের মধ্যেই ধীরে ধীরে একটি অংশের উদ্ভব হয় যারা বেশী দক্ষতার কাজ বা তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত হ'ত। সাধারণ শ্রমিকদের তুলনায় এই অংশের জীবনের গুণমান অনেকটাই উন্নত ছিল। এদেরকে কখনও কখনও 'অভিজাত শ্রমিক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুশীলনী—২

প্রত্যেকটি প্রশ্নের নীচে যথাস্থানে উত্তর লিখুন :

১) ইংলণ্ডে কৃষি-বিপ্লব আনাতে সাহায্য করেছিল এমন তিনটি পদ্ধতির কথা লিখুন।

(ক) ....

....

....

....

....

(খ) ....

....

....

....

....

....

(গ) ....

....

....

....

....

....

....

....

....

২) নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে লেনিন রাশিয়াতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্যায়ে যে তিনটি শ্রেণীর কথা বলেছিলেন তাদের চিহ্নিত করুন :

(ক)	বণিক	(খ)	কুলাক
(গ)	কারিগর	(ঘ)	মধ্য শ্রেণীর কৃষক
(ঙ)	ভাগচাষী	(চ)	সর্বহারা/ভূমিহীন কৃষক
(ছ)	বুদ্ধিজীবী	(জ)	ধনী কৃষক

৩) অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে শিল্পের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের উল্লেখ করুন।

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

(৪) ঊনবিংশ শতকের ইংলণ্ডে 'কারখানা আইন' কারখানা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির যে সাহায্য করেছিল তার দুটি প্রধান দিকের উল্লেখ করুন।

(ক) ....

(খ) ....

৯.৫ মূলধনের সঞ্চয় এবং মুনাফার প্রবর্তন

আমরা এর আগেই দেখেছি কিভাবে মূলধনের প্রাথমিক সঞ্চয় হয় এবং শিল্প-উৎপাদন থেকে গৃহীত উদ্বৃত্ত বা মুনাফা কিভাবে মূলধনের বৃদ্ধি করে। যে হারে মূলধন সৃষ্টি হয় তার থেকে অর্থনীতির বিকাশের সম্ভবনা আন্দাজ করা যায়। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে জাতীয় আয়ের অনুপাতে মূলধন সৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৩ থেকে ৪ শতাংশ। ১৮৬০-এর দশকে এটা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ শতাংশে এবং ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে এই অনুপাত ছিল মোটের ওপরে ৭ থেকে ৮ শতাংশ। বিকাশের প্রাথমিক স্তরে যেসব দেশে শিল্পায়ন শুরু হয় তার মধ্যে জার্মানী ও আমেরিকার মত দেশে মূলধন সৃষ্টির অনুপাত ছিল আরও বেশী (সাধারণত

১২ থেকে ১৫ শতাংশ)। সম্ভবত, ইংলণ্ডে অন্য দেশের তুলনায় কম হারে মূলধন সঞ্চয়ের ভিত্তিতেই শিল্পায়ন শুরু করা সম্ভব হয়েছিল। অন্য দেশগুলিতে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া দেরীতে শুরু হয়েছিল।

৯.৫.১ মূলধন সংঘটনের পরিবর্তন

শুধু কি হারে মূলধন সঞ্চয় হচ্ছিল তা মনে রাখলেই চলবে না, দেখতে হবে মূলধনের গঠনে কি পরিবর্তন হয়েছিল। যান্ত্রিক যুগে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে, স্থায়ী মূলধনের (যেমন যন্ত্র এবং কারখানা চালু রাখার জন্য শ্রমিক) তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের এটি একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যে সময়ে মূলধন শিল্প-উৎপাদনে বিনিয়োগ করা শুরু হ'ল, সেই সময়েই শ্রমিকও একই দিকে ঝুঁকেছিল। এজন্য কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত কমে যায়। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতকের শেষে এই অনুপাত ৮০ শতাংশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ৪০ শতাংশে দাঁড়ায় এবং ১৯০১ সালে তা হয় ৮.৫ শতাংশ।

ইংলণ্ডে শিল্পায়নের এই যুগে কৃষির আপেক্ষিক গুরুত্ব যে কমে যাচ্ছিল তা আরও বোঝা যায় জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান থেকে। ১৭৫০-এ জাতীয় আয়ের ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ আসত কৃষি থেকে; এটা ১৮৫৩ তে কমে হয় ২০ শতাংশ এবং ১৮৮১ তে হয় ১০ শতাংশ। শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে শিল্পায়িত দেশগুলির অর্থনীতির সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নিবিড় যোগাযোগ। ১৬৮০-র দশকে ইংলণ্ডের জাতীয় আয়ের ৫ থেকে ৬ শতাংশ আসত রপ্তানী বাণিজ্য থেকে। মোদ্দা অনুমানের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ১৭৯০-তে এই অনুপাত হয় ১৪ শতাংশ এবং ১৮৮০ তে হয় ৩৬ শতাংশ। এই আয় মূলধন সঞ্চয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব যখন সফলতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছাল, তখন এই বিকাশের হার চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। মাথা পিছু নীট্ জাতীয় আয় (১৯৯০-র মূল্যের সূচকে) ১৮৫৫-তে ছিল ১৮.৩; এটা বেড়ে ১৮৯০ তে হয় ৩৭ এবং ১৯১০-এ হয় ৪১.৯।

৯.৫.২ বিকাশের চক্রাকার ধারা

অবশ্য ইংলণ্ড ও অন্যত্র ধনতন্ত্রের বিকাশের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল বিকাশের মাঝে মাঝে মন্দার বা নিশ্চলতার আবির্ভাব। শিল্প-পণ্যের প্রভূত চাহিদা, উৎপাদন প্রচুর বিনিয়োগ এবং বিরাট মুনাফার দ্রুত শিল্প বিকাশের পর আসত নিম্নমুখী চাহিদা, ক্রমহ্রাসমান বিনিয়োগ এবং মুনাফার ঘাটতি (মন্দা)। এই ঘটনা বিভিন্ন সময়ের মেয়াদে চক্রাকারে ঘটত। ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদেরা এ ধরনের ছোট চক্র, মাঝারি চক্র (৮ থেকে ১০ বছর) বী দীর্ঘায়িত চক্র (৫০ বছর) চিহ্নিত করেছেন।

পশ্চিম ইওরোপের শিল্পায়নে বিকাশের তিনটি পর্ব হ'ল : (ক) ১৭৮৯-১৮৫১, ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগ; (খ) ১৮৪৫-১৮৭৩, যে সময়ে ফ্রান্স ও জার্মানিতে যথার্থ শিল্পায়নের শুরু হয় এবং (গ) ১৮৯৫-১৯১৯, যে সময়ের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়। বিশেষ মন্দার সময় ছিল ১৮৭৩-১৮৯৫ (যে সময়কে বিরাট মন্দার যুগ বলা হয়) এবং ১৯৩৫-'৩৫ যখন সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়।

৯.৬ ধনতন্ত্রের প্রসার

অষ্টাদশ শতকের শেষে ইংলণ্ডে শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের যে বিকাশ হয়েছিল, ইওরোপের অন্যান্য দেশে তার প্রসার ঘটে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি। ফ্রান্স বা জার্মানীর মত প্রতিবেশী দেশে শিল্পায়ন কেন সঙ্গে সঙ্গেই ছড়িয়ে পড়েনি? বিভিন্ন কারণের কথা বলা হয়েছে। একটি কারণ হ'ল এই সব দেশে আভ্যন্তরীণ বাজারের মন্দীকরণ। উদাহরণ : জার্মানীতে রাজনৈতিক ঐক্য ১৮৭৩-এর আগে আসেনি; ফ্রান্সেও বিভিন্ন বাণিজ্যিক অঞ্চল এবং আভ্যন্তরীণ শুল্কের প্রচলন ছিল। এছাড়া ফ্রান্সেও বিপ্লবপ্রসূত যুদ্ধ ও নেপোলিয়নের যুদ্ধের জন্য ১৭৮৯ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত মহাদেশীয় ইউরোপ, মোটের ওপরে, ইংলণ্ডের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং তখন ইংলণ্ডেই নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি শিল্পোৎপাদনের চেহারা পাল্টে দিচ্ছিল। এছাড়া ১৭৮৯-এর পরেও ইউরোপে বুর্জোয়াদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা ইংলণ্ডের বুর্জোয়াদের থেকে সম্ভবত কম ছিল।

১৭৮৯-র পরে, বিশেষ করে নেপোলিয়নের রাজত্বের সময়ে, ইউরোপে হয় বুর্জোয়াদের অবস্থার উন্নতি হয়। মূলধন ও শ্রমিকদের গতিবিধির ওপরে সামন্তাতান্ত্রিক বাধানিষেধ প্রথমে ফ্রান্সে ও পরে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে অবলুপ্ত হয়। জার্মানীতে আভ্যন্তরীণ বাজার যেন চমকপ্রদভাবে ঐক্যবন্ধ হয়—প্রথমে জলভেরাইন (১৮৩৪) নামক শুল্ক ঐক্যের মাধ্যমে দিয়ে। ফরাসী বিপ্লব কারগিরী উৎকর্ষতার জন্য একোল পলিটেক্নিক (Ecole Polytechnique) ধারা প্রতিষ্ঠিত করে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত আইন সংশোধিত হয় ধনতান্ত্রিক উদ্যোগের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে। ১৮৫০ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যে আরও দুটি ঘটনা এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে :

(ক) ১৮৭০ -এর মধ্যে রেলপথের ১৫ হাজার মাইল থেকে ৫০ হাজার মাইল সম্প্রসারণ এবং

(খ) ১৮৫০-এর দশকে ক্যালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণসম্ভারের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও ঋণের প্রসার।

ফলে, ফ্রান্স ও জার্মানী শিল্পায়নের প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করে। এইসব দেশের পণ্য বিশ্বের বাজারে পৌঁছে যায়। এর ফলে বিংশ শতকের ইংলণ্ডের প্রাধান্য কিছুটা ক্ষুন্ন হয়।

অনুশীলনী—৩

প্রশ্নের নীচে দেওয়া ফাঁকা অংশে উত্তর লিখুন :

১) সপ্তদশ শতক থেকে ১৯০১-এর মধ্যে ইংলণ্ডে কৃষি-শ্রমিকে ৮০ শতাংশ থেকে কমে ৮৫ শতাংশ হয়, কেন?

....

....

....

....

....

....

২) পশ্চিম ইওরোপের শিল্পায়নের প্রসারের তিনটি পর্যায় কি?

(ক)...

(খ)...

(গ)...

৩) ফ্রান্স ও জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব ইংলণ্ডের তুলায় কেন দেরীতে পৌঁছেছিল। দুটি কারন দেখান।

(ক) ....

....

....

....

....

(খ) ....

....

....

....

....

৯.৭ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের উদ্ভব

হব্সের সময় থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের উদ্ভব ইংলণ্ডের বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গেই জড়িত। অবশ্য, শিল্পবিপ্লবের যুগেই, অষ্টাদশ শতকে ও ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে, এই রাজনৈতিক আদর্শ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল। আবার এই যুগেই ইংলণ্ডে শ্রমিক চরমপন্থী মতবাদ ও বিপ্লবী ফ্রান্সের মতাদর্শের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। উদারপন্থী হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী মনে করেছিলেন যে কোথাও একটা সীমারেখা টানা দরকার, নচেৎ স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হবে। সুতরাং, আমরা দুটি পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা দেখতে পাই, ঊনিশ শতকের ইংলণ্ডের উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রশংসা করতে গিয়ে এই প্রবণতাকে প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়।

ঊনবিংশ শতকের উদারপন্থার (এখানে আমরা ইংলণ্ডের টোরি বা রক্ষণশীলদের বিপক্ষে উদারপন্থী দলের কথা বলছি না) সৃষ্টি হয়েছিল যা'র সেগুলি হ'ল : অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, উদ্যোগের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতি। অবাধ বাণিজ্য অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপরে নুন্যতম কর এবং বাণিজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা। রাজনৈতিকভাবে, এর অর্থ ছিল, রাষ্ট্র কর্তৃক নূন্যতম শাসন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির এবং ব্যক্তির নাগরিক স্বাধীনতার সুরক্ষা। এই ধরনের কর্মসূচীর পেছনে একটা মতাদর্শের প্রেরণা ছিল। এই মতাদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক, জাঁকজমকশূন্য এবং গীর্জার প্রতি অশ্রদ্ধা মুক্ত। সমাজের স্থায়িত্ব বিপন্ন হবে না। এরকম মতের স্বাধীনতার ওপরে জোর দেওয়া হ'ত। সাধারণত নিপীড়িত জাতি এবং অন্যান্য ইউরোপীয়

দেশের শাসন দাস ও ঔপনিবেশিক মানুষের প্রতি একধরনের ভাবাত্মক সহানুভূতি দেখানো হ'ত। উদারপন্থী মতবাদের প্রতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর আকর্ষণ থাকলেও শ্রেণী স্বার্থ অতিক্রম করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাছে এর সমর্থন পাওয়া যায়নি।

সংসদীয় সরকার

উদারপন্থী সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য ইংলণ্ডে সাংসদীয়, প্রতিনিধিত্বমূলক ও সাংবিধানিক সরকারের প্রবর্তন। ক্রমে ভোটদানের বিস্তৃত হয় এবং সংসদীয় ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন এমনভাবে করা হয় যে এর ফলে অল্প-সংখ্যকব্যক্তির দ্বারা শাসনব্যবস্থা, অভিজাততন্ত্র ও বাণিজ্যিক প্রধানদের একটি ক্ষুদ্র অংশের আধিপত্যের অবসান ঘটে। নতুন শিল্পপতি এবং মধ্যবিত্তদের সংসদীয় ব্যবস্থার সংস্কারের দাবী জেরেমী বেন্থাম ও জেম্স মিলের মত দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাছে এর সমর্থন লাভ করে। ১৮৩২ ও ১৮৬৭-র সংস্কার আইনের ফলে ভোটের অধিকার ক্রমশ সম্প্রসারিত হয় সম্পত্তির মালিকদের থেকে সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। ইংলণ্ডের নতুন শিল্প-শহরগুলি এর ফলে রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করে। একই সঙ্গে উদারপন্থী বা রক্ষণশীল উভয় মতের জননেতারা সমাজবাদী ভাবাপন্ন শ্রমিক আন্দোলনকে খুব জোরের সঙ্গে বাধা দেয় ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা যাতে বিস্তৃত না হয়, তার জন্যও বিশেষ প্রয়াস নেওয়া হয়। শ্রমিক আন্দোলন দমনের একটি কুখ্যাত ঘটনা হল 'পিটারলুক' হত্যাকাণ্ড'। ১৮১৯-এ শ্রমিকদের এই সভায় পুলিশ নির্বিচারে আক্রমণ করেছিল। একই সময়ে 'কম্বিনেশন আইন' প্রণয়ণের দ্বারা ষড়যন্ত্রের অভিযান এনে শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের বিচার করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৯-এর মধ্যে চার্টিস্ট আন্দোলন শুরু হয় নিম্নবর্গের জন্য ভোটাধিকার আদায় করতে। সরকার এই আন্দোলনেরও তীব্র বিরোধিতা করে। ১৮৫৯-এর আগে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করে বিক্ষোভ প্রদর্শন আইনানুগ হয়নি। যদিও বিভিন্ন ধরণের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই শুরু হয়েছিল, ট্রেড ইউনিয়নের আইনগত স্বীকৃতি এসেছিল ১৮৭৫-এ। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেই ইংলণ্ডের ট্রেড ইউনিয়ন তথা শ্রমিক আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সংসদীয় অন্তর্ভুক্ত করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে এই স্বীকৃতি ইউরোপ মহাদেশে অন্যত্র দেওয়া হয়নি সম্ভবত এই কারণেই ১৮৪৮-এ ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়।

৯.৮ বিশ্বের বিভাজন ও উপনিবেশ স্থাপন

আমরা আগেই দেখেছি যে মূলধনের প্রাথমিক সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক মূলধন সৃষ্ট মুনাফা এবং এশিয়া ও আমেরিকার সম্পদ লুণ্ঠন একটু গুরুতর ভূমিকা পালন করেছিল। শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে ইউরোপেরও উন্নতদেশগুলি (ক) সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ, (খ) শিল্প পণ্যের বাজার এবং (গ) উদ্বৃত্ত মূলধন বিনিয়োগের জন্য এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করতে থাকে।

লেনিন এই শোষণের ঘটনাকে ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসেবেই দেখেছিলেন। সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে শিল্পায়িত দেশগুলিতে নিম্নবর্গের মানুষের অর্থ কম থাকত এবং তাদের ভোগের মাত্রাও ছিল খুবই কম। এর ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের চাহিদা কমে গিয়েছিল এবং শিল্পপতিরা বাধ্য হয়ে বাজারের সন্ধানে বিদেশের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ধনতন্ত্রের বিকাশ উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছলে, বৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত মূলধন শিল্পগুলির ওপরে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং আরও লাভজনক বিনিয়োগের জন্য বিদেশ, বিশেষভাবে উপনিবেশগুলির কথা ভাবা দরকার হয়ে পড়ে। শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের বিকাশ উন্নততর

পর্যায়ে পৌঁছলে, বৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত মূলধন শিল্পগুলির ওপরে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং আরও লাভজনক বিনিয়োগের জন্য বিদেশ, বিশেষভাবে উপনিবেশগুলির কথা ভাবা দরকার হয়ে পড়ে। শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিজেদের আভ্যন্তরীণ বাজার ও শিল্পকে রক্ষা করার জন্য শুল্ক প্রাচীর সৃষ্টি করে। উদ্বৃত্তমূলধন বিনিয়োগ করার জন্য শিল্পপণ্য বিক্রয় করার এবং অধিক মুনাফা অর্জন করার জন্য সব থেকে সুবিধাজনক স্থান ছিল এই দেশগুলির উপনিবেশ। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ইওরোপের অগ্রসর দেশগুলিতে শিল্পের বিকাশ যত হচ্ছিল শিল্পপতি গোষ্ঠী এবং তাদের প্রায় কুক্ষিগত সরকারের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছিল। ফলে ইওরোপের দেশগুলি গোটা বিশ্বকে ভাগ করে নেয় উপনিবেশে, আধা-উপনিবেশ এবং আধিপত্যের এলাকা হিসেবে। ১৮৭০-এর পর থেকে শেষ যে ভূখণ্ডে এই প্রক্রিয়া দেখা যায় তা হল আফ্রিকা।

আমরা আবার ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। ব্রিটেন তার উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করত; যেমন, ভারত ও মিশর থেকে তুলা, পশ্চিম ভারতীয় দীপপুঞ্জ থেকে চিনি মালয় থেকে টিন ও রবার, নাইজেরিয়া থেকে পাম তেল, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সোনা ও হীরে ইত্যাদি। আধা-ঔপনিবেশিক দেশ থেকেও পণ্য আমদানি করা হ'ত যেমন, আর্জেন্টিনা থেকে গম ও গোমাংস, চীন থেকে চা, চিলি থেকে সার ও তামা, ব্রাজিল থেকে কফি ইত্যাদি। এছাড়া উপনিবেশগুলি শিল্প-পণ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজারও ছিল। একটি উদাহরণ : ১৮৪০ খ্রীষ্টব্দে চীন ও ভারত মিলে ব্রিটেনের বস্ত্র রপ্তানীর ২২ শতাংশ কিনত, ১৮৯৩-এর মধ্যে ভারত একাই ঐ রপ্তানীর ৪০ শতাংশ কিনত। ব্রিটেনের বিদেশী বিনিয়োগের ৩৯ শতাংশ ছিল উপনিবেশগুলিতে। এশিয়ার উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশগুলিতে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৪ শতাংশ এবং আফ্রিকাতে ছিল ১১ শতাংশ (১৮৭০-১৯১৪)। মোটের উপরে, অন্য ইওরোপীয় দেশের তুলনায় বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে উপনিবেশগুলি ব্রিটেনের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্রিটেনের কাছে তাদের প্রধান গুরুত্ব ছিল কাঁচামালের যোগানদার এবং শিল্প-পণ্যের বাজার হিসেবে।

লেনিনের বিশ্লেষণে এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল হিসেবেই দেখা গেছে। কিন্তু দাদাভাই নওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত ও রাণাডের মত ভারতীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন যে এর ফলে ভারতীয় কারিগরভিত্তিক শিল্প ধ্বংস হয়েছে, আধুনিক শিল্পোদ্যোগ ব্যাহত হয়েছে, কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদ বিদেশীদের দ্বারা শোষিত হয়েছে এবং উপনিবেশগুলি থেকে সম্পদ সাম্রাজবাদী দেশে নিষ্কাশিত হয়েছে। শিল্পোন্নত ইউরোপীয় দেশগুলির এই নির্মম শোষণ ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপের তীব্র সমালোচনা পরবর্তী কালে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে।

অনুশীলনী - ৪

১) মনে করা হয় যে ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে উদারপন্থী ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয়। যথাযথ উদাহরণ দিয়ে এই মতটি ব্যাখ্যা করুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

২) উপনিবেশ থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলি যে সুবিধা পেত তার তিনটি উল্লেখ করুন।

(ক) ....

....

....

....

(খ) ....

....

....

....

(গ) ....

....

....

....

....

৩) প্রথমদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদরা উপনিবেশবাদের যে ফলাফল বর্ণনা করেছিলেন, তার চারটি উল্লেখ করুন।

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

(ঘ) ....

৯.৯ সারাংশ

কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের ফলে আধুনিক বিশ্বের চেহারা পাল্টে গিয়েছিল বলা যুক্তিসঙ্গত।

সামন্ততন্ত্রের অবসানের পরে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন বণিক মূলধনের উদ্ভব, মজুরি শ্রমিকের সৃষ্টি, Putting-out ব্যবস্থা, বেষ্টন ব্যবস্থা শিল্প বিপ্লবের পটভূমিকা রচনা করেছিল। বর্দ্ধিত কৃষি-উৎপাদন ও নতুন প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের সাহায্য করেছিল। শিল্পের বিকাশের ফলে মূলধনের গঠনও পরিবর্ধিত

হয়েছিল। একটি চক্রাকার বিকাশের ধারাও লক্ষ্য করা যায়। শিল্পায়নের বিকাশের পথে মাঝে মধ্যেই অর্থনৈতিক মন্দা দেখা যেত, কিন্তু এই সমস্যা ক্রমপর্যায়ে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল। বর্ধিত শিল্প-উৎপাদন ধনতন্ত্র ও নতুন সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি করে। বেশ কিছু দেশে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি শুরু হয়। এর ফলে তৈরী হয় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ।

৯.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

আজটেক	:	মেক্সিকোর আদিম যাযাবর উপজাতি। এরা প্রধানত মধ্য মেক্সিকোতে বসবাস করত।
বুর্জোয়াজি	:	আধুনিক ধনতান্ত্রিক শ্রেণী, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিক।
বুলিয়ন	:	সোনা বা রূপার বাট।
বণিক সংঘ	:	বণিক ও পেশাদারদের সংঘ। মধ্যযুগে স্থাপিত হয়েছিল। সদস্যদের স্বার্থরক্ষা করত।
ইনকাস্	:	দক্ষিণ আমেরিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভুত আদি আদিবাসী। পেরু, ইকুয়েডোর ও চিলিতে তারা প্রাচীন সমরবাদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।
কুলাক	:	ধনী কৃষক যারা শ্রমিক ভাড়া করত।
স্পিনিং জেনি	:	সূতা কাটার যন্ত্র যাতে একাধিক তক্‌লি বা টাকু থাকে। ফলে একজন যুগপৎ অনেক সূতা কাটতে পারে।

৯.১১ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১) ৯.২ অংশ দেখুন।
২) ৯.২.৪ অংশ দেখুন।
৩) (ক) (iii) (খ) (iv)

অনুশীলনী—২

১) ৯.৩.১ অংশ দেখুন।
১) (খ), (ঘ), (চ)
৩) ৯.৪.১ অংশ দেখুন।
৪) ৯.৪.২ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী—৩

১) ৯.৫.১ অংশ দেখুন।
২) ৯.৫.২ অংশ দেখুন।
৩) ৯.৬ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী—৪

১) ৯.৭ অংশ দেখুন।
২) ৯.৮ অংশ দেখুন।
৩) ৯.৮ অংশ দেখুন।

পর্যায় 3 এবং 4

একক ১০ ❐ ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ঃ প্রাক্ ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য
১০.১ প্রস্তাবনা
১০.২ প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য
  ১০.২.১ কৃষি
  ১০.২.২ বাণিজ্য
  ১০.২.৩. হস্তশিল্প
১০.৩ ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন দিক
১০.৪ ঔপনিবেশিক শাসনের বিবর্তন
১০.৫ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব ঃ পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ
১০.৬ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব ঃ ভারতীয় দৃষ্টিকোণ
  ১০.৬.১ সম্পদের নিষ্কাশন
  ১০.৬.২ অবশিল্পায়ন
১০.৭ ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন পর্যায়
১০.৮ ঔপনিবেশিক শাসনে কৃষিব্যবস্থা
  ১০.৮.১ নূতন ভূমিব্যবস্থা
  ১০.৮.২ কৃষির বাণিজ্যকরণ
  ১০.৮.৩ কৃষিব্যবস্থার উপর প্রভাব
১০.৯. ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকা
১০.১০ সারাংশ
১০.১১ প্রধান শব্দগুচ্ছ
১০.১২ অগ্রগতি যাচাই করার উত্তরমালা

১০.০ উদ্দেশ্য

ব্রিটিশ শাসন শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াই নয়, এই শাসনব্যবস্থা ভারতীয় জনজীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ভারতীয় অর্থনীতিতে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন আনে। এই এককে উক্ত পরিবর্তনগুলি আলোচনা করা হবে। এই একক অধ্যয়ন করার পর আপনার ঃ

- ব্রিটিশ শাসনের অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষের অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

- ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হবে।
- সম্পদের নিষ্কাশন এবং অবশিল্পায়ন সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।
- ঔপনিবেশিক শাসন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য কতটা দায়ী সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

১০.১ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ। ভারতীয় সমাজে ও অর্থনীতিতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবও অত্যন্ত গভীর। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া এখনও বিদ্যমান এবং এই কারণে বর্তমান ভারতের অনেক সমস্যা বুঝতে গেলে ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা প্রয়োজন। শুরুতেই একটা কথা জানা দরকার যে, প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন উপনিবেশের জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। কারণ প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় উপনিবেশটি শাসকদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং ঔপনিবেশিক নীতি সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করে এই সব ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে।

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল এর দীর্ঘস্থায়ী। এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হবার ফলে সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। স্থায়িত্বের সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশরা শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন অনেকগুলি পর্বে বিন্যস্ত। ব্রিটিশরা নানা পর্বে বিভিন্নরকম অভিজ্ঞতার নিরিখে যুগোপযোগী নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল। প্রয়োজনমত তারা শাসন পদ্ধতির পরিবর্তনও করেছিল। কিন্তু তার আগে প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের অর্থনীতির ছবিটা দেখে নেওয়া দরকার।

১০.২ প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ছিল স্থিতিশীল; কৃষিব্যবস্থা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, বাণিজ্য সমৃদ্ধ এবং হস্তশিল্প উন্নত। মোটের উপর এইসব বিষয়গুলিকে প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

এইসব বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যাক।

১০.২.১ কৃষি

গ্রামীণ সমাজে ছোট কৃষকরাই ছিল কৃষিব্যবস্থার প্রকৃত আধার। গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাজনা পরিশোধ এবং কাছের শহর থেকে কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের মধ্যেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল। ক্ষুদ্র গ্রামীণ সমাজ এবং প্রান্তিক কৃষকরাই কৃষিব্যবস্থাকে চালিয়ে নিয়ে যেতেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপযোগী শস্যই কৃষক সাধারণত উৎপাদন করতেন। গ্রামের অন্যান্য কারিগরেরা যাঁরা কৃষককে উপকরণ সরবরাহ করতেন, কৃষক বিনিময়ে তাঁদের ফসল সরবরাহ করতেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। সুতরাং,কৃষিপণ্যের বাজার ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কৃষক ততটুকুই উৎপাদন করতেন যতটুকু তাঁর ও গ্রামের কৃষিবর্হিভূত বাসিন্দাদের প্রয়োজন ছিল। অনুকূল

বৃষ্টিপাতের ফলে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন হলে মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং খরার হাত থেকে বাঁচার জন্যে কৃষক তা' সঞ্চয় করতেন। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে খাদ্যশস্যের সঞ্চয় ছিল একটি বহুপ্রচলিত পন্থা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও খাদ্যের অভাব থেকে বাঁচার জন্যে এটিই ছিল একমাত্র প্রতিকার।

সমগ্র মধ্যযুগে এই ধরনের কৃষিব্যবস্থা বলবৎ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রামীণ সমাজগুলি নতুন শক্তির চাপে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এই পরিবর্তনের জন্য দুটি প্রধান কারণকে দায়ী করা যেতে পারে। (১) নতুন ভূমিব্যবস্থা সম্পত্তির পুরাতন সম্পর্ককে পরিবর্তন করে। (২) ভারতবর্ষের কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের রমরমা ঘটেছিল; ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বাজারের যোগাযোগ ঘটে। ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সাথে ভারতের যোগাযোগ হবার ফলে পরিবর্তনগুলি আরো জোরদার হয়।

১০.২.২ বাণিজ্য

স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি এবং সনাতন যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা সত্বেও ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে বহির্বাণিজ্য খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব ছিল। ভারত সাধারণত পারস্য উপসাগর থেকে মুক্তো, পশম, খেজুর, শুকনো ফল, গোলাপজল; আরব সাগরীয় এলাকা থেকে কফি, সোনা, ওষুধ এবং মধু; চিন থেকে চা, চিনি, রেশম; ইউরোপ থেকে সোনা, পশম বস্ত্র, তামা, লোহা, দস্তা এবং কাগজ আমদানি করত। ভারত থেকে প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য ছিল চাল, গম, চিনি, গোলমরিচ এবং অন্যান্য মশলা, মূল্যবান পাথর এবং ভেষজ ঔষধাদি।

- **প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ**

১) অনুকূল বাণিজ্য এবং ২) ভারতীয় শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বহির্বাণিজ্য। অনুকূল বাণিজ্যের অর্থ হল ভারত আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি করত। হস্তশিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য ভারতকে বেশিমাত্রায় জিনিষপত্র আমদানি করতে হত না। দ্বিতীয়ত, ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। অন্যকথায় বলতে গেলে, ভারত তার বিশিষ্ট ও বিখ্যাত দব্যগুলিকে রপ্তানি করত এবং তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি আমদানি করত।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের তুলনায় ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যদিও ভারতের রপ্তানি তার আমদানি বাণিজ্যের চাইতে বেশি ছিল, তবু বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়; উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভারত সূতীবস্ত্রের রপ্তানিকারক দেশ থেকে সূতীবস্ত্রের আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়; ফলস্বরূপ ভারতের সমৃদ্ধশালী হস্তশিল্প ধ্বংসের মুখে পড়ে।

১০.২.৩ হস্তশিল্প

উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে, ভারতে বিবিধি ও বিচিত্র হস্তশিল্প উৎপাদিত হত এবং ভারতীয় কারিগরেরা তাদের কাজের জন্য ভূবনবিখ্যাত ছিলেন। দেশীয় কারিগরদের দক্ষতার জন্যেই ভারত অনুকূল বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করত। ভারতে বিভিন্ন স্থানে সূতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, চিনি, পাট, রঞ্জক

দ্রব্যাদি, বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যাদি যেমন অস্ত্র, ধাতব তৈজসপত্রাদি এবং তেল উৎপাদন হত। বাংলাদেশের ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদ, বিহারের পাটনা, গুজরাটের সুরাট এবং আমেদাবাদ, উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, পাঞ্জাবের মূলতান এবং লাহোর, অন্ধ্র প্রদেশের মুসলিপত্তন এবং বিশাখাপত্তনম্, মহীশূরের বাঙ্গালোর, মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুর এবং মাদুরাই প্রভৃতি শহরে সূতীবস্ত্র ব্যাপকভাবে উৎপন্ন হত। পশমবস্ত্র তৈরিতে কাশ্মীর বিখ্যাত ছিল; মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও বাংলা জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র ছিল। বহু ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানী তাদের ব্যবহারের জন্য ভারতীয় জাহাজ ক্রয় করত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নিঃসন্দেহে ভারত ছিল বাণিজ্য এবং শিল্পের একটি বিরাট ঘাঁটি। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ভারতের এই শিল্প বাণিজ্যের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কলে তৈরি কাপড় ক্রমশ হাতে বোনা কাপড়ের জায়গা নেয়; ভারতের হস্তশিল্পীরা এর ফলে কর্মচ্যুত হয়। ব্রিটিশ বাণিজ্যপণ্যের এই চাপে ভারতের শিল্পের ধ্বংস প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাঁতশিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে।

১০.৩ ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন দিক

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ক্রমবিস্তারের অন্তত দুটি দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্রিটিশ শাসকেরা এক অঞ্চলের অভিজ্ঞতাকে অন্য অঞ্চলে প্রসারিত করেছিলেন নতুবা পরিমার্জন করেছিলেন। অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষাক্রমই তাঁদের ভারতের মত বিশাল শক্তিশালী উপনিবেশকে শাসন করার মত উপযুক্ত করে তুলেছিল। ব্রিটেনের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে নতুন সামাজিক শ্রেণীর চাহিদা অনুযায়ী নতুন নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছিল। আধুনিক ব্রিটিশ সমাজব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক পুঁজি থেকে শিল্প-পুঁজি এবং তারপর প্রতিযোগিতামূলক শিল্প পুঁজি থেকে একচেটিয়া শিল্প-পুঁজির দিকে বিবর্তিত হয়ে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের চাহিদা ছিল ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করা; অন্যথায় শিল্প-পুঁজিবাদ ভারতকে ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্যের ক্রেতা এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহকারী হিসেবে দাবি করেছিল। সুতরাং, ব্রিটেনের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সরাসরিভাবে ভারতের ঔপনিবেশিক নীতিকে প্রভাবিত করেছিল।

১০.৪ ঔপনিবেশিক শাসনের বিবর্তন

নবাব সিরাজদ্দৌলা

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছ থেকে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করার সনদ লাভ করে। অনতিকাল পরেই এই বাণিজ্যের সংস্থা ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। ভারত একদিনে বা কোন একটি যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে পরাভূত হয়ে তার স্বাধীনতা হারায়নি। বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রের ফলে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই দিল্লীর মুঘল রাজত্বের অবসানের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর মুঘল শাসনের দুর্বলতা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। ইউরোপীয় বণিকরা তখন ভারতে প্রভূত ব্যবসাই

শুধু করছে না, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্য ভাঙ্গাগড়ায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নানারকম ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হচ্ছে। তারা সামন্তরাজাদের পারস্পরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বেও পক্ষাবলম্বন করছে। এই পটভূমিতেই বাংলায় ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে একটি ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধ হয়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বণিকের সাহায্য চেয়েছিল বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরোধী গোষ্ঠী, যার নেতৃত্বে ছিল নবাবের সেনাপতি মীরজাফর এবং জগৎশেঠ ও উমিচাঁদ নামে দুই শ্রেষ্ঠী। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভের হাতে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে ইংরেজদের ভারত বিজয়ের সূত্রপাত ঘটে। অবশ্য ইংরেজরা তখনো জানত না যে এই যুদ্ধের ফলাফলের দ্বারা গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে এবং ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই হবে তার নিয়ামক। ক্লাইভের ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালের ভারতের মহাবিদ্রোহে ভারতীয়দের পরাজয় ঘটে এবং ১৮৫৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সঙ্গেই কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে এবং ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট ভারত শাসনের সরাসরি দায়িত্ব পায়। এই ব্যবস্থা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

অগ্রগতি যাচাই করুন ১

১. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি পাঠ করার পর ঠিক (✔) বা ভুল (×) চিহ্নে দাগ দিন।
   - ক) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি ভারতীয় সমাজব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল।
   - খ) ব্রিটেনের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ইংরেজদের ভারত-সংক্রান্ত নীতি প্রভাবিত হয়েছিল।
   - গ) ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হ'বার পর ভারতের দেশীয় শিল্পের উন্নতি হয়েছিল।
   - ঘ) প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ঔপনিবেশিক যুগ অবধি ভারতের কৃষিব্যবস্থা অপরিবর্তিত ছিল।

২. প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে পাঁচ লাইন করে লিখুন।

কৃষি

....

....

....

....

শিল্প

....

....

....

....

বাণিজ্য

....

....

....

....

....

....

১০.৫ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রভাব ঃ পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ

● ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রভাব ভারতের উপর কী রকম হয়েছিল?

ভারতীয় অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রভাব কী রকম হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক ও পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তীব্র মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।

অধিকাংশ পাশ্চাত্য লেখকদের মতে, ব্রিটিশ শাসনের ফলেই ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ও স্থায়ী শানতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক অরাজকতা দূর করে সুষ্ঠু স্থায়ী শাসন প্রবর্তন করা ব্রিটিশ শাসনের অবদান; যেমন, একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ মরিস ভি. মরিস মন্তব্য করেছেন,

"সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের যদিও হিন্দু ঐতিহ্য ছিল, তবু ভারতের ইতিহাসের কোন সময়েই এক অথবা দেড় শতাব্দী ধরে একটি স্থায়ী সরকারকে বিরাজ করতে দেখা যায়নি। রোম, মিশর বা চিনের সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভারতের কোন তুলনা চলে না। এর গুরুত্বপূর্ণ ফল হল এই যে, কোন সময়েই নিরবিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান এবং স্থায়ী আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠেনি।"

ভারতবর্ষে অতীতে রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা ছিল অলীক; বিমূর্ত এই ধারণাকে ব্রিটিশ শাসকরা বাস্তবে পরিণত করে। রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পুঁজির সঞ্চয় ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকরা ভারতে একটি অনুন্নত অর্থনীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য লেখকদের এই যুক্তি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী যুক্তির বিপরীত। জাতীয়তাবাদীরা মনে করতেন ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে ভারতীয় অর্থনীতি ছিল আকর্ষণীয় এবং লাভজনক।

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য লেখকেরা ভারতীয় কৃষির অতি নিম্ন উৎপাদিকা শক্তিকে সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে কৃষিকাজে পশু-শক্তিকে ব্যবহার না করার ফলে কৌশলের অভাবে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ভারতে বহু জমি অনাবাদী পড়ে থাকতে দেখা যায়। তামাক, আলু, বাদাম ইত্যাদির চাষ ভারতে ব্রিটিশরাই প্রবর্তিত করে।

তৃতীয়ত, তাদের মতে ভারত শিল্পে কখনই খুব বেশি উন্নতি করতে পারেনি, কারণ শিল্পে উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী দক্ষতা ভারতের ছিল না। যদিও ভারতের বস্ত্র এবং অন্যান্য কিছু শিল্প ছিল খুবই বিখ্যাত, কিন্তু এই খ্যাতির পিছনে কোন উন্নত কারিগরী বিদ্যা ছিল না। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই এই খ্যাতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজদের রেকর্ড বা বিবরণ থেকেই

তা বোঝা যায়,কারণ ইংরেজরা তখনই ভারতীয় সূতীবস্ত্র শিল্পের অস্থিতিস্থাপকতা নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। ডব্লু. এইচ. মোরল্যাণ্ড এবং আরো অনেকে কোম্পানীর শাসনের প্রথমদিকে ইউরোপীয় পর্যটকদের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ভারতীয় কারিগরীবিদ্যা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। এইসব প্রমাণের উপর ভিত্তি করে মরিস. ডি. মরিস মন্তব্য করেছেন যে,

"১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের শতকগুলিতে উপমহাদেশে মাথাপিছু আয় ছিল অত্যন্ত কম। রাজনৈতিক স্থায়িত্বের অভাব, নিম্নমানের কৃষির উৎপাদিকা শক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়।"

মরিস. ডি. মরিস, ডব্লু. এইচ. মোরল্যাণ্ড ইত্যাদির বক্তব্য যদি সত্যি হয় তাহলে ব্রিটিশরা যখন ভারত জয় করেছিল ভারত তখন ছিল একটি অনুন্নত দেশ। এর থেকে এটাই ধারণা করতে হবে যে, ব্রিটিশ শাসন ছিল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক। ইতিহাসে দেখা যায় যে, দুটি সভ্যতা যখনই পরস্পর মুখোমুখি হয়, উন্নত সভ্যতা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত সভ্যতার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে এবং অনুন্নত সভ্যতাটি উন্নত সভ্যতার শাসনতান্ত্রিক সংগঠন এবং কারিগরী কৌশল থেকে উপকৃত হয়। সুতরাং, এইটিই হল পাশ্চাত্য লেখকদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে একটি অনুন্নত সমাজব্যবস্থার উপর উন্নত সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ বলে ব্যাখ্যা করেন। এই প্রক্রিয়ায় ভারতের মত অনুন্নত উপকার হয়েছিল। উন্নতি তাদের মতে নিম্নরূপ ঃ

- ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য এবং স্থায়িত্ব এসেছিল।
- রেলপথ তৈরি এবং সড়কপথ উন্নত করার ফলে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের পথ সুগম হয়।
- সেচব্যবস্থা এবং অপর জনকল্যাণমূলক কাজের দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পাশ্চাত্যের লেখকেরা দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রথমত, ভারতে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপনের পূর্বে এই দেশ ছিল অনুন্নত, উৎপাদন ছিল সামান্য, মাথাপিছু আয় ছিল খুবই কম। উন্নত কারিগরী কৌশলের অভাব ছিল লক্ষণীয়। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য, প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম হয়।

১০.৬ ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব ঃ ভারতীয় দৃষ্টিকোণ

উপরোক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন একটি বক্তব্য উপস্থাপন করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে দাদাভাই নৌরজী, রমেশ চন্দ্র এবং বিংশ শতাব্দীতে রজনী পাম দত্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণটিকে উপস্থিত করেছেন। তাঁরা প্রথমেই যে প্রশ্নটিকে তুলে ধরেন তা হল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেন স্থানীয় যুদ্ধগুলিতে নিজেদের জড়িত করেছিল? কেন ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ মহারাণী প্রত্যক্ষভাবে ভারত শাসনের দায়িত্ব নিয়ে ১৯৪৭ অবধি তা বলবৎ করেন? মাত্র ৬৮,০০০ পাউণ্ড পুঁজি নিয়ে যে কোম্পানী তার বাণিজ্য শুরু করে, কীভাবে তারা শেষ অবধি এক বিশাল সাম্রাজ্যের পরিচালক হয়? ভারতের অর্থনীতি যদি সত্যিই বন্ধ্যা এবং অনুৎপাদক হত তাহলে কীভাবে এই অর্থনীতি থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুনাফা এবং প্রশাসনিক খরচ আসত?

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবকে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে পর্যালোচনা করেছেন। এই দুটি হল (১) সম্পদের নিষ্কাশন এবং (২) অবশিল্পায়ন।

১০.৬.১ সম্পদের নিষ্কাশন

সম্পদের নিষ্কাশন বলতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা সেই প্রক্রিয়াকে বোঝান যে প্রক্রিয়ায় ভারত থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্রিটেনে রপ্তানি হত অথচ যার বিনিময়ে ভারতের কোনো অর্থনৈতিক লাভ ঘটত না। অন্য কথায় বলতে গেলে, ভারতকে প্রতি বছর এক বিশাল অর্থ উপঢৌকন হিসেবে ব্রিটেনে প্রেরণ করতে হত। ঘরের খরচ (home charges), ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ কর্মচারীদের ভাতা এবং পেনশন, ভারতে নিয়োজিত ব্রিটিশ মূলধনের মুনাফা ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ নিষ্কাশিত হত। এটা বলার কোন অপেক্ষা রাখে না। যে, এর ফলে ইংল্যাণ্ডের লাভ হত এবং ভারতে বিনিয়োগের সুযোগ সঙ্কুচিত হত। অমিয় বাগচীর মতে,

"ভারতবর্ষ অধিগ্রহণের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং বেসরকারী ব্যবসায়ীরা ভারতীয় পণ্যাদি, ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, উপঢৌকন প্রকৃতপক্ষে প্রায় বিনামূল্যেই আত্মসাৎ করত। হিসেবের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ব্রিটেন ভারতে আর সোনা বা রূপা প্রেরণ করত না; বরঞ্চ ভারতবর্ষ থেকেই সোনা বা রূপা চিন বা ব্রিটেনে পাঠানো হত।"

নবাব মীরকাশিম

বাগচীর হিসেব মত বাংলা থেকে বিদেশে ধনের নিষ্কাশন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত পণ্যের (Gross domestic material product) তিন থেকে চার শতাংশ হবে। অধ্যাপক বাগচী আরও মনে করেন যে, যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধ বাবাদ ব্যয় এর সঙ্গে ধরা হয় তাহলে সম্ভাব্য বিনিয়োগের অন্তত পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ সম্পদ দেশ থেকে নিষ্কাশিত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্তই হল এই যে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা হয়; কিন্তু যদি উদ্বৃত্ত সম্পদ উপনিবেশ থেকে ঔপনিবেশিক শাসকের দেশে পাঠানো হয় তাহলে উপনিবেশটি উত্তোরত্তর অনুন্নত হতে থাকে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর সম্পদের নিষ্কাশন শুরু হয়েছিল, তার ফলে বাংলার অবক্ষয় শুরু হয়।

এই লুণ্ঠনের বিরুধে প্রথম প্রতিবাদ করেন নবাব মীরকাশিম। তিনি ইংরেজদের সাহায্যে নবাবীত্ব লাভ করলেও ব্রিটিশ বণিকদের স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করেননি। মুঘল শাসকদের কাছ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল। সেই সুযোগে কোম্পানীর কর্মচারীরাও বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্যও চলত। মীরকাশিম এটি বন্ধ করতে আদেশ দেন। কিন্তু তারা এ নির্দেশ না মানায় মীরকাশিম

দেশীয় বণিকদের শুল্কও মুকুব করে দেন যাতে তারা ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে সমানভাবে বাণিজ্য করতে পারে। ব্রিটিশের স্বার্থে আঘাত লাগায় তারা মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মীরকাশিম গিরিয়া, উধুয়ানালা এবং বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নবাবীত্ব হারান। তিনি পরাজিত হলেও ব্রিটিশ অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ গৌরবময়। বাংলার মাটিতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের সূচনা যেমন সত্য, তেমনি সত্য বাংলার বুক থেকেই গর্জে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ।

সম্পদের নিষ্কাষন ব্রিটিশ শোষণের অন্যতম একটি দিক মাত্র; এ ছাড়াও এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে উচ্চহারে আরোপিত করের মাধ্যমে শোষণ এবং ভারতের পক্ষে প্রতিকূল বাণিজ্যিক সম্পর্ক। ভারতবর্ষকে শোষণ করে ব্রিটেন যে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল এ কথা লর্ড কার্জন স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে "ভারতবর্ষ আমাদের সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড। এই সাম্রাজ্যের অন্য কোন অংশ যদি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তা হলেও আমরা টিকে থাকব। কিন্তু যদি ভারত আমাদের হস্তচ্যুত হয় তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্যাস্ত ঘটবে।"

১৭৬৫ সালে কোম্পানী দেওয়ানী বা রাজস্ব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এর ফলে লুণ্ঠন করবার এক নতুন সুযোগ কোম্পানীর সামনে উন্মুক্ত হয়। ভূমিরাজস্বের এক বিরাট অংশ কোম্পানী ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করত। দেওয়ানী লাভের আগে নবাবের আমলে ১৭৬৪-৬৫ সালে বাংলার রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ১৭ হাজার পাউণ্ড। কোম্পানী দেওয়ানী লাভের প্রথম বছরেই ১৭৬৫-৬৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড। প্রতি বছরই তাদের আদায় বাড়তে থাকে। ১৭৭১-৭২ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩ লক্ষ ৪১ হাজার পাউণ্ড এবং ১৭৬৫-৭৬ সালে তার হিসেব ছিল ২৮ লক্ষ ১৮ হাজার পাউণ্ড। কর্ণওয়ালিশ যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) করেন তখন বার্ষিক রাজস্বের স্থায়ী পরিমাণ নির্দিষ্ট করেন ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড। এই অর্থ আদায় হত দেশীয় কৃষকদের শোষণ করে। লুণ্ঠন ও শোষণের অবাধ ও একচেটিয়া অধিকার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর পর থেকে ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতি বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ থেকে শিল্পবিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয়। এবং নব উদিত শিল্প পুঁজিপতিরা কোম্পানীর অবসান দাবি করতে থাকে।

সম্রাট দ্বিতীয় শাহ-আলমের কাছ থেকে ক্লাইভের দেওয়ানীর সনদ লাভ

১০.৬.২ অবশিল্পায়ন

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতে বহির্নিষ্ক্রমণ ছাড়াও ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের অবশিল্পায়ন ঘটেছে। বস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ভারত ছিল বিখ্যাত। এই কারণেই কোম্পানী ভারতে ব্যবসা শুরু করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভারত সূতীবস্ত্রের আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়; এর ফলে, ভারতীয় হস্তশিল্পীরা কর্মচ্যুত হয় এবং দেশীয় শিল্পকেন্দ্রগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অমিয় বাগচী মন্তব্য করেন যে, "১৯১৩ সালের আগে পঁচাত্তর বছরেরও বেশি সময় জুড়ে ভারত ব্রিটেনের থেকে সূতীবস্ত্র আমদানি করত। ব্রিটেনের বস্ত্র রপ্তানির প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ ভারত ক্রয় করত।"

এইভাবে ব্রিটেনের শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি ভারতের সূতিবস্ত্র শিল্পের অবক্ষয় ঘটতে থাকে। এর ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার থেকেই দেশীয় শিল্পের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ কমতে থাকে এবং কৃষির উপর চাপ বাড়তে থাকে। এর প্রভাব উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক হয়। সুমিত সরকার এই প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন,

"আধুনিক যুগের বহু গণ আন্দোলনের চরিত্র বুঝতে গেলে হস্তশিল্পীদের দুর্দশাকে মনে রাখতে হবে। একদিকে অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া নরমপন্থী, চরমপন্থী ও গান্ধীবাদী যুগে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার করে। অন্যদিকে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে বহু বিক্ষোভ অবশিল্পায়নের প্রত্যক্ষ ফল।"

ঢাকা,সুরাট, মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য একদাসমৃদ্ধ শহরগুলির অবক্ষয় অবশিল্পায়নের আর একটি প্রমাণ। ১৮৪০ সালে স্যার চার্লস ট্রেভিলিয়ার্ম মন্তব্য করেছেন যে, "ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ১,৫০, ০০০ থেকে ৩০, ০০০ বা ৪০,০০০ এ নেমে আসে এবং জঙ্গল ও ম্যালেরিয়া ক্রমেই শহরকে গ্রাস করে নিচ্ছে। ঢাকা শহর ছিল ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার, কিন্তু এই সমৃদ্ধ শহরটি ক্রমশ ক্ষুদ্র ও হতশ্রী হয়ে পড়েছে। বাস্তবিক এই শহরটির দুর্দশা খুবই বেশি।"

১০.৭ ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন পর্যায়

সম্পদের নিষ্ক্রমণ ও অবশিল্পায়ন ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটতে থাকে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটি ভারত অধিগ্রহণ করার ফলে প্রক্রিয়াটি প্রথম শুরু হয়। ঠিক এই সময়ে ব্রিটেনে যুগান্তকারী কয়েকটি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে শিল্পবিপ্লবেরও সূত্রপাত ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, ১৭৬৪ সালে হারগ্রীভসের স্পিনিং জেনী, ১৭৬৫ সালে জেমস ওয়াটের ষ্টীম ইঞ্জিন, ১৭৬৯ সালে আর্কবাইটের ওয়াটার ফ্রেম, ১৭৭৯ সালে ক্রমটনের মিউল, ১৭৮৫ সালে কার্টরাইটের পাওয়ারলুম এবং ১৭৮৮ সালে ষ্টীম ইঞ্জিনকে "ব্লাষ্ট ফার্নেসে" প্রয়োগ উল্লেখ করা যায়। এর আগে ১৬৯৪ সালে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারতের লুণ্ঠন বিত্তের যোগান বাড়িয়ে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। শিল্পবিপ্লব ইংল্যাণ্ডে নতুন গোষ্ঠীসমূহের জন্ম দেয় এবং তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়।

ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রভাবকে রজনীপাম দত্ত এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,

'ইংল্যাণ্ডের কলে তৈরী কাপড় তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করল এবং কলের সূতো দেশীয় সূতো প্রস্তুতকারকদের সর্বনাশ করল। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে সূতো (Cotton

twist) রপ্তানি প্রায় ৫,২০০ গুণ বৃদ্ধি পায়। এই একই প্রক্রিয়া রেশমবস্ত্র, পশমবস্ত্র, লৌহ, মৃৎশিল্প, চিনামাটি, কাচ এবং কাগজ শিল্পের ক্ষেত্রে ঘটে। ভারতীয় হস্তশিল্পের এই অবক্ষয় ভারতের অর্থনীতিকে কী গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। ইংল্যান্ডে প্রাচীন হস্তশিল্পের অবক্ষয়ের মধ্য দিয়েই আধুনিক যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু পুরনো সব শহর, যেমন ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, সুরাট ইত্যাদি ''ব্রিটিশ শান্তি'' (Pan Britanica) -র ধাক্কায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কোন বিধ্বংসী যুদ্ধও এত ক্ষতি করতে পারত না।''

কোম্পানীর ভারত বিজয়ের মধ্য দিয়ে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক পুঁজির নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ বণিকরা ভারত থেকে সংগৃহীত রাজস্ব দিয়ে ভারতবর্ষ থেকেই একচেটিয়াভাবে জিনিসপত্র ক্রয় করে অত্যন্ত চড়া মুনাফায় বিদেশের বাজারে বিক্রি করত।

ইংরেজরা শিল্পায়নের পূর্বের বানিয়া-পুঁজি ভারতে বিনিয়োগ করেনি। বরং ভারত থেকে সংগৃহীত রাজস্ব দিয়ে ভারতেরই পণ্য খরিদ করে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করাই ছিল তাদের বাণিজ্যিক পদ্ধতি। এইভাবে দেখলে ইংল্যান্ডের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারত বিজয়ের ফলে ভারতীয়দের ওপর করভার আরোপ করার এবং বাজার সংগ্রহ করার অধিকার পায়। সামগ্রিক এই মুনাফা দিয়ে কোম্পানী ভারতীয় উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। ভারতের এই অর্ধদাসত্বের ফলেই ইংল্যান্ডের বানিয়া-পুঁজি ভারত বিজয়ের উপঢৌকন নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অধ্যাপক হাবিবের মতে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত থেকে ব্রিটেনে রপ্তানির পরিমাণ ১২ থেকে ২৪ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ব্রিটেন থেকে ভারতে আমদানির পরিমাণ যা ইতিপূর্বে ব্রিটেনের সমগ্র রপ্তানির ৬.৪ শতাংশ ছিল, বেড়ে ৯ শতাংশ দাঁড়ায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাণিজ্যিক পুঁজির শিল্পপুঁজিতে উত্তরণ ঘটে। এখন ভূমিরাজস্ব এবং বাণিজ্যের পরিবর্তে উদ্বৃত্ত আহরণের নতুন নতুন পথের সন্ধান শুরু হয়। শিল্পোন্নত ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক স্বার্থসাধন করার জন্যে ভারতের অর্থনীতিকে কাজে লাগান হয়। ভারত এখন ইংল্যান্ডের কাঁচামালের যোগানদার এবং উৎপাদিত শিল্পপণ্যের বাজারে পরিণত হয়। বিভিন্ন রকম উপায়ে ভারতের সম্পদ ইংল্যাণ্ডে নিষ্কাশিত হতে থাকে; এইরকমভাবে অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করলে উৎপাদিত শিল্পপণ্যের পাশাপাশি কিছু ব্রিটিশ পুঁজি ভারতের বাজারে প্রবেশ করে। এর কারণ হল এইসময় শিল্পোন্নত দেশগুলির হাতে প্রভূত পরিমাণে উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ-যোগ্য পুঁজি সঞ্চিত হয়েছিল। ইংল্যান্ড এখন ভারতকে কেবল তার কারখানায় তৈরী পণ্য বিক্রয়ের জন্যেই নয়, বরং উদ্ধৃত পুঁজি বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করে, এর ফলে ভারতের শিল্পায়ন শুরু হয়, যদিও তা হয়েছিল বিদেশী পুঁজির সাহায্যেই। রেলপথ নির্মাণ, পাট, লৌহ ও ইস্পাত (কেবল সূতিবস্ত্র শিল্প বাদে) সবই ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগে শুরু হয়, এর ফলে সম্পদের নিষ্কাশন আরও দ্রুত ঘটতে থাকে কারণ পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ থেকে সংগৃহীত সমস্ত মুনাফা পুনরায় ইংল্যান্ডে পাঠাতে থাকেন।

সুতরাং, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাণিজ্যিক পুঁজির যুগের মত শিল্পপুঁজির যুগেও ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শাসকের দ্বারা শোষিত হয়।

অগ্রগতি যাচাই করুন ২

১. **নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি পাঠ করার পর ঠিক (✔) বা ভুল (×) চিহ্নে দাগ দিন।**

ক) ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ভূমিকা সম্পর্কে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞদের ঐক্যমত আছে।

খ) জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশে ঐক্য এবং স্থায়িত্ব সম্ভব হয়েছে।

গ) পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা "সম্পদের নিষ্ক্রমণ" তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন।

ঘ) ভারতের অবশিল্পায়নের জন্য ব্রিটেনে শিল্পায়ন বহুলাংশে দায়ী।

২. **নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর অন্তত পঞ্চাশটি শব্দ লিখুন।**

সম্পদের নিষ্ক্রমণ।

অবশিল্পায়ন।

৩. **ঔপনিবেশিক শাসনের পর্যায়গুলির উপর দশ লাইন লিখুন।**

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

১০.৮ ঔপনিবেশিক শাসনে কৃষিব্যবস্থা

একটি দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়গুলি পরস্পর সংযুক্ত। কৃষি শিল্পকে সাহায্য করে এবং শিল্পের দ্বারা কৃষি উন্নত হয়। ব্রিটিশ সরকারের কৃষিনীতি ভারতের সমৃদ্ধ কৃষিব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল এবং গ্রামীণ ভারতের অগণিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছিল। এমনকী ব্রিটিশ সরকারের উদ্ভাবিত বাগিচা অর্থনীতি (চা, তামাক, পাট, নীল) ভারতীয় জনগণের প্রকৃত কোন উন্নতিসাধন করেনি।

সুতরাং, যে ব্রিটিশ কৃষিনীতি ভারতের কৃষি অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিল, তার পর্যালোচনা প্রয়োজন।

১০.৮.১ নূতন ভূমিব্যবস্থা

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়, ধাপে ধাপে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতজয় এবং নগদ টাকায় যত বেশি সম্ভব ভূমি রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোম্পানী এমন একটি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যার ফলে রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি ভারতে একটি সহযোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বিখ্যাত ''চিরস্থায়ী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা'' বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যায় প্রবর্তন করেন। পরে এই ব্যবস্থা মাদ্রাজের উত্তর অঞ্চলেও প্রবর্তিত হয়। এর ফলে এক 'চিরস্থায়ী জমিদার শ্রেণী' তৈরি হয়। জমিদারদের খাজনা চিরস্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় এবং জমিদারেরা কৃষককূল এবং শাসকদের মধ্যে এক যোগসূত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষক সম্প্রদায় চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু জমিদার এবং ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী লাভবান হয়। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক নিজেই মন্তব্য করেছেন,

''গণবিক্ষোভের বিরুদ্ধে আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি বলব অন্যান্য অনেক দিক থেকে ব্যর্থ হলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এমন একটি ভূ-স্বামী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে যাঁরা মনে প্রাণে ব্রিটিশ সরকারের স্থায়িত্ব কামনা করেন, যাঁদের জনগণের উপর কর্তৃত্ব আছে।''

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছাড়াও ব্রিটিশ শাসকরা ১৮২০ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ''রায়তওয়ারী'' ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। স্যার টমাস মারো ছিলেন এর প্রবর্তক। রায়তওয়ারী ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, প্রথমত, সরকার এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। কোন মধ্যস্বত্বভোগ ছাড়াই ভূমিরাজস্বের হার নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, কর্ণওয়ালিশের ব্যবস্থার মত এখানে কোন চিরস্থায়িত্ব ছিল না; এখানে সময়ে সময়ে ভূমিরাজস্বের হার পুনর্নির্ধারণ করার সুযোগ ছিল।

চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত হোক, অস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত হোক, ভূস্বামীরাই ছিলেন ব্রিটিশ ভূমিরাজস্বের ভিত্তি। এই ব্যবস্থা কৃষকদের ভূমিচ্যুত করে মহাজন এবং সাহুকারদের কৃষিসমাজে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। কৃষকদের কোন রক্ষাকবচ ছিল না, ফলে প্রকৃত কৃষকেরা ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃত কৃষকশ্রেণী ভূমিচ্যুত হবার ফলে কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন মধ্যস্বত্বভোগীরা একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে; এর ফলে কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয় এবং অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়। জমিদার এবং শাসকরা লাভবান হয়, অন্যদিকে কৃষকশ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ড্যানিয়েল থর্নারের ভাষায় বলতে গেলে,

''১৭৯০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে এমন একটি বিশাল সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিরাপদ জমিদার শ্রেণী গড়ে ওঠে যা ভারতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।''

ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট এই ধ্বংসাত্মক কৃষিব্যবস্থার পরিণাম হিসেবে আমরা ১৮৭০ এবং ১৮৯০ সালের দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির শ্লথগতিকে উল্লেখ করতে পারি।

সরকার বা কৃষকেরা যদি জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ বিনিয়োগ করতেন তাহলে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সম্ভব ছিল। স্বভাবতই দরিদ্র কৃষককুলের পক্ষে এই বিনিয়োগ সম্ভব ছিল না। ব্রিটিশরা এই ক্ষেত্রে

অত্যন্ত সীমিত বিনিয়োগ করেছিল। পাঞ্জাবের সেচ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের মধ্য দিয়েই দেখা যায় যে, কল্যাণমূলক প্রকল্পে সরকারী বিনিয়োগ ঘটলে উৎসাহব্যঞ্জক ফললাভ সম্ভব ছিল। সরকার এবং জমিদারশ্রেণী এই ধরনের বিনিয়োগে কোন উৎসাহ দেখায়নি বলে ভারতীয় কৃষি পশ্চাৎপদই থেকে যায়। কৃষকদের চিরন্তন দারিদ্র্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অন্যতম মারাত্মক দিক। ব্রিটিশ কৃষিব্যবস্থা ভারতে অসংখ্য ভূমিহীন কৃষকশ্রেণী সৃষ্টি করে; অনুন্নত কৃষি অর্থনীতির উপর জনসংখ্যার চাপ এবং লাভজনক বাগিচা অর্থনীতি ব্রিটিশদের মুনাফাকেই স্ফীত করেছিল। ভারতীয় কৃষকদের দারিদ্র্য সম্বন্ধে বলা হয় যে, ''একজন কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে জন্মায়, ঋণগ্রস্ত হয়ে বেঁচে থাকে এবং ঋণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। সাইমন কমিশন ভারতীয় কৃষকদের ঋণগ্রস্ততার কথা স্বীকার করেছেন। সরকারকে খাজনা দেবার জন্যও কৃষককে ঋণ গ্রহণ করতে হত। সুতরাং এই ঋণগ্রস্ত কৃষককুল কী করে কৃষিতে বিনিয়োগ করবে?

১০.৮.২ কৃষির বাণিজ্যকরণ

উপরিউক্ত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ভারতের সম্পত্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রেও (Property relations) বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। এর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে কৃষির বাণিজ্যকরণ। ১৮৬০ এর দশক থেকে কৃষির বাণিজ্যকরণ শুরু হয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে কৃষির বাণিজ্যকরণ বলতে বোঝায় বিক্রির উদ্দেশ্যে কৃষি উৎপাদন। উৎপাদন বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

বিভিন্ন কারণ এর জন্য দায়ী বলে মনে হয়—

- এই সময় রেল যোগাযোগের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। ১৮৫৭ সালে ২৮৮ মাইল রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৯০৮ সালে ৩০৫৭৬ মাইলে পৌঁছায়। রেলপথের এই দ্রুত প্রসার কৃষির বাণিজ্যকরণকে সাহায্য করে।
- ১৮৬৯ সালে সুয়েজখাল খুলে দেবার পর ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে দূরত্ব ৩০০০ মাইল কমে যায়। এর ফলে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিবিড় হয়।
- ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে কয়েকটি কারিগরী আবিষ্কারের ফলে আধুনিক বাষ্পীয় পোতের প্রবর্তন হয়। ফলে জাহাজের মাশুল প্রায় অর্ধেক কমে যায় এবং ভারত থেকে বিশাল পরিমাণ কৃষিজ পণ্য ইংল্যান্ডে রপ্তানি হতে থাকে।
- আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ব্রিটেন তুলো আমদানির জন্য বিকল্প সূত্রের সন্ধান করতে থাকে। স্বভাবতই ভারতীয় তুলোর দিকে সাময়িকভাবে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৮৬২ সালের পর স্বাভাবিকভাবেই তাই ভারতীয় তুলোর চাহিদা বেড়ে যায়। এর অর্থমূল্য ১৮৫৯-৬০ সালের ৫.৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৮৬৪-৬৫ সালে ৩৭.৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

  সামগ্রিক এই সব কারণে ভারত থেকে কৃষিজ পণ্যের রপ্তানির দ্রুত প্রসার ঘটে। ১৮৫৯-৬০ থেকে ১৯০৬-১৯০৭ সালের মধ্যে ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি পাঁচশত গুণ বেড়ে যায়।

  অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল বিদেশের বাজারে ভারতীয় কৃষিজ দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে কিন্তু ভারতীয় কৃষির উন্নতি ঘটেনি। **এইজন্য আমরা নিম্নলিখিত কারণগুলিকে দায়ী করতে পারি—**
- কৃষির পশ্চাৎপদ সংগঠন

- কারিগরী উন্নতিকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষকের সামর্থ্যের অভাব।
- কৃষির বাণিজ্যকরণের সুযোগ গ্রহণের জন্য কৃষকের মানসিক প্রস্তুতির অভাব।
- জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির অপ্রতুলতা।

সাম্রাজ্যবাদী কৃষির বানিজ্যকরণকে ভারতীয় কৃষকের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং ভারতীয় কৃষির বাণিজ্যকরণকে এক শক্তি কৃত্রিম এবং আরোপিত প্রক্রিয়া বলে মনে হয়। এর ফলেই ভারতীয় কৃষির স্থায়ী এবং প্রকৃত উন্নতি ঘটেনি। ঔপনিবেশিক শক্তি এইরকম উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত (objective) পরিবেশ ইতিপূর্বেই ধ্বংস করে ফেলেছিল। এতদ্সত্ত্বেও, কৃষি বাণিজ্যকরণের প্রভাব ছিল দীর্ঘমেয়াদি। শুরুতেই বলা যেতে পারে যে, এর ফলে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। খাদ্যশস্য এবং দানাশস্যের পরিবর্তে কাঁচা তুলো, পাট, নীল বেশি লাভজনক বলেই কৃষকেরা এই কাজ শুরু করে। বাণিজ্যিক পণ্য বেশি লাভজনক বলেই কৃষকেরা এই কাজ শুরু করে। কিন্তু দেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এর প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ হয়েছিল বলা যেতে পারে। ১৮৬৬ সালে বাংলা এবং ওড়িষ্যাতে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার কারণ হিসেবে উর্বর জমিতে ধান চাষের পরিবর্তে নীল চাষের প্রসারকে প্রধানত দায়ী করা হয়।

এ ছাড়াও, এই ব্যবস্থা কৃষক-সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি করে। মুষ্টিমেয় সেইসব কৃষক, যাদের অর্থ এবং সঙ্গতি ছিল তারা খাদ্যশস্যের পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করে এবং বিপুল পরিমাণে লাভবান হয়। অন্যদিকে, সঙ্গতিহীন দরিদ্র কৃষককুল তার নিজ খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এসব সত্ত্বেও কৃষির বাণিজ্যকরণের কতকগুলি আশাপ্রদ দিক লক্ষ্য করা যায়। কৃষি উৎপাদনে আঞ্চলিক দক্ষতার বিকাশ ঘটে। গ্রামীণ সমাজও তার বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে যুক্ত হয়। কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষক তার নিজের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের চেয়ে বাজারে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা এবং তার দামের প্রতি বেশি নজর দেয়।

সব মিলিয়ে এটা বলা যেতে পারে যে, কৃষির বাণিজ্যকরণের সুবিধা গ্রহণ করতে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল; ঔপনিবেশিক প্রতিবন্ধকতাই ছিল এই ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। অন্যান্য দেশে কৃষির বাণিজ্যকরণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজমির সম্প্রসারণ ঘটেছিল, জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল, বাণিজ্যিক কৃষিজ পণ্য খাদ্যশস্যের বিকল্প না হলেও বরং পরিপূরক হয়েছিল। ভারতবর্ষে কিন্তু এসব কিছুই ঘটেনি।

১০.৮.৩ কৃষিব্যবস্থার উপর প্রভাব

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত কৃষি অর্থনীতি ভারতীয় কৃষিব্যবস্থাকে বদ্ধ অচলায়তনে রূপান্তরিত করে। কৃষক ঋণগ্রস্থ হয়, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, অপুষ্টিজনিত কারণে এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। কৃষকের রাজস্বপ্রদানের ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, ইংরেজ সরকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে অবিচল থাকে।

অভাবের তাড়নায় কৃষক জমি বিক্রি করতে বাধ্য হলে শাসকরা বাধা সৃষ্টি করেনি কারণ এটি ছিল ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব নীতিরই প্রত্যক্ষ ফল। অধ্যাপক ইরফান হাবিব সঠিকভাবে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

"পূর্বতন রাজত্বে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন অনুযায়ী ভূমিরাজস্ব ছিল শস্য উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট

অংশ। এবং কৃষকের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্তেই হোক অথবা জমিদারদের মাধ্যমে আদায় করা হোক— তা প্রকৃতপক্ষে ছিল জমির উপর আরোপিত প্রকৃত কর ব্যবস্থা।"

তাই ভূমিরাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পায়, খাদ্যশস্যের প্রকৃত দাম হ্রাস পায়, গ্রামীণ ঋণ বেড়ে যায় এবং গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থায় অচল অবস্থা স্থায়ী হয়। কৃষির উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করাই ব্রিটিশ শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল এবং এর প্রত্যক্ষ ফল হ'ল ভারতীয় কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য এবং কৃষিব্যবস্থার বন্ধ অবস্থা।

১০.৯ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকা

১৮৫৭ সালের পরে যখন ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখনই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে "কল্যাণমূলক স্বৈরতন্ত্র" (benevolent despotism) অথবা উদারনৈতিক (laissez faire) রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়। এই রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র ছিল নৈশপ্রহরীর মত যা ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় ন্যূনতম হস্তক্ষেপ করত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের এই বর্ণনা ইতিহাসের বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। শক্তিশালী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো জমিদার, মহাজন এবং দেশীয় রাজাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করত। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা সদাসর্বদা ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করত।

১৮৫৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় ঘোষণাতে বলা হয়, "আমরা নিজেদের মত করে দেশীয় রাজন্যবর্গের অধিকার, মর্যাদা এবং সম্মানকে রক্ষা করব।"

মহারাণী আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে, "আমরা জানি পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূ-সম্পদকে ভারতীয়রা অত্যন্ত মূল্যবান মনে করেন। রাষ্ট্রের ন্যায্য পাওনা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের জমি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহকেও আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা দেব।"

ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশীয় রাজা এবং জমিদারশ্রেণীর সমস্ত রকম সমর্থন আদায় করাই ছিল এই সকল প্রতিশ্রুতি দেবার কারণ। ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার অর্থ ব্রিটিশ শিল্পপতি শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ বাজারকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করা। ১৮৫৮ সালে এই শ্রেণীই ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ভারত যেহেতু ছিল ইংল্যান্ডের উপনিবেশ, তাই ইংল্যান্ড ভারতকে বিশ্বধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত করে, ফলে ঔপনিবেশিক শোষণও তীব্র হয়।

রেলপথের প্রতিষ্ঠা, ইংরাজী ভাষা-শিক্ষার প্রবর্তন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি আধুনিকতার বিভিন্ন পক্রিয়া দিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতিতে ইংল্যান্ডের সর্বনাশা ভূমিকাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বাস্তবিকপক্ষে ঔপনিবেশিক মূল উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে ভারতকে গড়ে তোলা এবং মুনাফা সংগ্রহ করা। এই উদ্দেশ্যে ভারতে ব্রিটিশ শিল্পসমূহের কাঁচামালের যোগানদার তৈরি করা হয় এবং যে সমস্ত এলাকায় দ্রুত লাভ করা সম্ভব সেখানেই ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ করা হয়।

বাগিচা, খনি, পাটকল, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, ইনসুরেন্স, জাহাজী ব্যবসা, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, রেলপথ সবই ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন। ব্রিটিশ সরকার ও আমলাতন্ত্র সবসময় ভারতে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সবরকম সাহায্য করতেন। অপরদিকে শুল্ক, কর ইতাদি নানা বিষয়ে তারা ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক

আচরণ করতেন। অধ্যাপক সুমিত সরকার মনে করেন,

“Laissez faire নীতির আড়ালে সরকারী নীতির উদ্দেশ্যই ছিল ইউরোপীয় উদ্যোগকে সমর্থন ও সাহায্য করা। দুটি সহজলভ্যতা দৃষ্টান্ত হল রেলপথের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি প্রথা এবং আসামের চা-বাগিচার ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে বিশাল জমি বরাদ্দ করা। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যমূলক আচরণ করত। রেলপথের যোগাযোগ এবং মাশুল কাঠামো এমনই ছিল যে, এর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির বিশেষ লাভ হত না; সুবিধা পেত মূলত বন্দরগুলোই। সংগঠিত মুদ্রা বাজারের ওপর ছিল শ্বেতাঙ্গের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।....সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে, উনবিংশ শতকের অর্থনৈতিক ঠিকানা প্রধানত রপ্তানি বাণিজ্যের চাহিদাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। বিনিময় ব্যাঙ্ক, আমদানি-রপ্তানি সংস্থা, জাহাজী কোম্পানী ইত্যাদির মাধ্যমে ইংরেজরাই এদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর প্রায় সার্বিক কর্তত্ব কায়েম করেছিলেন।”

সুতরাং, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যই ছিল নির্মমভাবে ভারতকে শোষণ করা। শোষণের পদ্ধতি ছিল খুবই স্পষ্ট। প্রথমত, ভারতকে আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ভারত ছিল ইংল্যান্ডের কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জোগানদার। ভারতে ইংরেজরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বাস করতেন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীর স্বার্থকেই সুরক্ষিত রাখত। অন্যদিকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের বৈষম্যমূলক নীতির শিকার হতে হয়। জাতি বৈরী ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চরিত্র; শোষণ ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। উপনিবেশ হিসেবে ভারতকে ইংল্যান্ডের স্বার্থে সর্বদা ব্যবহার করা হয়। দুই বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশ অর্থনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যুদ্ধের আগে ভারত ছিল ইংল্যান্ডের নির্ভরযোগ্য বাজার এবং ব্রিটিশ পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগক্ষেত্র। যুদ্ধের ফলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধকালীন প্রয়োজনকে মাথায় রেখে ইংরেজরা ভারতীয় পুঁজিপতিদের অধীনে দেশীয় শিল্পোদ্যোগের বিকাশ ঘটাতে বাধ্য হল।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৩

১. ইংরেজদের দ্বারা প্রবর্তিত বিভিন্ন ভূমিব্যবস্থা এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২. **নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি পাঠ করার পর ঠিক (✓) অথবা ভুল (×) চিহ্নে দাগ দিন।**

ক) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে Laissez faire রাষ্ট্রহিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

খ) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতীয় অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছিল। গ)ঔপনিবেশিক নীতিসমূহ ভারতীয় পুঁজিপতিদের সুরক্ষা প্রদান করেছিল।

১০.১০ সারাংশ

উপসংহারে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির স্বার্থে ভারতবর্ষকে শোষণ করাই ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মুখ্য চরিত্র। দ্বিতীয়ত, দুই বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর বিকাশে সহায়তা করেছিল। ভারতীয় পুঁজিপতিরা চিনি, পাট, বস্ত্রশিল্প, লোহা ও ইস্পাত শিল্প এবং রসায়ন শিল্পে বিশেষভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে তখন ভারতীয় অর্থনীতির নিদারুণ মন্দা দশা। উপরোক্ত শিল্পগুলির বিকাশের অর্থ এই নয় যে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারত ছিল একটি শিল্পোন্নত দেশ। একটি দেশ শিল্পায়নের পথে তখনই দুর্বার গতিতে এগিয়ে

যেতে পারে যখন প্রথমত, উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকে এবং দ্বিতীয়ত, শিল্পায়নকে সমর্থন জোগানোর জন্য যখন ভারী যন্ত্রশিল্প, লৌহ ইত্যাদি মৌল শিল্পের বিকাশ ঘটে। ব্রিটিশ আর্থিক নীতির ফলে ভারতবর্ষে কয়েকটি শিল্প গড়ে উঠলেও প্রকৃত শিল্পায়ন ঘটেনি। এর কারণ হল অর্থনীতির এই দিকটিতে ইংরেজদের কোন আগ্রহ ছিল না। উপরন্তু, ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা ছিল মন্দা কবলিত। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় এবং কৃষি উৎপাদন ছিল নিম্নগামী, সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল সামান্য, পরিকাঠামো ছিল অনুন্নত। মানুষের দক্ষতার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার এই পরিস্থিতিতে সম্ভব ছিল না। ইংরেজরা দাবি করে থাকে যে তারা ভারতীয় অর্থনীতিকে আধুনিক করে তুলেছিল। উপরোক্ত আলোচনা এই দাবির অসারত্বেকেই প্রমাণ করে।

১০.১১ প্রধান শব্দগুচ্ছ

মূলধনের পুঞ্জীভবন	ঃ	শিল্পোন্নয়নের জন্য জমি, শ্রমিক ও সংগঠনের একত্রিকরণের প্রক্রিয়া।
অবশিল্পায়ন	ঃ	ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে প্রচুর সংখ্যক সাবেকী শিল্পের ধ্বংসের প্রক্রিয়া।
বিদেশী পুঁজি	ঃ	অন্য কোন দেশ অথবা বহুজাতিক সংস্থা থেকে আহূত অর্থ বা সম্পদ।
মোট লাভ	ঃ	কর, মূল্যাপকর্ষণ ইত্যাদির আগেই অর্জিত লাভ।
মুক্ত বাণিজ্য	ঃ	প্রধানত বাণিজ্যিক ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ না করার নীতি।
একচেটিয়াত্ব	ঃ	মূলধন, সম্পদ অথবা শিল্পের একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হবার প্রবণতা।
অনুন্নত সমাজ	ঃ	ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে যে সমাজের উন্নতি রুদ্ধ থাকে সেই সমাজকে অনুন্নত সমাজ বলে।

১০.১২ অগ্রগতি যাচাই করার উত্তরমালা

অগ্রগতি যাচাই করুন ১

১. ক) ✓ খ) ✓ গ) × ঘ) ×

২. অনুচ্ছেদ ১০.২ পাঠ করে উত্তর লিখুন।

অগ্রগতি যাচাই করুন ২

১. ক) × খ) × গ) × ঘ) ✓

২. অনুচ্ছেদ ১০.৬ পাঠ করুন।

৩. অনুচ্ছেদ ১০.৭ পাঠ করুন।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৩

১. অনুচ্ছেদ ১০.৮ পাঠ করুন।

২. ক) × খ) ✓ গ) × ঘ) ✓

একক ১১ ❑ জাতীয় আন্দোলন-১

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য
১১.১ প্রস্তাবনা
১১.২ ১৮৫৭ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম
  ১১.২.১ কারণ
  ১১.২.২ বিস্তৃতি ও তীব্রতা
  ১১.২.৩ পরাজয়
১১.৩ জাতীয় আন্দোলনের প্রাথমিক পর্ব
  ১১.৩.১ বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা
  ১১.৩.২ ঔপনিবেশিক শাসনের ভূমিকা
  ১১.৩.৩ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব
১১.৪ নরমপন্থী ও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ
  ১১.৪.১ নরমপন্থী দল ঃ উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা
  ১১.৪.২ চরমপন্থী দল ঃ উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা
১১.৫ স্বদেশী আন্দোলন
১১.৬ সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ
  ১১.৬.১ প্রধান সংস্কারকগণ ঃ বিবিধ বিষয় ও মতবাদ
  ১১.৬.২ সমাজ সংস্কারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী
  ১১.৬.৩ পদ্ধতি
১১.৭ সারাংশ
১১.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ
১১.৯ অগ্রগতি যাচাই করার উত্তরমালা

১১.০ উদ্দেশ্য

জাতীয় আন্দোলনকে বাদ দিয়ে আধুনিক ভারতবর্ষের অগ্রগতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। বিদেশীদের জোয়াল থেকে মুক্ত হবার জন্য ভারতীয় জনসাধারণের প্রয়াসই হচ্ছে ভারতের জাতীয় আন্দোলন। এই একক সঠিকভাবে অনুধাবন করলে নীচের বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করতে পারবেন ঃ

- সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সামগ্রিক প্রেক্ষিত।
- জাতীয় আন্দোলনের উত্থানের কারণগুলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।
- জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

- নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের তফাৎ সহজেই বুঝতে পারবেন।
- ভারতের জাতীয় আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ও কার্যকারিতা বুঝতে পারবেন।
- সাংস্কৃতিক পদ্ধতিকে সনাক্ত করতে পারবেন এবং উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের বিভিন্ন সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।

১১.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা আপনাদের ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছুটা পরিচয় করিয়ে দেব। ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সবসময়েই ছিল, কিন্তু ১৮৫৭ সালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভারতীয়রা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা করেছিল। এই কারণে এই আন্দোলনকে ভারতের প্রথম জাতীয় আন্দোলন বলে অভিহিত করা হয়। কিছু দুর্বলতার জন্য ব্রিটিশ রাজ এই আন্দোলনকে সহজেই দমন করে, কিন্তু এই সংগ্রাম থেকে পিছু হটার কোন প্রশ্ন ছিল না। এই সংগ্রাম পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যারা এতদিন ব্রিটিশের বদান্যতার প্রতি আস্থাশীল ছিল, তারাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলে দেবার জন্য এগিয়ে এল। রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল এবং জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামে পথনির্দেশ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। এই এককে আমরা নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের কার্যাবলী ও প্রচেষ্টা লক্ষ্য করব। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কীভাবে জনগণকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সামিল করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেব।

ভারতীয় সমাজে এই সময়টিই ছিল সাংস্কৃতিক নবজাগরণের উপযুক্ত সময়। আমাদের সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেকে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। নতুন ভারত গঠনে তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ভারতীয় সমাজ সংস্কারকেরা কোন্ কোন্ দৃষ্টি দিয়েছিলেন, এই এককে তার একটি আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই এককটি অবশ্য, ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে গান্ধীর উত্থানের আগে পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।

১১.২ ১৮৫৭ ঃ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করতে শত শত সৈন্য, শ্রমজীবী ও কৃষক যৌথ প্রয়াস নিয়েছিল। এটি কোন তাৎক্ষণিক ঘটনা নয়। এটি ছিল শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী শোষকের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ রাজ ভারতবর্ষ দখল করে। তার অর্থনীতি ও সমাজকে সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। এই দীর্ঘ সময়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন সংঘটিত হয় বিভিন্নভাবে-কোথাও তা ক্ষমতাচ্যুত শাসকদের দ্বারা, কোথাও হৃতদরিদ্র জমিদার বা পলিদার (দক্ষিণ ভারতের সাময়িক জমিদার) দের দ্বারা এবং কোথাও বা অধিকৃত দেশীয় রাজন্যদের দ্বারা। এই আন্দোলনগুলির সামাজিক ভিত্তি হল কৃষক, কারিগর ও জীবিকাচ্যুত সৈন্যদল। ১৭৬০ সালের বাংলা ও বিহারের সন্ন্যাসী ও চুয়াড় বিদ্রোহ দিয়ে প্রতিবাদ শুরু

হয়। এমন একটি বছরও ছিল না যখন দেশের কোন না কোন অংশে প্রতিবাদ হয়নি। ১৭৬৩ সাল থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে অন্তত চল্লিশটি বড় বিদ্রোহ এবং শতশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে যদিও এই আন্দোলনগুলি ছিল বিশাল তবুও এগুলির চরিত্র ছিল একেবারেই স্থানীয় এবং ফলাফলের নিরিখে একে অপরের থেকে বিচ্ছন্ন।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ যোগদান করেছিল। ব্রিটিশ রাজত্বের মূল উচ্ছেদ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

১১.২.১ কারণ

প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এক মহা গণঅভ্যুত্থান। ১৮৫৭-১৮৫৯ দু'বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই গণবিদ্রোহ যার লক্ষছিল ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি। বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয় বাংলার মাটিতে কলকাতারই উপকণ্ঠে ব্যারাকপুর সেনা শিবিরে। প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বেঙ্গাল রেজিমেন্টের তরুণ সিপাই মঙ্গাল পাণ্ডের। দিনটি ছিল ১৮৫৭ সালের ২৯ শে মার্চ। বিদ্রোহের অপরাধে মঙ্গাল পাণ্ডের সামরিক আদালতে বিচার হয় এবং ফাঁসি হয় ১৮৫৭ সালের ৮ই এপ্রিল। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে ভারতের নানা প্রান্তের সেনা ছাউনিতে। বিক্ষোভের বারুদস্তূপে শহীদের রক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গার কাজ করল। বহরমপুর বিদ্রোহ শুরু হল।

চিত্র মঙ্গাল পাণ্ডে

১০ই মে ১৮৫৭ সালে কোম্পানীর ভারতীয় সিপাইরা মীরাটে ইউরোপীয়ান অফিসারদের হত্যা করে দিল্লীতে উপস্থিত হল। এরপর তারা লালকেল্লায় প্রবেশ করে নামসর্বস্ব মুঘল প্রতিনিধি বৃদ্ধ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে।

কোম্পানীর সিপাইদের তাদের নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ ছিল যেমন, আর্থিক ও চাকুরির অন্যান্য শর্ত, ধর্মে হস্তক্ষেপ ও উগ্র জাতিবৈরীও। কিন্তু, মূলত সিপাইদের মধ্যে দিয়ে ভারতের জনসাধারণের সাধারণ অসন্তোষ প্রতিফলিত হয়েছিল। তারা তো ভারতীয় জনসাধারণেই একটা অংশ; বলা যায়, সামরিক উর্দি পরিহিত কৃষক। ভারতীয় সমাজের বৃহত্তর অংশের আশা, আকাঙ্খা, হতাশা এবং অসন্তোষ তাদের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হত। জনসাধারণের এই সর্বস্তরের অসন্তোষই সিপাহী বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল কোম্পানীর অর্থনৈতিক শোষণ ও তার ফলে জনসাধারণের ধূমায়িত অসন্তোষ। কোম্পানীর উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয় অর্থনীতির বনিয়াদকে ধ্বংস করে তাকে ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রয়োজনে ব্যবহার করা। সর্বোপরি কোম্পানীর ঔপনিবেশিক নীতি অনুযায়ী ক্রমাগত ভূমিরাজস্বের হার বৃদ্ধির ফলে জমিতে কৃষকদের স্বত্ব লোপ হয়। কৃষকরা ক্রমাগত ইজারাদার, ব্যবসাদার ও মহাজনদের

কাছে জমি হস্তান্তরে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষের চিরাচরিত কুটীর শিল্প ধ্বংস হবার ফলে হাজার হাজার শ্রমজীবী তাদের জীবিকা হারায়। ১৭৭০ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে ১২টি প্রধান ও অসংখ্য ছোট দুর্ভিক্ষ কৃষক ও হস্তশিল্পীদের দুরবস্থারই পরিচায়ক।

হাজার হাজার জমিদার ও পলিদার নিজেদের জমির ও রাজস্বের স্বত্ব হারায়। শতশত ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাদের রাজত্ব হারান। রাজ্যশাসনে কোম্পানীর হস্তক্ষেপ অধিকাংশ শাসকই পছন্দ করতেন না। সাবেক বিদ্বজ্জন ও পুরোহিত শ্রেণী এতদিন ঐতিহ্যশালী শাসক, গোষ্ঠীপতি, অভিজাত ও জমিদারের আনুকূল্য পেয়ে আসছিল; কিন্তু কোম্পানীর আমলে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

চিত্র : বেরিলীর যুদ্ধে সৈন্য এটা জনতা (৫ই মে, ১৮৫৮)

ব্রিটিশ শাসনের বিদেশী চরিত্র সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধাণ কারণ। এদেশে ব্রিটিশ চিরদিনই বিদেশী ছিল। বিদেশী জবরদখলকারীদের প্রতিফলিত নির্দেশ মান্য করা ভারতীয় জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত অপমানকর মনে হত।

১১.২.২ বিস্তৃতি ও তীব্রতা

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ কালবৈশাখীর ঝড়ের মত উত্তর ভারতকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রায় অর্ধেক ভারতীয় সৈন্য বিদ্রোহ করে। উত্তর ভারতের সর্বত্র সিপাহী বিদ্রোহে অসামরিক জনগণ অংশগ্রহণ করে। একটি হিসেব অনুযায়ী অযোধ্যায় প্রায় দেড়লক্ষ লোক ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মারা যায়, যার মধ্যে প্রায় এক লক্ষই ছিল অসামরিক ব্যক্তি। এই বিদ্রোহ শীঘ্রই অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড,

দোয়াব, বুন্দেলখণ্ড মধ্যভারত, বিহারের বৃহৎ অংশ ও পূর্ব পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। রাজস্থানের গাজিয়াবাদ, কোটা ও নিমচ অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। কোলাপুরের সিপাহীরাও বিদ্রোহে অংশ নেয়। এই অঞ্চলের বহু দেশীয় রাজ্যের রাজন্যরা কোম্পানীর পক্ষে থাকলেও সৈন্যবাহিনীও জনসাধারণ বিদ্রোহে অংশ নেয় অথবা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে অস্বীকার করে। লণ্ডন টাইমস-এর সংবাদদাতা ডব্লু এইচ রাসেল ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করে তাঁর প্রতিবেদনে লেখেন যে, শ্বেতাঙ্গদের গাড়ীর দিকে কোন ভারতীয় বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় না। তাদের চোখের ভাষা কে ভুলবে! কে তা ভুল বুঝবেন? কেবলমাত্র এই থেকেই বুঝেছিলাম যে, আমাদের জাতিকে অনেকেই আর ভয় পায় না, আর এখনতো সকলেই তাদের অপছন্দ করে।

চিত্র : যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁসীর রাণী

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ছিল বিদ্রোহের মূল শক্তি। সিপাহী, জনসাধারণ ও নেতাদের মধ্যে সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িক সংহতি কাজ করেছিল। বিদ্রোহে কয়েকজন সাহসী ও বিচক্ষণ নেতার আবির্ভাব ঘটে। ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈ, তাঁতিয়া টোপী, অযোধ্যার বেগম হজরতমহল, কুনওয়ার সিং, বেরিলির খান বাহাদুর, ফৈজাবাদের মৌলবী আহমতুল্লা ও ব্রিটিশ বাহিনীর সামান্য সৈনিক বখত খান, যিনি বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক হয়েছিলেন; এঁরা হলেন বিদ্রোহের নাম করা নেতাদের অন্যতম। সর্বোপরি, সাধারণ সিপাহী ও সাধারণ দৃষ্টান্তমূলক সাহস ও নিঃস্বার্থ আনুগত্যের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন।

১১.২.৩ পরাজয়

অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নির্মমভাবে বিদ্রোহকে দমন করতে সক্ষম হল। এর বিভিন্ন কারণ ছিল। যদিও এই বিদ্রোহ যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল তবুও সমগ্র দেশের সর্বশ্রেণীর, সর্বস্তরের জনসাধারণ এতে সামিল হয়নি। বাংলাদেশ, দক্ষিণ ভারত ও পাঞ্জাব এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্রোহ করে এইসব অঞ্চল ছিল রণক্লান্ত। বেশীরভাগ ভারতীয় দেশীয় রাজ্যনবর্গ ও বড় জমিদারেরা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, হায়দাব্রাদের নিজাম, যোধপুর ও রাজপুতনার অন্যান্য রাজারা, ভূপালের নবাব, কাশ্মীর ও পাতিয়ালার শাসকরা, নেপালের রাজারা এবং অপরাপর বিভিন্ন শাসক ও নেতৃবৃন্দ এই বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশদের সক্রিয় সাহায্য করেছিল।

সামগ্রিকভাবে ব্যবসাদার, মহাজনরা হয় ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিল না হয় বিদ্রোহের প্রতি নিষ্পৃহ ছিল। আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয়রাও বিদ্রোহে সাহায্য করেনি। বিদ্রোহী নেতারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও তারা যৌথ

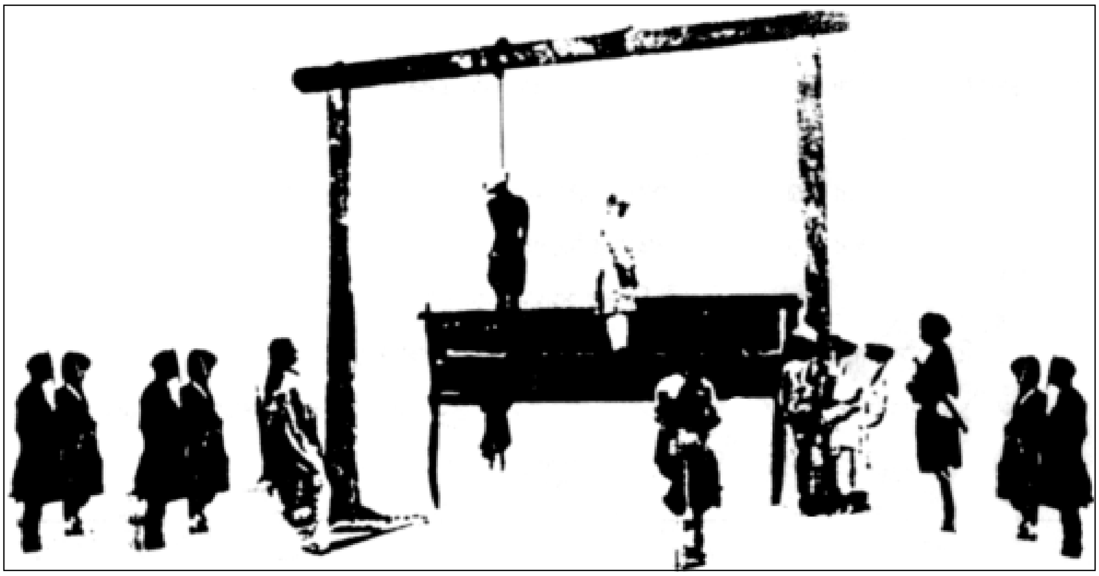

চিত্র : ব্রিটিশদের দ্বারা বিদ্রোহীদের ফাঁসী

লক্ষ্য ও আভিন্ন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেনি। পরিবর্তে তারা নিজেদের মধ্যে সবসময় ছোটখাটো বিবাদে লিপ্ত থাকত। বিদ্রোহীদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র অপ্রতুল ছিল এবং বেশীর ভাগ সময় তাদের তরবারী ও বর্শার মতো পুরোন অস্ত্র নিয়ে লড়াই করতে হত। তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতাও ছিল। সিপাহী সাহসী ছিল তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব তাদের সমারিক শৌর্যকে বিঘ্নিত করত।

সর্বোপরি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে অথবা কী ধরনের বিকল্প সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা উচিত সে সম্বন্ধে বিদ্রোহীদের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ

তাদের একত্রিত করেছিল। তারা চেয়েছিল প্রাক-ব্রিটিশ যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি কী হবে সে বিষয়ে সঠিক ধারণা ছিল না। বোধহয়, এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। সাধারণের মধ্যে সর্বভারতীয় চেতনা তখনও গড়ে ওঠেনি। সম্ভবত যদি বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হত, তাহলে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আধুনিক জাতীয় চেতনা আরো বিকশিত হতে পারত। যেমন পরবর্তী যুগে আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু বিদ্রোহীরা বেশি সময় পায়নি। ১৮৫৮ সালের শেষে বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করা হয়।

ভারতীয় জনসাধারণের প্রথম স্বাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বিফল হয়নি। ভারতীয় জনগণের চেতনায় এটি একটি অনপনেয় চিহ্ন রেখে গেছে এবং তা পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনে স্থায়ীভাবে প্রেরণা জোগায়।

অগ্রগতি যাচাই ক(ন

১. ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি সম্বন্ধে একশ শব্দের একটি আলোচনা করুন।

২. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি ঠিক না ভুল (✔) অথবা (✕) চিহ্নে দিন।

ক) ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে জাতীয় স্তরে প্রথম প্রচেষ্টা।

খ) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ শুধুই সিপাহীদের বিদ্রোহ।

গ) সমস্ত জমিদার ও মহাজন সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেছিল।

ঘ) হিন্দু-মুসলমানের সংহতি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে শক্তিশালী করেছিল।

৩. ক) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দেশীয় তিনজন রাজার নাম লিখুন যারা ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিল।

খ) ১৮৫৭-র বিদ্রোহে ব্রিটিশ বিরোধী তিন ভারতীয় নেতার নাম লিখুন।

১১.৩ জাতীয় আন্দোলনের প্রাথমিক পর্ব

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের বিফলতা পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে, সাবেক দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক বিন্যাস আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারবে না। এর জন্য চাই নতুন সামাজিক গতিবেগ, নতুন চেতনা, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রকে উপলব্ধি করে তার ভিত্তিতে গড়ে তোলা আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে সমবেত রাজনৈতিক আন্দোলন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই ধরনের আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এই নতুন আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি ছিল সংকীর্ণ কিন্তু তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল নতুন রাজনৈতিক বোধ, বুদ্ধিজীবীদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী এবং নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। আন্দোলনে ছিল নতুন গতিবেগ, নতুন লক্ষ্য, নতুন শ্রেণী ও নতুন সাংগঠনিক কলাকৌশলের প্রতীক।

অনেক কারণেই এই শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় জনগণের সামগিক স্বার্থ ব্রিটিশ স্বার্থের বৈপরীত্যের ফলে ভারতের সমাজ ও অর্থনীতি ক্রমেই অনুন্নত হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক উন্নতিতে এরই ফলে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। আপাতত দেখা যাক কীভাবে সংগঠিত জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল।

১১.৩.১ বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

চিত্র : রাজা রামমোহন রায়

প্রারম্ভে এই প্রক্রিয়া ভারতের আধুনিক বুদ্ধিজীবীরাই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। একটা স্ববিরোধী সত্য যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, এঁরা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রতি কিছুটা সমর্থনসূচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, নবভারতের পুনর্গঠন ব্রিটিশ শাসনেই সম্ভব কারণ তৎকালীন বিশ্বে ব্রিটিশই ছিল সবচেয়ে উন্নত দেশ। তাঁরা আশা করতেন যে, ইংরেজরাই ভারতীয়দের পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে। বুদ্ধিজীবীরা আশা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে শীঘ্রই শিল্পোন্নত করবে ও এখানে আধুনিক পুঁজিবাদ চালু করবে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, যেহেতু ব্রিটেন গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পীঠস্থান সেহেতু, সে ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান কৃৎকৌশল এবং আধুনিক ধ্যানধারণা চালু করবে। এর ফলে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নবজাগরণ ঘটবে। ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষ ছিল অতিরিক্ত আকর্ষণ। ফলে তাঁরা ১৮৫৭-র বিদ্রোহে ইংরেজদের সমর্থন করেন। তাঁরা ইংরেজ রাজত্বকে ‘‘ঈশ্বরের দান’’ বা ‘‘ঈশ্বরের অভিপ্রায়’’ বলে বর্ণনা করেছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বুদ্ধিজীবীদের ধীরে ধীরে মোহমুক্তি ঘটতে শুরু করে। তাঁরা দেখেন যে, তাঁদের আকাঙ্খা ভুল পথে চালিত হয়েছে। তাঁরা ক্রমেই ব্রিটিশ শাসকের চরিত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মূল্যায়ণে পূর্বের ভ্রান্তি অনুধাবন করতে পারেন।

লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, কার্যত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে এবং ভারতে আধুনিক শিল্পায়ন ও কৃষির উন্নতিতে বাধাদান করছে।

সামন্ততন্ত্রের প্রসার ও স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনের ব্রিটিশ শাসকরা ভারতে স্থায়ী জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করতেই আগ্রহী ছিলেন।

তারা জনশিক্ষাকে অবহেলা করেছে, জনগণের নাগরিক অধিকার খর্ব করেছে এবং বিভেদ নীতি চালু করেছে। সুতরাং, এই অবস্থায় বুদ্ধিজীবীরা কী করতে পারেন? ক্রমান্বয়ে বুদ্ধিজীবীরা চেতনার বিস্তারের জন্য ও দেশে রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু করার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করেন। ভারতে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য

আন্দোলন প্রথম শুরু করেন রামমোহন রায়। বলা যেতে পারে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কলমের যুদ্ধের সূত্রপাত তখন থেকেই। তিনি ইংরেজ শাসনের সমালোচনা, দেশের জনসাধারণের দুর্গতির প্রতিকার দাবি থেকে শুরু করে সতীদাহ নিবারণের যৌক্তিকতা, শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে জোরালো রচনা প্রকাশ করেন তাঁর সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকায়। কলমের যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তদানীন্তন গর্ভনর জেনারেল জন অ্যাডাম সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রনদেশ জারী করেন। রামমোহন এর প্রতিবাদ করলেন সুপ্রীম কোর্ট ও ব্রিটেনের রাজার কাছে প্রতিবাদ করে। এর তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। এই প্রথম একজন ভারতীয় ব্রিটিশ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মুখর হলেন। বলা যেতে পারে, শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে আন্দোলন পরবর্তীকালে সংগঠিত হয়েছিল রামমোহনের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে স্মারকলিপি তারই সূচনা।

এবারের লড়াই শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগরণের। ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পাশ্চাত্য শিক্ষার জানালা উন্মোচিত হল। হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নতুন চিন্তা, যুক্তিবাদ ও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করেন তাঁর ছাত্রদের যাঁরা ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী নামে খ্যাত। তাঁর শিক্ষার ফলে তরুণ মনের জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞানমানসিকতা ও ইহমুখীনতা বাংলার সমাজে একটা জাগরণের সূচনা করে।

বঙ্কিমচন্দ্র

অন্যদিকে জনজাগরণ ও জনচেতনাকে শাণিত করে তোলার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', হরিশচন্দ্র মুখার্জীর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার', শিশির কুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক লড়াইয়ে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত শক্তি ক্রমশ আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে অগ্রসর হতে লাগল। শিক্ষা, মনন, শিল্প ও সাহিত্যের জগতেও জাতীয় চেতনার উন্মেষে বাংলার ভূমিকাই ছিল অগ্রণী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁদের কবিতায় ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাস ও অন্যান্য রচনার মাধ্যমে এক ভাববিপ্লব সৃষ্টি করেন। তাঁর রচিত 'বন্দে মাতরম' স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি নানাধরনের বিদ্বজ্জন সভার মাধ্যমেও আলোচনা ও বিতর্কের সূত্রপাত হয়, যার লক্ষ্য ছিল জনশিক্ষা ও জনচেতনার প্রসার ও জাগরণ। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজের এ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮), প্রতিষ্ঠিত হয় জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৯৩৮), যার সদস্য ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকপাল মনীষী রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় গঠিত হয় তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯)। জমিদাররা ১৮৪৩ সালে তৈরি করেছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। পরে ১৮৫১ সালে তা মিশে যায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান

অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে। তার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রখ্যাত লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিলেতে ১৮৫২ সালে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়ে ভারতে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদ গঠনের দাবি করা হয়। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আন্দোলন এখন পর্যন্ত সংগঠিত আকারে দেখা না গেলেও ঔপনিবেশিক শাসন যে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক নয় একথাটা ব্রিটিশ শাসকদের সেদিন সুস্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সংগঠনগুলি ছিল স্থানীয় এবং এখানে ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যাইহোক, ১৮৭৬ এবং ১৮৮০-র দশকে আরো আধুনিক, স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে।

১১.৩.২ ঔপনিবেশিক শাসনের ভূমিকা

ভাইসরয় লিটনের স্পষ্টতই প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গতি দ্রুত করে দেয়। নীচে লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ-

১৮৭৮ সালের অস্ত্র-আইন এক ধাক্কায় সমগ্র ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করে দিল।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ভারতীয় সমালোচনার কণ্ঠস্বরের কথা হল ১৮৭৮ সালে 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' পাশ করে।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতার উর্দ্ধতম বয়সসীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ করায় ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে সফল হবার আশা আরও কমে গেল।

১৮৭৭ সালে 'রাজকীয় দরবারে' অজস্র অর্থ ব্যয় হল। মনে রাখবেন এই সময় তীব্র দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার ভারতীয় প্রাণ হারাচ্ছিল এবং ভারতের অর্থে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রচুর অর্থের অপব্যয় হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি করা কাপড়ের উপর কর কমিয়ে দেওয়ার ফলে ভারতীয় বয়নশিল্পের ভবিষ্যৎ সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। ভারতীয় বয়নশিল্পের ভবিষ্যৎ নিদর্শন দূর করতে এই উদ্দেশ্যে তিনি ইলবার্ট বিল রচনা করলেন। বলা হল, ভারতীয় জেলা ও সেসন জজরা ফৌজদারী মামলায় ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারবে। ভারতে অবস্থিত ইউরোপীয় তীব্র জাতিগত প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলে সরকার এই বিল সংশোধন করতে বাধ্য হন। এই ঘটনাবলী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্রুত প্রসারের উপাদানী বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

১১.৩.৩ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব

সেইসময় একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে গঠন করার উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করা হল। নেতৃবৃন্দ এমন এক সংগঠন গড়ে তুলতে চাইলেন যেটি শোষকদের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসীর রাজনৈতিক প্রয়াসকে সংগঠিত করবে। বেশ কিছুদিন ধরে এই দিকে চেষ্টা চলেছিল। আই. সি. এস. ত্যাগী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী 'ভারতসভা' গঠন করে

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫

এটিকে নেতৃত্ব দেন। শেষ পর্যন্ত এই প্রয়াস একটি সঠিক সংগঠনের রূপ নেয়। দাদাভাই নৌরজী, বিচারপতি এম. জি রামাজে, কে. টি তেলাংগ এবং বদরুদ্দীন তায়েবজী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়নের এ.ও. হিউমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত করেন। ডব্লু. সি. ব্যানার্জী হন প্রথম সভাপতি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সেইভাবে শুরু হয়।

প্রথম যুগের জাতীয় নেতারা মনে করতেন স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সময় এখনো হয়নি। তাঁরা বরং সমগ্র আন্দোলনের ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আপনার নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা হচ্ছে যে প্রথম যুগের নেতাদের মৌলিক দাবিগুলি কী ছিল?

(ক) মৌলিক দাবিগুলির একটি হল ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের চেতনা গড়ে তোলা এবং ভারতবর্ষকে একটি জাতি হিসেবে গড়ে তোলা; উদ্দেশ্য হল ভারতীয় সমাজকে এমনভাবে তৈরি

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী (ডানদিকে)

করা যাবে যাতে তারা ভারতীয় জাতি নয়, তারা বিভিন্ন দল, ভাষা ও ধর্মে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন বলে ব্রিটিশ অভিযোগের যোগ্য জবাব দিতে পারে।

(খ) দ্বিতীয় মৌলিক উদ্দেশ্য হল একটি জাতীয় রাজনৈতিক মঞ্চ ও অভিন্ন কার্যাবলী তৈরি করা যা সারা ভারত রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি বলে স্বীকার করে নেবে।

(গ) তৃতীয় উদ্দেশ্য হল জনমানসে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলা, রাজনৈতিক প্রশ্নে উৎসাহ বাড়ান এবং রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।

(ঘ) আর এক উদ্দেশ্য হল সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ও নেতৃত্ব দ্বারা আন্দোলন সম্ভব নয়। সর্বভারতীয় স্তরে ১৮০৮-র দশকেও এই ধরনের নেতৃত্ব ছিল না। একই সঙ্গে একদল রাজনৈতিক কর্মচারী বা ক্যাডার তৈরি করা প্রয়োজন ছিল, যারা রাজনৈতিক কাজ চালাতে পারবে।

সুতরাং, প্রথম দু'বছর জাতীয়তাবাদীদের মৌলিক উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে বলা যায় তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি ঔপনিবেশিকবিরোধী, সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা।

অগ্রগতি যাচাই ক(ন

১. কোন্ বক্তব্য সঠিক না ভুল? চিহ্ন দিন **(✔)** বা **(✘)**।
   ক) ১৮৫৭ সালের পর পরিষ্কার হয়েছিল যে ঔপনিবেশিক শাসনকে প্রতিহত করতে হলে নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন।
   খ) ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা সবসময় ব্রিটিশের অনুগত ছিল।
   গ) ব্রিটিশ শাসকরা নাগরিক অধিকারকে উৎসাহিত করত।
   ঘ) ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতের অর্থনীতি বিকাশ লাভ করেছিল।

২. প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মূল লক্ষ্য কী ছিল? দশ লাইনে উত্তর দিন।

১১.৪ নরমপন্থী ও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ

প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী যারা নরমপন্থী নামে পরিচিত ছিল তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সমালোচনা এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নে অটল ও নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণের তিনটি দিকই যথা, বাণিজ্য, শিল্প ও রাজস্বের বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রই হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্রিটিশ অর্থনীতির তাঁবেদারে পরিণত করা। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে কাঁচামালের ভাণ্ডার, ব্রিটিশ নির্মিত জিনিষের বিক্রির বাজার ও বিদেশী পুঁজি লগ্নীর স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। নরমপন্থীরা ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গড়ে তোলার এই অপচেষ্টার বিরোধী ছিলেন।

১১.৪.১ নরমপন্থী দল ঃ উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা

প্রথম যুগের নরমপন্থী দল গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার এবং বর্ণবিদ্বেষহীন উদার শাসনব্যবস্থার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। কার্যত, এই সময়েই জাতিয়তাবাদীদের কার্যকলাপের ফলে জনসাধারণের চিন্তাধারায়, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার শিকড় প্রোথিত হয়।

নরমপন্থীরা আধুনিক শিল্প, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার বিস্তারে আন্দোলন শুরু করেন। আইনসভায় ও শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের বেশি করে অংশগ্রহণের জন্য সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁরা সংস্কারের দাবি জানান।

প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীদের প্রধান দুর্বলতা ছিল এই যে তাঁদের আন্দোলনের সামগ্রিক ভিত্তি ছিল সংকীর্ণ। রাজনৈতিক আন্দোলন এখন পর্যন্ত ব্যাপক হতে পারেনি। এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের স্তরে পৌঁছতেও পারেনি। শহুরে, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই নরমপন্থী আন্দোলন সীমিত ছিল। কিন্তু, তাঁদের নীতি ও কার্যক্রম কেবলমাত্র মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁরা সব সম্প্রদায়ের অভিযোগের দিকেই নজর দিতেন এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে উদীয়মান ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে অবলম্বন করেন।

নরমপন্থীরা আইন মোতাবেক সাংবিধানিক আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন। তাই, তাঁরা সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মাধ্যমে আন্দোলনের উপরেই নির্ভর করতেন। সরকারের কাছে সুচিন্তিত ও সুলিখিত আবেদন নিবেদন পাঠাতেন। যদিও এই আবেদন-নিবেদন ছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে, কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনগণকে রাজনীতি সচেতন করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; ১৮৯১ সালে তরুণ জি কে গোখেলকে বিচারপতি রানাডে বলেন, আমাদের দেশের ইতিহাসে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে তোমার সঠিক জ্ঞান নেই। এই আবেদনগুলি শুধু নামেই সরকারের কাছে পাঠানো হচ্ছে, আসলে তা জনগণের উদ্দেশ্যে লিখিত যাতে তারা এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে শেখে কারণ....এ দেশে এই ধরনের রাজনীতি সম্পূর্ণ নতুন।

তাঁদের আন্দোলন নরমপন্থী হলেও সরকারের দৃষ্টিতে তা ছিল সন্দেহজনক। ইংরেজ তাঁদের চক্রান্তকারী ও রাজদ্রোহী বলে মনে করত। ১৯০০ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন যে, তাঁর প্রধান কর্তব্যই হল কংগ্রেসকে খতম করা। কারণ নরমপন্থীরা সীমিত পরিসরে হলেও, জনগণের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তীব্র অর্থনৈতিক শোষণের প্রক্রিয়াকে সমালোচনা করে তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারিত করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে, তাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ সংঘটিত করতে তাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অর্থনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁরা ব্রিটিশ রাজত্বের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছিলেন। উপরন্তু, নরমপন্থী বা জনজীবনের কঠোর বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই তাঁদের রাজনৈতিক কার্যাবলী স্থির করেছিলেন। সংকীর্ণ ধর্মীয় আনুগত্য বা আবেগের উপর তা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। জাতীয় আন্দোলনের শক্ত ভিত তৈরি হয়েছিল বলেই স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীকালে গণআন্দোলন গড়ে উঠতে পেরেছিল।

১১.৪.২ চরমপন্থী দল ঃ উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় চরমপন্থীদের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরবর্তী ধাপে উন্নীত হল। বলা যেতে পারে, এটা ছিল পূর্ববর্তী পর্যায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতি। আবার, একে উনিশ শতকের শেষে সাম্রাজ্যবাদী হুঙ্কারের জবাবও বলা চলে। সাম্রাজ্যবাদের এই আস্ফালনের প্রতিভূ ছিলেন কার্জন। তিনি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্যভার হাতে নিয়েই ‘‘দক্ষতা’’ এবং ‘‘স্বৈরাচার’’, এই দুটি বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। রাজনীতি সচেতন ভারতীয় ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে প্রতিকার পাবার আশা ছেড়ে এবার স্বাধীনতার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ গণআন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও এই সিদ্ধান্তের সহায়ক হয়েছিল। অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং

অনগ্রসরতা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনেরই ফল। উনবিংশ শতকের শেষে এই লক্ষণগুলি এবার অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার অকাট্য প্রমাণ হল ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যেকার দুর্ভিক্ষগুলি। লক্ষ লক্ষ লোক এইসব দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়।

এই সময়ের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনাও ভারতের চরমপন্থী আন্দোলনের বিকাশে সাহায্য করেছিল। ১৮৯৬ সালে ইথিওপিয়দের হাতে ইতালীর বাহিনীর পরাজয় ও ১৯০৫ সালে জাপানের কাছে রাশিয়ার পরজায় ‘‘ইউরোপ অপরাজেয়’’ এই কিংবদন্তীকে ভুল প্রমাণ করেছিল। একইভাবে আয়ারল্যাণ্ড, রাশিয়া, মিশর, তুরস্ক ও চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলন চরমপন্থীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। সংঘবদ্ধ মানুষ, যারা আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত, তারা যে নিশ্চিত ভাবে আপাতদৃষ্টিতে শক্তিশালী, বিদেশী স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে পরাস্ত করতে সক্ষম এই চেতনা ক্রমেই বদ্ধমূল হল।

একটি নূতন নেতৃত্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হল। এদের মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপত রায়। নূতন নেতৃত্ব বিশ্বাস করতেন এবং প্রচার করতে লাগলেন যে, ভারতীয়দের আত্মনির্ভর হতে হবে, আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের রাজনৈতিক কার্যাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গী শিখিয়েছিল আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা। উপরন্তু, তাঁরা ভারতীয় জনগণের অন্তর্নিহিত শক্তি ও গণআন্দোলন সম্পর্কে গভীর আস্থা রাখতেন। তাঁরা সঠিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, একবার জনগণ যদি রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে ইংরেজরা সেই আন্দোলনকে বানচাল করতে পারবে না। তাই তাঁরা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যাবলী চালিয়ে যেতে লাগলেন। ইংরেজ শাসনকে ভিতর থেকে সংস্কার করা যাবে একথা তাঁরা বিশ্বাস করেতন না। স্বরাজ বা স্বাধীনতা হবে এই নবোদিত জাতীয় আন্দোলনের শেষ লক্ষ্য।

১১.৫ স্বদেশী আন্দোলন

সুতরাং, জাতীয় আন্দোলন এখন নূতন একটি স্তরে উন্নীত হল। ১৯০৫ সালের ২০ শে জুলাই বড়লার্ট কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করে ঘৃতাহুতি দিলেন। সরকার দাবি করলেন যে, এই সিদ্ধান্ত শাসনতান্ত্রিক সুবিধের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলার জনগণ ঐক্যবদ্ধ বাঙালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিই একমাত্র কারণ বলে মনে করল। বাঙালীর জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই আঘাত বাঙালী জাতি নতশিরে মেনে নিতে অস্বীকার করে। ১৬ই আগস্ট বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আহ্বানে বাঙালী জাতি ‘অরন্ধন’ উপবাস ও হরতাল পালন করে নৈতিক প্রতিবাদ জানায়। বিশাল জনতা কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে চলে এবং সন্ধ্যাবেলায় ৫০০০০ জনতার এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ দিনটিকে রাখীবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপনের দিন হিসেবে পালনের উদ্যোগ নেন। বাংলার শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র সভা, মিছিল ও প্রতিবাদ প্রদর্শিত হয়। তাদের কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রনাথ রচিত গান ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল/পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, হে ভগবান’।

এক অপূর্ব স্বদেশিকতার আবেগে আপ্লুত হয়ে গেল সমস্ত পরিবেশ। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের মিলনের দৃশ্যও অভিভূত করল দেশবাসীর মন। এ শুধুই হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর আন্দেলন ছিল না। মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যারিষ্টার আবুল রসুল, আবুল কাশেম, আবুল হোসেন, আবদুল হালিম, গজনভী, আবদুল গুফর সিদ্ধিকী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সমাবেশে যোগ দিয়ে বাংলার মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদকে

সুদৃঢ় করেন। বাংলার মানুষের এই আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করে নতিস্বীকার করতে। ১৯১১ সালে বঙ্গবিভাগ রদ হয়। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা আবারে ঐক্যবন্ধ হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার কেড়ে নিল কলকাতার মর্যাদা। রাজধানী স্থানান্তরিত হল দিল্লীতে।

বাংলার এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক বিক্ষোভ যা একটা জাতির সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাসের উপকরণকে সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছিল। বাঙালীর জাতিসত্তার ওপর ব্রিটিশের এই সাম্রাজ্যবাদী কুঠারাঘাত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে দেখিয়ে দিল সংগ্রামের কলাকৌশল কী হওয়া উচিত। এ থেকেই জন্ম নিল স্বদেশী আন্দোলন।

শীঘ্রই একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক কার্যবিধি গৃহীত হয়। ঠিক হল, সমস্ত বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন স্থানে বিদেশী বস্ত্রের বহ্নুৎসব ও বিদেশী দোকানের সামনে প্রতিবাদ চলতে থাকে। নূতন নেতৃত্ব জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে পরোক্ষ প্রতিরোধ গঠন করতে আহ্বান করলেন। এই আন্দোলন স্কুল, কলেজ, আদালত ও সরকারী অফিস বয়কট করে সরকারের সঙ্গে সবরকমের অসহযোগ করতে আহ্বান জানাল। এই আন্দোলনকে অবশ্য উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্যমণ্ডিত করা যায়নি। নূতন নেতৃত্বে পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে স্বাধীনতারও ডাক দিল। এর একটি ফল হল এই যে, দাদাভাই নৌরজী ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করলেন ভারতীয়দের দাবি হল 'স্বায়ত্বশাসন বা স্বরাজ'।

চরমপন্থী নেতারা গ্রাম ও শহরের বিপুল সংখ্যক জনগণকে আন্দোলনে সামিল করতে সক্ষম হন। এই আন্দোলনে বিশেষ করে ছাত্র, মহিলা ও শহুরে শ্রমজীবীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। স্বদেশী ও স্বরাজের দাবী ক্রমশ অন্যান্য প্রদেশেও গৃহীত হল। বিদেশী বয়কট পূর্বভারতীয় স্তরে সংগঠিত হল। সমগ্র দেশ একটি ঐক্যবন্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হল।

সরকার শীঘ্রই দমন-পীড়নের মাধ্যমে এর যোগ্য জবাব দিল। মিটিং বেআইনী ঘোষিত হল; সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল; রাজনৈতিক নেতাদের কারারুদ্ধ করা হল; অনেক নেতার দ্বীপান্তর হল এবং ছাত্রদের পীড়ন করা হল। চরমপন্থী ও নরমপন্থীর মধ্যে এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা শুরু হল। একই সময়ে, নেতৃত্ব নূতন ধরনের সংগঠন গড়ে তুলতে পারলেন না যা তাঁদের নতুন ও উন্নত রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পরোক্ষ প্রতিরোধ সঠিকভাবে রূপায়িত হতে পারেনি। ফলে, সরকার এই আন্দোলন দ্রুতগতিতে দমন করতে সক্ষম হল। এই আন্দোলন সফল হল না কারণ তিলক প্রথমে কারারুদ্ধ ও পরে ৬ বৎসরের জন্য নির্বাসিত হন। বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষ সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং লালা লাজপত রায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

গণআন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ায় যুবসমাজের আবেগ এবং অনুভূতি এবং ভাবপ্রবণতা ও সাহসিকতার সঙ্গে সরকারী উৎপীড়নের মোকাবিলা করার জন্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকল। কুখ্যাত সরকারী আমলাদের হত্যার মধ্যে দিয়ে তারা যেন ঔপনিবেশিক শাসনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বদলা নিতে চাইল। অনুশীলন ও যুগান্তর এই সময়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী সংগঠন ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গণসমর্থন ছিল না। তারা দীর্ঘদিন এই আন্দোলন চালাতেও পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে

মূল্যবান অবদান রেখেছে। একজন ঐতিহাসিকের ভাষায়, ‘‘তারা আমাদের মনুষ্যত্বের গর্বকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।’’

১৯০৯ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলন খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তা আবার জেগে ওঠে, যখন ভারতীয় সংস্কৃতির একজন ইংরেজ অনুরাগী শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত এবং সদ্য জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকমান্য তিলক আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা সারা ভারতে দুটি ভারতীয় হোমরুল লীগের ছত্রছায়ায় সাংবিধানিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। যুদ্ধের সময় বিদেশের ভারতীয় বিপ্লবীরাও খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে স্মরণ করতে হয় কানাডা ও আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত গদরপার্টি যার পূর্ব-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে শাখা ছিল। এরা ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করার চেষ্টা করেছিল।

অ্যানি বেসান্ত

অগ্রগতি যাচাই ক(ন ৩

১. নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের পদ্ধতিগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন। (দশ লাইনে উত্তর লিখুন)।

২. ইংরেজরা কেন নরমপন্থী আন্দোলনকারীদের দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করেছিল? (দশ লাইনে উত্তর লিখুন)

৩. স্বদেশী আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তার তুলনায় আন্দোলনকে কতটা উচ্চতর স্তর বলে মনে হয়? (একশ শব্দের মধ্যে লিখুন)

১১.৬ সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ

উনিশ ও বিশ শতকের ভারতবর্ষের প্রগাঢ় বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক জাগরণ দেখা যায়। ভারতীয় জনগণের চেতনার আমূল পরিবর্তন হতে থাকে। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা জানতেন যে, ভারতবর্ষের সমাজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই মুষ্টিমেয় কিছু বিদেশী আমাদের দেশকে পদানত করতে পেরেছিল। সুতরাং, তাঁরা ভারতীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের দুর্বলতার বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে, তাঁরা জানতেন যে, ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সামাজিক জ্ঞানে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের পথ ধরে পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের দেশে প্রবেশ করেছিল। এগুলির ভিত্তি ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিবাদী গঠিত। মানুষের প্রচারিত মানবতাবাদের উপরে বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানবতাবাদ। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা প্রবলভাবে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর প্রধান কথাই ছিল সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিশেষ চিন্তাধারার প্রয়োগকে ঐতিহাসিকেরা নবজাগরণ বলে অভিহিত করেছেন। এই নবজাগরণ দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় নবজাগরণের সঙ্গে তুলনীয়।

যদিও ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ে

দেখা দিয়েছে; এমনকি, অঞ্চলবিশেষে এর অর্থও বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, এগুলির সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ছিল প্রায় একইরকম। এগুলির মধ্যে একই ধরনের চেতনা এবং সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে দূর করার একই ধরনের প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায়।

১১.৬.১ প্রধান সংস্কারকগণ ঃ বিবিধ বিষয় ও মতবাদ

মানসিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের পথপ্রদর্শক ছিলেন রামমোহন রায়। প্রাচ্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার প্রতি তিনি আস্থাবান ছিলেন। প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তার প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তবু তিনি বিশ্বাস করতেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চেতনার সাহায্যে মানুষের মর্যাদা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতেই আমাদের সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। রামমোহনের পর একাধিক বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় সমাজ সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, সৈয়দ আহমেদ খান, গোপাল হরি দেশমুখ, জোতিবা ফুলে, স্বামী দয়ানন্দ, বিচারপতি রানাডে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বীরসালিঙ্গাম, নারায়ণ গুরু, স্বামী বিবেকানন্দ, ই ভি রামস্বামী নৈয়িক্কার প্রভৃতির নাম সহজেই স্মরণে আসে।

এইসব ধর্মীয় সংস্কারকেরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, কুসংস্কার ও জাতপাতের গোঁড়ামীরও প্রতিবাদ জানান। অনেকে আবার পুরোহিততন্ত্রেরও বিরোধিতা করেছিলেন। বিশেষত যেখানে পুরোহিতরা অত্যন্ত গোঁড়া ও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন। তাঁরা প্রচলিত হিন্দু, ইসলাম ও শিখ ধর্মের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারকেরা জাতিভেদ প্রথা, বিশেষ করে এই পথার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সামাজিক অসাম্য ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁরা সমাজে মহিলাদের অবমাননারও তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে ভারতীয় সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তিতে কোন তফাৎ নেই। তাঁরা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, বহুবিবাহের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। বিধবা-বিবাহ প্রচার প্রবর্তন চেয়েছিলেন এবং নারীশিক্ষার প্রসারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রামমোহনের মত কেউ কেউ এমন কথাও বলেছিলেন যে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার থাকা আবশ্যিক।

তথাকথিত 'নিম্নশ্রেণীর' থেকে উঠে আসা কিছু সংস্কারক ও চিন্তাশীল নেতারা জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এদের তিন উল্লেখযোগ্য নেতা হলেন জ্যোতিবা ফুলে, নারায়ণ গুরু ও ডঃ বি. আর আম্বেদকর। গান্ধীজী ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামজনক অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তিনি প্রতিটি কংগ্রেস সদস্যের পক্ষে নিজে অস্পৃশ্যতা বর্জন করা এবং অপরে পালন করলে তার বিরোধীতা করা আবশ্যিক করেছিলেন। তিনি নিখিল ভারত হরিজন সেবাসঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন এবং উদ্দেশ্য ছিল হরিজনদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষার উন্নতি করা।

নারীশিক্ষার প্রেরণাও এই চেতনার সার্থক দিক। বেথুন সোসাইটি (১৮৫১) গঠন করে বাংলার শিক্ষিত শ্রেণী বিশ্ববিদ্যাচর্চার পাশাপাশি নারীশিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়। নারী নিগ্রহ ও নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য যে নারীশিক্ষার প্রয়োজন সে বিষয়ে সর্বাগ্রে বেথুন সোসাইটির উদ্যোক্তারা ছিলেন সজাগ। নারীশিক্ষা প্রসারে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন অন্তঃপূরস্ত্রী শিক্ষাসভা (১৮৬৩)। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ছিল এদেরই মুখপত্র। ১৮৯৮ সালে ভগিনী নিবেদিতা স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করেন।

উনিশ শতকে মহিলাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে পুরুষরাই সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু, বিংশ শতাব্দীতে মহিলারা নিজেরাই নিজেদের সামাজিক মুক্তির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। মহিলা সম্পাদিত বিভিন্ন

মহিলা পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু হল। ১৯৩০ সালে মহিলাদের আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট রূপ নিল যখন নিখিল ভারত উইমেন্স কনফারেন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় আন্দোলন, শ্রমিক সংঘ ও বিজ্ঞান সভাও মহিলাদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হয়ে উঠল।

এইসব সংস্কার আন্দোলন ও সামাজিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুরুষ ও মহিলার সমান অধিকার স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান স্বীকৃতি লাভ করল।

সমস্ত সংস্কারকরাই ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী হতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর, অন্ধবিশ্বাসের উপর নয়। তাঁরা ধর্মের কঠোর অনুশাসনকে ও অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, প্রচলিত নীতি ও ধর্মীয় অনুশাসন যদি যুক্তির বিরোধী হয় বা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তবে তার সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

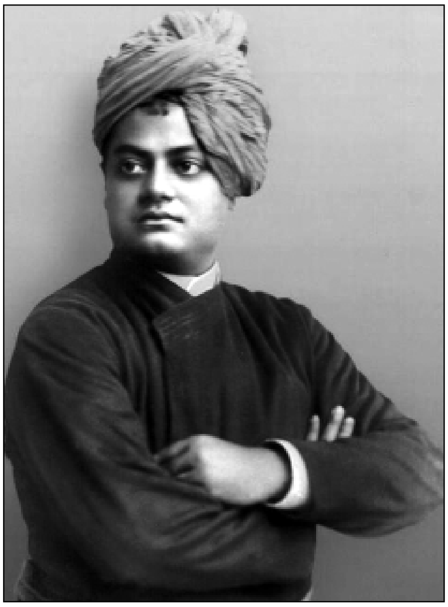

স্বামী বিবেকানন্দের

উদাহরণস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলা যায় "ধর্ম কী যুক্তির দ্বারা নিজের যথার্থ প্রমাণ করে, যেমন বিজ্ঞান প্রতিটি বিষয়কেই যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে? বিজ্ঞানে যেভাবে অনুসন্ধান চালান হয় ধর্মের বিজ্ঞানেও কী সেই ধরনের অনুসন্ধান চালাতে হয়? আমার মতে, তাই হওয়া উচিত, এবং আমি নিশ্চিত যে যত শীঘ্র তা হয় ততই মঙ্গ ল।"

স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও বাণী হিন্দু জনসাধারণের মনে গভীরে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এই ধর্মবোধ মূলত জাতীয়তাবোধের সঙ্গে ছিল সম্পৃক্ত। ভজন-পূজন ও শাস্ত্রবিচারের গণ্ডী থেকে বার করে এনে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দিলেন ধর্মের। ঐতিহ্যের বিচারেও তার বিশ্লেষণ সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা অপূর্ব মহিমায় তরুণ সমাজের কাছে প্রতিভাত হল। তিনি হয়ে ওঠেন বীর সন্ন্যাসীর এক জ্বলন্ত প্রতীক।

একইভাবে, সৈয়দ আহমেদ খান চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং যুক্তিবর্জিত চিন্তার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যতদিন না চিন্তার মুক্তি ঘটবে ততদিন কোন জাতি সভ্য হতে পারে না।" এমনকি সবথেকে গোঁড়া ধর্মসংস্কারক স্বামী দয়ানন্দও বলেছেন, বেদ অভ্রান্ত, যদিও তার প্রকৃত ব্যাখ্যা তা সাধারণ মানুষ, পুরোহিত শ্রেণী নয়। অন্যভাবে বলা যায়, বেদের অর্থ হল যা মানুষ যুক্তি দ্বারা গ্রহণ করতে পারে।

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী পরম্পরা ব্রাহ্মসংস্কার আন্দোলন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশকে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, জাতীয়তাবাদী ও স্বাদেশীকতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মীতা ছিল অসাধারণ। তিনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ভাষণে ও কর্মধারায় তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে।

১১.৬.২ সমাজ সংস্কারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী

ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারকেরা সংস্কারের ক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথার ও ঐতিহ্যের সমর্থন খুঁজতেন। তাঁরা প্রায়ই দাবি করতেন, যেন তাঁরা সনাতন বিশ্বাস ও চিন্তাধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান। অনেকে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কিন্তু কৌতুহলের বিষয় এই যে, তাঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সপক্ষেই ঐতিহ্যের উদাহরণ টানতেন। সংস্কারকে আরো গ্রহণীয় করার জন্যই তাঁরা চিরাচরিত প্রথার উল্লেখ করতেন। যখন এবং যেখানে সনাতন প্রথা পরিকল্পিত সংস্কারের পরিপন্থী হত, তখন সনাতন প্রথাই ভ্রান্ত বলে প্র্যাতাখান করা হত। আগেই বলা হয়েছে যে, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিচারবোধ ও শুভবুদ্ধির উপরে আস্থা স্থাপন করা। উদাহরণস্বরূপ বিচারপতি রানাডের লেখার উল্লেখ করা যায় ঃ "The dead and the burried or burnt are dead. burried and burnt once for all, and the dead Past cannot be revived" মৃত অতীতের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়।

অন্যভাবে বলা যায়, গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতার মূলোচ্ছেদ করার আন্দোলনের ভিত্তি ছিল যুক্তি ও মানবতাবাদ। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন হিন্দুশাস্ত্রে অস্পৃশ্যতার সমর্থন নেই। তিনি বললেন, শাস্ত্রকেও অস্বীকার করতে হবে যদি তা মানুষের মর্যাদার পরিপন্থী হয়। চিরন্তন সত্য কখনও একটি পুঁথির মধ্যে আবন্ধ থাকতে পারে না।

ধর্মীয় ও সামাজিক হিতসাধন ছাড়াও সংস্কারকারীরা দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের কাজকর্মের ফলে আত্মবিশ্বাস ও নিজেদের সংস্কৃতির উপর আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি যখন আধুনিক চিন্তাধারার হাওয়া সমাজকে প্রভাবিত করছে তখনও তাঁরা কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেননি। অধ্যাপক কে. এম. পানিক্কর বলেছেন ভারতে সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ছিল ভারতীয়দের নিরাপত্তা। জওহরলাল নেহরু বলেছেন—"বিকাশশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, ধর্মের প্রতি নয়। কিন্তু তারা সংস্কৃতির দেশজ শিকড়ের সন্ধান করেছিল যাতে তারা নির্ভর করতে পারে; যাতে নিজেদের মূল্য সম্বন্ধে আস্বস্ত হতে পারে; যাতে তাদের বিদেশী শাসনের গ্লানি এবং অপমান দূর হতে পারে।"

১৯২০ সালের পর বহু জাতীয়তাবাদী ও সংস্কারকরা ধর্মীয় সংস্কার, সমাজে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং গণ আন্দোলন সংগঠিত করতে সত্যাগ্রহের পন্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন লড়াই করার জন্য। এতে তাদের প্রায়ই ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাতে যেতে হত। ফলে প্রায়ই সংস্কার আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে মিলিত হয়ে যেত। দুটি প্রধান উদাহরণ হল বিশের দশকে পাঞ্জাবে শিখ মন্দির ও গুরুদ্বারগুলির সংস্কারের জন্য আকালি আন্দোলন এবং বিশ ও ত্রিশের দশকে গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন।

১১.৬.৩ পন্ধতি

জাতীয় বুদ্ধিজীবী ও নেতারা দেখলেন যে, শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্কার করলেই হবে না তাকে জনপ্রিয়ও করে তুলতে হবে। এর জন্য তাঁরা একদিকে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ও অপরদিকে, আধুনিক ভারতীয় ভাষার উন্নয়নের ডাক দিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ১৮৩০ থেকে ১৮৬০ এর দশক পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা জাতীয়তার পথ নিচ্ছে তখন তারা পিছিয়ে আসতে শুরু করে। তখন ভারতীয়রা নিজেরাই স্কুল কলেজ প্রতিষ্টা করতে প্রয়াসী হয়। স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদীরা ঔপনিবেশিক কাঠামোর বাইরে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ডাক দেন। শত শত জাতীয় স্কুল ও কলেজ এবং কতিপয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু মূলত, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়।

ক) উনিশ শতকের শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদী ও আধুনিক ভারতীয়রা সংস্কারবাদী ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে প্রসারিত করার জন্য ভারতীয় ভাষাসমূহের উপর নির্ভর করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা পুস্তক প্রস্তুত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বাংলায় প্রাথমিক স্তরের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন যা আজও প্রচলিত আছে। ১৮৬০-এর দশক থেকে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা ভারতীয় ভাষাকে কলেজে শিক্ষার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে দাবি জানান। বস্তুত সাধারণ মানুষের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল সংবাদপত্র এবং এখানেও রামমোহন রায় ছিলেন পথ প্রদর্শক। জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য রামমোহন রায় বাংলা, ইংরাজী, ফার্সী ও হিন্দীতে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। মহারাষ্ট্রে এই একই কাজ করেছিলেন গোপাল হরি দেশমুখ, যিনি লোকহিতবাদী নামে পরিচিত ছিলেন। উনিশ শতকে শতশত সংবাদ ও সাময়িক পত্র বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকা প্রকাশের পেছনে মুনাফার বাসনা ছিল না, ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা; সেই সঙ্গে ছিল জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রসারিত করার মহৎ উদ্দেশ্য।

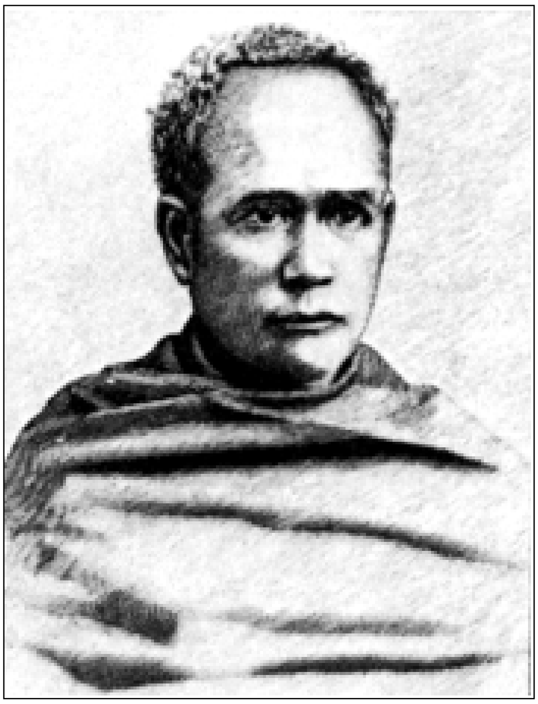
বিদ্যাসাগর

বস্তুত, সব অগ্রণী রাজনীতিবিদ অথবা সমাজ সংস্কারক কোন না কোন পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাংলা ভাষায় অমৃতবাজার পত্রিকা, সোমপ্রকাশ ও সঞ্জীবনী, গুজরাতীতে রাস্ত গফতার ও গুজরাট সমাচার, মারাঠীতে ইন্দুপ্রকাশ, ধ্যানপ্রকাশ, কেশরী ও সুধাকর, তামিলে স্বদেশমিত্রম, তেলেগুতে অন্ধ্রপত্রিকা ও অন্ধ্রপ্রকাশিকা, মালায়লীতে মাতৃভূমি, হিন্দীতে হিন্দীপ্রদীপ, হিন্দুস্থানী, আজ ও প্রতাপ, উর্দুতে আজাদ, আখবর-ই আম ও কোহিনূর,

ওড়িয়াতে উৎকল দীপিকা প্রভৃতি ছিল এই যুগের প্রধান প্রধান প্রচলিত সংবাদপত্র।

খ) ভারতীয় ভাষায় লিখিত আধুনিক কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমেও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও দেশপ্রেমিক চিন্তাধারা প্রস্ফুটিত হতে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষায় বলিষ্ঠ সাহিত্যচর্চা লক্ষ্য করা যায়। ইতিমধ্যে ১৮৬০ এর দশক থেকে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান প্রকাশিত হতে থাকে। বিশ শতকে এই দু'ধরনের সাহিত্য জনমত গঠনে ও জনগণকে রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রায় সব ভারতীয় ভাষাতেই উনিশ ও বিশ শতকে শ্রেষ্ঠ কবিদের আবির্ভাব ঘটে। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও হিন্দীতে ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র ও মৈথিলী শরণ গুপ্ত, উর্দুতে মহম্মদ ইকবাল, আলতাফ হুসেন আলি ও জোশ মালিহাবাদী, তামিলে সুব্রামনিয়ম ভারতী, মালয়ালীতে কুমারন আসান ও ভাল্লাথল, অসমিয়াতে লক্ষ্মীকান্ত বেজবড়ুয়া প্রভৃতি উনিশ ও বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবিদের অন্যতম।

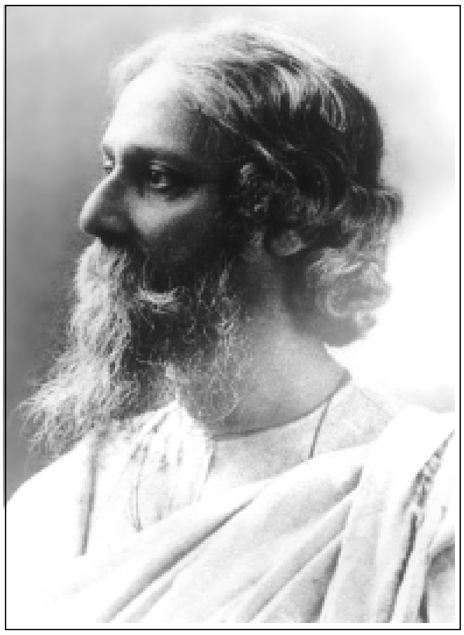
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬০ সালে নীলবিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদী নাটকের আবির্ভাব ঘটে। ভারতবর্ষ শক্তিশালী ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখকের জন্ম দিয়েছিল যারা বিষয়বস্তু হিসেবে জাতীয়তাবাদী বিষয় ও সংস্কারকামী কাহিনী বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের ভারতীয় সমাজের সংঘাত, জাতি বৈষম্য, মহিলাদের দুরবস্থা, তাঁদের সাহিত্যের বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রেমচাঁদ। এঁদের রচনা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। প্রবন্ধ ছিল সাহিত্যের আর এক শাখা যার মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংস্কারকরা তাঁদের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। উনিশ শতকের প্রধান প্রবন্ধকার হিসেবে গোপাল হরি দেশমুখ, বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুংকর ও বীরসালিঙ্গমের নাম করতে হয়। সাংস্কৃতিক নবজাগরণ সঙ্গীত, অঙ্কনশিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রচলিত হয়েছিল। পরের দিকে চলচ্চিত্রেও এর প্রতিফলন ঘটে।

৬০ বছর ধরে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে যিনি উদ্ভাসিত করেছিলেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ-বস্তুত সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি তাঁর দৃপ্ত পদচিহ্ন রেখে রেখে গিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি অঙ্কন শিল্পেরও চর্চা করেছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ১৯১৯ সালে তাঁর নাইটহুড (স্যার) উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯১৩ সালে তাঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৪

১. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি সঠিক না ভুল (✓) অথবা (✗) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) ধর্মীয় সংস্কারকরা অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামী সমর্থন করতেন।

(খ) সংস্কারকরা সতীদাহ ও বহুবিবাহকে আক্রমণ করেছিলেন।

(গ) গান্ধীর কাছে অস্পৃশ্যতার প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

(ঘ) জাতীয়তাবাদী মনোভাব গঠনে ও প্রসারে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

(ঙ) 'নীলদর্পণ' নাটকে (এদেশে বসবাসকারী) ভারতীয়দের অবস্থার বর্ণনা আছে।

২. মহিলাদের উন্নতিতে সংস্কারকরা কী কী কাজ করেছিলেন? এ সম্বন্ধে পাঁচ লাইন লিখুন।

১১.৭ সারাংশ

প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ প্রমাণ করেছিল যে, ভারতীয়রা আর পরাধীন থাকতে চায় না। তবে আন্দোলনের বিফলতা সংগ্রামের দুর্বলতাকেই তুলে ধরে। ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবার নতুন ধারায় আন্দোলন করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সারা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত করা। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দমন-পীড়নের নীতি জাতীয়তাবাদীদের কাজকে সহজ করে দিয়েছিল। তাঁরা সংবাদপত্রে প্রচার ও আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে তাঁদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। শীঘ্রই জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একটি অংশের আবির্ভাব হল যাঁরা সাংবিধানিক পথকে ত্যাগ করে আন্দোলনের ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। এঁরা চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী বলে পরিচিত।

ব্রিটিশ তাদের স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে গেল। বঙ্গভঙ্গ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করল। যদিও স্বদেশী আন্দোলন সম্পূর্ণ গণবিদ্রোহের রূপ নেয়নি, কিন্তু গণচেতনা প্রসারে এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। আর একটি সহিংস চরমপন্থী ধারাকে বিপ্লববাদ বলে অভিহিত করা যায়।

এছাড়াও জাতীয় আন্দোলনের অপর একটি দিক ছিল। বহু সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকরা যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। সংবাদপত্র ও সাহিত্য ভারতের নবজাগরণ প্রভূত অবদান রেখেছিল।

১১.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

অন্ধবিশ্বাস ঃ যুক্তি ছাড়া কোন বিশ্বাস বা মতবাদকে মেনে নেওয়া।

জনসংগঠন ঃ বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনগণকে একত্রে নিয়ে আসা।

জাতীয় চেতনা ঃ জাতি সম্বন্ধে সচেতনতা।

ক) আন্দোলন ও আত্মবিশ্বাসের পথে।

খ) শিক্ষা ও জাতীয় নেতাদের দ্বারা একত্রিত হওয়া।

জাতীয়তাবাদ ঃ ঔপনিবেশিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনা। বিশেষত, ঔপনিবেশিকতবাদের বিরুদ্ধে

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকল্প। ইউরোপের সঙ্গে তুলনায় সেখানে বাজারের প্রয়োজনে এর বিকাশ হয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে বিকল্প হিসেবে ভারতীয় জনগণ সংগঠিত হয়েছিল।

দেশাত্মবোধ ঃ নিজের দেশের প্রতি আনুগত্য।

বিদ্রোহ ঃ যে কোন পরাধীনতার বিরুদ্ধে বাধা।

গোঁড়ামী ঃ যুক্তিহীন ব্যবহার; চিন্তার পদ্ধতি।

জমিদার ঃ গ্রামে স্থায়ী জমির মালিক যার কর ব্রিটিশ সরকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

১১.৯ অগ্রগতি যাচাই করার উত্তরমালা

অগ্রগতি যাচাই করুন ১

১. অনুচ্ছেদ ১১.২.১ দেখুন

২. ক) ✓ খ) × গ) × ঘ) ✓

৩. ক) উদাহরণস্বরূপ, গোয়লিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, হায়দ্রাবাদের নিজাম।
খ) ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈ, কুনওয়ার সিং, তাঁতিয়া টোপী।

অগ্রগতি যাচাই করুন ২

১. ক) ✓ খ) × গ) × ঘ) ✓

২. অনুচ্ছেদ ১১.৩.৩ দেখুন

অগ্রগতি যাচাই করুন ৩

১. অনুচ্ছেদ ১১.৪.১ ও ১১.৪.২ দেখুন।

২. অনুচ্ছেদ ১১.৪.১ দেখুন।

৩. অনুচ্ছেদ ১১.৫ দেখুন।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৪

১. ক) × খ) ✓ গ) ✓ ঘ) ✓ ঙ) ×

২. অনুচ্ছেদ ১১.৬.১ দেখুন

একক ১২ ❐ জাতীয় আন্দোলন—২

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য
১২.১ প্রস্তাবনা
১২.২ গান্ধীর উত্থান
১২.২.১ সরকারী প্রতিক্রিয়া
১২.২.২ অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন
১২.২.৩ পরবর্তী পর্যায়
১২.৩ আইন অমান্য আন্দোলন
১২.৪ বিপ্লবী আন্দোলন
১২.৫ স্বরাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান
১২.৫.১ কমিউনিস্ট এবং সোসালিস্ট গোষ্ঠীর উত্থান
১২.৫.২ নেহেরুর ভূমিকা
১২.৫.৩ কংগ্রেসের উপর প্রভাব
১২.৬ কৃষক, শ্রমিক এবং দেশীয় রাজ্যের গণআন্দোলন
১২.৬.১ কৃষক আন্দোলন
১২.৬.২ শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম
১২.৬.৩ দেশীয় রাজ্যগুলিতে আন্দোলন
১২.৬.৪ অন্যান্য আন্দোলন
১২.৭ স্বাধীনতার পথে
১২.৭.১ কংগ্রেস মন্ত্রীসভা
১২.৭.২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত
১২.৭.৩ ভারত ছাড়ো আন্দোলন
১২.৭.৪ স্বাধীনতা
১২.৮ সারাংশ
১২.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ
১২.১০ অগ্রগতি যাচাই করার উত্তরমালা

১২.০ উদ্দেশ্য

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ধীরে ধীরে একটি গণআন্দোলনে পরিণত হচ্ছিল। এই একক পড়বার পরে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝতে পারবেন ঃ

- ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর উত্থানের তাৎপর্য।

- অসহযোগ, খিলাফত এবং আইন অমান্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।
- স্বরাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক উপাদান। স্বরাজ অর্জনের জন্য নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের কী ভূমিকা ছিল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি এবং অবশেষে কীভাবে স্বাধীনতা অর্জিত হল।

১২.১ প্রস্তাবনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল। গান্ধীর উত্থানের ফলে জনগণ আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হল। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তিনটি প্রধান গণআন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল : অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩৪) এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২)। এই গণআন্দোলনগুলি ছাড়াও বিপ্লবী আন্দোলন, কৃষক এবং শ্রমিক আন্দোলন এবং স্টেট পিপলস্ মুভমেণ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

এই পর্যায়ে স্বরাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক উপাদানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব অরোপিত হয়েছিল। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে সোস্যালিস্ট গোষ্ঠীগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে উপর গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক যুক্তির দিকটিও তুলে ধরেছিলেন।

এই এককটি উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন দিকগুলি অলোচনা করে অবশেষে আপনাকে সেইসব ঘটনার সাথে পরিচিত করাবে, যেগুলি স্বাধীনতার গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

১২.২ গান্ধীর উত্থান

স্বাধীনতা আন্দোলনের তৃতীয় এবং শেষ পর্যায় শুরু হয় ১৯১৯ সালে। এই সময় থেকে আন্দোলনের যুগের সূচনা হয়।

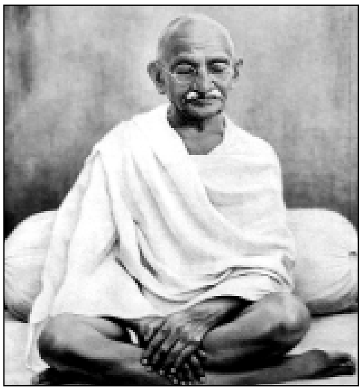

মহাত্মা গান্ধী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্তি, অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা ঘোষণা করে যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এবং জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের (Self determination) অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কিন্তু জয়ের পরে তারা ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাতে বিশেষ আগ্রহ বা ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। ভারতীয়রা শুধুমাত্র যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তাই করেনি তারা যথেষ্ট দুর্দশাও ভোগ করেছিল। ফলে, তারা তাদের ন্যায্য প্রতিদান আশা করেছিল। কিন্তু, খুব শীঘ্রই তারা আশাহত হল। যদিও ব্রিটিশ সরকার সাংবিধানিক সংস্কারের একটি খাপছাড়া প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তবু একটি বিষয় তারা পরিষ্কার করে দেয় ঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা ত্যাগের কোন ইচ্ছা তাদের নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে হাল ধরলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামে এক নতুন নেতা। নতুন নেতাটি পূর্বের নেতৃত্বের মৌলিক দুর্বলতাগুলি মাথায় রেখে এগুলিকে দূর করতে

চেয়েছিলেন। তিনি 'অসহযোগ' নামে একটি নতুন ধরনের আন্দোলন এবং 'সত্যাগ্রহ' নামে সংগ্রামের একটি নতুন কৌশল উদ্ভাবন করলেন। অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহ শুধুমাত্র কর্মসূচীর পর্যায়েই থাকল না, এগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়াও সম্ভব ছিল। তিনি ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় অভিবাসী ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগকে প্রয়োগ করেছিলেন। গান্ধী বিহারের চম্পারণ জেলার কৃষকদের এবং গুজরাটের আমেদাবাদ-এর শ্রমিকদের স্বার্থেও এগিয়ে এসেছিলেন।

এই সময়ে ক্রমান্বয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার নামে অত্যাচার ও জুলুম করা হত। গান্ধী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ এবং সংগ্রামী মনোভাবকে উপলব্ধি করেছিলেন। এগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তিনি গণভিত্তিক এক নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

১২.২.১ সরকারী প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সরকার সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের উপর নিপীড়ন চালায়। সরকার যুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদীদের চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে আরও বেশি ক্ষমতা করায়ত্ত করতে মনস্থ করে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইংরেজ সরকার রাওলাট আইন পাস করে (ভারতীয়রা একে কালা কানুন বলে অভিহিত করে)। এই আইনের সাহায্যে সরকার যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করতে পারত। ভারতীয় অনুভূতি এতে ভীষণভাবে আহত হয়।

১৯১৯ এর ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধী একটি সত্যাগ্রহ সভা গঠন করলেন। সভার সদস্যরা এই আইন অমান্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। তার ফলে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়। এইভাবে গান্ধী জাতীয় আন্দোলনকে শুধুমাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি রাজনৈতিক গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করবার পথে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে তিনি আরও বেশি সংখ্যক কৃষক ও শ্রমজীবীদের কংগ্রেসে সামিল করতে পরামর্শ দেন। খাদির ব্যবহার এই নতুন শ্রেণীর উপর গুরুত্বদানের প্রতীক ছিল বলা যায়।

পরবর্তী ছ'মাসের মধ্যে প্রায় সমগ্র দেশে প্রাণের জোয়ার এল। ধর্মঘট, হরতাল, মিছিল এবং প্রতিবাদ সভা ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়। এই সময়ে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত ঘটনাটি ঘটে। ১৯১৯ এর ১৩ই এপ্রিল একদল শান্তিপ্রিয় নিরীহ জনতাকে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী একটি আবদ্ধ বাগানের মধ্যে কৌশলে আটকে নির্বিচারে রাইফেল এবং মেশিনগান চালায়। হাজার হাজার লোক নিহত বা আহত হয়। সারা দেশ নৃশংস এই ঘটনায় শিউরে ওঠে। ঔপনিবেশিক শাসনের নিষ্ঠুরতা আরও একবার প্রকাশিত হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ব্রিটিশ সরকার সামরিক আইন জারি করে প্রচারে বাধা দেয়। কিন্তু লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক কালীনাথ রায় প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয়র মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে এই বর্বর নৃশংস হত্যার কথা জানিয়ে দেন। এই সংবাদ জানার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষোভ ও মর্মবেদনা প্রকাশ করে ভাইসরয়কে এক ঐতিহাসিক চিঠি দেন এবং তার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত নাইট খেতাব ফিরিয়ে দেন প্রতিবাদস্বরূপ।

যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের প্রতি উদার মনোভাব গ্রহণের যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাঁর সাম্রাজ্যের অনেকটা কেড়ে নেয় এবং ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে। তুরস্কের সুলতানকে অনেকেই মুসলিমদের ধর্মগুরু বা খলিফা মনে করতেন, কাজেই তুরস্কের সুলতানের অবমাননা ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে গভীর

অসন্তোষের জন্ম দেয়। এর প্রতিবাদেই খিলাফতের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন।

১২.২.২ অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন

গান্ধী এবং জাতীয় কংগ্রেস ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যতদিন পর্যন্ত পাঞ্জাব এবং খিলাফত অন্যায়ের প্রতিকার না হচ্ছে এবং স্বরাজ না আসছে ততদিন পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গান্ধী শ্লোগান দেন যে, ‘‘এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জিত হবে’। জনসাধারণকে সরকারী স্কুল-কলেজ, আদালত, আইনসভা, বিদেশী পোশাক বর্জন করতে বলা হয়। এছাড়াও সরকারী খেতাব ও সম্মান বর্জন করতেও আবেদন জানানো হয়। স্থির হয় যে, পরবর্তীকালে কর্মসূচীকে আরও প্রসারিত করে সরকারী চাকরী থেকে পদত্যাগ, আইন অমান্য এমনকী খাজনা প্রদান বন্ধের মতন বিষয়কেও কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে; জনসাধারণকে জাতীয় স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়; চরকায় সুতো কেটে খাদি বস্ত্র তৈরি করতে, অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় রাখতে বলা হয়। ভাষার ভিত্তিতে এখন থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি গঠিত হবে বলে বলা হয়। কংগ্রেস সংগঠনকে গ্রাম পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় এবং এর সত্য চাঁদা চার আনায় (বর্তমানে ২৫ পয়সা) কমিয়ে আনা হয়। প্রতি বছর আরও বেশি সংখ্যক গ্রামের ও শহরের গরীবদের কংগ্রেসের সদস্য করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। সুভাষচন্দ্র বসু সবেমাত্র বিলেত থেকে ফিরে এসে দেশবন্ধুর সহযোগী হিসেবে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলেও পরে তিনি এর প্রতি পূর্ণ সমর্থ জ্ঞাপন করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর পত্নী বাসন্তী দেবী

প্রথম গণআন্দোলন ১৯২০-২২ তে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। লক্ষ লক্ষ ছাত্র স্কুল ও কলেজ ত্যাগ করে। শয়ে শয়ে আইনজাবী তাদের পেশা পরিত্যাগ করেন। ভোটদাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। বিদেশী পোশাকের বয়কট আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ নেয়। বিদেশী কাপড়ে অগ্নিসংযোগ ভারতের আকাশকে আলোকিত করে তোলে। বিলেতী কাপড়ের দোকান এবং বিলেতী মদের দোকানে পিকেটিংও যথেষ্ট সফল হয়েছিল। অনেক জায়গায় কারখানার শ্রমিকরা এবং কৃষকরা আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল।

বাংলাতেও গ্রামে গ্রামে অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বত্র তা অহিংস ছিল না। চিত্তরঞ্জন দাশ, তাঁর পত্নী বাসন্তী দেবী সহ বহু নেতা ও কর্মী কারাবরণ করেন। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে, রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদে আদিবাসীরা বিক্ষোভে সামিল হয়। তমুলক ও কাঁথিতে নেতৃত্ব দেন

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। কলকাতায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। অসহযোগের জন্য গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে ব্রিটিশ সরকার বেআইনি ঘোষাণা করে। গ্রেপ্তার হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সারা বছরে অন্তত ২০ হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাইসরয়কে গান্ধী চিঠি দিয়ে জানান যে অত্যাচার বন্ধ না হলে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দিলে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে।

এর কিছুদিনের মধ্যেই ৫ই ফেব্রুয়ারী গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরার ঘটনা ঘটে। তিনহাজার কৃষকদের একটি কংগ্রেসী মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালালে ক্ষুব্ধ জনতা এর প্রতিবাদে ২২ জন পুলিশকে থানায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। গান্ধী এই ঘটনাকে খুবই গুরুত্ব দেন। তিনি অনুভব করেন যে, জনগণ এখনও সঠিকভাবে অহিংসায় দীক্ষিত হয়নি; কাজেই তিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী গোটা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। যাইহোক, এই আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল।

১) এই আন্দোলনই প্রথম লক্ষ লক্ষ কৃষক এবং শহরের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের জাতীয়তাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। বস্তুতপক্ষে, ভারতীয় সমাজের সব শ্রেণীর মানুষই যেমন, কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, দোকানদার, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসক, সরকারী চাকুরে এবং অন্যান্য পেশার মানুষ, সবাই রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন হয়। নারীদেরও আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আন্দোলন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল্যে পৌঁছায়। বস্তুতপক্ষে, গান্ধী জনগণের সংগ্রামী ও আত্মত্যাগের মানসিকতাকেই তাঁর রাজনীতির ভিত্তি করেন। তিনি জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামনে আনেন। তিনি জাতীয় আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করেন।

২) ভারতের জনসাধারণ নির্ভীকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। তারা আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তির ভয়ে ভীত ছিল না, নেহেরু পরবর্তীকালে বলেন "Gandhi made a man of him"। এই কথাটি সমস্ত জাতির ক্ষেত্রেও সত্য ছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বুঝতে হবে যে গান্ধীর কাছে অহিংসা দুর্বল এবং কাপুরুষের অস্ত্র ছিল না। শুধুমাত্র শক্তিশালীরাই অহিংসা অনুশীলন করতে পারে। গান্ধী বারংবার বলেন যে কাপুরুষতার চাইতে বরং হিংসাও শ্রেয়। তিনি ১৯২০ তে লেখেন ঃ

"যেখানে কাপুরুষতা এবং হিংসার মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে সেখানে আমি হিংসাকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেব। আমি ভারতকে কাপুরুষের মতন তার নিজের অসম্মানের একজন অসহায় সাক্ষী হিসেবে দেখার চেয়ে বরং চাইব ভারত তার সম্মান রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করুক।"

অসহযোগ আন্দোলনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফল হল ভারতের জনসাধারণের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি। ভারতের জনগণ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিল। সংগ্রামে সাময়িকভাবে পিছু হটলেও জনসাধারণ তাদের লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। আন্দোলন প্রত্যাহার করার পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী গান্ধী লিখলেন যে ঃ

"It is high time that the British people were made to realize that the fight that was commenced in 1920 is a fight to finish, whether it lasts one month or one year or many months or many years & whether the representative of Britain re-enact all the indescribable orgies of the Mutiny days with redoubled force or whether they do not"

১২.২.৩ পরবর্তী পর্যায়

অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে দেশবাসীর মনে হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দেয়। কাউন্সিলে যোগ দেওয়া নিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে গান্ধীপন্থীদের মতদ্বৈধ ছিল। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মতিলাল নেহেরুর মত নেতারা স্বরাজ্য দল গঠন করেন। স্বরাজ্য দলের নেতারা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা আইনসভায় প্রবেশ করে ব্রিটিশের বিরোধীতা করবেন। চিত্তরঞ্জনের দাবি কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে (১৯২২) অনুমোদিত না হলেও দিল্লী অধিবেশনে (১৯২৩) স্বরাজ্য দলের সদস্যদের নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করাতে অনুমতি দেওয়া হয়। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা। আইনসভায় অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত আনুপাতিক হার কার্যকর করার জন্য চিত্তরঞ্জন একটি রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেন যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত। চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বাধীন কলকাতা কর্পোরেশনে তিনি এই চুক্তি চালু করেন। কিন্তু সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলার এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করানো যায়নি। চিত্তরঞ্জন এতে গভীর ক্ষোভ ও মর্মবেদনা প্রকাশ করেন। একে তিনি বাংলার প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন বলে অভিহিত করেন। স্বরাজ্য দলের প্রার্থীরা নির্বাচন লড়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন এবং বহু প্রাদেশিক আইন সভার কাজকর্ম দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা সৃষ্টি করেন। বাংলাদেশে আইনসভায় মতিলাল নেহেরু হলেন স্বরাজ্য দলের নেতা, চিত্তরঞ্জনই সে সময় ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের মঞ্চে যিনি গান্ধীর বিপুল প্রভাব সত্ত্বেও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর অভিমত কর্মসূচী পেশ করে জনসমর্থন আদায় করতে পারতেন। পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জনের হাতে গড়া তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও গান্ধীর ব্যক্তিত্বের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সুভাষচন্দ্র বসু

১৯২৭-এর নভেম্বরে সাংবিধানিক দিকগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করে। এই কমিশনে শুধুমাত্র ইংরেজরাই সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। ভারতীয়রা একে বিরাট অপমান বলে গণ্য করে। সাইমন কমিশন ভারতে এলে একে বয়কট করা হয়। সারা দেশ জুড়ে 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনি তুলে শোভাযাত্রা বের করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলির দৃশ্যাবলী পুনরায় ফিরে আসে। সরকার বুলেট ও লাঠির যথেষ্ট ব্যবহার করে শোভাযাত্রায় যোগদানকারী ব্যক্তিদের দমন করে। লাহোরে পুলিশের লাঠি চার্জের সময় লালা লাজপত রায় গুরুতরভাবে আহত হয়ে পরে মারা যান।

অগ্রগতি যাচাই ক(নে ১

১. বক্তব্যগুলি সঠিক হলে (✓) এবং ভুল হলে (×) চিহ্ন দিন।

ক) গান্ধী পূর্বের নেতৃত্বের মৌল দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সেগুলি দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন।

খ) ভারতের জনসাধারণ 'রাওলাট আইন'কে স্বাগত জানিয়েছিল।

গ) তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশের অন্যায়ের প্রতিবাদেই খিলাফত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।

ঘ) কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক কমিটি গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।

২. অসহযোগ আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী ফলাফলগুলি কী? (দশ লাইনে লিখুন)

১২.৩ আইন অমান্য আন্দোলন

১৯২৭ এবং ১৯২৯ এ রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন স্রোত প্রবাহিত হল। ১৯২৯ এর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে তারুণ্যের প্রতীক জওহরলাল নেহেরু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। এই অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজকেই আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে প্রস্তাব পাস করে। ১৯৩০ এর ২৬ শে জানুয়ারী প্রথম স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্থির হয় যে, এই দিনটিতে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলিত হবে এবং জনসাধারণ এই বলে শপথ গ্রহণ করবে যে, বিদেশী শাসনের অধীনতা স্বীকার করে চলার অর্থ ঈশ্বর এবং মানবজাতির প্রতি অপরাধ করা। ১৯৩০-এর ১২ই মার্চ গান্ধীর বিখ্যাত ডান্ডি অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস দ্বিতীয়বার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বেআইনী লবণ তৈরি ও বিক্রি করে লবণ আইন ভঙ্গ করে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সত্যাগ্রহ অথবা অহিংস প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অসংখ্য মানুষ হরতাল, শোভাযাত্রা, মিছিল এবং বিদেশী দ্রব্য ও মদ বয়কটের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। দেশের বহু অঞ্চলে কৃষকেরা ভূমিরাজস্ব ও খাজনা প্রদান করতে অস্বীকার করে, এর ফলে তাদের জমি বাজেয়াপ্ত হয়। এই আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নারীদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ। অপর বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠানদের মধ্যে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে লাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরে আন্দোলনের প্রসার। ২৪ এপ্রিল থেকে ৪ মে-র মধ্যে পেশোয়ারে ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। ১৯৩১-এর মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে আন্দোলনে সাময়িকভাবে ভাঁটা পড়েছিল। কিন্তু ১৯৩২ এর প্রথমে আবার আন্দোলন শুরু হয়।

কোন গণআন্দোলনই চিরস্থায়ী হতে পারে না এবং এই আন্দোলনের গতিও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে! ১৯৩৪ এর মাঝামাঝি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে লণ্ডনে আহুত গোলটেবিল বৈঠকগুলিও ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

১২.৪ বিপ্লবী আন্দোলন

রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ধারা হিসেবে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ বিংশ শতাব্দীতে মাঝে মাঝেই প্রবল বেগে আবির্ভূত হয়েছে। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে স্বদেশী আন্দোলনের গতি স্তিমিত হবার পরে। এইরূপ রাজনৈতিক কার্যকলাপ পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের

পরে। জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত নতুন এক প্রজন্ম এই আন্দোলনের পথ অনুসরণ করেন। এই যুব-গোষ্ঠীর তৎকালীন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ দেখে মোহভঙ্গ হয়েছিল। উদ্দীপনায় জাগ্রত এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এই যুবকেরা সরকারী দপ্তর, সম্পত্তি এবং সরকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হিংসার পথ গ্রহণ করে।

ক্ষুধিরাম **বসু**

যখনই কোনো বড় মাপের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছে বা তার জীবনীশক্তি হারিয়েছে, তখনই সাময়িক রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই শূন্যতা বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে উঠবার একটি প্রধান কারণ। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম স্ফুরণ ঘটে ১৯০৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল যখন বিপ্লবী ক্ষুধিরাম ও প্রভুল্ল চাকী কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুরে হত্যার প্রচেষ্টা করেন। তবে ভুলবশত তাঁরা বোমা মেরে মিসেস কেনেডী ও তাঁর কন্যাকে হত্যা করেন। প্রভুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়। এই ঘটনা বাংলার রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১৯০৮ সালের ২রা জুন মানিকতলা বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও অরবিন্দ ঘোষ।

বাঘাযতীন

এদিকে মহারাষ্ট্রের নেতা বালগঙ্গাধর তিলক পত্রিকা 'কেশরী'তে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকীর আত্মদান নিয়ে পরপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। ফলে রাজদ্রোহীতার অপরাধে তিলকের ছ'বছর কারাদণ্ড হয়। তিলকের কারাদণ্ডের ফলে সারা দেশে বিরাট পতিক্রিয়া দেখা যায়। বোম্বাই শহরে সমস্ত কলকারখানায় শ্রমিকরা ছ'দিন এর প্রতিবাদে ধর্মঘট করে। এই বিপ্লববাদী কর্মসূচী বাংলায় বর্তমান শতাব্দীর তিনেক দশক পর্যন্ত অনুসৃত হয়।

বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচার ও প্রয়োগের জন্য দুটি সংগঠন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। (১) অনুশীলন সমিতি (২) যুগান্তর। শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে তিনের দশক পর্যন্ত এই দুটি সংগঠনের অনুগত কর্মীদের কার্যকলাপ

ছিল অক্ষুন্ন। রাশিয়ার এনার্কিষ্ট আন্দোলন থেকে অনুশীলন সমিতি প্রেরণ লাভ করে। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ প্রমুখ এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যুগান্তর বিপ্লবী সংগঠনের মূলে ছিলেন বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। যুগান্তরও ছিল গুপ্ত সমিতি। সশস্ত্র-সংগ্রামের প্রেরণায় তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ব্রিটিশের শত্রুদের জার্মানীর সাহায্য লাভের জন্য যুগান্তর দলের সদস্যরা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (এম. এন. রায়) ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম ইতিহাসে সুবিদিত। ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বুড়ীবালামের তীরে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন) কলকাতার কুখ্যাত ডেপুটী পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের সশস্ত্র পুলিশ ও ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মোকাবিলা করেন। ঐ সালেই রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যাল পাঞ্জাবের গদর বিপ্লবীদের সহযোগিতায় সারা ভারতের ব্যাপক সেনাবিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন। ১৯২৪ সালে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠনের মাধ্যমে বিপ্লবী আন্দোলন সাংগঠনিক রূপ পায়। সরকার সাথে সাথেই নিপীড়ন ও অত্যাচারের দ্বারা প্রত্যুত্তর দেয়। পরিণতিতে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির একদল কর্মী গ্রেপ্তার হন এবং ১৯২৫ সালে বিখ্যাত কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁদের বিচার হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মূলত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাবে এই সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে হয় হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাললিক্যান অ্যাসোসিয়েশন। চন্দ্রশেখর আজাদ এই সংগঠনের নেতা ছিলেন। ভগদ সিং, রাজগুরু, রামপ্রসাদ বিসমিল, সুখদেব এবং বটুকেশ্বর দত্ত ছিলেন, ১৯২০ এর দশকে বিপ্লবী আন্দোলনের কয়েকজন নেতা।

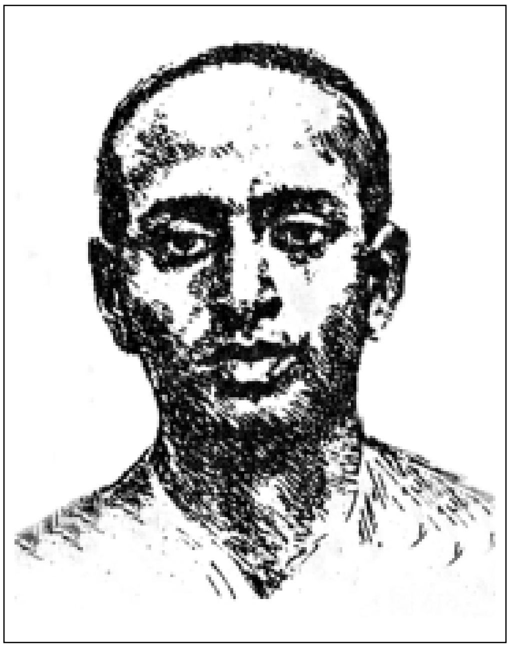

সূর্য্য সেন

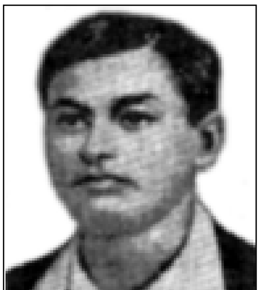

বিনয়,

বাদল

দীনেশ

৩০-এর দশকে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা হলেন সূর্য্য সেন (মাষ্টারদা)। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। তাঁর সহযোদ্ধারা ছিলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল প্রমুখ। ১৯৩২ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। ১৯৩০ সালের ২৫ শে আগস্ট ডালহৌসি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ্ পুলিশ লোম্যান বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন ১৯৩০ এর ২৯ শে আগস্ট। ঐ বছর ৮ই ডিসেম্বর বিপ্লবী বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত ও বাদল বসু রাইটার্স বিল্ডিংসে কারা বিভাগের আই. জি. কর্নেল সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করেন।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা ছিল দূরদৃষ্টির অভাব। যদিও বিপ্লবীদের স্বদেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত এবং তাঁদের আন্দোলন ছিল রাষ্ট্রের পক্ষে ত্রাসের কারণ, কিন্তু তবু এই আন্দোলনের সময়কাল ছিল খুবই কম। সরকার শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনকে দমন করে ফেলে। যদিও এই আন্দোলন পরাজিত ও দমিত হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিপ্লবীদের অবদান খুব কম ছিল না। বিপ্লবীরা যুব সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ান এবং তাঁদের আত্মত্যাগের ঘটনা জাতীয়তাবাদের অনির্বাণ অগ্নিশিখাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল।

১২.৫ স্বরাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান

গোড়ার থেকেই জাতীয় আন্দোলনের একটি জনমুখী বা বলা যায় দরিদ্র-জনমুখী দিক ছিল। নরমপন্থীদের ঔপনিবেশিক শাসন সংক্রান্ত সমস্ত অর্থনৈতিক সমালোচনার ভিত্তিই ছিল ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য। এই সমস্যার মোকাবিলার জন্য নরমপন্থীরা শিল্পোন্নয়ন এবং কর ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা করেন। বস্তুতপক্ষে, তাঁদের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী তৎকালীন মানদণ্ডে যথেষ্ট চরমপন্থী ছিল। দরিদ্র মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা আন্দোলনের প্রধান নেতা হিসেবে গান্ধীর উত্থানের ফলে এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের ফলে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা আরও দৃঢ় রূপ ধারণ করে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কংগ্রেসের মধ্যে একটি শক্তিশালী বামঘেঁষা গোষ্ঠীর উদ্ভব হওয়ায় আন্দোলন আরও চরমপন্থী হয়ে উঠতে থাকে। বামপন্থী গোষ্ঠীর রাজনীতি শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একই সাথে এই বামগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ শ্রেণী শোষণের প্রশ্নটিও উত্থাপন করেন।

১২.৫.১ কমিউনিস্ট এবং সোসালিস্ট গোষ্ঠীর উত্থান

১৯২০-র দশকে ভারতীয় যুবসমাজের মনোভাব ক্রমশ উগ্রতর হতে থাকে। এই দশকেই কমিউনিস্ট ও সোসালিস্ট গোষ্ঠীর উত্থানও পরিলক্ষিত হয়। বোম্বাই শহরে ১৯২০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা লালা লাজপত রায়কে সভাপতি করে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। এর পরেই বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে থাকে। বাংলার চটকল শ্রমিকদের সমিতি গঠিত হয়। এ. আই. টি. ইউ. সি-র লাহোর অধিবেশনে (১৯২৩) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতির ভাষণে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সংহতি জানান। ১৯২০ সালে নির্বাসিত বিপ্লবী এম. এন. রায় ও অবনী মুখার্জী তা সম্বন্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯২২ সালে

এম. এন. রায় তার দপ্তর স্থাপন করেন বার্লিনে। তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মার্কসবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট গোষ্ঠী সমূহের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। বাংলায় মুজফ্ফর আহ্মেদের সঙ্গে, বোম্বাইতে এস. এ ডাঙ্গে, মাদ্রাজে সিঙ্গারে ভেলু চেটিয়ার ও লাহোরে গোলাম হুসেনের সঙ্গে যোগাযোগ হয় একই সঙ্গে। এঁরা তখন সংখ্যায় অল্প হলেও আদর্শের দৃঢ়তায় ছিলেন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক কর্মী। ভারতের প্রকাশ্যে প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কানপুরে ১৯২৫ সালে। কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করে।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃত
মুজফ্ফর আহমেদ

সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী কর্মীদের নিয়ে ১৯২৫ সালে মুজফ্ফর আহ্মেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পেজেন্টস্ এ্যান্ড ওয়ারকারস্ পার্টি'। ১৯২৭ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার প্রথম গঠনতন্ত্র তৈরি করে। কলকাতার শ্রমিক সংগঠন তার সংহতি ও দৃঢ়তার পরিচয় দেয় ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে। অনুষ্ঠান মণ্ডপে মিছিল করে গিয়ে তারা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানায়। শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে এগোতে সাহায্য করে। পরবর্তীকালে 'কৃষক সভা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের কৃষকদেরও আন্দোলনে সামিল করা হয়। ১৯২৮ থেকে সারা দেশ জুড়ে ছাত্র এবং যুব সংগঠনগুলি গড়ে উঠতে শুরু করে। এছাড়া, ভারতীয় যুবসম্প্রদায় আরও বেশি করে সমাজবাদী চিন্তাধারার প্রতি আসক্ত হয়। ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে শত শত যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চন্দ্রশেখর আজাদ এবং ভগৎ সিং-এর নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁকে এবং তাদের সংগঠনের নাম 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' থেকে পরিবর্তন করে 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' রাখা হয়। ভগৎ সিং তাঁর শেষ চিঠিগুলির একটিতে লিখেছিলেন ঃ ''কৃষকরা শুধুমাত্র বিদেশী দাসত্ব থেকে মুক্ত হলেই হবে না তাদের জমিদার এবং পুঁজিপতিদের দাসত্ব থেকেও মুক্ত হতে হবে।''

ভগৎ সিং

১৯৩০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা আরও জনপ্রিয় হয়েছিল কারণ, সেইসময়ে সারা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রকোপে পড়েছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে কমিউনিস্ট পার্টি পি.সি. জোশীর নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হয় এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য নরেন্দ্র দেব এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বাধীন

কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০-র দশকের মধ্যবর্তীকালে কংগ্রেসের শক্তিশালী বামগোষ্ঠীর নেতা হিসেবে সুভাষচন্দ্র বোসের উত্থান ঘটে।

১২.৫.১ নেহরুর ভূমিকা

জওহরলাল নেহরু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের পরে সমাজতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। স্বাধীনতা যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংজ্ঞা নয় এর যে একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও আছে এরূপ ধারণা উত্তরোত্তর নেহরুর নামের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

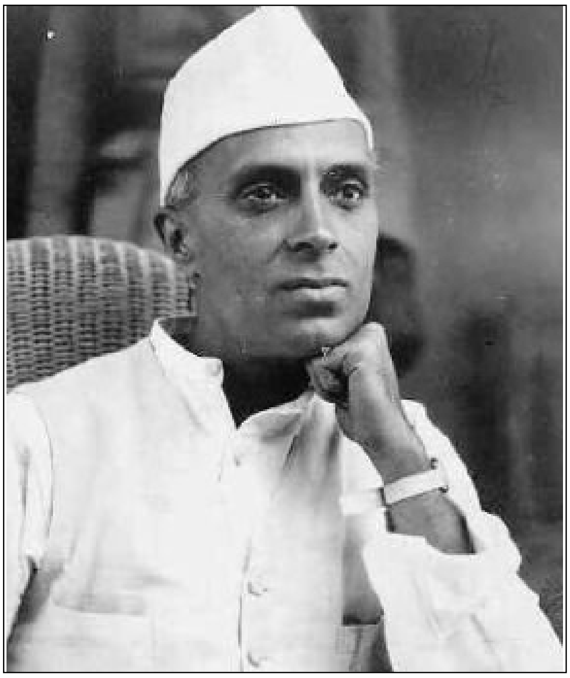

জওহরলাল নেহেরু

নেহরু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হন। এই পদে তিনি আবার ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে এবং গান্ধীর পরে জাতীয় আন্দোলনের সব থেকে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে নেহরু বারংবার সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। নেহরু তাঁর সভাপতির ভাষণে এবং অন্যান্য জনপ্রিয় বক্তৃতাগুলিতেও সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যদি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধন করতে পারে তবেই সেই স্বাধীনতা অর্থবহ হবে এবং সেক্ষেত্রে এর পরে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠবে। কংগ্রেসের ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে নেহরু সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেনঃ ‘‘আমি একজন সোসালিস্ট এবং রিপাবলিকান, আমি রাজাদের এবং রাজপুত্রদের বিশ্বাস করি না। আমার সেই সামাজিক বিন্যাসেও আস্থা নেই, যে বিন্যাস শিল্পক্ষেত্রে আধুনিক রাজাদের জন্ম দেয়। এই সব রাজারা মানুষের জীবন ও ভাগ্যের উপর পুরোন রাজাদের থেকেও অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। এরাও পুরনো সামন্ত অভিজাতদের মতই লুণ্ঠনকারী’’।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতের দারিদ্র এবং বৈষম্যের অবসান শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক পথেই সম্ভব। সমাজতন্ত্রের প্রতি নেহরুর এই দায়বদ্ধতা আরও পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দেয় ১৯৩৩-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত কোনদিকে চলেছে এই প্রশ্নের উত্তরে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি লেখেন, ‘‘নিশ্চিতভাবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমতার দিকে চলেছে; চলেছে জাতির দ্বারা জাতির এবং শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীর শোষণের অবসানের দিকে’’। ডিসেম্বর ১৯৩৩ এ তিনি লেখেন ‘‘সত্যিকারের নাগরিক আদর্শ হচ্ছে সাম্যের

ও কমিউনিস্ট আদর্শ''। নেহরু সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা দ্বিধাহীনভাবে ১৯৩৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করেন ঃ ''আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিশ্বের ও ভারতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান নিহিত আছে সমাজতন্ত্রে মধ্যে; এর অর্থ হল কিছু সীমিত ক্ষেত্র ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটানো এবং সমবায় পদ্ধতির মত উচ্চ আদর্শের দ্বারা বর্তমান মুনাফাব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো...আমি দারিদ্র্যের ও বিশাল বেকার সমস্যার সমাধান এবং ভারতীয় জনগণের অধঃপতন ও পরাধীনতার অবসান ঘটানোর জন্য সমাজতন্ত্র ব্যতীত অন্য রাস্তাই দেখছি না''।

১২.৫.৩ কংগ্রেসের উপর প্রভাব

দেশে উগ্রপন্থী শক্তিগুলির বিকাশ খুব শীঘ্রই কংগ্রেসের কর্মসূচী এবং নীতিগুলিতে প্রতিফলিত হয়। জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে করাচী কংগ্রেস অধিবেশনে মৌলিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক নীতির প্রস্তাব-কে এই প্রক্রিয়ার প্রাণবিন্দু বলা যায়। প্রস্তাবে ঘোষণা করা হল ঃ ''জনগণের শোষণের অবসান ঘটাতে লক্ষ লক্ষ উপোসী মানুষের প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই প্রস্তাবে মানুষের ন্যূনতম নাগরিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ঃ

- বর্ণ, ধর্ম অথবা লিঙ্গ নির্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান।
- সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন।
- বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করা।

প্রস্তাবে আরও অঙ্গীকার করা হয় যে,

- খাজনা এবং রাজস্বের পরিমাণের যথেষ্ট হ্রাস করা হবে।
- অলাভজনক জমির ক্ষেত্রে খাজনা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।
- কৃষিঋণ লাঘব করা এবং মহাজনদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।
- শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, তাদের উপযুক্ত মজুরী প্রদান, সীমিত ঘণ্টার শ্রম এবং মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধান করা হবে।
- শ্রমিক এবং কৃষকদের ইউনিয়ন গড়ার অধিকার দেওয়া হবে।
- মূলশিল্পগুলির উপর, খনি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হবে।

  ফৈজপুর কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিতে এবং ১৯৩৬ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেসের মধ্যে উগ্রপন্থী ঝোঁক স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এগুলিতে নিম্নোক্ত অঙ্গীকার করা হয় ঃ

- কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।
- খাজনা ও রাজস্বের উল্লেখযোগ্য হ্রাস।
- গ্রামীণ ঋণের পরিমাণ হ্রাস এবং অল্প সুদে সহজে ঋণ করবার সুযোগ সৃষ্টি।
- সামন্ততান্ত্রিক আদায়ের অবসান।
- প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা।
- কৃষি-শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী প্রদান।
- ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষকদের ইউনিয়ন গঠনের ও ধর্মঘট করবার অধিকার।

পরবর্তীকালে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জমিদারী ব্যবস্থার অবসানের সুপারিশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন কংগ্রেস অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দায়বদ্ধ হয় এবং জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি স্থাপন করে। নেহরু এবং অন্যান্য বামপন্থীররা ও গান্ধী স্বয়ং অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বৃহৎ শিল্পগুলি গড়ে তুলবার কথা বলেন। বস্তুত পক্ষে ১৯৩০ এর দশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হ'ল গান্ধীও প্রগতিশীল অর্থনৈতিক নীতিগুলি উত্তরোত্তর গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৩৩-এ গান্ধী নেহরুর সাথে একমত হন যে ব্যক্তিস্বার্থের পুনর্বিন্যাস না হলে জনগণের অবস্থার উন্নতি ঘটানো কখনই সম্ভব নয়। তিনি চাষীকে জমির মালিকানা দেবার নীতিও গ্রহণ করেন। গান্ধী ১৯৪২-এ ঘোষণা করেন যে, "যারা জমিতে কাজ করবে জমি তাদের ছাড়া অন্য কারুর হবে না"।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় সৈন্যবাহিনাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ব্যবহারের বিরোধিতা করে এসেছিল। ধীরে ধীরে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার নীতি গ্রহণ করে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয় আন্দোলনগুলিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ১৯৩০ এর দশকে নেহরুর তত্ত্বাবধানে কংগ্রেস আরও সক্রিয় বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করে। কংগ্রেস ফ্যাসিবাদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে দৃঢ় ভূমিকা নেয় এবং ইথিওপিয়া, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়ার জনগণকে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করে। কংগ্রেস চীনকেও জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে মদত দেয়। কংগ্রেস মনে করে যে, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী যৌথ সংগ্রামেরই অর্থ।

অগ্রগতি যাচাই করুন ২

১. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে কোন্‌টি-সঠিক (✓) ও কোন্‌টি ভুল (×)
   - ক) আইন অমান্য আন্দোলনে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
   - খ) হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাবে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মিতে পরিণত হয়েছিল।
   - গ) নেহরু ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্যের সমাধানের জন্য সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন।
   - ঘ) কংগ্রেস অন্যান্য দেশ জয় করার জন্য ভারতীয় সৈন্যদলের ব্যবহারের বিরোধীতা করেনি।

২. দশটি বাক্যে করাচী প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

১২.৬ ❒ কৃষক, শ্রমিক এবং দেশীয় রাজ্যে গণ আন্দোলন

জাতীয় আন্দোলন কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহীত বৃটিশ বিরোধী অনুভূতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তারা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। সমাজবাদী ধ্যান-ধারণাও কৃষক ও শ্রমিকদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তারা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভাব-অভিযোগকে মুক্তি সংগ্রামে সামিল করল। অনুরূপভাবে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির অধিবাসীরাও গণআন্দোলন সংগঠিত করল।

১২.৬.১ কৃষক আন্দোলন

ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায়ের ইংরেজ, ভূস্বামী এবং মহাজনদের নিপীড়নের বিরুধে অভ্যুত্থানের এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তাদের দীর্ঘদিনের লড়াইকে নতুন করে উদ্দীপ্ত করল। সেইসঙ্গে এইসব আন্দোলনকে মুক্তি সংগ্রামের মুখ্য প্রবাহে সামিল করল।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা ও কৃষি-সম্পর্ক একই রকম ছিল না। তবুও কতকগুলি নির্দিষ্ট সাধারণ অভিযোগ সব অঞ্চলেই অভিন্ন ছিল।

আমরা নীচে সেগুলি এইভাবে সাজাতে পারি ঃ

- উচ্চহারে ভূমি-রাজস্ব দাবি।
- খাজনার অস্বাভাবিক উচ্চ হার।
- বলপ্রয়োগ করে মজুর নিয়োগ ও পণ্য সরবরাহ।
- জমির থেকে উৎখাত এবং রায়তীস্বত্বের অনিশ্চয়তা।
- ক্ষেতমজুরদের কম মজুরী।
- ঋণগ্রস্ততা ইত্যাদি।

কৃষকশ্রেণীর এখন এই সংগ্রামে তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগের পাশাপাশি কংগ্রেসের সমর্থনের দিকেও তাকিয়ে রইলেন। আমরা এখানে এই সব কৃষক আন্দোলনের কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ক) চম্পারণ

ইউরোপীয় নীলকর সম্প্রদায় চম্পারণের কৃষকদের জোর করে নীলচাষে বাধ্য করত। ঐ চাষীরা নীলকরদের সর্বপ্রকারের জুলুম ও শোষণের শিকার হয়। তখন রাজকুমার শুকুল নামে একজন সর্বস্বান্ত কৃষক নীলচাষীদের সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্মৌ-এর কংগ্রেস অধিবেশনে গিয়ে চম্পারণের কৃষকদের দুর্দশার বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই রাজকুমার শুকুলই ১৯১৭ সালে গান্ধীজীকে চম্পারণে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল, চাষীদের অবস্থা গান্ধীকে স্বচক্ষে দেখান। কৃষকরা এক জোরদার আন্দোলন শুরু করে ফলে ইংরেজ সরকারকে অবশেষে কৃষকদের কিছু দাবি দাওয়ার কাছে নতি স্বীকার করতে হ'ল।

খ) অযোধ্যা

অযোধ্যাতেও চাষীদের রায়তীস্বত্ত্বের নিরাপত্তা ছিল না। তাদের ঐ দখলী স্বত্ত্ব বজায় রাখতে অতিরিক্ত নজরানা (অতিরিক্ত আদায়) দিতে হত। তাদের কাছ থেকে জমিদাররা জবরদস্তি শ্রম, রসদ ও নানাধরণের অবৈধ কর জোর করে আদায় করত। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে অনেকগুলি কৃষকসভা (কৃষক সমিতি) সংগঠিত হ'ল। বাবা রামচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি যিনি ফিজিতে চুক্তিবন্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছিলেন, কৃষকদের সংঘবন্ধ করে এক জোরদার আন্দোলন গড়ে তুললেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গান্ধীজীর মনোযোগ আকৃষ্ট করতে ৫০০ কৃষককে নিয়ে এলাহাবাদে মিছিল করে গেলেন। ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে অযোধ্যায় এক বিশাল কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তখন ঐ উপলক্ষ্যে ঐ সমস্ত কৃষকের থাকার জন্যে মসজিদ ও মন্দির খুলে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২১ সালের জানুয়ারীতে অযোধ্যায় এক বিশাল কৃষক অভ্যুত্থান ঘটল। অনেক গ্রামে কৃষকরা তাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করল। সরকার প্রচণ্ড শক্তিপ্রয়োগ করে অবশেষে সেই অভ্যুত্থানকে

দমন করে। পুলিশের গুলিতে বহু চাষী মারা যায়। রায়বেরিলী জেলায় মুন্সীগঞ্জে যে ভয়ংকর গণহত্যা ঘটে, তা সারা দেশে ক্রোধের আগুন ছড়িয়ে দেয়। সরকার তখন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাধ্য হয়ে অযোধ্যা খাজনা (পরিশোধনী) আইন পাশ করে। এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল এই, জওহরলাল নেহরু এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে কৃষকদের গভীর দুর্দশার কথা উপলব্ধি করলেন, আর তারপর কৃষকদের সংগ্রাম নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

গ) মালাবার

প্রায় একই সময়ে মালাবার জেলাতেও (অধুনা কেরালার অন্তর্ভুক্ত) কৃষকদের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এখানেও মাপ্পিলা চাষীরা তাদের রায়তী-স্বত্বের অনিশ্চয়তা, উঁচু হারে খাজনা, আর নানা অবৈধ আদায়ে জেরবার হয়ে উঠেছিল। কৃষকদের প্রতিবাদ ক্রমশ ব্যাপক আকারে সংগঠিত হয়ে উঠল, যা কালক্রমে অসহযোগ আন্দোলন আর খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই প্রতিবাদ আন্দোলন শীঘ্রই এক সশস্ত্র উত্থানে পরিণত হ'ল।

সংগ্রামী কৃষকেরা সরকারী অফিস, থানা কাছারি আক্রমণ করল। সেখানে নথিপত্র জ্বালিয়ে দিল। কোষাগার লুঠ করল। তারা অবাঞ্ছিত ভূস্বামীদের উপর হামলা চালাল। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকার এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করতে কৃতকার্য হন। পরে এই অভ্যুত্থানকে কাবু করতেও সমর্থ হন।

ঘ) অন্ধ্র

বৃটিশ রাজের প্রবর্তিত বনসংক্রান্ত বিধি-নিষেধ সমস্ত দেশজুড়ে আদিবাসী ও জনজাতির মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আলুরি সীতারাম রাজু অন্ধ্রপ্রদেশের রম্পা অঞ্চলের আদিবাসীদের সংগঠিত করতে লাগলেন। তাঁরা গ্রামপঞ্চায়েত গঠন করে মদ্যপান বিরোধী অভিযান শুরু করলেন। রাজু গান্ধীজিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশদের তাড়াতে হ'লে অহিংস আন্দোলনের প্রয়োজন। অনিবার্যভাবে তাই ঐ আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠল। থানাগুলিতে হামলা হল। সশস্ত্র বাহিনীর সাথে রাজুর বাহিনীর লড়াই গেরিলা যুদ্ধের আকারে চলতে লাগল। অবশ্য পরিশেষে রাজুকে ব্রিটিশ সরকার গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করলেন। এখনও পর্যন্ত রাজু ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে এক প্রবাদপুরুষ হিসাবে খ্যাত।

ঙ) বারদৌলি

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে গুজরাটের বারদৌলি তালুকের কৃষকেরা ৩০% ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি বিষয়টি একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল দিয়ে তদন্ত করান। কৃষকেরা বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা সর্বপ্রকার সরকারী জুলুম ও জোরজবরদস্তি প্রতিরোধ করতে থাকেন, সমস্ত সরকারী আমলাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং তাঁদরে বাসস্থানগুলিতে তালা লাগিয়ে দেন। তারপর কৃষকেরা তাঁদের গরুমহিষ নিয়ে পাশের বরোদা প্রদেশে পালিয়ে যান। পরিশেষে সরকারকে তাদের তদন্তের দাবি মেনে নিতে হয়, আর রাজস্বের বর্ধিত হার ৬% এ কমিয়ে দেওয়া হয়।

উদয়পুর এবং মেবারেও মতিলাল তেজাবৎ-এর নেতৃত্বে আদিবাসী ও কৃষকশ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটে। দ্বারভাঙ্গায় স্বামী বিদ্যানন্দের নেতৃত্বেও এই ধরণের আন্দোলন সংগঠিত হয়। বিহারে স্বামী সহজানন্দ

সরস্বতী বিহার কিষাণসভা সংগঠিত করেন।

১৯৩০ এর দশকে সমগ্র দেশজুড়ে কৃষক শ্রেণী তাদের শ্রেণী স্বার্থরক্ষার জন্য নতুন আত্মত্যাগ শুরু করেন। এরই অভিব্যক্তি ঘটে সর্বভারতীয় কিষাণসভা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। যে মুখ্য দাবিগুলি ঘিরে কৃষকদের সংগঠিত করা হয়েছিল—সেগুলি হ'ল—খাজনা এবং ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস। বিভিন্ন অবৈধ লেভি যেমন, জমিদারদের দ্বারা আরোপিত 'বেগারী', 'ভিটি', কর্জের পরিমাণ হ্রাস, ভূস্বামী ও মহাজনদের অত্যাচারের অবসান, অবৈধভাবে দখলিকৃত জমির উদ্ধার, রায়তের রায়তী-স্বত্ব কায়েম করা ইত্যাদি কৃষকদের সংঘবন্ধ করার জন্য সভা-সমাবেশ, গণ-বিক্ষোভ, কৃষকদের মিছিল, বিভিন্ন কিষাণ সভাসংগঠন, খাজনা ও রাজস্ব প্রদান বন্ধ, সত্যাগ্রহ হিত্যাদির আশ্রয় নেওয়া হয়। স্বাধীনতা এগিয়ে আসার সাথে সাথে কৃষক আন্দোলন এক নতুন গতি পেল। সারা দেশ জুড়ে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবিরও গুরুত্ব বেড়ে গেল। যুদ্ধোত্তর সংগ্রামগুলির মধ্যে তেভাগা আন্দোলন সবচেয়ে জঙ্গী। এটি বাংলার ভাগচাষীরা সংগঠিত করেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে তার সূত্রপাত। এর সংগঠক কৃষকসভা। ইংরেজ সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) বাংলার কৃষকদের চিরন্তন শোষনের কারণ। ইংরেজরা তাদের উপনিবেশ রক্ষার জন্য নির্ভরশীল ছিল জমিদার শ্রেণীর উপর। জমিদারদের স্বেচ্ছাচারীতা তার ফলে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বাংলার কৃষক উৎপাদনের সমস্ত ব্যয় নিজেরা বহন করলেও উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক খরচ না দিলে জমিদার-জোতদারদের গোলায় তুলে দিতে বাধ্য ছিল। তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের দাবি ছিল উৎপাদনের অর্ধেক খরচ না দিলে জমিদার-জোতদার পাবে তিনভাগের এক ভাগ, চাষীর ঘরে উঠবে দু'ভাগ ফসল। এরই নাম তেভাগা। তেভাগার দাবির ন্যায্যতা ফ্লাউড কমিশন স্বীকার করেছিল। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন বাংলার নানা জেলায় শুরু হয়ে যায়। দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, যশোহর, কাকদ্বীপ ছিল তাদের মধ্যে অগ্রণী। বাংলার ২৬টি জেলার মধ্যে ২৩টি জেলাতেই তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল। আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান চাষীরা একসঙ্গে কাজ করেছেন এবং এতে মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখ্য। অনুরূপভাবে তেলেঙ্গানাতেও খুব জোরদার আন্দোলন শুরু হ'ল। এই উভয় আন্দোলনই পরিচালনা করেছিলেন কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ।

১৯৪৭ এর আগে তাৎক্ষণিক দাবিগুলিকে ঘিরেই কৃষক সংগ্রামগুলি সংগঠিত হচ্ছিল। তাদের কাছে রাজশক্তি, জমিদার এবং মহাজনদের নির্যাতন-এর কঠোরতা কমানোই ছিল আশু লক্ষ্য। তবে ঐ আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল ভূমিসংস্কার ও কৃষিব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন। গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের সাথে কৃষকের সম্পর্ককে নতুন করে গড়ে তোলা।

১২.৬.২ শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম

১৯২০ এর দশকে শ্রমিক সংগ্রাম ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আধুনিক শিল্প, খনি ও রেলপথের বিচ্ছিন্নভাবে উন্নতির সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পে এই অগ্রগতির সূচনা থেকে শ্রমিকরা নানাপ্রকার অমানুষিক ও গর্হিত শোষণের জাঁতা-কলে পড়ে। নিম্নহারে মজুরী, দৈনন্দিন কার্যকালের দীর্ঘতা, কাজের ও জীবনযাত্রার অসহনীয় পরিবেশ এই সবের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে থাকলেও ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করতে তাদের বেশ সময় লেগে যায়। স্বদেশী আন্দোলনই প্রথম বড় রকমের শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলার রেলশ্রমিকদের আন্দোলন। ১৯১৮ থেকে

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় সবশিল্পেই স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট বা হরতালের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধোত্তর-কালে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং সেই সময়ের উত্তাল জাতীয় আন্দোলনের আবর্ত্য এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন রেলশ্রমিকেরা যারা চাকুরি ক্ষেত্রে তীব্র বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। (স্বদেশী কর্মচারীদের থেকে ইউরোপীয় কর্মচারীরা বেশি মাইনে ও ভাতা পেতেন)। এছাড়া অর্থনৈতিক ও শ্রেণী-বৈষম্যের নির্যাতন বহাল ছিলই। শিল্পশ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সংগ্রামগুলি সংগঠিত করতে ১৯২০ সালে স্থাপিত হয় অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। প্রখ্যাত জাতীয় নেতা লালা লাজপৎ রায় এই সংস্থার প্রথম সভাপতি হন। এ.আই.টি.ইউ.'সির বিভিন্ন অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু, সি. আর দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো স্বনামধন্য নেতা সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে নতুন করে শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘটের জোয়ার আসে। বাংলায় পাঠশিল্প শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট হয়। খড়গপুরের রেলওয়ে কারখানায় দু'মাসব্যাপী ধর্মঘট চলে। দক্ষিণপূর্ব ও পূর্বভারতীয় রেলপথের কর্মচারীরাও ধর্মঘটে সামিল হন। আর একটি ধর্মঘট সংগঠিত হয় জামসেদপুরে টিস্‌কোতে। এই সবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট চলে বম্বের কাপড় কলগুলিতে। প্রায় পাঁচ মাস ধরে প্রায় দেড়লক্ষ কর্মচারী সামিল হ'ন। এই ঐতিহাসিক ধর্মঘট পরিচালনা করেন প্রবাদ প্রতিম গিরনি কামগার ইউনিয়ন। এই ধর্মঘট সমূহের শেষ ঘটনা ঘটে বম্বের জি.আই.পি. রেলওয়েতে।

সরকার, বস্তুত, এই দীর্ঘ ধর্মঘটের ঢেউয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে। ১৯২৯ সালে তারা ৩১ জন শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের রাজদ্রোহের অপরাধে বিচার করে। মীরাট ষড়যন্ত্র নামে এই মামলা ইতিহাস খ্যাত। সরকার ভারতে শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্রে অবস্থা খতিয়ে দেখতে এবং তাদের অবস্থার উন্নতি-বিধানের সুপারিশ পেশ করতে হুইটলি কমিশন নামে এক রাজকীয় কমিশন গঠন করে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় শোলাপুরে শ্রমিকগোষ্ঠী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে এক বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৩৫ ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা, আমেদাবাদ এবং কানপুরে বেশ কতকগুলি বড় মাপের ধর্মঘট ঘটে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হ'লে নাগরিক অধিকারের প্রসার ঘটে। ফলে, শ্রমিক সংগঠন ও সংগ্রামে নতুন করে বিস্ফোরণ ঘটে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্যসংখ্যা ১৯৩৮ সালে, ১৯৩৭ সালের থেকে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে কলকাতা, বম্বে ও কানপুরে ব্যাপক ধর্মঘট ঘটে।

১২.৬.৩ দেশীয় রাজ্যগুলিতে আন্দোলন

ব্রিটিশেরা শতশত দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। এইসব রাজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দেশীয় রাজা বা শাসকবর্গের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'ত। এই সমস্ত দেশীয় রাজন্যবর্গ যদিও ব্রিটিশরাজের অনুগত ছিলেন কিন্তু এঁরা নিজেদের রাজ্য-শাসনের ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল দুর্বিষহ। এই সমস্ত শাসকবর্গ আদায়ীকৃত রাজস্বের সিংহভাগই ব্যয় করতেন তাঁদের নিজেদের পারিষদ ও কর্মচারীদের জন্যই। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার তাঁদের অভ্যন্তরীণ যে কোনও বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের থেকে রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন, তাই তাঁরা যাবতীয় অপশাসন ও অরাজকতায় ছিলেন বাধাবন্ধহীন।

যদিও জাতীয় আন্দোলন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষেই গড়ে উঠেছিল, কিন্তু এইসব দেশীয় রাজ্যগুলিও

সেই আন্দোলনে প্রভাবিত হয়েছিল। সর্বভারতীয়ভাবে রাজ্যগুলির গণসম্মেলন, (All India State Peopel's Conference) ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দেই সংগঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলির রাজনৈতিক আন্দোলনের সমন্বয়-সাধন। আইন অমান্য আন্দোলনে এভাবে ঐ সমস্ত রাজ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। কাশ্মীর, জয়পুর, রাজকোট, হায়দ্রাবাদ এবং ত্রিবাঙ্কুরে গণ আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। গণতান্ত্রিক এবং জাতীয় চেতনার বিকাশের সাথে সাথে বহু রাজ্যে প্রজামণ্ডল গঠিত হয়।

জাতীয় কংগ্রেস প্রথমদিকে এই আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালের পর কংগ্রেস এই আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন দেয় এবং রাজাদের এই গণআন্দোলন দমনের প্রয়াসকে প্রতিরোধ করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজন্যবর্গকে চাপ দেওয়া হয় প্রজাদের নাগরিক স্বাধীনতা দিতে এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক শসনব্যবস্থা চালু করার জন্য। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যার মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতাও অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই দেশীয় রাজ্যগুলির গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সংগ্রাম ও ভারতবর্ষের সার্বিক স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুসমন্বিতভাবে পরিচালনার জন্য সর্ব ভারতীয় স্তরে ১৯৩৯ সালে রাজ্যগুলির গণসম্মেলনের সভাপতি করা হয় জওহরলাল নেহ্রুকে। দেশীয় রাজ্যগুলির এই গণআন্দোলন পরিশেষে ভারতীয় ইউনিয়নে সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলির অর্ন্তভুক্তিতে সাহায্য করে।

১২.৬.৪ অন্যান্য আন্দোলন

অপর দু'টি শক্তিশালী আন্দোলনের ধারাকেও যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে দেখা দরকার। একটি আন্দোলন হচ্ছে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন সংক্রান্ত। এই আন্দোলন বিভিন্ন অঞ্চল বা ক্ষেত্রের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য জাতীয়তাবাদী কাঠামোর বাইরে সংগঠিত হয়। অনতিকালের মধ্যে এইসব আঞ্চলিক আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে সামিল হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে তাদের প্রাদেশিক কমিটিগুলি পুনর্গঠিত করে। এই জাতীয় আন্দোলনে এই সত্য স্বীকৃত হয় যে ভারতবর্ষ একটি বহুভাষা ও সংস্কৃতির দেশ এবং এই দেশের সংহতির মূলমন্ত্র হবে বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যসাধন।

অনুরূপভাবে নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের প্রভুত্বের বিরুধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রাম চালান। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য সত্যশোধক সমাজ আন্দোলন, মহারাষ্ট্রে মারাঠা অব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর আন্দোলন, দক্ষিণ ভারতে আত্মমর্যাদা আন্দোলন এবং ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলন ও বি. আর আম্বেদকর পরিচালিত তপশিলী জাতি ও হরিজন আন্দোলন। এই সব বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের গতি ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নিজের ব্যাপক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৩

১. নীচের কলম 'ক' এ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন উল্লিখিত আর কমল 'খ' এ সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের নেতাদের নাম উল্লিখিত। ক ও খ কলমের স্থান ও নেতার নাম সঠিকভাবে মেলান।

ক	খ
১) অযোধ্যা	ক) রাজকুমার শুকুল
২) চম্পারণ	খ) সীতারাম রাজু
৩) অন্ধ্র	গ) মতিলাল তেজোয়াত
৪) দ্বারভাঙ্গা	ঘ) বাবা রামচন্দ্র
৫) উদয়পুর ও মেবার	ঙ) বিদ্যানন্দ

২. ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সম্পর্কে দশ লাইনের মধ্যে আলোচনা করুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

৩. পাঁচ লাইনের মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির গণআন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

....

....

....

....

....

....

১২.৭ ❐ স্বাধীনতার পথে

এই পর্যায়ে ১৯৩৭ থেকে পরের এককে ভারতবর্ষ কীভাবে স্বাধীনতা লাভ করল সেই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই সময় সমস্ত ক্ষেত্রের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে জাতীয় আন্দোলন এক সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছিল।

১২.৭.১. ❐ কংগ্রেস মন্ত্রীসভা

১৯৩৫ সালে এক নতুন আইন—'ভারত সরকার আইন' পাকা হয়েছিল। নির্বাচন ১৯৩৭ সালেই হওয়ার কথা স্থির হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসে এক বিতর্কের অবতারণা হয় যে, পার্টির ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ উচিত হবে কিনা। অবশেষে সাব্যস্ত হয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া হবে। আর এই লক্ষ্যে সাফল্য অর্জনের জন্য সর্বতোমুখী প্রয়াস নেওয়া হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করলেন। জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি হ'ল।

মাদ্রাজ, বম্বে, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়ী হয়। এখন প্রশ্ন উঠল কংগ্রেসের সরকারে যোগ দেওয়া সমীচীন হবে কিনা। বহু তর্কবিতর্কের পর সরকারে কার্যভার গ্রহণের অনুকূলে মত প্রকাশ করা হয়। যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়েছিল, সে সব প্রদেশে কংগ্রেস প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের কাঠামোয় মন্ত্রীসভা গঠন করে।

পরবর্তীকালে কংগ্রেস আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোয়ালিশন সরকার গঠনে কৃতকার্য হয়। অবিভক্ত বাংলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ ছিল। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে মোট ২৪৮ টি আসনের মধ্যে আসন ভাগাভাগির চিত্রটা ছিল এ রকম ঃ কংগ্রেস ৫৪, মুসলিম লীগ-৩৯, কৃষক প্রজাপার্টি-৪০, নির্দল মুসলিম-৪৩, নির্দল হিন্দু-৩৭, ইউরোপীয়ান-২৫, হিন্দু ন্যাশানালিষ্ট (বর্ণ হিন্দু)-৩, হিন্দুসভা (তফশীলি)-২, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান-৪, ভারতীয় খ্রীষ্টান-২।

এই একটা সুযোগ এসেছিল বাংলায় প্রথম নির্বাচিত মন্ত্রীসভায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীকগে প্রবেশ করতে না দেওয়ার। কৃষক প্রজাপার্টির নেতা ফজলুল হক কংগ্রেসকে কোয়ালিশনের প্রস্তাব দেন। কংগ্রেস বন্দীমুক্তিকে কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেবার দাবি জানাল কোয়ালিশনের শর্ত হিসেবে। কৃষক প্রজাপার্টি নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হবে। বাংলার কৃষকের একটা বড় অংশ ছিল মুসলমান। জমিদারদের অধিকাংশই হিন্দু। কংগ্রেসের মধ্যে জমিদার, পুঁজিপতির ভীড় যথেষ্ট। সুতরাং জমিদারী উচ্ছেদ তার কাছে অগ্রাধিকার পেল না। কংগ্রেস ফজলুল হকের সঙ্গে ১৯৩৭ সালে বাংলায় কোয়ালিশন সরকার গঠন করলে আর কিছু না হোক বাংলার মাটিতে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতি একটা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণও তার পক্ষে সম্ভব হত না। বাংলায় তার সঙ্গে পাঞ্জা কষার ক্ষমতা ফজলুল হকের ছিল। সুভাষচন্দ্র বসু তা উপলব্ধি করলেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের নেতারা তা বুঝতে পারেন নি। ফলে, বাংলায় কৃষক প্রজাপার্টি ও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন সরকার তৈরি হয়। যাই হোক সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও কংগ্রেস জনসাধারণকে স্বস্তি দিতে কিছু সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেষ্টা করে। যথা ঃ

- রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান।
- পুলিশের ক্ষমতা হ্রাস করা।
- নাগরিক স্বাধীনতাকে উৎসাহ দেওয়া এবং তার প্রসার ঘটানো।
- শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের দিকে আরও মনোযোগ।
- মন্ত্রিপরিষদ আইন প্রণয়ন করে কৃষকের হৃত ভূমি ও রায়তী-স্বত্বের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেন।
- শ্রমিকদেরও সুযোগসুবিধা প্রসারের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। মন্ত্রী পরিষদের কাজকর্মের ফলে ভারতবাসীর

মনে একটা ব্যাপক অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল যে, ব্রিটিশ শাসনে মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এর অবসানের জন্য শুধু সময়ের অপেক্ষা।

১২.৭.২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত

১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বরে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন কংগ্রেস এক কঠিন সমস্যায় পড়ে। আমরা আগে দেখেছি ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনে যারা বলি হয়েছিল, তাদের প্রতি কংগ্রেসের পুরো সহানুভূতি ছিল। কংগ্রেস ফ্যাসি বিরোধী মিত্র শক্তিগুলিকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতেও আগ্রহী ছিল। কিন্তু তারা বুঝতে পারছিল না, নিজে একটা পরাধীন দেশ হয়ে সে কীভাবে অন্য দেশের মুক্তিতে সহায়তা করবে। কংগ্রেস বৃটিশ সরকারকে তাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ ভারতীয়দের রাজনৈতিক স্বাধীনতা মঞ্জুর করতে বলল। দাবি জানাল, যুদ্ধের পর ভারতীয়দের হাতে পূর্ণ স্বাধীনতা তুলে দিতে হবে। এই মত ঘোষণা করলে ভারতীয়দের পক্ষে আন্তরিকতার সঙ্গে জনবল ও রসদ দিয়ে ইংরেজদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করা সহজ হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এ ব্যাপারে কংগ্রেসকে বাধিত করল না। এই প্রসঙ্গে বরং স্যার উইনষ্টন চার্চিলের পরবর্তীকালের একটি উক্তি প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ সাম্রাজ্যকে লাটে তুলতে তিনি যুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী হন নি। এর প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু তবুও কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে কোনও বাধা সৃষ্টি করতে চায়নি। তৎক্ষণাৎ ব্রিটিশ সরকারবিরোধী বিপুল গণআন্দোলনেরও ডাক দেয়নি। ফলে শীঘ্রই কংগ্রেস নেতৃত্ব ও জনগণ ধৈর্য্যচ্যুত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

গান্ধীজি তখন সীমিতভাবে আঞ্চলিক স্তরে সত্যাগ্রহ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। এতে একপক্ষে ভারতীয় জনগণের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ঘটবে, অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ পরিহার করে ভারতীয়দের দাবিগুলি মেনে নেওয়ার আর একটা সুযোগ দেওয়া হবে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ নাগাদ ২৫০০০ এরও বেশি সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

১৯৪১ এ দু'টি বড়রকমের পরিবর্তন ঘটল। পশ্চিম ইউরোপ দখল করার পর নাৎসী জার্মানী ১৯৪১ এর ২২ শে জন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল। আর ১৯৪১ এর ৭ই ডিসেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরে পার্ল হার্বারে জাপান আমেরিকার নৌবহরের উপর আকস্মিক আক্রমণ করে। এই অভিযানে জাপান দ্রত ফিলিপাইনস, ইন্দোচীন (ভিয়েৎনাম), ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে বর্মার উপর দিয়ে এগিয়ে চলে। এইভাবে পরিশেষে এই যুদ্ধ ভারতে সীমান্তে এসে পৌঁছায়।

ভারতের নেতৃবৃন্দ ডিসেম্বরে মুক্তি পান। তাঁরা ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, তাঁরা একইসাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর চীনের নিরাপত্তার ব্যাপারেও উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। তাঁরা জানালেন যে, তাঁরা আর একবার ব্রিটিশ রাজের যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত যদি ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীদের কিছু কার্যকারী শাসনক্ষমতা প্রদান করেন। ব্রিটিশ সরকারের উপরও তাদের মিত্র আমেরিকা ও চীনের কাছ থেকে এ ব্যাপারে চাপ ছিল। ১৯৪২ এর মার্চে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করার জন্য ক্রিপস্ মিশনকে ভারতবর্ষে পাঠানো হ'ল। কিন্তু এ আলোচনা অচিরেই ভেঙ্গে গেল যেহেতু ব্রিটিশরা তখনই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি মানতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই পরিণতি দেখে

ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ সরকার-এর উপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা মনে করলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর শেষ আঘাত হানার সময় উপস্থিত হয়েছে।

১২.৭.৩ ভারত ছাড়ো আন্দোলন

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯৪২ এর ৪ঠা আগস্ট বোম্বাই-এ সম্মিলিত হলেন। ঐ সম্মেলনে বিখ্যাত "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ হয় এবং চূড়ান্ত গণসংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৪ঠা আগস্ট রাত্রে গান্ধীজি কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সমগ্র ভারতীয় জনগণকে আহ্বান দেন "Do or Die" অর্থাৎ 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। তিনি বলেন, 'আমরা হয় ভারতকে স্বাধীন করব অথবা ঐ প্রচেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দেব'।

ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই আঘাত হানলেন। ৭ই আগষ্ট কাকভোরে সরকার গান্ধীজীকে এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করল। তাঁদের যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত জেলে বন্দী করে রাখল। এরপর সমগ্র দেশজুড়ে গণঅভ্যুত্থান হল। হরতাল আর ধর্মঘটের ঢেউ আছড়ে পড়ল চতুর্দিকে। সরকার এই বিক্ষোভের মোকাবিলায় ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ ও গুলি চালনার আশ্রয় নিল। ক্রুদ্ধ জনতা হিংসাশ্রয়ী হ'য়ে উঠল এবং ব্রিটিশ শাসনের সব প্রতীক যথা, থানা, ডাকঘর, রেলস্টেশনগুলিকে আক্রমণ করল। তারা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিল; রেল লাইন উপড়ে ফেলল। দেশের একাধিক অঞ্চলে তারা সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করল। সরকার এবার তার পুরোশক্তি নিয়ে দমন পীড়নে নেমে পড়ল। ১০০০০-এর বেশি লোক পুলিশ ও সামরিকবাহিনীর গোলাগুলিতে মারা যায়।

নেতাজী

ইতিমধ্যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের আর একটি অঙ্গন খোলা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষ থেকে ১৯৪১ সালের মার্চে অন্তর্ধান করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে তিনি জাপানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি গিয়েছিলেন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়। এ অঞ্চলে জাপানী সেনার কাছে বন্দী হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারদের সংগঠিত করে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনী গড়ে তোলেন। সংখ্যায় তা ছিল ষাট হাজারের মত। এঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য নেতাজি সুভাষের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে এই ফৌজের প্রতিটি সদস্যের অঙ্গীকার ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে দেশের মুক্তির জন্য আত্মদান। আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী ফৌজের সাথে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছয় বিদেশী শাসনের জোয়াল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে। মণিপুর সীমান্ত অতিক্রম করে ইম্ফলের মাটিতে আজাদ্ হিন্দ ফৌজ ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল। কিন্তু জাপানী বাহিনী ১৯৪৪-৪৫ সালে পর্য্যুদস্ত হয়। ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ঐতিহাসিক ভূমিকা আজ স্বীকৃত।

১২.৭.৪ স্বাধীনতা

বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির সাথে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম এক নতুন পর্বে প্রবেশ করল। ভারতীয় জনগণের মেজাজ ছিল ক্ষিপ্ত। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচারকে কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভ এক সংঘবদ্ধ গণবিক্ষোভে পরিণত হ'ল। ফলে সরকার বাধ্য হল ঐ সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করতে। ১৯৪৫-১৯৪৬ এর মধ্যে সমস্ত দেশজুড়ে হরতাল, বিক্ষোভ, ধর্মঘটের তাণ্ডব চলল। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বম্বেতে ভারতীয় নৌসেনারা বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহীদের সমর্থনে বম্বেতে ব্যাপকভাবে গণবিক্ষোভ ঘটে। এই অভ্যুত্থান দমনে সরকারী সেনাবাহিনী ২৫০ জনের বেশি বিক্ষোভকারীকে বম্বের বিভিন্ন সড়কে গুলি ক'রে হত্যা করল।

ব্রিটেন যদিও জয়লাভ করল, তবু তারা যুদ্ধের পরে এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'ল। এই বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে বিশ্ব ক্ষমতার রাষ্ট্রশক্তিগুলির ক্ষমতার নতুন বিন্যাস ঘটল। এই সমীকরণে ব্রিটেনের আর বিশ্বশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি রইল না। তার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে ধস নেমেছিল। তাছাড়া সমগ্র ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়েছিল। ফ্রান্স আর হল্যাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জার্মানী, ইটালী, জাপান তো পরাভূত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতবর্ষ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যান্য উপনিবেশগুলিকে সমর্থন জানাল। আমেরিকাও এই সব দেশের এই আকাঙ্খার প্রতি বিরূপ ছিল না। বরং আমেরিকা ব্রিটেনের ভারতের জাতীয় আন্দোলন দমনের কোন প্রয়াসকে সমর্থন জানাতে রাজি হ'ল না।

ব্রিটেনের মধ্যেও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল জাতীয় আন্দোলনকে দমনের নতুন কোনও প্রয়াসের অনুকূপ ছিল না। ব্রিটিশ সৈন্যদলও যুদ্ধের প্রতি বীতস্পৃহ আর ক্লান্ত বোধ করছিল। ১৯৪৫ এর মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটেনের শ্রমিক দল, যারা ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, কনজারভেটিভ পার্টিকে নির্বাচনে পরাজিত করল। এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনের জনগণ নতুন করে দমন পীড়নের মাধ্যমে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শাসনকে বহাল করতে রাজি হ'ল না। ভারতের ভিতরেও ঔপনিবেশিক শাসনের ও দমনপীড়নের যন্ত্রও ভেঙে পড়েছিল। আমলাতন্ত্র আর ভরসাযোগ্য ছিল না। পুলিশবাহিনী অশান্ত হয়ে উঠেছিল। সেনাবাহিনীও আর আগের মত অনুগত ছিল না। নৌ-বিদ্রোহ ছাড়াও দেশময় প্রচুর হরতাল ও বিক্ষোভ হয়েছিল সেনাদলে ও বিমানবাহিনীতে।

সবথেকে বড় কথা ভারতের জনগণের ভিতর তখন একটা কঠিন সংকল্প গড়ে উঠেছিল যে, তারা আর বিদেশীদের শাসনাধীন থাকতে অস্বীকার করল।

ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার ঠিক করলেন, তাঁরা কালের আহ্বান শুনবেন। তাঁরা স্থির করলেন যে, ২০০ বছর উপনিবেশ শাসন করার পর ভারত থেকে তাঁরা এবার চলে আসবেন। ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রথম দিনটিতে জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল; অবশ্য এই আনন্দ কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল এক রূঢ় আঘাতে। এই স্বাধীনতার সঙ্গে উপমহাদেশে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল ঃ ভারত ও পাকিস্তান।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৪

১. কংগ্রেস মন্ত্রীসভার দ্বারা প্রবর্তিত সংস্কারকার্যগুলি পাঁচ লাইনে আলোচনা করুন।

২. নীচের উক্তিগুলি কোন্‌টি সঠিক বা ভুল নির্দেশ করুন।

ক) ফ্যাসীবাদি আগ্রাসনকে কংগ্রেস ধিক্কার জানিয়েছিল।
খ) 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক ছিল 'কর এবং পালাও'।
গ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজকে সমর্থন যুগিয়েছিল।
ঘ) কন্‌জারভেটিভ পার্টি ইংলণ্ডে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল।

১২.৮ সারাংশ

এই পর্বে আমরা দেখেছি কীভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলন স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে গিয়েছিল। নরমপন্থী পথ থেকে ব্যাপক গণ আন্দোলনে উত্তরণ এই আন্দোলনের উজ্জ্বল সাফল্য। ক্রমপর্যায়ের এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল গান্ধীজীর নিরন্তর প্রচেষ্টায়। এই সময়ে কংগ্রেসের উদ্যোগে তিনটি বড় গণ আন্দোলন ঘটেছিল। কংগ্রেসের এই আন্দোলনের পাশাপাশি আমরা দেখলাম কম্যুনিস্ট ও সোসালিস্ট গোষ্ঠীর অভ্যুদয়। এদের অবদান শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যেই এই অবদান স্মরণীয়।

এই সময়ের মধ্যে কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এক সংগঠিত রূপ নেয়। বিশেষত, অখিল ভারত কিষাণ সভা ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তৈরি হওয়ার পর। দেশীয় রাজ্যগুলিতেও জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করল। তারা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে তাদের সংগ্রামকে যুক্ত করে। অবশেষে ভারতের জনগণের সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট বৃটিশরাজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করে। পরিশেষে আমরা ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীন জাতি হ'তে সক্ষম হয়েছি।

১২.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

সাবালকের ভোটাধিকার ঃ বর্ণ, লিঙ্গ, আয়, ধর্ম নির্বিশেষে প্রতি সাবালকের ভোটাধিকার।

রক্ষণশীল দল ঃ ব্রিটেনের একটি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল। জমিদার আর ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

অর্থনৈতিক শোষণ ঃ একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যাতে একটি শ্রেণী অন্য শ্রেণীর উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ভোগ করে। (যথা ঃ জমিদার কৃষকের উদ্বৃত্ত ভোগ করে)।

ফ্যাসিষ্ট ঃ এক কট্টর দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ যার উদ্ভব হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে ইতালী ও জার্মানীতে কম্যুনিস্ট, সমাজবাদী, গণতন্ত্রী এবং শ্রমিক আন্দোলনের মোকাবিলায়।

সামন্ততান্ত্রিক লেভী ঃ অতিরিক্ত আদায়ে বাধ্য করা যেমন—বেগার বা জবরদস্তি করে শ্রম আদায়।

ঋণগ্রস্ততা ঃ গ্রামের বা শহরের দরিদ্র শ্রেণীর ওপর সুদখোর মহাজনদের নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া।

শ্রমিক দল ঃ ব্রিটেনের একটি রাজনৈতিক দল যারা রক্ষণশীল আর কম্যুনিস্টদের থেকে পৃথক, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ উন্নয়নের জন্য সওয়াল করে।

জমিদারী প্রথা ঃ মধ্যযুগের ভূস্বামীদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে পাকাপাকি জমিদারেপরিণত হবার প্রক্রিয়া।

অহিংসা ঃ শত্রুকে আঘাত না করে সংগ্রাম পরিচালনা ও গান্ধী প্রবর্তিত দর্শনের ভিত্তি।

অবস্থান ধর্মঘট ঃ নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্মকে প্রতিরোধ করার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রক্রিয়া, যার দ্বারা প্রতিবাদও জ্ঞাপন করা হয়।

মৌলবাদীকরণ ঃ যে কোন ধর্মের, ধ্যানধারণার সনাতন বিশ্বাসের আক্ষরিক ব্যাখ্যার সমর্থনের ধারা।

লবণ আইন ঃ ভারতীয়দের উপর লবণ উৎপাদন করার জন্য কর ধার্য্য করে প্রবর্তিত আইন।

সত্যাগ্রহ ঃ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এর ভিত্তিভূমি সত্যের যথার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমাজতন্ত্র ঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহায় ও সম্পদের সমভাবে পুনর্বণ্টনের দর্শন।

১২.১০ অগ্রগতি যাচাই করার উত্তরমালা

অগ্রগতি যাচাই করুন ১

১. ক) ✓ খ) × গ) ✓ ঘ) ×
২. অনুচ্ছেদ ১২.২.২ দেখুন।

অগ্রগতি যাচাই করুন ২

১. ক) ✓ খ) গ) ✓ ঘ)
২. অনুচ্ছেদ ১২.৫.৩ দেখুন।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৩

১. ১) ঘ. ২) ক ৩) খ ৪) গ
২. অনুচ্ছেদ ১২.৬.২ দেখুন।
৩. অনুচ্ছেদ ১২.৬.৩ দেখুন।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৪

১. অনুচ্ছেদ ১২.৭.১ দেখুন।
২. ক) ✓ খ) × গ) × ঘ) ✓

একক ১৩ ❒ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল্যবোধ

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ প্রস্তাবনা

১৩.২ ভারতের ঐক্য

১৩.৩ ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ

১৩.৩.১ ধর্মনিরপেক্ষতা কী

১৩.৩.২ ধর্মনিরপেক্ষতার অভ্যাস

১৩.৩.৩ গান্ধী এবং নেহরু

১৩.৪ সমাজতন্ত্র এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতি

১৩.৫ গণতন্ত্র এবং নাগরিক স্বাধীনতা

১৩.৫.১ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি

১৩.৫.২ গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম

১৩.৬ মানবতাবাদ

১৩.৬.১ মানবতাবাদের উৎস

১৩.৬.২ মানবতাবাদের জন্য সংগ্রাম

১৩.৬.৩ ব্রিটিশ শক্তির ভূমিকা

১৩.৭ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তি

১৩.৭.১ কিছু পুরোন দৃষ্টান্ত

১৩.৭.২ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

১৩.৮ সারাংশ

১৩.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

১৩.১০ অগ্রগতি যাচাই করার উত্তরমালা

১৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর ঃ

- জাতীয় আন্দোলন থেকে উদ্ভুত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ সম্পর্কে আপনার একটি ধারণা হবে।
- আপনি বিচার করতে সমর্থ হবেন কীভাবে এই সব মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।
- এই সব মূল্যবোধ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শক্তি এবং জীতায়তাবাদীরা যে পরস্পর বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল তা আপনি চিহ্নিত করতে সমর্থ হবেন।

১৩.১ প্রস্তাবনা

জাতীয় আন্দোলনের শক্তি নিহিত ছিল এক বাস্তব বিকল্প গড়ে তোলার মধ্যে। এই বিকল্পের সঙ্গে যুক্ত মূল্যবোধগুলি জন্ম নিয়েছিল বিভিন্ন সামাজিক ধারার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গঠিত সমঝোতার মধ্য থেকে। শেষ পর্যন্ত এদের থেকেই গড়ে ওঠে উপনিবেশিবাদ বিরোধী এক প্রশস্ত মঞ্চ। এ ছিল এক ক্রমিক ধারা বিভিন্নভাবে, যার চূড়ান্ত রূপ স্বাধীন ভারতের সংবিধান।

১৩.২ ভারতের ঐক্য

ভারতের ঐক্য কী? ব্রিটিশরা সব সময়েই দাবি করত যে তারা মুঘল ভাঙ্গনের পর বিশৃঙ্খলার দূর করে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করে। ভারতের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিভিন্নতাকে তারা এক বিভক্ত সমাজের চিহ্ন হিসেবে তুলে ধরে। তাদের দাবি যে এগুলিকে ঐক্যবন্ধ করা তাদেরই কৃতিত্ব। যাই হোক, ব্রিটিশ নীতির ফসল হোল 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন' যা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সত্ত্বাকে একে অন্যের বিরুধে যুযুধান করে তোলে। এই পরিকল্পনার কয়েকটি নিদর্শন হল হিন্দু-মুসলিম ভিত্তিতে ব্যবচ্ছেদ (১৯০৫), বিখ্যাত 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' নীতি এবং ১৯০৯ এ আলাদা ভোটগোষ্ঠী (Separate Electorative)।

ভারতের জাতীয়তাবাদীদের উত্তর ছিল এই যে, ভারতের বৈচিত্রের উপাদানগুলি ঐক্যের উপাদানের সঙ্গে যুক্ত যেগুলি ব্রিটিশরা ধ্বংস করছে। তাই, বাংলার ব্যবচ্ছেদের পর এই বিভাজনকে বাতিল করার জন্য এক বিশাল গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। একইভাবে গান্ধী সম্প্রদায়ভিত্তিক ভোট গোষ্ঠীর বিরুধে অনশন করেন। জাতীয়তাবাদীরা দেশীয় রাজ্যগুলিতেও জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম গড়ে তোলে।

বক্তব্য প্রচারের পদ্ধতি ঃ

জাতীয়তাবাদীদের কাজ ছিল ব্রিটিশ নীতির বিরোধীতা। কিন্তু তা কীভাবে করা হবে? এই চিন্তার বিস্তার এবং ঐক্য চেতনার প্রচারের পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ

- জাতীয়তাবাদী নেতাদের বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে,
- ভারতের সমস্ত অংশে পালাক্রমে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, অর্থাৎ পশ্চিমে করাচী থেকে পূর্বে গৌহাটি এবং উত্তরে লক্ষ্মৌ থেকে দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত।
- জাতীয় পতাকার মাধ্যমে, যা ছিল জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয়ের চেতনার অংশ।
- ভারতের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় মূলস্রোতে তাদের অংশগ্রহণে।

সরকারের বিরোধিতা এবং 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন' পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছড়াও সংগ্রাম করতে হয়েছিল বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের খণ্ডিত আনুগত্যের বিরুধেও। এই সব গণ-আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই স্বাধীনতার আন্দোলনে ঐক্য এক বিশেষ রূপ পায়। যে পদ্ধতিতে তা লাভ করা হয় তা ছিল এই সংগ্রামে সাফল্য ও ব্যর্থতার ফসল (উদাহরণ হিসেবে দেশবিভাগকে ধরা যায়)।

অগ্রগতি যাচাই করুন ১

১. উপরের অংশটি পড়ে যে কেউ সহজেই বলতে পারেন (উপযুক্ত বক্তব্যটিকে ✓ চিহ্ন দিন)
   ক) যে, ভারতীয় সমাজে কোন বিভাগ ছিল না।
   খ) যে, ভারতীয় সমাজ এত বিভক্ত ছিল যেখানে কোন ঐক্যের আশা ছিল না।
   গ) যে, ব্রিটিশদের মতে ব্রিটিশরাই ভারতকে ঐক্যবন্ধ করেছিল এবং জাতীয়তাবাদীদের মতে ব্রিটিশরা ভারতের বিভিন্নতাকে যুক্ত করার উপাদানগুলিকে ধ্বংস করছিল।
   ঘ) যে, ব্রিটিশরাই ভারতকে ঐক্যবন্ধ রেখেছিল।

২. এই বক্তব্যগুলির কোনটি ঠিক ঃ
   ক) জাতীয়তাবাদীরা ভারতকে ঐক্যবন্ধ করার কোন কাজে লিপ্ত ছিল না।
   খ) জাতীয়তাবাদীরা ভারতকে ঐক্যবন্ধ রাখার জন্য কেবলমাত্র বাংলার ব্যবচ্ছেদের বিরোধীতা বা পৃথক ভোটগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অনশনের মত কাজেই বিশ্বাস করত।
   গ) জাতীয়তাবাদীরা ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে যেমন গণ-আন্দোলন করে তেমনি বক্তৃতা, ভাষাভিত্তিক অঞ্চলগুলিকে জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোতে প্রবেশ, জাতীয় পতাকা জনপ্রিয় করে তোলা প্রভৃতির মাধ্যমে ঐক্যের চিন্তা ও প্রচার করে।
   ঘ) জাতীয়তাবাদীরা কেবল ঐক্যের সম্পর্কে বলেছিলেন।

৩. জাতীয়তাবাদীরা ঐক্যের ধারণা কীভাবে প্রচার করেন সে সম্পর্কে অন্তত পাঁচটি লাইন লিখুন।

১৩.৩ ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ

ভারতবর্ষ কয়েকটি প্রধান ধর্মের দেশ। ইতিহাসের ধারায় এই দেশ বহু ধর্মের দেশ হিসেবে পরিচিত। ভারতের জনগণ গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী যা তাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। এরকম পরিস্থিতিতে তার একমাত্র ধর্মীয় সহনশীলতার নীতিই সামাজিক অশান্তি ও সংঘর্ষকে পরিহার করতে পারে। এই ক্ষেত্রে ব্রিটিশ অনুসৃত নীতি ধর্মীয় সংঘর্ষ বাড়িয়ে তোলে ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতির জন্ম দেয়। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সঠিকভাবেই বিভিন্ন ধর্মের এই সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে এই চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর দেয়।

১৩.৩.১ ধর্মনিরপেক্ষতা কী?

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা চারটি অর্থে প্রযুক্ত ঃ

ক) প্রথমত, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব জনগণের মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে।
খ) দ্বিতীয়ত, কুসংস্কার দূরীকরণ এবং বিশ্বাসীদের অন্ধবিশ্বাস দূর করার জন্য বহু সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।
গ) তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সমস্ত ধর্মের সমান অধিকারের উপর গুরুত্ব দেয়।
ঘ) চতুর্থত, ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার উপর জোর দেওয়া হয়।

১৩.৩.২ ধর্মনিরপেক্ষতার অভ্যাস

হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের সংস্কারের ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এক্ষেত্রে ত্রিমুখী নীতি গ্রহণ করা হয়—

১) এই সংস্কারকরা অন্য কোন ধর্মকে আক্রমণ করেননি।

২) এঁরা বিভিন্ন ধর্মের যুক্তিবাদী ও সংস্কারভিত্তিক উপাদানগুলির উপর গুরুত্ব দেন।

৩) তাঁরা বলেন ধর্মীয় পরিচিতি বৃহত্তর ভারতীয় পরিচিতির অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মীয় সংস্কার ও সহনশীলতার এই ধারাকে আরও শক্তিশালী করেন মহাত্মা গান্ধী এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তাঁরা ধর্মে বিশ্বাসী, কিন্তু সব সময়েই ধর্মীয় সংস্কার এবং পারস্পরিক ধর্মীয় সহনশীলতার কথা প্রচার করেন। উদাহরণস্বরূপ, গান্ধী শুরু করেন 'গঠনমূলক কাজের' পরিকল্পনা যার লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। এই ঐক্যবোধ সার্বিক ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' এবং ভারতে হিন্দু-মুসলমানের ভিন্ন ভোটগোষ্ঠী সৃষ্টির ব্রিটিশ অপচেষ্টার মুখে এ কাজ করতে হয়েছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদীদের এক্ষেত্রে উত্তর ছিল সংখ্যালঘুদের রক্ষা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি। তাঁরা কংগ্রেসকে এক ধর্মনিরপেক্ষ মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্বদেশী বয়কট ও স্বরাজের আন্দোলনে ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়কে একত্র করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঔপনিবেশিক রাজনীতির বিরুদ্ধে এই ছিল কংগ্রেসীদের রণনীতি।

ধর্মনিরপেক্ষতায় জাতীয়তাবাদীদের আরো অবদান ঃ

- জাতীয় পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার চিন্তা।
- ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের সংগ্রামে যুক্ত করা।

১৩.৩.৩ গান্ধী এবং নেহরু

ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সংগ্রামে গান্ধী ও নেহরু ঃ গান্ধী ও নেহরুর ধর্মনিরপিক্ষতার ধারণাকে ঘিরে ধর্মনিরপেক্ষতার সংগ্রাম আবর্তিত হয়েছিল। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার দুটি ধারাকে বুঝতে হ'লে এই দুই দেশনেতার ভিন্ন ভিন্ন ধারণা লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

গান্ধীর রাজনীতির সঙ্গে ধর্মবোধ সম্পৃক্ত ছিল। রাজনীতির উৎস ছিল সমস্ত ধর্মের সমান অধিকার এবং সহনশীলতায় তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। গান্ধীর রাজনীতির উৎস ছিল ধর্ম। কিন্তু ধর্মীয় বিভেদ এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ও জাতীয় ঐক্য ও সহিষ্ণুতাকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি এটা স্পষ্ট করেছিলেন যে, ধর্মের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা থাকা অনুচিত, কারণ এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাঁর মতে জনগণের মঙ্গল, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রানীতি প্রভৃতি ধর্মবহির্ভুত বিষয়ের উপর রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকবে।

পক্ষান্তরে, নেহরু ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সংগ্রামকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে অন্ধবিশ্বাস অশিক্ষার জন্ম দেয়। তাঁর কাছে বিজ্ঞানের মূল কথা হল প্রচলিত বিশ্বাসকে

সন্দেহ করা ও নতুনকে জানবার চেষ্টা করা। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সংগ্রামে নেহরুর কাছে ধর্মের কোন স্থান নেই।

ধর্মনিরপেক্ষতার এই দুই ধারাকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের মত সংকীর্ণ ও আগ্রাসী সংগঠনগুলির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হন। একই যুক্তিতে এই নেতৃত্ব ব্রিটিশের ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এই দুই সংগ্রামের শক্তি ও দূর্বলতার মধ্যে নিহিত ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের শক্তি।

অগ্রগতি যাচাই করুন ২

১. উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে ধর্মনিরপেক্ষতা হল ঃ
   ক) এক ধর্ম দ্বারা অন্য ধর্মের নিপীড়ন।
   খ) অন্য ধর্মগুলির উপর এক ধর্মের প্রাধান্য।
   গ) এমন এক নীতি এবং অভ্যাস যেখানে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সাম্য, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি ও ধর্ম থেকে রাজনীতির পৃথকীকরণ।
   ঘ) ধর্ম ও রাজনীতির এক জোরালো মিশ্রণ।

২. এ কথা বলা যায় যে ঃ
   ক) নেহরু বিশ্বাস করতেন যে, রাজনীতির ভিত্তি হবে ধর্ম।
   খ) গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, রাজনীতি ধর্ম থেকে উদ্ভূত।
   গ) নেহরু বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতির ভিত্তি হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক।
   ঘ) গান্ধী এবং নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে একই ধারণা ছিল।
   ঙ) খ) এবং গ) দুটিই ঠিক।

৩. হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের মত সংগঠনগুলিকে জাতীয়তাবাদীরা বিরোধীতা করতেন, কারণ ঃ
   ক) তারা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয়তাবাদী সংগঠন।
   খ) তারা ঐ সংগঠনগুলিকে পছন্দ করত না।
   গ) দৃষ্টিভঙ্গীতে তারা ছিল সংকীর্ণ এবং ধর্মের রাজনীতি করত।
   ঘ) তাদের দাবি ছিল পৃথক হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্র।
   ঙ) গ) এবং ঘ) দু'টিই ঠিক।

৪. ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে জাতীয়তাবাদীদের কিছু অবদান উল্লেখ করুন।

১৩.৪ সমাজতন্ত্র এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতি

ব্রিটিশ শাসনের এক প্রত্যক্ষ ফল ভারতের দারিদ্র এবং অর্থনৈতিক অবনতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে জনগণকে দেশপ্রেমের আন্দোলনে সমবেত করার জন্য নেতৃত্বকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দু'টি কাজ করতে হয়েছিল ঃ

- ঔপনিবেশিক শক্তির ক্ষতিকারক নীতিগুলির বিরুদ্ধে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা।
- জনগণকে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মত কঠিন সমস্যা সমাধানের বিকল্প পথ সম্পর্কে অবহিত করা।

জাতীয়তাবাদী এবং কমিউনিস্ট নেতৃত্ব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নতির এক সুনির্দিষ্ট সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের উৎসাহ দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নতি ও সামাজিক পুর্নগঠন।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দুটি দিককে স্পষ্টভাবে জোর দিয়ে প্রচার করা হয় ঃ

- প্রথমত, ভারতের কৃষি ব্যবহারে রূপান্তর ঘটবে এবং অনুপস্থিত জমিদারপ্রথার অবসান ঘটবে।
- দ্বিতীয়ত, পরিকল্পিত উন্নতি কেবলমাত্র উৎপাদনের উপর জোর দেবে না। উৎপাদনকে বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

নেহরু আবার এইসব বিষয়কে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন বার্ষিক অধিবেশনে সমাজতন্ত্রের অর্থ ও পরিপ্রেক্ষিতকে বাস্তব রূপ দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, স্বরাজ সমাজতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাজতন্ত্রের অভ্যাস ঃ ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে জনগণের জন্য সমাজতন্ত্র বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এই সমস্ত ঘটনাগুলিতে এর বাস্তব রূপ দেখা যায় ঃ

- সমাজতন্ত্রের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রামে কৃষক এবং শিল্প-শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য কিষানসভা ও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়। সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ১৯২০-র ৩১শে অক্টোবর বম্বেতে প্রথম বসে; সর্বভারতীয় কিষান সভা প্রথম বসে ১৯২৮-এ। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতারা কিষান সভা ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এইভাবে স্বদেশীর অর্থ হয়, স্বশাসন ও সমাজতন্ত্র।
- কংগ্রেসের ঘোষণা ও বাৎসরিক অধিবেশনগুলিতে দরিদ্র মানুষের জন্য চিন্তা ভাবনা ঃ গান্ধী বলেন অর্ধভুক্ত কোটি কোটি মানুষের কথা, নিজের সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গে তাদের যুক্ত করার চেষ্টা করেন। নেহরু ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেসে কেবলমাত্র ভারতের জাতীয়তাবাদী আবেগ নয়, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সর্বহারার আবেগও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।
- ১৯৩৮-এ কংগ্রেস শিল্পায়ন এবং গ্রামীণ সমাজের উন্নতির জন্য এক জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি নিয়োগ করে; খাদি এবং গ্রামের শিল্পের উন্নতিকে শিল্পায়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
- ১৯৩১-এ কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত এক প্রধান প্রস্তাব পাশ করা হয়। এই প্রস্তাব ঘোষণা করে, 'জনগণের শোষণ সমাপ্তির জন্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত কোটি কোটি মানুষের প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা'। এই প্রস্তাব জনগণের মূল নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, যথা ঃ

ক) জাতি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান।

খ) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন।

গ) বিনা খরচে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

আরো প্রতিশ্রুতি দেয় যে ঃ

ক) খাজনা ও রাজস্বে পর্যাপ্ত ছাড়।

খ) অলাভজনক জমিগুলির ক্ষেত্রে খাজনা ছাড়।

গ) কৃষিঋণের হ্রাস ও মহাজনীপ্রথা নিয়ন্ত্রণ।

ঘ) শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মধ্যে থাকবে জীবনধারণের উপযোগী মজুরী, কাজের নির্দিষ্ট সময় এবং নারীশ্রমিকদের নিরাপত্তা।

ঙ) শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠন ও ইউনিয়ন তৈরির অধিকার।

চ) প্রধান শিল্প, খনি এবং পরিবহণ মাধ্যমগুলির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ।

১৯৩৬-এ করাচী অধিবেশনের পর ভৈজপুর কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দেয় ঃ

ক) কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।

খ) সামন্ততান্ত্রিক আদায়ের অবসান।

গ) কৃষি ও শ্রমিক ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ধর্মঘটের অধিকার।

এইসব ঘটনা ভারতীয় জনগণের জন্য সমাজতন্ত্র ও পরিকল্পনার মূল্যবোধের অর্থ প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজতন্ত্রের প্রতি ব্রিটিশ বিরোধীতা ও কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা, যথা কানপুর ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রচারের ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলন যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল, তা তুলে ধরে।

অগ্রগতি যাচাই করুন

১. চল্লিশের দশকে জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টি সমাজতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছিল ঃ

ক) এক পরোক্ষ, অর্থহীন লক্ষ্য।

খ) পরিকল্পিত উন্নতিযুক্ত ব্রিটিশ শাসন।

গ) পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে যুক্ত স্বরাজ।

ঘ) অপরিকল্পিত উন্নতি।

২. ১৯৩৬-এ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রকে এইভাবে জনপ্রিয় করে তোলে ঃ

ক) স্বরাজ সহযোগে কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, সামন্ততান্ত্রিক আদায়ের অবসান, কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের ধর্মঘটের অধিকার, প্রধান শিল্প, খনি এবং পরিবহণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

খ) স্বরাজ এবং কেবলমাত্র কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার।

গ) শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের ধর্মঘটের অধিকার ব্যতীত স্বরাজ।

ঘ) কেবলমাত্র কৃষি।

৩. পাঁচটি সমাজতন্ত্র ও স্বরাজ সম্পর্কে লিখুন।

১৩.৫ গণতন্ত্র এবং নাগরিক স্বাধীনতা

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল গণতন্ত্র এবং নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম। ব্রিটিশ শাসন ছিল স্বৈরাচারী এবং এই স্বৈরাচার থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামের অর্থ ছিল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য সংগ্রাম। এজন্য গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চেতনা ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

১৩.৫.১ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি ঃ

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল মূলত অত্যাচারী এবং স্বৈরাচারী। এই রাষ্ট্র যে আইনী ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তা ছিল বৈষম্যমূলক এবং দেশের শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধক। পুলিশ

ও সৈন্যবাহিনীর সহযোগে আইন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কেবল ঔপনিবেশিক স্বার্থকেই রক্ষা করত। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ব্রিটিশ পন্ডিতের এই অভিমত স্বীকার করা যায় না যে, গণতন্ত্র ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশের দান। ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ এর আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের স্বশাসনের শিক্ষা দেয়নি, বরং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভারতীয়রা গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের জন্য সংগ্রাম করেছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সীমিত সুযোগ সুবিধে দিয়ে এই প্রচেষ্টা বানচাল করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৩.৫.২ গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম

প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশদের বাধ্য করে এইসব মেনে নিতে ঃ

- ভোটদানের অধিকার।
- নির্বাচন ও ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা।

একই সঙ্গে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ অভ্যাসের উদ্দেশ্যে নিজস্ব সংগঠনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। প্রকাশ্য বিতর্কের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সংগ্রাম প্রকাশ্যে পরিচালিত হয়। কংগ্রেসে ভিন্নমত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত ছিল। অহিংস প্রত্যক্ষ আন্দোলনের মত গণ আন্দোলনে যখন এই সব পদ্ধতি গৃহীত হয়, তখন এই সব পদ্ধতির ভিত্তি পরীক্ষিত হয়। কিছু কিছু সময়ে অবশ্য কিছু একতরফা প্রত্যাহার, যেমন ১৯২১ এ অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যাহার, এইসব পদ্ধতির দুর্বলতাই সূচিত করে। তা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, গণতান্ত্রিক অধিকারের সূত্রপাত বা সূচনা এই সময়েই ঘটেছিল।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৪

১. ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে আইন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ক) জনগণের স্বার্থ রক্ষা করত।

খ) গণতান্ত্রিক ছিল।

গ) কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপাদান ছিল না।

ঘ) কিছু সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ছিল যা সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের অত্যাচারী শক্তির সাহায্যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করে।

২. জাতীয়তাবাদীরা

ক) ঔপনিবেশিক আইনী রাজনৈতিক ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন।

খ) গণতান্তিরক অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

গ) সীমাবদ্ধ সুযোগের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

৩. জাতীয়তাবাদীরা কী কী গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা আদায় করেছিলেন?

১৩.৬ মানবতাবাদ

জাতীয় আন্দোলন ভারতীয় জনগণের মধ্যে এক নতুন মানবতাবাদের জন্ম দেয়। যে কোন সংগ্রামেরই এক মানবতাবাদী দিক আছে যা বিভিন্ন রকমের মানুষকে এক যৌথ ভ্রাতৃত্ববোধে একত্রিক করে।

১৩.৬.১ মানবতাবাদের উৎস

জতীয় আন্দোলনের মানবতাবাদ দু'টি উপাদানের উপর নির্ভরশীল, (ক) বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তি, যা শেখায় যে পশ্চাৎপদ বিষয়সমূহ যেমন বর্ণ, আচারসর্বস্ব ধর্ম, দাসপ্রথা, সতী প্রভৃতি মানুষের উন্নতির প্রতিবন্ধক। (খ) ভারতের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের চেতনা, যার অর্থ ভারতের বহু সংস্কৃতির ধারাকে জাতীয় মূলস্রোতে নিয়ে আসা।

১৩.৬.২ মানবতাবাদের জন্য সংগ্রাম

বর্ণ ব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা, সামন্ততান্ত্রিক বিভিন্ন বন্ধন, সতী প্রভৃতির উপর বিভিন্ন সমাজসংস্কারকের সরাসরি আক্রমণ দিয়ে শুরু হয় মানবতাবাদের সংগ্রাম। রামমোহন রায় এর জন্য বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করেছিলেন আবার বিবেকানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দর মত ব্যক্তিরা এই সব অভ্যাসকে আক্রমণ করবার জন্য ভারতীয় সাংস্কৃতিক চিরন্তন ধারার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন, ভারতীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে এইসব অভ্যাস সঙ্গতিহীন। তাঁরা দেখান যে, এইসব অভ্যাস আমাদের সংস্কৃতিকে মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণের যন্ত্র করে তুলেছে। বিবেকানন্দ বিশেষ করে তাঁর অল্প পরিচিত পুস্তিকা 'কেন আমি সমাজতন্ত্রী' তে এর উপর জোর দেন।

এইসময়ে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বহু আন্দোলনও দেখা যায়। যেমন, মহারাষ্ট্রে মহাত্মা ফুলে ব্রাহ্মণ্য মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের মানুষদের সংঘবদ্ধ করেন।

এর থেকে উদ্ভূত জাতীয় আন্দোলনে তিনটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করতে পারি ঃ

ক) একটি ধারাকে নেহরুর সঙ্গে চিহ্নিত করা যায়। বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ থেকে উৎসাহ নিয়ে নেহরু এক সামাজিক-অর্থনৈতিক মানবতাবাদ প্রচার করেন। তাঁর কল্পিত সমাজের ভিত্তি ছিল মার্কসবাদ। তাঁর মানবতাবাদী চেতনা রাশিয়ার মত দেশের সমাজতন্ত্রী মানবতাবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এই মানবতাবাদী ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল 'প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ অনুযায়ী', যা ছিল পাশ্চাত্যের অর্থভিত্তিক স্তর অথবা অনুন্নত দেশের বর্ণ, ধর্মভিত্তিক স্তর থেকে পৃথক।

খ) গান্ধী গুরুত্ব দিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর। জাতিভেদ ও ধর্মীয় বিভেদকে বাতিল করে তিনি তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধ দিয়ে এক মানবভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই বোধ খিলাফতের সময়ে অথবা বিশ বা চল্লিশের দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে তিনি অস্পৃশ্যদের হরিজন নামে এক নতুন পরিচয়ে অভিহিত করেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন।

গ) তৃতীয় প্রধান ধারার প্রতিনিধি ডঃ আম্বেদকর। তিনি আরো উগ্র উচ্চবর্ণ বিরোধী আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং তাদের এক নতুন পরিচয় দান করেন। মাদ্রাজে জাস্টিস আন্দোলন অথবা কেরালায় এজহবদের ক্ষেত্রে শ্রীনারায়ণ গুরু একই ভুমিকা নিয়েছিলেন।

১৩.৬.৩ ব্রিটিশ শক্তির ভূমিকা

জাতীয় আন্দোলনের এই সব মানবতাবাদী ধারার প্রতি ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। প্রথম পর্যায়ে রামমোহন রায়ের সতীবিরোধী আন্দোলনের মত মানবতাবাদী ব্যবস্থাকে তারা সমর্থন করে। কিন্তু এই মানবতাবাদ জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলে নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু হয়। জাতীয় আন্দোলনের এই অধ্যায়ে ব্রিটিশ শাসনের অমানবিক ব্যবস্থার হিংস্ররূপ দেখা যায়। তাদের অমানবিকতার প্রধান উদাহরণ হিসেবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের হত্যাকে চিহ্নিত করা যায়। তবে এই সব শহীদের উৎসর্গদানের মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের ধারা বেগবান হয় কারণ মানুষ উপলব্ধি করে যে, জাতীয় আন্দোলনের মানবতাবাদী বিকল্প ব্রিটিশ শাসন অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৫

১. জাতীয় আন্দোলন মানবতাবাদের দুটি ধারার দ্বারা পুষ্ট। এরা ছিল ঃ
সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন।
ক) নীচুতলার মানুষের প্রতি দয়া ও ভালবাসা।
খ) ব্রিটিশ শাসনের সম্পর্কে হতাশা ও বিরক্তি।
গ) ব্রিটিশ শাসনের কার্যকলাপ থেকে সুখ ও আনন্দ লাভ।
ঘ) এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং এক সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের চেতনা যা শেখায় যে পশ্চাদপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূল্যবোধ দূর করা যায় এবং এক জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রধান ধারা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

২. বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে ঃ
সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন।
ক) বর্ণাশ্রয়ী ও আচারশ্রয়ী ধর্মীয় অভ্যাসই সর্বোত্তম ভারতীয় মূল্যবোধ।
খ) মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের জন্য বর্ণ ও আচার আচরণ মানুষেরই সৃষ্টি।
গ) আচারসর্বস্ব ধর্ম ঈশ্বরের দান এবং একে অনুসরণ করা উচিত।

৩. ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের তিনটি মানবতাবাদী ধারার উল্লেখ করুন। তারা কীভাবে একে অন্যের থেকে পৃথক ছিল?

১৩.৭ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও শান্তি

জাতীয় আন্দোলন তার সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতাবাদের পথে উন্নীত হয়। এক্ষেত্রে এই আন্দোলন তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিকটি বজায় রাখে আবার একই সঙ্গে মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যাবোধকেও যুক্ত করে।

১৩.৭.১ কিছু পুরোন দৃষ্টান্ত

- ১৮৮৫ থেকেই জাতীয়তাবাদীরা আফ্রিকা ও এশিয়ায় ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা করার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং ভারতীয় উপকরণ ব্যবহারের বিরোধীতা করে।
- ১৯২৭ এর ফেব্রুয়ারীতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আক্রান্ত দেশের নির্বাসিত রাজনীতিক ও বিপ্লবীরা নির্যাতিত জাতিদের এক সম্মেলন ব্রাসেলসে আয়োজন করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে নেহরু এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সংঘ তৈরি হয়, নেহরু তার কার্যকরী সমিতির সদস্য হন।

- ১৯৩৭ এ জাপান যখন চীন আক্রমম করে, জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের উদ্দেশে এক প্রস্তাব পাশ করে, যেখানে জনগণকে চীনের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য জাপানী জিনিষ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়।

১৩.৭.২ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

১৯৩০ এর দশকে পশ্চিম ইওরোপে এক গুরুত্বপূর্ণ একনায়কতন্ত্রী ধারার উদ্ভব হয়। অর্থনৈতিক মন্দার সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের চাপ মুক্ত হয়ে জার্মানীতে নাৎসীবাদ এবং ইটালীতে ফ্যাসিবাদের মত গণতন্ত্রবিরোধী মতবাদ গড়ে ওঠে। ১৯৩০-এর দশকে এদের সংমিশ্রণ সমস্ত উন্নত দেশ এবং তাদের উপনিবেশগুলির মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। ব্রিটেনও ভীত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় আন্দোলনেরও একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখার প্রয়োজন ছিল।

মানবতাবাদী ও গণতন্ত্রী মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেহরুর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। বিশাল শক্তি সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্রিটিশ শাসন বিরোধী সংগ্রামে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করে। সঠিকভাবেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এক আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রসারকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান না করলেও জাতীয় কংগ্রেস জার্মানী বা ইটালীকে কোন বাস্তব বা নৈতিক সমর্থন দিতে অস্বীকার করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বৈদেশিক নীতির দিকগুলির সঙ্গে এর গণতন্ত্রী ও মানবিক মূল্যবোধের যথেষ্ট সঙ্গতি ছিল। এই সঙ্গতিই স্বাধীনোত্তরকালে এক নির্জোট নীতির আর্বিভাবে সাহায্য করেছে।

অগ্রগতি যাচাই করন ৬

১. জাতীয় আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতাবাদ ঃ
(সঠিক উত্তরটিকে (✓) চিহ্ন দিন)
ক) জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত।
খ) জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন।
গ) কোন গুরুত্বই ছিল না।

২. জাতীয় আন্দোলন ঃ

(সঠিক উত্তরটিকে (✓) চিহ্ন দিন)

ক) ব্রিটিশদের উপর প্রাধান্য লাভের জন্য ফ্যাসিস্টদের সমর্থন করে।

খ) ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সমর্থন করে।

গ) ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাও সমর্থন করেনি অথবা ব্রিটিশদের উপর প্রাধান্য লাভের জন্য ফ্যাসিস্টদেরও সমর্থন করেনি।

১৩.৮ সারাংশ

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল্যবোধের এই আলোচনা থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি বেরিয়ে আসে ঃ

- এক সংগ্রামী ধারার মধ্য দিয়ে ঐক্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রী বিকাশ, গণতন্ত্র, মানবতাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রভৃতি মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এগুলি ব্রিটিশের দান ছিল না।
- বস্তুত, ব্রিটিশরা এইসব মূল্যবোধের যথেষ্ট বিরোধীতা করে, ফলে সংগ্রাম হয়ে ওঠে আরো কঠিন।
- এইসব মূল্যবোধ কেবলমাত্র জাতীয় সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও একই প্রভাব ফেলেছিল।

১৩.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

অনুপস্থিত জমিদার প্রথা ঃ ঔপনিবেশিক ভারতের এক বৈশিষ্ট্য। বিশাল জমির মালিকেরা তাদের জমিদারী থেকে অনুপস্থিত থাকত; বড় বা ছোট শহরে বাস করত এবং বিপুল খাজনা ছিল তাদের আয়। এই খাজনা ছিল প্রকৃত কৃষকের উৎপাদনের এক বিরাট অংশ।

কৃষিঋণ প্রথা ঃ কৃষিজীবী শ্রেণীর দরিদ্রতর অংশ সবসময়েই মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকে; মহাজন সাধারণ বীজ এবং অন্যান্য কৃষউপকরণ ক্রয়ের জন্য চড়া সুদে চাষীকে অর্থ অগ্রিম দেয়। পরিশোধে অসমর্থ কৃষক এই ফাঁদে পড়ে আবার টাকার জন্য সন্ধান করে। এইভাবে মহাজন কৃষকশ্রেণীর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিস্থিতিকে কাজে লাগায়। ১৮৭৬ এ মহারাষ্ট্রে মহাজনবিরোধী বিদ্রোহ এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি দিক।

গঠনমূলক কাজ ঃ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর গান্ধী নিপীড়িতদের উন্নতির জন্য এবং হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রচারে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

অর্থনৈতিক মন্দা ঃ অতি উৎপাদনের ফলে উদ্ভূত চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অবস্থা। এর ফল বেকারত্ব এবং মূল্যমানের ক্ষেত্রে বিরাট হ্রাস।

মানবতাবাদ	ঃ	মানুষের পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত মূল্যবোধ।
ভাষাভিত্তিক গঠন	ঃ	ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতির ক্ষেত্রে ভাষাকে মূল ভিত্তি ধরে জাতীয়তাবাদীরা ভারতে সমাজ গঠনে উদ্যোগ নেন। এইভাবে তাঁরা সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাকে বিকশিত হতে সাহায্য করেন এবং জাতীয়তাবাদের মূলস্রোতে নিয়ে আসেন।
যুক্তিবাদী	ঃ	যে যুক্তিতে বিশ্বাসী। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিভিত্তিক চিন্তা নবজাগরণের সূত্রপাতের সঙ্গে জড়িত।
সংস্কারপন্থী	ঃ	যে সমাজকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য সদর্থক পরিবর্তনে বিশ্বাসী।
পৃথ নির্বাচকমণ্ডলী	ঃ	হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীতে ভাগ করা ও নির্বাচনের মাধ্যমে পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্রিটিশ প্রচেষ্টা।
দ্বি-জাতি তত্ত্ব	ঃ	যে তত্ত্বে বলা হয় ঐতিহাসিক দিক থেকে ভারত দু'টি জাতির ভিত্তিতে গঠিত হিন্দু ও মুসলমান।
অ-লাভজনক জমি	ঃ	পরিমাণে অল্প জমি, যা কৃষকের নূন্যতম প্রয়োজনও মেটায় না।

১৩.১০ অগ্রগতি যাচাই করার উত্তরমালা

অগ্রগতি যাচাই করুন ১

১. (গ) ২., (গ) ৩. ১৩.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

অগ্রগতি যাচাই করুন ২

১. (গ) ২. (ঙ) ৩. (ঙ)

অগ্রগতি যাচাই করুন ৩

১. (গ) ২. (ক) ৩. ১৩.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৪

১. (ঘ) ২. (গ) ৩. ১৩.৫.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৫

১. (ঘ) ২. (খ) ৩. ১৩.৬.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

অগ্রগতি যাচাই করুন ৬

১. (ক) ২. (গ)

১৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

Chandra, Bipan 1971 : *Modern India,* N.C.E.R.T., New Delhi.

Desai, A.R. 1959 : *Social Background of Indian Nationalism,* Bombay.

Dutt, R.P. 1947 : *India Today,* Bombay.

Pavlov, V.I. 1978 : *Historical Premises for India's Transition to Capitalism,* Moscow.

Rothermund and Kulke 1968 : *History of India,* Manohar, New Delhi.

Sarkar, Sumit 1983 : *Modern India,* Macmillan, New Delhi.

Sittarammya, Pattabhi (2 vols.) 1946-47 : *History of Indian National Congress,* Bombay.

Tara Chand (4 vols.) 1961-72 : *History of the Freedom Movement in India,* Delhi.

চতুর্থ পর্যায় ❒ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাবলী

ভারতের জাতিগঠনের অর্থনৈতিক বিষয়গুলি এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এই পর্যায়ে পাঁচটি একক আছে, একক ১৪ থেকে ১৮।

১৪ নম্বর এককের বিষয়বস্তু হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাধারণ সমস্যাসমূহ এবং এতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ও বিচারাধীন বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। যে অবস্থায় পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তা আলোচনা করা হয়েছে ১৫ নম্বর এককে। ১৬ এবং ১৭ নম্বর এককের আলোচ্য বিষয় আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রকৃতপক্ষে গৃহীত যোজনার রণকৌশল-সংক্রান্ত বিষয়। ১৮ নম্বর এককে উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে মানবসম্পদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষত জনসংখ্যার প্রসঙ্গে।

এই পর্যায়টি যখন আপনি পড়বেন তখন ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংশ্লিষ্ট নীতিগুলো আপনি আরও ভালো করে অনুধাবন করতে পারবেন।

একক ১৪ ❒ উন্নয়ন-লক্ষ্য ও বিচারবস্তু

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য
১৪.১ প্রস্তাবনা
১৪.২ উন্নয়নের অর্থ ঃ বিভিন্ন সম্পর্কযুক্ত ধারণার পার্থক্য
 ১৪.২.১ অর্থনৈতিক বিকাশ বনাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন
 ১৪.২.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ একটি ব্যাপকতর ধারণা
১৪.৩ ভারতে উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ ঃ ভারতের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ
 ১৪.৩.১ লক্ষ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক ঃ দ্বন্দ্বমূলক ও পরিপূরক লক্ষ্যসমূহ
১৪.৪ উন্নয়নমূলক লক্ষ্যসমূহ এবং সময়-পরিধি
 ১৪.৪.১ উন্নয়নের লক্ষ্য, সময়-পরিধি এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ
১৪.৫ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের উপাদানসমূহ
 ১৪.৫.১ ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
 ১৪.৫.২ আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
 ১৪.৫.৩ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
১৪.৬ সারাংশ
১৪.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ
১৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী
১৪.৯ উত্তরমালা

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির পাঠ শেষ হলে অপানি নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন ঃ

- অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিভাষাটির ব্যাখ্যা,
- 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' ও 'অর্থনৈতিক বিকাশ'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ,
- ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্দেশ্যগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ,
- বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী ও পরিপূরক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ,
- নির্দিষ্ট সময়সমীর মধ্যে উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের প্রয়োজনীয় নির্দেশ, এবং
- কীভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি স্থাপিত ও নির্ধারিত হয় এবং কারা তা স্থাপন করে, এই বিষয়টির বর্ণনা।

১৪.১ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী একটি এককে ভারতে বিভিন্ন ধরনের সম্পদের বিষয়ে আপনি জেনেছেন। কোনো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন, শক্তি এবং মানবসম্পদের উপর নির্ভর করে। ভারতের

পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী? এর একটি সহজ-সরল উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ 'উন্নয়ন' কথাটির কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। কারো কারো মতে উন্নয়ন হল বিকাশ, আবার কারো কাছে উন্নয়ন হল অগ্রগতি। অনেকে আবার একে আধুনিকীকরণের সমার্থক মনে করেন। উন্নয়ন কথাটির মধ্যে বৃদ্ধি, অগ্রগতি ও আধুনিকীকরণ— সবই জড়িত, কিন্তু এই শব্দগুলি অত্যন্ত ব্যাপক এবং সামান্যিকৃত (general) এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তাই এদের অর্থও আলাদা।

১৪.২ উন্নয়নের অর্থ ঃ বিভিন্ন সম্পর্কযুক্ত ধারণার পার্থক্য

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ সম্পর্কে কোনও রকম অস্পষ্টতা থাকা ঠিক নয়। 'উন্নয়ন' কোনও বিবরণমূলক শব্দমাত্র নয়। এটি আমাদের মনে এমন একটি বোধ প্রতিষ্ঠিত করবে যা আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করার জন্য একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। প্রথমত, উন্নয়নের সংজ্ঞা দেওয়া যাক, বৃদ্ধি ও অগ্রগতি। আমরা সকলেই দেখেছি কীভাবে একটি চারাগাছ বৃক্ষে বিকশিত হয়। তারপর ফলদায়ী হয় অথবা একটি বাছুর বড় হয়ে দুগ্ধবতী গাভীতে পরিণত হয়। এই দু'টিই বৃদ্ধির উদাহরণ; — যার ফল সকলেই কাছেই আকাঙ্ক্ষিত। এ ধরনের কাঙ্ক্ষিত বিকাশকে সঠিকভাবেই উন্নয়ন বলা যেতে পারে। এই দুটি উদাহরণ নিয়ে আরও একটু ভাবা যাক, যদি আরও বেশি করে প্রতি বছরই চারা রোপণ করা হয় অথবা প্রতি বছরে আরও বেশি সংখ্যায় গো-প্রতিপালন করা হয় তবে ফল এবং দুধের উৎপাদন হবে ক্রমবর্ধমান। এ ধরনের উৎপাদন বৃদ্ধিকে উন্নয়নের সংজ্ঞার মধ্যে আনা যেতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে দরিদ্র মা এবং তার শিশু দুধের উৎপাদন বেশি হওয়া সত্ত্বেও দুধের বাজারের বাইরে থেকে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এই ধরনের বৃদ্ধি উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থবহ নয়।

আরও একটি উদাহরণ থেকে দেখা যাবে যে, কখনো উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে যথেষ্ট দ্রুতগতিতেই কিন্তু উন্নয়ন হচ্ছে না। ধরা যাক, আপনি একজন উন্নয়ন-পরিকল্পনাবিদ্ এবং আপনার কাছে আছে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ও অন্যান্য উপকরণ যার সাহায্যে আপনি দুটি বিকল্প উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন ঃ মাংস উৎপাদনের জন্য খরগোশ পালন অথবা দুধের জন্য গো-পালন। এক্ষেত্রে দুটি বিকল্পের মধ্যে কোনটি আপনি বাছবেন? আপনি জানেন যে খরগোশের বংশবৃদ্ধির হার গরুর তুলনায় অনেক বেশি। যদি অপানি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, কেবল বিকাশ বা বৃদ্ধি মানেই উন্নয়ন, তাহলে স্পষ্টতই আপনি প্রথম বিকল্পটি নির্বাচন করবেন। এরফলে নিশ্চিতভাবেই আপনি দ্বিতীয় বিকল্পটির উৎপাদনের (দুধ) তুলনায় বেশি উৎপাদন (খরগোশের মাংস) পাবেন। কিন্তু, যদি দেখা যায় যে, খুব অল্প সংখ্যক মানুষ খরগোশের মাংস পছন্দ করে সেক্ষেত্রে আপনার উচ্চতর বৃদ্ধির হার অর্জনের লক্ষ্যসাধন খুব সামান্যই কাজে আসবে। যেহেতু এই ধরনের বৃদ্ধির ফল বেশিরভাগ লোকের কাছেই অবাঞ্ছিত, একে সঠিকভাবে উন্নয়ন বলা যায় না।

১৪.২.১ অর্থনৈতিক বিকাশ* বনাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন

উন্নয়ন হচ্ছে সেই ধরনের বৃদ্ধি যার ফলাফল আকাঙ্ক্ষিত ও যেটি জনগণের পছন্দের সঙ্গে

(*Economic Growth-এর পরিভাষা হিসেবে 'অর্থনৈতিক বিকাশ' বা 'অর্থনৈতিক বৃদ্ধি' দুটিই প্রচলিত। এখানে দুটি পরিভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে।)

সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করে। এই ধরনের বৃদ্ধিকে অগ্রগতিও বলা যেতে পারে। অবশ্যই এই অগ্রগতি বস্তু নির্ভর। অন্যভাবে বলা যায় যে, সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবার বর্ধিত সরবরাহ সুনিশ্চিত করাই অর্থনৈতিক প্রগতি।

দ্রব্য ও সেবার এই বর্ধিত যোগানকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। যদি দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রব্য ও সেবার বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে গেছে সেক্ষেত্রে মাথাপিছু যোগান অবশ্যই হ্রাস পাবে আর তখন সেই উৎপাদন বৃদ্ধি বা উন্নয়নকে বলা যাবে **অধোগতিশীল**। দ্বিতীয় একটি পরিস্থিতির কথা ভাবা যেতে পারে যেখানে উৎপাদন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমান। সেক্ষেত্রে দ্রব্য ও সেবার মাথাপিছু যোগান অপরিবর্তিত থাকবে; সেক্ষেত্রে উন্নয়ন গতিহীন। পরিশেষে বলা যায় যে, যখন দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যাবে তখন দ্রব্য ও সেবার মাথাপিছু যোগান বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ ধরনের উন্নয়নকে আমরা বলতে পারি **প্রগতিশীল**।

কোনো সমাজে দ্রব্য ও সেবার যোগান পরিমাপ করা হয় জাতীয় আয়ের মাধ্যমে। আর তাই একটি দেশের জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি দ্বারা সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর বোঝা যায়। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, এই পদ্ধতিটি নিতান্তই পরিমাণমূলক এবং এ ধরনের উন্নয়নের ব্যাখ্যা একটি সংক্ষেপিত পরিমাণবাচক পদ্ধতির সূচক। অন্যপক্ষে, মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মান উন্নত করার নিরিখে উন্নয়নের বিচার করা উচিত। জীবনযাপনের গুণগত মান বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন—স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি, প্রত্যাশিত আয়ু, শিক্ষা আবাসন এবং সাধারণভাবে জীবনধারণের পরিস্থিতি। এটা সত্যি যে, জীবনযাপনের গুণগত মান পরিমাপ করা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও জীবনযাপনের গুণগত মান পরিমাপ করার উপযুক্ত একটি নির্দেশক বা সূচক গঠন করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। এসব প্রতিবন্ধকতা বাদ দিলে জীবনযাপনের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন অগ্রগতির পরিচায়ক, যেটা মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সর্বদা নির্দেশ করে না।

এখন আধুনিকীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। সমাজতত্ত্ববিদরা 'আধুনিকতা' শব্দটি ঐতিহ্যগত বা পরম্পরাগত শব্দটির বিপরীত অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। পরম্পরা অর্থাৎ পুরাতন যা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাতিভেদ প্রথা একটি প্রাচীন পরম্পরাগত প্রতিষ্ঠান। ঠিক একইরকমভাবে বলদ চালিত কাঠের লাঙল একটি প্রাচীন পরম্পরাগত কৃষিযন্ত্র। আধুনিকতার অর্থ প্রাচীন ও ঐতিহ্যগত বিষয়কে বর্জন করে নিত্য-নতুন পথ, পদ্ধতি, উপায়, প্রযুক্তি, পরিকল্পনা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রহণ করা। সংক্ষেপে বলা যায়, আধুনিকতা মানে আরও বেশি বেশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে জনপ্রিয় করে তোলা। জাতিভেদ প্রথা পরিত্যাগ করাই হবে সামাজিক আধুনিকতার পথে একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ। একইরকমভাবে উন্নত ধরনের লাঙল বা ট্রাক্টরের ব্যবহার অথবা উন্নত সংকরজাতের বীজ এবং সারের প্রচলন ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের একটি দৃষ্টান্ত। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে, আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এক জিনিস নয়। এমন কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিশেষত প্রযুক্তিকে দেশের মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপযোগী করে নিতে হবে।

১৪.২.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ একটি ব্যাপকতর ধারণা

উপরে বর্ণিত আধুনিকতা আর্থিক বিকাশ ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। আধুনিকতা বিকাশকে উন্নীত

করে উৎপাদন প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, আধুনিকতা কীভাবে দক্ষতার উৎকর্ষ লাভে সহায়ক হয়? এটি দু'ভাবে কাজ করে। প্রথমত, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব হয় এবং একই পরিমাণ উপাদান থেকে বেশি পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, নতুন প্রযুক্তি যখন বেশি উপাদান ব্যবহার করে তখন পুরাতন প্রযুক্তির তুলনায় অনেক গুণ বেশি উৎপাদন করতে সমর্থ হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যাচ্ছে যে, প্রতি একক উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ উপাদানের প্রয়োজন হচ্ছে তা পূর্বতন উৎপাদন পদ্ধতির তুলনায় কম; এর ফলে একই পরিমাণ উৎপাদন করে কিছু পরিমাণ উপাদান উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে যা ব্যবহার করে আরও বেশি পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হবে, যা প্রকারান্তরে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিরই নামান্তর। আমরা একেই উৎপাদনশীলতার উন্নতিসাধন বলে থাকি। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, এই আধুনিকতা মানবসমাজের প্রয়োজনীয়তা ও পছন্দ অনুযায়ী অতিরিক্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন সম্ভব করে আর্থিক উন্নতির সহায়ক হবে। বাস্তবিক পক্ষে উন্নয়ন বলতে এটাই বোঝায়।

অবিবেচনাপ্রসূত ও মাত্রাতিরিক্তভাবে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে আধুনিকতা একটি নির্দিষ্ট সীমার পর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবর্তে সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে—মানব সমাজের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের ক্ষতিসাধন করতে পারে। সারা বিশ্বে, বিশেষত পশ্চিমি উন্নত দেশগুলিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ফলশ্রুতিতে পর্যাবরণের অবনতি ও পরিবেশ-দূষণ একটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আমরা অনেকেই জানি যে অম্ল-বৃষ্টিপাত (অ্যাসিড রেইন)-এর ফলে পশ্চিম জার্মানির বিস্তীর্ণ বনভূমি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে। শিল্পের অম্লজাত দূষিত দ্রব্য আবহাওয়ার মধ্যে নিষিক্ত হয়ে বৃষ্টির সঙ্গে ধরায় নামে। একে আমরা অম্ল-বৃষ্টি বলি।

আমদের দেশেও বনভূমির বিপুল ক্ষয়ের জন্য পর্যাবরণের অবনতি ঘটেছে। আমাদের দেশের উন্নয়নের স্তর পশ্চিমি দেশগুলির তুলনায় অনেক পিছিয়ে।

মধ্য-পাঞ্জাবের কোনো কোনো স্থানে কৃষিতে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ জলের মধ্যে নাইট্রোজেনজনিত দূষণ নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেছে; যার ফলে সেই সঞ্চিত জল মানুষ এবং প্রাণীদের পানযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। এরকম অসংখ্য উদাহরণ সকলেরই জানা আছে, তাই উদহরণের ভারে একে আর ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই।

এই সমস্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রকৃতিবিদ্, পরিবেশবিদ্, বৈজ্ঞানিক এবং পরিকল্পনাবিদ্‌রা 'অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সীমা'-র কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে থেকেই উদ্ভুত হয়েছে 'অনুমোদনযোগ্য (বা সহনীয় উন্নয়ন'-এর ধারণা। আশা করি সকলেই একমত হবেন যে, বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নকে দেখলে তা' পরিশেষে মানুষের প্রকৃতি-শোষণে পরিণত হয়। যখন এই শোষণ সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করে, তখন প্রকৃতি তার নিজের প্রতিঘাতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। কাঠের যোগান ক্রমাগত অতিরিক্ত বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে যদি মাত্রাতিরিক্তভাবে কেউ অরণ্য বিনষ্ট করে তবে ভবিষ্যতে কাঠের যোগান ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকবে। তাছাড়া অরণ্য বিনষ্টীকরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়ে মৃত্তিকা ক্ষয়, বন্যা, এবং বৃষ্টি স্বল্পতা, যা সামগ্রিকভাবে ব্যাহত করবে কৃষি-সংক্রান্ত উৎপাদন। একই-রকমভাবে যদি ভূগর্ভ থেকে অতিরিক্ত তেল উত্তোলন করা হতে থাকে তবে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় খনিজ তেলের ঘাটতি সৃষ্টি হবে।

এই সমস্ত বিচার্য বিষয়ই সহনশীল উন্নয়নের ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছে। এটা হচ্ছে সেই ধরনের উন্নয়ন যা প্রকৃতি বহন করতে পারে। এই ধরনের উন্নয়ন প্রকৃতির সম্পদের যে জীবন-চক্র আছে তার বিনাশ ঘটায় না। অনুমোদনযোগ্য বা সহনশীল উন্নয়ন হচ্ছে তাই, যা একই সঙ্গে প্রাকৃতিক পর্যাবরণ এবং পরিবেশের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

অনুশীলনী ১

সঠিক উত্তরটি বৃত্ত দিয়ে বেষ্টন করুন ঃ

১। **অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হচ্ছে ঃ**

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমার্থক।
(খ) একটি দেশের নতুন দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি।
(গ) একটি দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ।
(ঘ) জীবনধারণের মান বজায় রাখা।
(ঙ) উপরের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সমাহার।

২। **নীচের কোনগুলি অর্থনীতির উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যবাহী নয়?**

(ক) সঞ্চয়-এর উচ্চ স্তর।
(খ) আয়ের অসম বণ্টন।
(গ) অধিক মাথাপিছু আয়।
(ঘ) একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী।
(ঙ) স্বল্প হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

৩। **আর্থিক বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়, কারণ ঃ**

(ক) এটি জীবনধারনের চরম মান বজায় রাখে।
(খ) এটি কিছু মানুষের জীবনধারণের চরম মান উন্নত করে, কিন্তু সবার ক্ষেত্রে নয়।
(গ) এটি প্রতিটি মানুষের জীবনধারণের চরম মান উন্নত করে।
(ঘ) এটি সঞ্চয়ের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং যার ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক-বৃদ্ধির মান উন্নত হয়।
(ঙ) এটি বিনিয়োগের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং যার ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক-বৃদ্ধির মান উন্নত হয়।

৪। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি সত্য?**

(ক) নতুন প্রযুক্তির বিকাশই অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য সম্পদ ও আয়ের বর্তমান মাত্রা বজায় রাখা।

৫। **নীচের তালিকা থেকে কয়েকটি বিষয় চয়ন করুন যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি ঃ**

প্রযুক্তি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মুনাফা হ্রাস, শ্রমিকদের ঊর্ধ্ব-মজুরী, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ঊর্ধ্ব মাত্রা, উপযুক্ত মান ও পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিক।

৬। **নীচের বিষয়গুলি সঠিক (✓) না ভুল (✗) নির্দেশ করুন ঃ**

(ক) আর্থিক বৃদ্ধি ব্যতীত আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু আর্থিক উন্নয়ন ব্যতীত আর্থিক বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ( )
(খ) আর্থিক বৃদ্ধির স্বল্প হার দারিদ্র্য বজায় এবং বজায় রাখে। ( )
(গ) আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক বিপরীতমুখী। ( )
(ঘ) স্বল্প বিনিয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বাধাগুলির মধ্যে অন্যতম। ( )

৭। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে যা জানেন তা সংক্ষেপে পাঁচ লাইনের মধ্যে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

....

১৪.৩ ভারতে উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ ঃ ভারতের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

আমরা এখানে ভারতে উন্নয়নের উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের সবারই জানা আছে যে, স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথটি বেছে নেওয়া হয়। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তারপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি দেখা যায়। সংক্ষেপে এগুলি হল ঃ

(১) জাতীয় আয়-এর বৃদ্ধি;
(২) বিভিন্ন শ্রেণি ও অঞ্চলের মধ্যে আয়-বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস;
(৩) জমিসহ বিভিন্ন উৎপাদন-উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস করা, যাতে মুষ্টিমেয়-এর হাতে সম্পদ ও সম্পত্তির কেন্দ্রীভবন রোধ করা সম্ভব হয়;
(৪) নিয়োগ বৃদ্ধি;
(৫) দারিদ্র্য দূরীকরণ;
(৬) ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মেটানোর ব্যবস্থা;
(৭) পরিবেশ ও পর্যাবরণের ভারসাম্য রক্ষা ও সংরক্ষণ;
(৮) জাতীয় অর্থনীতির স্বনির্ভরতা।

এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই (শুধুমাত্র ৫, ৬, ৭ নম্বর উদ্দেশ্যগুলি ছাড়া) প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। ৫নং ও ৬নং উদ্দেশ্যদ্বয় সংযোজিত হয়েছে পঞ্চম পরিকল্পনাকে (১৯৭৪-৭৯) এবং ৭নং টি সংযোজিত হয়েছে সপ্তম পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০)। এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলিকে মূলত চারটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। (ক) বৃদ্ধি (খ) বণ্টন ও সামাজিক ন্যায় বিচার (গ) পরিবেশ ও যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নতি (ঘ) স্বনির্ভরতা।

পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা 'উন্নয়ন'কে বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছি। কিন্তু শুধুমাত্র 'বৃদ্ধি' উন্নয়নের সুবিধাগুলির সুষম বণ্টনকে সুনিশ্চিত করে না। অন্যদিকে, নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণ সমাজব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সমস্ত মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন সুনিশ্চিত করা এবং উন্নয়নের সুফলের সম-বণ্টনকেও নিশ্চিত করা যাতে আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস পায়। তাই বলা যায়, সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হল উন্নয়নের দ্বৈত লক্ষ্য। উপরে লক্ষ্যগুলির যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ২ থেকে ৬ মূলত সামাজিক ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ও পরিবেশের সংরক্ষণ ও

উন্নয়ন, সহনীয় বা অনুমোদনযোগ্য বৃদ্ধির সহায়ক।

প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকে স্বনির্ভরতা জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এর অর্থ, রপ্তানি সব সময়ই আমদানিতে ছাড়িয়ে যাবে যার ফলে দেশ বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ এবং বৈদেশিক নির্ভরতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। স্বনির্ভরতাকে আমদানির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, প্রয়োজনীয় আমদানিসমূহ, যেমন, ভারী যন্ত্রপাতি ও মূলধন দ্রব্যের আমদানি দেশীয় প্রস্তুতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা। একে 'আমদানি প্রতিস্থাপন' বলা হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, স্বনির্ভরতা একটি দ্বিমুখী-পথ দ্বারা নির্ধারিত—আমদানি প্রতিস্থাপন ও রপ্তানি প্রসার।

ভবিষ্যতের জন্য এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলির প্রাসঙ্গিকতা কি? এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভবিষ্যত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই লক্ষ্যগুলি সমান প্রাসঙ্গিক থেকে যাবে। বিশেষ করে বলা যায় যে, অতীতে আমরা এই উদ্দেশ্যগুলি থেকে যত বেশি দূরত্বে থেকেছি ততই এই উদ্দেশ্যগুলির ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বেড়ে গিয়েছে।

১৪.৩.১ লক্ষ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক ঃ দ্বন্দ্বমূলক ও পরিপূরক লক্ষ্যসমূহ

বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহের মধ্যে যে সম্পর্ক দেখা যায় কিছু ক্ষেত্রে তা দ্বন্দ্বমূলক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলি পরিপূরক। যে কোনো দুটি লক্ষ্যকে ধরা যাক্। যদি উন্নয়ন প্রক্রিয়া কোনো একটি লক্ষ্যকে ধনাত্মকভাবে প্রবাবিত করে এবং এর ফলে যদি দ্বিতীয় লক্ষ্যটি ধনাত্মক দিকে প্রভাবিত হয়, তবে লক্ষ্য দুটির সম্পর্ক পরিপূরক। অন্যদিকে যদি একটি লক্ষ্য-এর সঙ্গে অন্য লক্ষ্যটির সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক হয় অর্থাৎ একটি লক্ষ্য ধনাত্মক দিকে প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে যদি অন্য লক্ষ্যটি থেকে দূরে সরে যেতে হয় তবে বলা যায় যে ঐ লক্ষ্য বা অভিলক্ষ্যগুলি পরস্পর বিরোধী বা দ্বন্দ্বমূলক।

লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, 'দরিদ্রদের জন্য নিয়োগ সম্প্রসারণ' লক্ষ্যটি 'দারিদ্র্য দূরীকরণ' লক্ষের পরিপূরক। অর্থাৎ নিয়োগ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য হ্রাস পায়, যা নিয়োগ সম্প্রসারণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণ—উভয় ক্ষেত্রেই ধনাত্মক অবদান রাখে। বিপরীত দিকে দেখা যায় যে, 'বৃদ্ধি' ও 'আয় বণ্টন'-এর লক্ষ্যগুলি পরস্পর বিরোধী বা দ্বন্দ্বমূলক হতে পারে। আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের থেকে বেশি পরিমাণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। অন্যদিকে, উন্নততর আয় বণ্টনের পূর্বশর্ত দরিদ্র জনসাধারণের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি। অথচ দরিদ্র শ্রেণির মানুষের সঞ্চয় সৃষ্টির ক্ষমতা কম; এক্ষেত্রে একই পরিমাণ আয় থেকে সঞ্চয় হ্রাস পাবে, ফলে বিনিয়োগ ও পরিশেষে 'আর্থিক বৃদ্ধি' হ্রাস পাবে। অর্থাৎ এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি লক্ষ্য প্রতিযোগিতামূলক বা দ্বন্দ্বমূলক। অন্যদিকে আয় বণ্টন উন্নততর হওয়ার ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, সামাজিক উত্তেজনা, ধর্মঘট ইত্যাদি হ্রাস পাবে, যা থেকে সুস্থির ও উচ্চ আয় বৃদ্ধি-হার প্রাপ্তি সহজতর হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য লক্ষ্যদুটির চরিত্র দ্বন্দ্বমূলক নয়। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বলা যায় আয় বণ্টন ও আর্থিক বৃদ্ধি, এই দুটি লক্ষ দ্বন্দ্বমূলক হতেও পারে বা নাও হতে পারে। একই-রমকভাবে 'আয় বৃদ্ধি' ও 'সংরক্ষণ' এই দুটি লক্ষ্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা থাকতে পারে। 'সামাজিক ন্যায়বিচার' সংক্রান্ত লক্ষ্যগুলিও যে সর্বদা পরিপূরক অর্থাৎ একটি অর্জন করলেই আর একটি অর্জিত হবে তা বলা যায় না। এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য এরকম দুটি লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক—দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আয় বণ্টন।

ধরা যাক্, সমাজে দুটি শ্রেণি— ‘ক’ ও ‘খ’। উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু হওয়ার সময় ‘ক’ শ্রেণির মানুষ অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্বল বা দরিদ্র এবং ‘খ’ শ্রেণির মানুষ অপেক্ষাকৃতভাবে কম দুর্বল বা দরিদ্র। তাদের মাসিক আয় ছিল যথাক্রমে ৫০ টাকা ও ২০০ টাকা। মূল্যস্তর স্থির থাকলে মাথাপিছু ৭৬ টাকা মাসিক আয় হল দারিদ্র্যসীমা। এখন যদি ‘ক’ শ্রেণির মানুষের আয় ৭৬ টাকার বেশি বাড়ানো যায় তবে সে দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করবে ও ‘খ’ শ্রেণির মানুষের শ্রেণিতে গণ্য হবে। অর্থাৎ অ-দরিদ্র হিসেবে গণ্য হতে থাকবে। এখন এ ধরনের সম্ভাব্য উন্নয়ন নমুনার কথা ভাবা যাক্। প্রথমত, ‘ক’ ও ‘খ’ উভয় শ্রেণীর আয় সমহারে বৃদ্ধি পেল দ্বিতীয়ত ‘ক’ শ্রেণীর আয় বৃদ্ধির হার ‘খ’ শ্রেণীর আয় বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে গেল।

নীচের সারণিতে (১৪.৩.১) দারিদ্র্য ও আয় বণ্টন সংক্রান্ত প্রাথমিক অবস্থা ও চূড়ান্ত অবস্থা দেখানো হল। তিনটি বিকল্প চূড়ান্ত অবস্থা দেখানো হয়েছে। প্রথম চূড়ান্ত অবস্থায় দেখানো হয়েছে যদি উভয় শ্রেণির আয় সমহারে বৃদ্ধি পায় যেমন পরিকল্পনাকালে উভয় শ্রেণির আয় দ্বিগুণ হল। দ্বিতীয় চূড়ান্ত অবস্থায় দেখানো হয়েছে যদি ‘ক’ শ্রেণীর আয় বৃদ্ধির হার ‘খ’ শ্রেণীর আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়। তৃতীয় চূড়ান্ত অবস্থাতেও একই জিনিস প্রদর্শিত হয়েছে, পার্থক্য শুধু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ‘ক’ শ্রেণীর আয় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে ‘ক’ শ্রেণীর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ছ’গুণ।

সারণি ১৪.৩.১ দারিদ্র দূরীকরণ ও আয় বণ্টনের লক্ষ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক

বিবরণ	প্রাথমিক অবস্থা	চূড়ান্ত অবস্থা		
		প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
১। ক-এর আয়	৫০	১০০	২০০	৩০০
২। খ-এর আয়	২০০	৪০০	৪০০	৪০০
৩। দারিদ্র্যসীমার আয়	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬
৪। আয় পার্থক্য বা বৈষম্য	১৫০	৩০০	২০০	১০০
(‘ক’ ও ‘খ’-এর আয়ের বৈষম্য)				

এখন প্রাপ্ত ফলাফলগুলির বিশ্লেষণ করা যাক্। ওপরের ফলাফল থেকে আপনি দেখতে পাবেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ‘ক’ শ্রেণীর দারিদ্রসীমার ওপরে উঠে এসেছে। অর্থাৎ তিনটি ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যটি সাধিত হয়েছে। কিন্তু এবার দেখা যাক্, আয় পার্থক্য বা বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস এর লক্ষ্য কোন্ ক্ষেত্রে কতদূর সফল। প্রাথমিক অবস্থার সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে যে প্রথম ও দ্বিতীয় চূড়ান্ত অবস্থায় আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, শুধুমাত্র তৃতীয় চুড়ান্ত অবস্থাটি আয় বৈষম্যকে কমিয়ে এনেছে। এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে দারিদ্র্য দূর করা সত্ত্বেও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং বৈষম্য হ্রাস বা বৃদ্ধির ব্যাপারটি আপেক্ষিক আয় বৃদ্ধির হার-এর ওপর নির্ভর করছে। এখন স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন আসে, আলোচ্য লক্ষ্য দুটি কি পরস্পর বিরোধী না কি পরিপূরক? অবশ্যই এরা পরস্পর বিরোধী নয়, কারণ দারিদ্র্য একটু কমালে আয় বৈষম্য নিশ্চিতভাবে বাড়বে না। আবার এরা সর্বতোভাবে এবং

সর্বক্ষেত্রেই যে অবশ্যম্ভাবীভাবে পরিপূরক হবে একথাও ঠিক নয়। যেমন দারিদ্র্য দূরীকরণ করলেই আয় বৈষম্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কমে যাবে এটা ঠিক নয়। অন্যপক্ষে যদি আয় বৈষম্য হ্রাস করার চেষ্টা করা যায় তাহলে সেইসঙ্গে দারিদ্র্য কমিয়ে আনা যেতে পারে (তৃতীয় অবস্থা)। কখনো কখনো দারিদ্র্যকে ও বণ্টন করে দেওয়া সম্ভব ঃ ধরা যাক, দুজনের আয় প্রাথমিক স্তরে স্থির রাখা যায় অর্থাৎ যদি ক ও খ উভয়ের মোট প্রাথমিক আয় ১৫০ টাকাকে (ক-এর ৫০ টাকা ও খ-এর ১০০ টাকা) সমভাবে বণ্টন করা হয়, তবে উভয়ের চূড়ান্ত আয় হল ৭৫ টাকা, এক্ষেত্রে আয় বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা সম্ভব হল। যদিও এক্ষেত্রে উভয়েই সম-দারিদ্র্যভুক্ত হয়ে পড়ল, অর্থ্যৎ দারিদ্র্য সমভাবে বণ্টনের মাধ্যমে আয় বণ্টনের বৈষম্য দূর করা হল। এই অবস্থায় ক-এর অবস্থার সামান্য উন্নতি হল তাই বলা যায় অভিলক্ষ্য দুটি অন্তত আপেক্ষিকভাবে পরিপূরক।

অনুশীলনী ২

১। ভারতে পরিকল্পনার মূল চারটি উদ্দেশ্য কি কি?

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

২। বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত শব্দগুলি থেকে সঠিক শব্দ বা শব্দগুলি বেছে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) আর্থিক বৃদ্ধি আপনা-আপনিভাবে তার সুফলের সমবণ্টনকে সুনিশ্চিত .... (করে/করে না)।

(খ) একটি ন্যায়সম্মত ও সাম্য সামাজিক ধারার প্রণয়নের জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটানো .... (প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই)।

(গ) আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচার হচ্ছে আমাদের উন্নয়নের .... অভিলক্ষ্য (একটি /যুগ্ম)।

(ঘ) দ্রব্য ও সেবার আমদানি স্বনির্ভরতার অভিলক্ষ্যের .... (অন্তর্গত/ অন্তর্গত নয়)।

৩। নীচের বাক্যগুলির কোন্‌টি নির্ভুল (✓) এবং কোন্‌টি ভুল (×) নির্দেশ করুন

(ক) নিয়োগ সম্প্রসারণ ও দারিদ্র দূরীকরণ এই দুটি অভিলক্ষ্যগুলির মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক বিদ্যমান। ( )

(খ) উন্নয়নের অভিলক্ষ্যগুলি বর্তমানে যত কম পূরণ হবে সেগুলির ভবিষ্যৎ তাৎপর্য তত বেশি হবে। ( )

(গ) স্বনির্ভরতা অভিলক্ষ্যটির অর্থ গার্হস্থ্য উৎপাদন দ্বারা সমস্ত আমদানি প্রতিস্থাপন করা। ( )

(ঘ) নিয়োগ-এর সম্প্রসারণ সামাজিক ন্যায়বিচার-এর অভিলক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। ( )

৪। **আপনি কি মনে করেন ভারতবর্ষের পরিকল্পনার অভিলক্ষ্যগুলি পরস্পর বিরোধী? আপনার উত্তর সংক্ষেপে চারটি বাক্যে লিখুন।**

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

১৪.৪ উন্নয়নমূলক লক্ষ্যসমূহ এবং সময়-পরিধি

অভীষ্ট সাধনের জন্য উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্য স্থির করা হয় কিন্তু বাস্তব লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সময়-এর প্রয়োজন। এমনকি একজন দৌড়বীরেরও তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। সময় বেশি বা কম লাগা নির্ভর করে কি পরিমাণ শক্তি নিয়োজিত হচ্ছে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তার উপর। আপনি হয়ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন না যদি আপনার শক্তির ঘাটতি থাকে অথবা অন্তবর্তী সময়ের মধ্যে যদি কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়। উন্নয়নের দৌড়-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একইরকম-ভাবে উন্নয়নও এক প্রকারের দৌড়, কোনো সময় যদি এর গতি কমে যায়, পরবর্তী ধাপগুলিতে উন্নয়ন নামক দৌড়ের গতি বাড়িয়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ভারতে উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহের তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া ছিল না, এবং কোনো স্থির ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারিত ছিল না। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্য ও সময়-সীমা বলতে যা বলে থাকি তা দেশের আকাঙ্ক্ষিত সাধারণ বিবরণ মাত্র, যা ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে প্রকাশিত হয়ে থাকে। কোনো একটি পরিকল্পনায় যতটা দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব হবে না তা পরবর্তী পরিকল্পনার অভিলক্ষ্যে সংযোজিত হয়ে থাকে।

দৌড়বীর-এর দৌড়ের মতো উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ সুনির্দিষ্ট হবে যদি তাতে 'সময়-কাল'-এর ব্যাপারটি সংযোজিত হয়। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক্, জাতীয় আয় বৃদ্ধির অভিলক্ষ্যটিকে। যখন জাতীয় আয়-এর বছরে একটি সুনির্দিষ্ট হারে, ধরা যাক্ বছরে ৫ অথবা ৬ শতাংশ হারে, বৃদ্ধি পাওয়ার অভিলক্ষ্য স্থিরীকৃত হয় সেক্ষেত্রে অভিলক্ষ্যটি একটি সুনির্দিষ্ট সময় পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। একইরকমভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ একটি অনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য। কিন্তু যখন পরিকল্পনাবিদরা বলে থাকেন আগামী দশ বছরের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ১৯৮৫তে ৩৭ শতাংশ থেকে ১৯৯৫-এ ১০ শতাংশ কমিয়ে আনা হবে, তখন বলা যায় যে অভিলক্ষ্যটি সময়-নির্দিষ্ট।

১৪.৪.১ উন্নয়নের লক্ষ্য, সময়-পরিধি ও প্রয়োজনীয় সম্পদ

একটি সুনির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে যদি কোনো লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য পেতে হয় তবে এই উদ্দেশ্যে আকাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগানকে সুনিশ্চিত করতে হবে। দৌড়বীরের দৌড়-এর উদাহরণে শক্তির যে ভূমিকা এক্ষেত্রে সম্পদের যোগানের ভূমিকাও তাই। এটাই সাফল্যের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর সহায়ক। কি হবে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদের যোগান না থাকে? স্পষ্টতই সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থিরীকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। যদি কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ এই রকম অবস্থা আগে থেকে অনুমান করতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে সময়সীমাকে অপরিবর্তিত রেখে লক্ষ্যমানগুলিকে কমিয়ে আনতে পারেন অথবা লক্ষ্যমানকে অপরিবর্তিত রেখে সময়সীমাকে দীর্ঘায়িত করতে পারেন। বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য আমরা আমাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের উদাহরণে ফিরে যাই; অর্থাৎ ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ এই দশ বছরে ভারতে দারিদ্র্যের প্রকোপকে ৩৭% থেকে ১০% কমিয়ে আনার লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের কোনো কারণে ঘাটতি হল, এক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্যটিকে খানিকটা নামিয়ে আনতে পারেন। যেমন ১০ শতাংশের বদলে ২৫ বা ২০ শতাংশ নীচে থাকার লক্ষ্যে নামতে পারেন। সেক্ষেত্রে সময়-সীমাটি দশ বছরে অপরিবর্তিত রাখা হল। বিকল্প হিসাবে তাঁরা ভাবতে পারেন যে ২০০০ সালের মধ্যে অর্থাৎ পনেরো বছরের মধ্যে তাঁরা দারিদ্র্যের প্রকোপকে ১০ শতাংশ নামিয়ে আনবেন, এক্ষেত্রে সময়সীমাটি বর্ধিত করা হল।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে উন্নয়নের অভিলক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা, সময়সীমা ও সম্পদের যোগান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সাধারণভাবে উন্নয়নের অভিলক্ষ যখন একটি সুনির্দিষ্ট আকারে স্থির করা হয় তখন তাকে বলে লক্ষ্যমাত্রা। লক্ষ্যমাত্রার একটি নির্দিষ্ট সময়-পরিধি আছে যার মধ্যে সেটি অর্জন করতে হয়। প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগানের ওপর নির্ভর করে এই লক্ষ্যমাত্রা ও সময় পরিধি নির্ধারণ করতে হয় চূড়ান্তভাবে। যখন সম্পদের পরিমাণ অপ্রতুল হয়ে পড়ে তখন পরিকল্পনাবিদ্‌দের হাতে থাকে দুটি বিকল্প পথ—হয় লক্ষ্যমাত্রাকে কমিয়ে আনতে হবে নতুবা সময়-সীমাকে সম্প্রসারিত করতে হবে।

১৪.৫ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের উপাদানসমূহ

এবার দেখা যাক্ কোনো দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ কীভাবে নির্দারণ করা হয় এবং কারা এ-দায়িত্ব পালন করেন? যেমন ভারতে এই উন্নয়ন-এর লক্ষ্যমাত্রা (১৪০৩-এ দেওয়া) নির্ধারণ করেন কারা?

সরকার, পরিকল্পনা পর্ষদ অথবা নির্বাচকমণ্ডলী-কারা এই দায়িত্ব পালন করেন?

একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই জটিল পদ্ধতিটি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কাজ করে থাকে, সময়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আর্থ-সামাজিক সমস্যা এবং দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। এখন দেখা যাক্ এই উপাদানগুলি কীভাবে তাদের ভূমিকা পালন করে।

১৪.৫.১ ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

একথা আপনারা সবাই জানেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, মূলত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি, পশ্চিমের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এই সমস্ত দেশগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে 'আর্থিক স্বনির্ভরতা'কে গুরুত্ব দিতে। কিন্তু কেন? কারণ এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির ধারণা যে, যদি তারা তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন না করতে পারে তবে তাদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য পূর্বতন ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা বিঘ্নিত হবে। আমদের উন্নয়নের অন্যতম স্থপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রায়ই বলতেন 'ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ততদিন অবধি অর্জন সম্ভব নয় যতক্ষণ না রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বনির্ভরতা অর্জন করবে'। তাই বলা যায় যে, উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় আর্থিক স্বনির্ভরতা সংযোজিত হয়েছে একটি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায়, যার মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে তাদের স্বধীনতা প্রাপ্তির আগে এবং পরে যেতে হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনকালের অর্থনৈতিক অচলায়তন অবস্থা এবং সম্পদের ক্রম নির্গমন এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে সচেতন করেছে, এবং উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে তাই গুরুত্বপূর্ণভাবে স্থান পেয়েছে 'অর্থনৈতিক বৃদ্ধি'; যখন বিশেষত এই দেশগুলি সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পেরেছে।

১৪.৫.২ আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছাড়াও কোনো দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সেই দেশের বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ভারতবর্ষের মতো কোনো দেশে যেখানে জনসংখ্যা এবং শ্রমজীবীদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে সেখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ একটি অতি অবশ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা। যেহেতু এই জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ অতি দরিদ্র সেহেতু 'দারিদ্র দূরীকরণের' অবিলক্ষ্য অবশ্যই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকবে। কিন্তু যে মুহূর্তে বেকারী ও দারিদ্র সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তখনই এই দুটি অভিলক্ষ্য আর আকাঙ্ক্ষিত থাকবে না।

১৪.৫.৩ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানগুলো হল সেইসব উপায়সমূহ যার মাধ্যমে উন্নয়নের অভিলক্ষ্যগুলি প্রকাশিত হয় এবং দানা বাঁধে এবং শেষ পর্যন্ত জাতির অভিলক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়। সর্বত্রই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান একইরকম হবে, এরকম বলা যায় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে যেমন চীন ও কিউবায় অর্থাৎ যেখানে একদলীয় শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান সেখানে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারিত হবে পার্টির বিভিন্ন

অংশের অভ্যন্তরীণ বিতর্কের মধ্য দিয়ে। আমদের মতো দেশে যেখানে বহুদলীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চালু আছে সেখানে এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয় সাংসদ এবং রাজ্যস্তরের বিধায়কদের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল যদি ক্ষমতায় আসীন হয় তবে তারা কি ধরনের উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করবে বা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করবে তার ইঙ্গিত তারা তাদের দলীয় ঘোষণাপত্র বা নির্বাচনী-বিতর্কের মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে পৌঁছে দেন। ফলে যে দল ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয় সেই দলের দ্বারা প্রচারিত লক্ষ্যমাত্রাগুলিই তখন উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু তখনই সেগুলিকে রাষ্ট্রের লক্ষ্যমাত্রা বলে নির্দেশ করা যায় না। এই ক্ষেত্রে এর সফল রূপায়ণের জন্য সরকার তখন যোজনা পর্যদ বা পরিকল্পনা পর্যদকে এই অভিলক্ষ পূরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারণ করার ভার দেয়। এই পরিকল্পনা পরবর্তীকালে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয় জাতীয় উন্নয়ন পর্যদের কাছে। উন্নয়ন পর্যদ (NDC) এই পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও পরিমার্জনের পর তা অনুমোদন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীরা রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রীরা এবং পরিকল্পনা পর্যদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় জাতীয় উন্নয়ন পর্যদ। পর্যদ দ্বারা অনুমোদিত এই পরিকল্পনা থেকে প্রতিফলিত হয় রাষ্ট্রীয় ঐক্যমত। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা যখন সংসদে গৃহীত হয় তখন এটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং একটি জাতীয় দলিল হিসেবে গণ্য হয়। আর এর লক্ষ্যমাত্রাগুলিই তখন রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যমাত্রায় রূপান্তরিত হয়।

আপনি হয়তো দ্বিতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলি প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবর্তিত হয় নি। শুধুমাত্র তাদের তুলনামূলক গুরুত্ব বা প্রাধান্য পরিবর্তিত হয়েছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে এখনও আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রাগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে সাধন করতে পারিনি।

১৪.৬ সারাংশ

এখন পর্যন্ত আমরা যা শিখলাম তা এক জায়গায় সন্নিবিষ্ট করা যাক্। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো উন্নয়নের সংজ্ঞা আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি। বৃদ্ধি, অগ্রগতি, আধুনিকীকরণ হচ্ছে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক। আমরা আরো জানলাম কীভাবে সহনীয় (বা অনুমোদনযোগ্য) বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। আমরা ভারতের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহের একটি তালিকা গঠন করলাম এবং তাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ তাৎপর্য আলোচনা করলাম। আমরা লক্ষ্যমাত্রাগুলির পরস্পর বিরোধীতা ও তাদের পরিপূরক প্রকৃতি আলোচনা করে তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কগুলি অনুধাবন করেছি এবং জেনেছি সময় পরিসীমার তাৎপর্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জেনেছি সাধারণভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা, সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও সম্পদের মধ্যে সম্পর্কটি কি রকম। এবং তারপর আমরা দেখেছি কি কি বিষয় লক্ষ্যমাত্রাগুলি নির্ধারণ করে এবং কীভাবে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলিকে একটি পরিপূর্ণতা দান করে। পরিশেষে আমরা আলোচনা করেছি পরিকল্পিত উন্নয়নের গুরুত্ব।

অনুশীলনী ৩

১। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক (✓) কোনটি ভুল (✗) তা নির্ধারণ করুন ঃ

(ক) সাধনের লক্ষ্যেই উদ্দেশ্যগুলি গ্রহণ করা হয় কিন্তু তারজন্য প্রয়োজন সময়। ( )

(খ) আমাদের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি সময় নির্দিষ্ট নয় এবং এগুলির জন্য কোনো নির্দিষ্ট ও স্থির লক্ষ্য স্থাপন করা হয়নি। ( )

(গ) ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি দেশের আকাঙ্ক্ষার একটি সাধারণ বক্তব্য প্রতিফলিত করে এবং যা প্রতিটি পরিকল্পনাতেই ব্যক্ত। ( )

(ঘ) উদ্দেশ্যসমূহের অসফল অংশগুলি কখন পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে অভিলক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হওয়া উচিত নয়। ( )

২। বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত শব্দ বা শব্দগুলির সাহায্যে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে .... (স্বল্প/উচ্চ) মাথাপিছু আয় এবং অধিকতর .... (সুষম/অসম) আয়ের বণ্টন।

(খ) ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে .... (জনবিস্ফোরণ/জনস্বল্পতা) থেকে।

(গ) অপর একটি সমস্যা হচ্ছে .... (উচ্চ/ স্বল্প) সঞ্চয়ের হার।

(ঘ) উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিলক্ষ্য নির্ধারণের .... (একাধিক/ মাত্র দুটি) পূর্ব শর্ত বিদ্যমান।

৩। লক্ষ্যমাত্রা, সময়সীমা ও সম্পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর পাঁচ লাইনের একটি টীকা লিখুন।

....
....
....
....
....
....

৪। ৮০-১০০ শব্দের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

১৪.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

প্রান্তিক ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো বিশেষ পরিবর্তনের ফলে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় বা সুফল পাওয়া যায় অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা ও শেষ প্রস্তাবিত পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য, যা পরিমাপ করা হয় অতিরিক্ত এক এককের পরিবর্তনের দ্বারা।

মূলধন দ্রব্য ঃ যে সমস্ত দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং যা সাধারণত এক বছর বা একাধিক উৎপাদনকাল ধরে ব্যবহৃত হয়।

মূলধন সম্পদ ঃ টেঁকসই যন্ত্রপাতি, অট্টালিকা বা নির্মাণকার্যসমূহ রাস্তাঘাট ইত্যাদি বিষয়গুলি মূলধন সম্পদের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে শ্রম ও অন্যান্য সম্পদের সাহায্যে সৃষ্ট যে কোন বস্তুই, যা উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সমর্থ তাকেই মূলধন সম্পদ বলা হয়ে থাকে।

অরণ্য নাশ ঃ নির্বিশেষে গাছ কাটা এবং শিল্পের জ্বালানীর প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে বৃহৎ আকারের ক্ষতিসাধনকে অরণ্য বিনষ্টীকরণ বলা হয়ে থাকে। দেশের মোট প্রয়োজনীয় শক্তির ৬০ শতাংশ আসে জ্বালানী কাঠ থেকে। দেশের জ্বালানী কাঠের বিশাল ঘাটতি মেটানোর জন্যেই চলে নির্বিচারভাবে অরণ্যের বিনষ্টীকরণ।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোনো দেশ তার দীর্ঘকালীন 'বৃদ্ধি' অর্জন করতে পারে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। মূলধন গঠন, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, শ্রমের কুশলতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোগ-ক্ষমতার উন্নতি সবই এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এই প্রক্রিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে যা বৃহত্তর জনসংখ্যার স্বার্থের পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত।

আর্থিক বৃদ্ধি বা আর্থিক বিকাশ ঃ সময়ের সাথে উৎপাদন ক্ষমতার সহনীয় মাত্রায় বৃদ্ধিকে আর্থিক বৃদ্ধি বা বিকাশ বলে। এই বৃদ্ধি মূলত পরিমাপ করা হয় মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি দিয়ে। সমাজে উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য ও সেবার সমষ্টি হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঃ সমন্বয়, দক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারসহ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অভিলক্ষ্যে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সরকারী হস্তক্ষেপই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। সম্পদের পরিমাণের পরিমাপ এবং সেই সম্পদের সবচেয়ে দক্ষ ব্যবহার করে পরিকল্পনা রূপায়ণ করা এই বিষয়ের অন্তর্গত। একই সঙ্গে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলির নির্দিষ্টকরণকেও এই বিষয়ের মধ্যেই ধরা হয়ে থাকে।

শক্তি-সম্পদ ঃ এটি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অতি মূল্যবান উপাদান, যার মাধ্যমে জীবনধারণের মান উন্নয়ন সম্ভব। এই জাতীয় সম্পদকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— (১) পুনর্নবীকরণ যোগ্য ও (২) পুনর্নবীকরণের অযোগ্য। কয়লা, খনিজ তেল, গ্যাস এবং ইউরেনিয়াম হচ্ছে পুনর্নবীকরণের অযোগ্য অন্যদিকে পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তিগুলির মধ্যে জ্বালানী কাঠ, কৃষি-বর্জ্য, মানব ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার-এর বর্জ্য বস্তু, বায়ু, সৌরশক্তি এবং সামুদ্রিক শক্তি হচ্ছে প্রধান।

পক্ষপাতশূন্য সামাজিক ব্যবস্থা ঃ এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আয় ও সম্পদ সমাজের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বণ্টিত হয়, এই বণ্টনের সময় লক্ষ্য রাখা হয় যাতে বণ্টনের ক্ষেত্রে সৎভাবে পক্ষপাত ছাড়া একটি সুনির্দিষ্ট নীতির সাহায্যে আয় সম্পদ বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বণ্টিত হয়।

আমদানি পরিবর্ততা ঃ যখন আমদানির পরিবর্তে সেই দ্রব্যটির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন শুরু করে তার ব্যবহার করা হয়।

আয় বণ্টন ঃ দেশের মোট আয় বা উৎপাদন যেভাবে বিভিন্ন সদস্য-এর মধ্যে বণ্টিত হয় তার পরিমাণগত সারাংশকে আয় বণ্টন বলা হয়।

আধুনিকীকরণ ঃ আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের একটি কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন এবং এটি একক ও যৌথভাবে মানব সমাজের সৃজনশীলতার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে। এর ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রগত বিভাজনের পরিবর্তন হয়, কাজকর্মের ধারার সম্প্রসারণ হয় এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয় সাংস্কৃতিক ও প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে নতুন দিক উদ্ভাবন করে সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে আধুনিক ও স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ঃ পরিকল্পনা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্যমত উপস্থিত হবার জন্যে এটি সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্বার্থে সম্পদ ও প্রচেষ্টাগুলির গতিশীলতা আনার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হয়। দেশের সমস্ত অংশে উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক নীতি গ্রহণ করাও এই প্রতিষ্ঠানটির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীগণ ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদ কেন্দ্রও রাজ্যগুলিকে সুপারিশ করে থাকে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ যে কোনো বস্তু যা তার স্বাভাবিক/ প্রাকৃতিক রূপে উৎপাদনের কাজে উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাকেই প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়, যেমন কৃষিজমি, অরণ্য, খনিজদ্রব্যসমূহ এবং বিভিন্ন প্রাণীজ সম্পদ যেমন মৎস্য, জীবজন্তু, গাছ, জলসম্পদ এবং জলবায়ু সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য।

পরিকল্পনা কমিশন ঃ ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে এটি ভারত সরকারের কার্য নির্বাহক আদেশে গঠিত হয়, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থনৈতিক বিষয়ে সুপারিশ করা। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই কমিশনের তার কার্যাবলী চালিয়ে যাবার কথা। দেশের বস্তু সমূহ, মূলধন ও মানব সম্পদের সার্বিক মুল্যায়ণ করে, সেই সম্পদগুলির যাতে সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণ করা এই কমিশনের অন্যতম কাজ। অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা এবং পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনও এই কার্যাবলীর অন্তর্গত। পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য কি ধরনের প্রক্রিয়া কার্যকরী অথবা পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে কি ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন প্রয়োজনীয় যে সম্বন্ধে সুপারিশ প্রদান করাও এই কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত। দেশের প্রধানমন্ত্রী এই কমিশনের প্রধান বা চেয়ারম্যান।

আয়ের দারিদ্র্য সীমা ঃ এটি একটি সরকারী পরিসংখ্যান যার দ্বারা নির্ধারিত হয় কোনো ব্যক্তি দরিদ্র কি না।

সম্পদ ঃ সম্পদ বলতে বোঝায় সেই সমস্ত বস্তুগত সম্পদ যা ব্যবহার করে দ্রব্য বা সেবা উৎপন্ন করা হয়। জমি, খনিজ-শক্তি ও কাঁচামাল প্রভৃতি সম্পদের অন্তর্গত; এছাড়া মানব-শ্রম, জ্ঞান ও কুশলতা ও মানব সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত সম্পদকে উৎপাদনের উপকরণও বলা হয়ে থাকে বিশেষত তাদেরকে যখন নিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত করা হয়।

স্বনির্ভরতা ঃ একটি দেশের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবার প্রয়োজন তা উৎপন্ন করতে যদি তারা প্রযুক্তিগতভাবে বা প্রয়োজনীয় সম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল না হয় তবে তাকে আমরা বলব স্বনির্ভরতা। স্বনির্ভরতার আরেক অর্থ যথোপযুক্ত আয়ের সৃষ্টি করা যার দ্বারা দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। বহির্দেশ থেকে আনীত আমদানির ব্যয় নির্বাহের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকে স্বনির্ভরতা বলা চলে।

স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ঃ এর অর্থ হল দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার চাহিদা মেটানোর জন্য অন্য রাষ্ট্রের থেকে আমদানির উপর নির্ভর না করে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাধ্যমে সেই প্রয়োজন মেটানো।

প্রযুক্তি বা উৎপাদন কৌশল ঃ সাধারণভাবে প্রযুক্তি বা উৎপাদন কৌশল বলতে আমরা সামগ্রিকভাবে কারিগরি জ্ঞান, উৎপাদন পদ্ধতি, আবিষ্কার, উদ্ভাবন-এর মিলিত রূপকে বুঝি যার মাধ্যমে আমরা অপ্রতুল সম্পদ থেকে আরো বেশি দ্রব্য সম্ভার উৎপাদন করতে পারি। প্রযুক্তি হচ্ছে উৎপাদনের এক বিশেষ জ্ঞান যা নির্দেশ করে কীভাবে সম্পদকে উৎপাদিত দ্রব্যের রূপ দেওয়া যায়। প্রযুক্তিগত উন্নতি বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থেকে আরো বেশি দ্রব্য উৎপাদন। বর্তমান প্রযুক্তি বিভিন্ন উদ্ভাবনের ফলস্বরূপ। এই সমস্ত উদ্ভাবনের ফলে কিছু নতুন সম্পদের আবিষ্কার করা হয়েছে। যেমন—অ্যালুমিনিয়াম, রেডিয়াম, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। সঙ্কর-চারা, বিদ্যুৎ এবং কৃত্রিম রসায়ন প্রভৃতি সম্পদও নতুন উদ্ভাবনের ফল। যে সমস্ত উদ্ভাবন শ্রমিক ও মূলধনের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক তা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সমার্থক। দ্রব্য ও সেবার প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও উদ্ভাবন শক্তি ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ প্রযুক্তি হচ্ছে এক ধরনের সম্পদ যা প্রাকৃতিক ও মানব-সম্পদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক এবং যার সাহায্যে মানব-নির্মিত সম্পূর্ণ নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা যায়।

১৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

Meier, Gerald M. (1984) : *Leading Issues in Economic Development,* 4th Ed., Chapter 1 (pp. 5-19), New York, O.U.P.

Nafziger, E. Wayne (1984) : *The Economics of Developing Countries,* Chapter 2, Belmont Wadsworth.

Todaro, Michael P. (1987) : *Economic Development in the Third World,* 3rd Ed. Chapter 3, (pp. 84-91), New Delhi, Orient Longmans Ltd.

১৪.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১) গ
২) খ
৩) গ
৪) ক

৫) প্রযুক্তি, উচ্চাহারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং যথেষ্ট পরিমাণের ও গুণগত মানের শ্রমিক।

৬) (ক) ✘
(খ) ✓
(গ) ✓
(ঘ) ✓
(ঙ) ✓

অনুশীলনী ২

১) দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আধুনিকীকরণ, স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার হল আমাদের পরিকল্পনার চারটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

২) (ক) করে না
(খ) প্রয়োজনীয়
(গ) যুগ্ম
(ঘ) অন্তর্গত

৩) (ক) ✓
(খ) ✓
(গ) ✘
(ঘ) ✘

৪) ১৪.৪.২ অনুচ্ছেদটি পাঠ করে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

অনুশীলনী ৩

১) (ক) ✓
(খ) ✓
(গ) ✓
(ঘ) ✘

২) (ক) স্বল্প, অসম
(খ) জনবিস্ফোরণ
(গ) স্বল্প
(ঘ) একাধিক

৩) ১৪.৫.২ অনুচ্ছেদটি পাঠ করে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

৪) ১৪.৬.২ অনুচ্ছেদটি পাঠ করে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

একক ১৫ ❒ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

গঠন

১৫.০ উদ্দেশ্য
১৫.১ প্রস্তাবনা
১৫.২ বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় 'পরিকল্পনা'
১৫.৩ পরিকল্পনার পক্ষে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা
১৫.৩.১ সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণ
১৫.৩.২ মহামন্দা ও নয়া চুক্তি
১৫.৩.৩ যুদ্ধকালীন অর্থনীতি
১৫.৩.৪ কল্যাণমুখী রাষ্ট্র
১৫.৪ বাজার ব্যবস্থার বিপর্যয়
১৫.৫ অনুন্নতির রূপান্তর
১৫.৫.১ অনাগ্রসরতার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য
১৫.৫.২ সম্পদের উপকরণের আপেক্ষিকতা
১৫.৫.৩ সম্পত্তির মালিকানা ও আয় বণ্টনের বিন্যাস
১৫.৫.৪ সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূলধন-এর পুঞ্জীভবন
১৫.৫.৫ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১৫.৬ পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রের ভূমিকা
১৫.৭ সারাংশ
১৫.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ
১৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী
১৫.১০ উত্তরমালা

১৫.০ উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই এককে আমরা পরিকল্পিত উন্নয়নের বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হব। এই একক অধ্যয়নের পর আশা করা যায় যে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবেন ঃ

- বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার পরিকল্পনা।
- পরিকল্পনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।
- বাজার ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে তা সংশোধনের জন্য কীভাবে 'পরিকল্পনা'কে কাজে লাগানো যায়।
- অর্থনৈতিক অনুন্নতির বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ভূমিকা।

১৫.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা নিম্নলিখিত বিষয় দুটির আলোচনা করব— (১) পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্যিই কি অপরিহার্য (২) কোন্ বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজনীয় ছিল।

১৫.২ বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় 'পরিকল্পনা'

কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক সচেতন নকশাকে আমরা পরিকল্পনা বলে থাকি। এটি অবশ্যই রাষ্ট্র পরিচালিত একটি কার্যক্রম। তার কারণ রাষ্ট্র হচ্ছে সার্বভৌম এবং ব্যক্তি, পরিবার, উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, নিগম, সংঘ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উর্ধ্বে রাষ্ট্রের অবস্থান। এই প্রেক্ষাপটে আমরা ধরে নিতে পারি যে রাষ্ট্র সমস্ত আর্থিক সমস্যার সম্যক জ্ঞানের অধিকারী এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা সম্পর্কে অবহিত। রাষ্ট্রের প্রকৃত ভূমিকা বিভিন্ন দেশে ভিন্ন রূপ হয়। তার কারণ বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও অর্থ ব্যবস্থা এক নয়। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে আমাদের দেশের মতো বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো নেই। শুধু তাই নয় এই সমস্ত রাষ্ট্রে উৎপাদন ব্যবস্থায় উপকরণের মালিকানা সমাজ বা রাষ্ট্রের এবং স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও সুসংহত। অন্যদিকে আছে জাপান ও অন্যান্য শিল্পোন্নত পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ যাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল। সেখানে অধিকাংশ উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ব্যক্তিগত এবং এই সমস্ত দেশগুলিতে মূলত বহুদলীয় রাজনৈতিক কাঠামো বিদ্যমান। এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকাও সীমাবদ্ধ থাকে, যাকে নির্দেশক পরিকল্পনা বলে। অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে রাষ্ট্র স্থির করে কোন্ ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে কতটা সহায়তা দান করতে হবে এবং অর্থনীতির গতি কোন্ দিকে ধাবিত হওয়া উচিত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ১৯৬০ সালে জাপান সরকার মনে করে যে ১০ বছরের মধ্যে আয় দ্বিগুণ করে নেওয়া উচিত এবং তাই তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক নীতি গ্রহণ করে।

এই দুই শ্রেণীর দেশ ছাড়াও আর এক শ্রেণীর দেশ আছে যারা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ নামে পরিচিত। এরা মূলত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ। এখানে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা গৃহীত হয়েছে। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়কালে এই সমস্ত দেশগুলি তাদের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে জন্মলাভ করেছে। এই সমস্ত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা ব্যবস্থার কাঠামো এক রকম নয়, যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার ব্যাপারে রাষ্ট্র অতিরিক্ত সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে। এই সমস্ত দেশগুলির অর্থব্যবস্থা 'মিশ্র অর্থনীতি' নামে পরিচিত, যেখানে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সমান্তরালভাবে সহাবস্থান করে। পরিকল্পনা ব্যবস্থার পাশে পাশে বাজার ব্যবস্থাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষত, ব্যক্তিগত বিনিয়োগও উৎপাদন সংক্রান্ত নীতিগুলি বাজার ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত। স্বাভাবিক কারণে তাই এই সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একাধারে নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত এবং অপরদিকে বাজার ভিত্তিক গতিপ্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই উদাহরণ প্রযোজ্য।

অনুশীলনী ১

১। **নির্ভুল (✓) বা ভুল (✗) নির্দেশ করুন ঃ**

(ক) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই পরিকল্পনা ব্যবস্থা সুসংহত। ( )

(খ) নির্দেশিত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশের ক্ষেত্রে পরামর্শ-দানকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। ( )

(গ) একটি মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাই বিদ্যমান।( )

(ঘ) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বলতে আমরা সেই ক্ষেত্রগুলিকেই বুঝি যার মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে এবং যেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ( )

(ঙ) মিশ্র অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থার ভূমিকা নগণ্য। ( )

২। **সমাজতান্ত্রিক মিশ্র অর্থনীতি ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলির মধ্যে পাঁচ লাইনের সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।**

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

১৫.৩ পরিকল্পনার পক্ষে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা

এই শতাব্দীতে বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে পশ্চিমি দেশগুলির কিছু কিছু ঘটনা থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলি পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে যুদ্ধোত্তর কালে এই পথে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আসুন আমরা এক-একটি উদাহরণ দিয়ে উপরের বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি।

১৫.৩.১ সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণ

১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার পর বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়া পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। উৎপাদনের উপকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার অবলুপ্তি ঘটানো হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মুক্ত বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তে 'পরিকল্পনা' ও 'রাষ্ট্রীয়-উদ্যোগ' উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়। এই পরিবর্তনের সাফল্য ছিল অচিন্ত্যনীয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উচ্চ হারে সঞ্চয়

সংগ্রহ ও বিনিয়োগ সম্ভব হয়ে ওঠে। এর ফলে মূলধন গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধির হার অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে উন্নীত হয়। মোটামুটি চার দশকের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া তার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা কাটিয়ে একটি উন্নত দেশ হিসেবে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে উন্নতিকামী দেশগুলির কাছে তাদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য এই উদাহরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সোভিয়েত উদাহরণ থেকে আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও উন্নয়নের পরিকল্পনা যথেষ্টভাবে অনুপ্রাণিত হয়।

১৫.৩.২ মহামন্দা ও নয়া চুক্তি

আপনি হয়ত ১৯২৯ সালের মহামন্দার কথা শুনেছেন বা 'বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট' নামে সুপরিচিত। এই সময়ে সারা বিশ্বে, বিশেষত পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বাজার ব্যবস্থা হঠাৎ ভেঙে পড়ে। উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদাকে ছাড়িয়ে যায়। অবিক্রিত দ্রব্যের স্তূপ বাড়তে থাকে। চতুর্দিকে কলকারখানা বন্ধ হতে থাকে, শেয়ার বাজারে ধস নেমে আসে ক্রমবর্ধমানভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই সমস্তই হচ্ছে উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে অসামঞ্জস্যের ফলাফল। আগে মনে করা হত বাজার ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিগত উদ্যোগ নির্ভর অর্থনীতিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ধরে রাখা সম্ভব। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মহামন্দার অভিজ্ঞতা আমাদের নতুন করে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নিয়ে আসে; বিশেষত যখন পরিকল্পনা নির্ভর সোভিয়েত অর্থনীতিতে এই মহামন্দার প্রভাব একেবারেই পড়ল না। মহামন্দার সঙ্কট তাহলে কীভাবে কাটানো গেল? অবশ্যই সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পশ্চিমের যে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মহামন্দার প্রভাব খুব বেশি পড়েছিল সেখানে সরকার তার ব্যয়-এর বহর বাড়িয়ে কৃত্রিম উপায়ে চাহিদাকে চাঙ্গা করে তুলল আর সেই বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য নতুন টাকা ছাপানো হল যাতে ঘাটতি ব্যয় বলা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থায় অতিরিক্ত আয় ও নিয়োগ সৃষ্টির মাধ্যমে আস্তে আস্তে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা বাড়তে থাকল এবং এই নীতির ফলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে থাকল। উন্নয়নের প্রক্রিয়াও পুনর্জীবিত হয়ে উঠল। এইরকম সরকারি হস্তক্ষেপের নীতিকে 'কেইনসীয় সমাধান' বলা হয়ে থাকে। প্রখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ জে. এম. কেইনস-এর নামানুসারেই এই সমাধান নীতির নামকরণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের সরকারি হস্তক্ষেপ-এর নীতিকে নয়াচুক্তি বলা হয়েছিল।

মহামন্দার ফলাফল বহুমুখী কিন্তু অন্যতম যে পরিবর্তন এর ফলে পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল সরকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জগতে এক নীরব দর্শক, বাজার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ ও অচল। এই দৃষ্টিভঙ্গির এক ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় মহামন্দার পর। এরপর ধনতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থায় সময়ের প্রয়োজনের সাথে সাথেই সরকার সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত একেবারে যুদ্ধকালীন ও জরুরী অবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ গ্রহণ করা হত। দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতির কথা মাথায় রেখে সরকার নির্দেশক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে এবং সর্বশেষ এই যে সামাজিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়-এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। উন্নত দেশগুলির এই আর্থিক নীতির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিও এক ধরনের শিক্ষা-প্রাপ্ত হয় তা হচ্ছে বাজার ব্যবস্থা নির্ভর ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেও সরকারি হস্তক্ষেপের অপরিসীম গুরুত্ব।

১৫.৩.৩ যুদ্ধকালীন অর্থনীতি

মহামন্দার অভিজ্ঞতার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ দীর্ঘ সময় ধরে হয়েছিল এবং তা ছিল সর্বাত্মক। শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক ও ফ্যাসিস্ত জার্মানি ও জাপানে যুদ্ধের প্রয়োজনেই সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন উপলব্ধি হয়নি, সমগ্র অর্থনীতির উৎপাদন পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণও এই সময় জরুরী হয়ে পড়েছিল। এই ধরনের ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন অর্থনীতির পরিকল্পনা নামে পরিচিত। যুদ্ধের পরও পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ-এর কাজের জন্যও সক্রিয় সরাসরি হস্তক্ষেপ ছিল সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের পরিকল্পনার পক্ষে এটি হচ্ছে তৃতীয় ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা।

১৫.৩.৪ কল্যাণমুখী রাষ্ট্র

এই সমস্ত দ্রুত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং বহু ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রই এই কল্যাণমুখী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তন শুরু করে। সরকার হস্তক্ষেপমূলক নীতি ছাড়াও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে সমস্ত ঋণাত্মক প্রভাব অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয় তা দ্রবীভূত করার দৃষ্টিভঙ্গি ই মূলত ব্যাপক অর্থে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র-গঠনের অভিলক্ষ্য। পশ্চিমের উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সরকার বয়সকালীন নিরাপত্তা, বেকারদের সুবিধাদান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক সেবামূলক কারণে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় করে থাকে। এই সমস্তকে এক কথায় সামাজিক নিরাপত্তা বা কল্যাণমুখী ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। এই সমস্ত সুবিধা প্রদানের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিকাশের একটি অন্যতম বিরুদ্ধ ফলাফল হচ্ছে পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের ভারসাম্যের বিনাশ ঘটানো, ফলে কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের ভারসাম্য যাতে সুরক্ষিত হয় তার উপযুক্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণকে সুনিশ্চিত করা। মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় মুনাফার অভিলক্ষ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সুনিশ্চিত এবং তা সততই সংশয়যুক্ত। এটি তাই আরো একটি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যা থেকে আমরা পরিকল্পনার প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতে পারি।

অনুশীলনী ২

পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন

১। **আপনার মতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি যা পরিকল্পিত উন্নয়নের নীতি গ্রহণকে প্রভাবিত করে?**

....

....

....

....

....

....

....

....
....
....
....
....

২। 'নয়া চুক্তি' পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে মহামন্দার হাত থেকে মুক্ত করে। এই নয়া চুক্তি কি এবং কীভাবে এটা অর্থনীতিতে কার্যকর হয়েছিল ?

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

৩। কল্যাণমুখী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ?

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

....

....

....

....

১৫.৪ বাজার ব্যবস্থার বিপর্যয়

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করা হল তা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম কোন্ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন-এর অর্থনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নীতি প্রণয়নের রূপরেখা অঙ্কন করা উচিত। এখন আমরা অনুসন্ধান করব বাজার ব্যবস্থার দুর্বলতা ও অসামঞ্জস্যগুলি, কেন বাজার ব্যবস্থা বিপন্নতাবোধে ভোগে। আমরা বলতে পারি, উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে পুরোপুরিভাবে বাজার-ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এই ধরনের আলোচনার সময় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করাই উপযুক্ত। এখন আমরা সংক্ষেপে বাজার ব্যবস্থার দুর্বলতা ও বিপর্যয় আলোচনা করব।

(ক) আমাদের একটি অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় উৎপাদনের জন্য সম্পদের সর্বাপেক্ষা অনুকূল বিভাজন বা বণ্টন, যাতে করে আমরা আমাদের সামাজিক লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি। নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতির পরম্পরা থেকে আমরা জেনেছি যে এই ধরনের সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব হয় যখন বাজার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাব প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই যে বাজারে সাধারণত পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না। তা সে দ্রব্যের বাজারই হোক অথবা উপাদানের বাজারই হোক। তাই বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয়, সর্বাপেক্ষা অনুকূল সম্পদের বণ্টন বা বিভাজন অসম্ভব। সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে, বাজার নির্ধারিত দাম কখনই প্রকৃত সামাজিক দুষ্প্রাপ্যতাকে প্রতিফলিত করে না এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বা উৎপাদনের উপকরণের 'মূল্য' নির্ধারণ তাই কখনই বাস্তবে সম্ভব নয়।

(খ) এমনকি যখন বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে তখনও চাহিদা ও যোগান সমতা এনে ভারসাম্য বজায় রাখলেও তা যে সবসময় পূর্ণ নিয়োগ অবস্থার ভারসাম্য হবে তা বলা যায় না। সব সময়ই যে সমস্ত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হবে তা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। মহামন্দার সময় বেকারী চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বহু সংখ্যক শ্রমিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও অলস জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি স্বাভাবিক অবস্থাতেও স্থায়ীভাবে বেকারত্ব থেকে যাওয়া বাজার অর্থনীতির একটি অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। কর্মহীন ব্যক্তির উপর সামাজিক প্রভাব ছাড়াও বাজার-ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্য অব্যবহৃত সম্পদের মধ্যে নিহিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সহায়তার বাস্তবায়নে বাধাস্বরূপ হয়।

(গ) মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সুবিধা বা বাহ্যিক অসুবিধাকে গ্রহণ করা যায় না। অথচ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে বলা যায় যে, অর্থনীতির এই বাহ্যিক প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকাকে গ্রহণ করা উচিত। বাহ্যিক সুবিধা সাধারণত দু ধরনের ঃ (১) কারিগরি (২) আর্থিক। শিল্পে গ্যাস, রাসায়নিক ও অন্যান্য বর্জ্যবস্তুর নির্গমন-এর দরুণ যে পরিবেশ দূষণ হয় তা কারিগরিজনিত বাহ্যিক অসুবিধা। নলকূপের

সেচের খরচ কমে আসে যদি সেচের জল খাল-বাহিত সেচের অঞ্চলের আওতাভুক্ত হয় কারণ এর দরুণ ভূগর্ভস্থ জলতলের মাত্রা উপরে উঠে আসে। এটি কারিগরিজনিত বাহ্যিক সুবিধা। প্রথম উদাহরণটিতে আমরা দেখতে পাই যে সমাজের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। কিন্তু বাজার-ব্যবস্থা এর জন্য শিল্প মালিকদের ওপর আর্থিক দায় কি হবে তা নির্ধারণ করতে পারে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নলকূপের মালিকেরা কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে।

এখন আর্থিক-বাহ্যিক সুবিধাকে চিত্রিত করা যাক্। এই সুবিধা কিন্তু সুবিধাভোগী আগে থেকে অনুমান করতে পারে না। মনে করুন, আপনি একজন 'চা' প্রস্তুতকারক এবং আমি একজন 'চিনি' প্রস্তুতকারী। ধরা যাক, চা-এর চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে আপনি চা-এর উৎপাদন মাত্রা বাড়িয়ে তুললেন এবং তার ফলে আমি চিনির উৎপাদন মাত্রা বাড়িয়ে তুললাম, এর জন্য অমার একক পিছু উৎপাদন ব্যয় কমে গেল এবং আমি বাহ্যিক আর্থিক সুবিধা ভোগ করতে থাকলাম। চা-এর চাহিদা যদি হ্রাস পেত তাহলে আমাকে বাহ্যিক আর্থিক অসুবিধা ভোগ করতে হত। এই ধরনের বাহ্যিক সুবিধা বা অসুবিধা অর্থনীতিতে বিরল ঘটনা নয়। কিন্তু বাজার ব্যবস্থা উৎপাদনকারীকে এই সম্পর্কে কোনো আগাম ইঙ্গিত দিতে পারে না যাতে করে তারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরো সফল হতে পারে।

(ঘ) উৎপাদনের উপকরণ যখন ব্যক্তিগত থাকে তখন আয় বণ্টনের অসাম্য দেখা যায়; বাস্তবে এই বৈষম্য থাকে চরম। মুক্ত বাজার-ব্যবস্থায় কোনো দ্রব্য বা সেবার ক্ষেত্রে উৎপাদকেরা সেই সমস্ত মানুষের কথা বিবেচনা করে না যারা ন্যূনতম যোগান দাম দিতেও অক্ষম। আকালের সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য সম্ভারের ক্ষেত্রেও এই রকম হয়ে থাকে। এই অর্থে, মুক্ত বাজার ব্যবস্থা হচ্ছে দরিদ্র মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী।

(ঙ) ব্যক্তি তার নিজস্ব কল্যাণ-এর সাথে সঙ্গতি রেখে বর্তমান আয়কে ভোগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে বিভাজিত করে। জনগণ তাদের আদর্শ সঞ্চয় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাজার-ব্যবস্থার কাছ থেকে কোনো রকম সৎ পরামর্শ বা সহযোগিতা পায় না। উদাহরণ হিসেবে আমরা পুনর্নবীকরণের অযোগ্য একটি সম্পদ পেট্রোলিয়াম-এর কথা ভাবতে পারি। একটি দেশে এই সম্পদের মজুত সুনির্দিষ্ট। এই জ্বালানির উত্তোলন যখন ব্যক্তি-মালিকানায় বা মুক্ত বাজার ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত তখন এই সম্পদের ভবিষ্যৎ অভাবের কথা মাথায় রেখে তার ব্যবহার করা কখনো সম্ভব নয়। সব সময়ই তা মুনাফার অভিলক্ষ্য থেকে নির্ধারিত হয়। এর ফলে এই সম্পদের সংরক্ষণ-এর সমস্যা সৃষ্টি হয়। বর্তমান চাহিদার দ্বারা এর উত্তোলন নির্ধারিত হয় বাজার-ব্যবস্থার এই অদূরদর্শিতার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য সম্পর্কিত সমস্যাও সৃষ্টি হয় এবং যা ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-এর ধারাকেও সমস্যাসঙ্কুল করে তোলে।

(চ) পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজ-জীবনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র আছে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য অথচ ব্যক্তি-মালিকানায় মুনাফা নির্ভর উদ্যোগগুলি কোনোভাবে এই সব ক্ষেত্রে তার ভূমিকা পালন করতে পারে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ও তার সংরক্ষণ এই সমস্ত ক্ষেত্রের আদর্শ উদাহরণ যেখানে বাজার-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

উপরের তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। ইচ্ছে করলে আপনি আরো উদাহরণ এর সংযোজন করতে পারেন; যেমন, উৎপন্ন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন এবং এর মাধ্যমে জনগণের পছন্দ-অপছন্দের উপর

সূক্ষ্ম মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব। বাজার-ব্যবস্থার দুর্বলতা থেকেই সরকারি হস্তক্ষেপ ও উন্নয়নের পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়।

অনুশীলনী ৩

১। **বাহ্যিক সুবিধা ও বাহ্যিক অসুবিধা বলতে কি বোঝায় তা আপনার নিজের শব্দে তিনটি বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করুন।**

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

২। **সঠিক (✓) না ভুল (✗) নির্দেশ করুন ঃ**

(ক) মুক্ত বাজার-ব্যবস্থা স্বল্প আয়ের ব্যক্তিবর্গের প্রতি পক্ষপাত-দুষ্ট। ( )

(খ) মুক্ত বাজার-ব্যবস্থা মানে সর্বদা পূর্ণ-প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। ( )

(গ) মুক্ত বাজার-ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ লাগাম ছাড়া ভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে, যার দরুণ ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ব্যাহত হয়। ( )

(ঘ) মুনাফার অভিলক্ষ্যে চালিত মুক্ত বাজার-ব্যবস্থা সমস্ত দ্রব্য ও সেবা যা সমাজ প্রয়োজনীয় মনে করে তা তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। ( )

(ঙ) বাজার-ব্যবস্থা বিজ্ঞাপন দ্বারা বাজারকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। ( )

১৫.৫ অনুন্নতির রূপান্তর

অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন বা রূপান্তরকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয়। এই পরিবর্তন যত দ্রুত হারে ঘটবে অর্থনৈতিক উন্নয়নও তত দ্রুত ঘটবে। আজকের যে সমস্ত দেশ উন্নয়নশীল দেশ নামে পরিচিত আগে তাদের অনুন্নত দেশ বলে চিহ্নিত করা হত।

এই অনুন্নতার কারণ অনেকটাই ঐতিহাসিক এবং অনেকটাই ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সাথে জড়িত যা এখানে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব না। এখানে আমরা সেই সমস্ত প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিই আলোচনা করব যার পরিবর্তনের ফলে আর্থিক অগ্রসরতার সূচনা হয়। যদিও প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে এই

বৈশিষ্ট্য এবং তার মাত্রা সমান নয়। কিন্তু অনুন্নতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। আমরা এখানে সেগুলিই পর্যালোচনা করব।

১৫.৫.১ অনগ্রসরতার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

অনুন্নত দেশগুলি প্রধানত কৃষি-নির্ভর। মোট শ্রমিকের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষই নির্ভর করে কৃষি কাজের ওপর। কৃষি উৎপাদন প্রধানত পুরাতন প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল, যা মূলত পরিবারভিত্তিক ও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। সামন্ত প্রভুরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত এবং তারা কৃষিতে ন্যূনতম বিনিয়োগেও অনাগ্রহী। শিল্পক্ষেত্রের মধ্যেও পরম্পরাগত হস্তশিল্পই প্রধান। আধুনিক শিল্প প্রায় থাকে না বললেই চলে, যদিও তা থাকে তা দু-একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ যেমন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আধুনিক শিল্প বলতে ছিল পাট ও বস্ত্র শিল্প। পরিবহণ ও যোগাযোগসহ পরিকাঠামো ক্ষেত্রের অবস্থা থাকে অতি দুর্বল ও সীমিত।

১৫.৫.২ সম্পদের উপকরণের আপেক্ষিকতা

অনগ্রসরতার অন্যতম কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য থেকে একটি জিনিস প্রতীয়মান হয় তা' হচ্ছে এই সমস্ত দেশগুলিতে তুলনামূলকভাবে জমি বা শ্রম ও জমি হচ্ছে প্রধান উপকরণ-সম্পদ। মূলধনের স্বল্পতা এই সমস্ত দেশগুলিতে চরম। পরম্পরাগত কুশলতা দ্বারা সৃষ্ট মূলধন দ্রব্যগুলিই একমাত্র সম্বল। চীন ও ভারতবর্ষের মতো জনবহুল দেশগুলিতে জমি-শ্রমিক অনুপাত অত্যন্ত অল্প। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত শ্রমিক অন্যত্র জীবিকার সুযোগ না থাকায় কৃষিক্ষেত্রেই সরাসরি চলে আসে এবং এর ফলে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের একটা বড় অংশ অনুৎপাদনশীলভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে এবং যার ফলস্বরূপ শ্রমিক বা জন-মূলধন সম্পদটির মান অতি নিম্ন।

১৫.৫.৩ সম্পত্তির মালিকানা ও আয় বণ্টনের বিন্যাস

অনুন্নত দেশগুলিতে সম্পত্তি, বিশেষত জমির মালিকানা, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত যারা মূলত জমিদার এবং সামন্ত প্রভু। অন্যদিকে বাকি গ্রামীণ মানুষ কৃষক বা জমিহীন ক্ষেতমজুর হিসাবে কৃষিকার্যে যুক্ত, যাদের মধ্যে দাস শ্রমিকও বর্তমান। সম্পত্তির মালিকানার এই চরম বৈষম্য থেকেই শুরু হয়েছে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য। ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ উৎপাদিত ফসল চলে যায় একটি ছোট্ট শ্রেণীর হাতে, যারা জমির মালিক। অন্যদিকে অধিকাংশ গ্রামীণ মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কোনোক্রমে জীবন ধারণ করছে। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে চরম বৈষম্য আছে, তার কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপকরণ-সম্পদের তারতম্য ও আঞ্চলিক উন্নয়নের মাত্রার তারতম্য।

১৫.৫.৪ সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূলধন-এর পুঞ্জীভবন

আমরা অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে দেখেছি যে, এই সমস্ত দেশগুলির উৎপাদনে বদ্ধ

ভাব বজায় থাকে এবং নিম্নমাত্রার ভারসাম্যের অবস্থায় থাকে, ফলে এখানে সঞ্চয়-এর হার হয় স্বল্প আর তাই বিনিয়োগের মাত্রাও স্বল্প। প্রথম পরিকল্পনার সময় ভারতে সঞ্চয়ের হার ছিল জাতীয় আয়ের মাত্র ৬ থেকে ৭ শতাংশ। এক ধরনের দুষ্ট ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় হওয়ার পরিণাম দাঁড়ায় ঃ স্বল্প আয়-স্বল্প সঞ্চয়-স্বল্প বিনিয়োগ-স্বল্প আয়। স্বল্প সঞ্চয় আর স্বল্প বিনিয়োগের ফলে মূলধন গঠনের হার নীচে নেমে যায়। অধিকাংশ মানুষ কোনোক্রমে ন্যূনতম আয়টুকুও সংগ্রহ করতে পারে না ফলে তাদের পক্ষে সঞ্চয় সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে জমিদার ও খাজনা ভোগকারী বিত্তবান শ্রেণী যাদের সঞ্চয় সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট তাদের বিলাসবহুল ভোগের মাধ্যমে সঞ্চয় সৃষ্টির অন্তরায় ঘটায় বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষেরা কিছু পরিমাণ আর্থিক মূলধন গঠন করলেও উদ্যোগের অভাবে শিল্পে তার বিনিয়োগ হয় না। অন্য আর একটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আধুনিক শিল্প সংগঠনে যে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় তা এই স্বল্প আর্থিক মূলধন গঠনকারীদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

১৫.৫.৫ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অনুন্নয়ন-এর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিম্নমানের বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগকৌশলগত জ্ঞান। নিরক্ষরতা ও শিক্ষার অভাবে মানব-মূলধনের মানও যথেষ্ট নিম্ন, অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উৎপাদনের যে পদ্ধতি-প্রকরণ ব্যবহার করা হয় তাতে প্রযুক্তির উন্নতির সুযোগ অত্যন্ত কম।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই হচ্ছে অনুন্নত দেশসমূহে প্রধান এবং এগুলির পরিবর্তন-সাধন-এর মাধ্যমেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী ভাবে এইসব পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা সম্ভব? এই সকল পরিবর্তন ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনও আছে কারণ অনুন্নত দেশগুলির অভিন্ন লক্ষ্য হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে ওঠা যায়। শুধুমাত্র বাজার ব্যবস্থার অসফলতাই নয়, অনুন্নত দেশগুলির বাজার ব্যবস্থাও অনুন্নত। এর অন্যতম কারণ এই সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদন মূলত অবাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে সংগঠিত হয়, বিক্রয় বা বিনিয়োগের তাগিদে উৎপাদন সংগঠিত হয় না। তাই এই অনুন্নয়নের রূপান্তরের স্বার্থে সরকারি হস্তক্ষেপ অতি আবশ্যক। উন্নয়নের পরিকল্পনা ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

অনুশীলনী ৪

পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ

১। **অনুন্নত অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?**

....
....
....
....
....
....

....
....
....
....

২। অনুন্নত দেশগুলি যে দুষ্ট ঘূর্ণাবর্ত প্রবাহিত হয় তা’ কী? ব্যাখ্যা করুন।

....
....
....
....
....
....
....
....
....

১৫.৬ পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রের ভূমিকা

পরিকল্পনা পদ্ধতিকে কয়েকটি অনুক্রম হিসাবে সাজানো যেতে পারে যেমন গঠন পরিকল্পনা, প্রয়োগ ও সাফল্যের বা ব্যর্থতার মূল্যায়ণ। পরিকল্পনার মূল বিন্দু হচ্ছে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বণ্টন সম্পন্ন করা। বেসরকারি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মধ্যে বিভাজন যেমন পরিকল্পনার অন্তর্গত তেমনি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে যে বিভাজন তাও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মধ্যে বিনিয়োগ-এর বিভাজন বা বণ্টন কেমন হবে তা নির্ধারিত হয় তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ঃ (১) উন্নয়নের অভিলক্ষ্য, (২) উন্নয়নের দীর্ঘকালীন কৌশল এবং (৩) বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমতা বা সঙ্গতি। ইতিমধ্যেই আপনি পরিকল্পনার অভিলক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা প্রাপ্ত হয়েছেন, পরবর্তী অধ্যায়ে আপনি পরিকল্পনার কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন। আপাতত জেনে রাখুন যে কৌশল থেকে আমরা বুঝতে পারি কোন্ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অগ্রাধিকার পাবে এবং যার দরুন উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়ে উঠবে। আন্তঃক্ষেত্রে সমতার প্রয়োজনের জন্য একটি ক্ষেত্রের উৎপাদন অন্যক্ষেত্রে উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, উৎপাদিত কয়লা ইস্পাত শিল্পের উপকরণ; কৃষিজ উৎপাদন মজুরী-দ্রব্য হিসাবে শিল্পের উপকরণ। পরিকল্পনা সাধারণত রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। আমরা সবাই জানি যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় ও রাজ্য সরকারগুলি করে থাকে। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ সংস্থা যেমন, যোজনা পরিষদের সাহায্যও নিয়ে থাকে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া দলিল প্রস্তুত হওয়ার পর তা জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ-এর কাছে পাঠানো হয় সম্মতির জন্য। সম্মতি পাওয়ার পর তা প্রেরণ করা হয় সংসদ কক্ষে যা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রের একটি প্রত্যঙ্গ, এখানে সংখ্যাধিক্যের ভোটের মাধ্যমে এটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যবসিত হয় বা বাস্তব রূপায়ণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান

করার দায়িত্ব থাকে আরো একটি রাষ্ট্রীয় প্রত্যঙ্গের যার নাম আমলাতন্ত্র। পরিকল্পনার সফলতা ও ব্যর্থতার মূল্যায়ণ করে থাকে যোজনা পরিষদ বা প্ল্যানিং কমিশন। পরিকল্পনা-কালের মধ্যবর্তী সময়ে যে মূল্যায়ণ হয় তা মধ্যবর্তী পর্যালোচনা বা মধ্যবর্তী মূল্যায়ণ নামে পরিচিত। এই পর্যালোচনার প্রয়োজন মূলত পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নের তাগিদে যা এই সময়ই শুরু হয়ে যায়। চূড়ান্ত পর্যালোচনা শুরু হয় পরিকল্পনা-কালের শেষে এবং যা পরবর্তী পরিকল্পনা নথিতে সংযোজিত হয় উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ-এর আকারে।

মিশ্র অর্থনীতিতে ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সীমায়িত নয়। বিভিন্ন উপযুক্ত নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সমর্থন আদায়ের মাধ্যমেই উন্নয়ন-পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আর্থিক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতির সমর্থন ছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না। উন্নয়ন পরিকল্পনার স্বার্থে এমনভাবে এই নীতিগুলি প্রণয়ন করতে হবে যাতে সঞ্চয়ের সাথে সাথে তা বিনিয়োগ ব্যবস্থায় নিয়োজিত হতে পারে। সেই রকম কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমতা রক্ষার স্বার্থে উপযুক্ত জোতের ঊর্ধ্বসীমা ও জমির পুনর্বণ্টন সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অত্যন্ত জরুরি।

পরিশেষে, আমাদের মনে রাখতে হবে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বাজার ব্যবস্থা, বেসরকারি ক্ষেত্রের উৎপাদন ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক। বিশেষত, পরিকল্পনা নিজে থেকেই বাজার গড়ে ওঠার ও পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। যেমন—পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি এবং একই সঙ্গে বাজার-ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠতেও সাহায্য করে। যার ফলে পরিকল্পনা ও বাজার ব্যবস্থা—উভয়ের দ্বারাই উন্নয়নের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে থাকে।

অনুশীলনী ৫

মাত্র একটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ

১। আন্তঃক্ষেত্র সমতা কি?

....

....

....

....

২। পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কোন্ সময় করা হয়ে থাকে?

....

....

....

....

৩। উন্নয়নকে সাহায্য করতে সমর্থ নীতিগুলি কি কি?

....

....

....

....

....

১৫.৭ সারাংশ

এই অধ্যায়ে আমরা জানলাম কেন উন্নয়নের স্বার্থে পরিকল্পনার প্রয়োজন। বিভিন্ন রাষ্ট্র বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পনার সাফল্য কীভাবে সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন কারণে কেন সরকারি হস্তক্ষেপ অপরিহার্য তা জানতে পারলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাজার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং কেন ও কোথায় তা অক্ষম তাও অনুধাবন করা হয়েছে, পরিশেষে, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ কতখানি প্রয়োজনীয় এবং ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে কীভাবে এই হস্তক্ষেপ ঘটে তাও আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা ভারতে পরিকল্পনার কৌশলগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১৫.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক ঃ যে ব্যবস্থায় উৎপাদন-এর উদ্বৃত্তের একটি অংশ অর্থনীতি বহির্ভূত প্রক্রিয়ায় জমির মালিক কুক্ষিগত করে এবং যেখানে জমির মালিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত থাকে না।

মুক্ত বাজার ঃ যে ব্যবস্থায় সরকার বাজারকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগকারীরা নিজেদের পছন্দ মতো দামে উৎপাদন ও বিক্রি করতে পারে এবং কোনো রকম হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হয় না তাকেই মুক্ত বাজার ব্যবস্থা বলা হয়।

নির্দেশক পরিকল্পনা ঃ যে সরকারি অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা নির্দেশ না করে শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগকারীর ভবিষ্যৎ উৎপাদন সম্পর্কে দিক নির্দেশের কথা বলা হয় তাকে নির্দেশক পরিকল্পনা বলে।

অবাধ অর্থনীতি ঃ এই কথার আক্ষরিক অর্থ হল নিজের মতো চলা। এই ব্যবস্থায় সরকার কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করে না। অর্থনীতি তার নিজস্ব গতি-প্রক্রিয়াতে প্রবাহিত হয়, এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগকারীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করতে পারে।

মিশ্র অর্থনীতি ঃ যে ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ সহাবস্থান করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

খাজনাভোগী ঃ এই শ্রেণির মানুষের আয়ের অন্যতম অংশটি আসে সম্পদের খাজনা হিসাবে। এই সম্পদের মধ্যে আছে সরকারি ঋণপত্র, সাধারণ ঋণপত্র এবং শেয়ার ইত্যাদি। এই সমস্ত সম্পদের মধ্যে ঝুঁকি বহনের প্রয়োজন থাকে না এবং উদ্যোগ ব্যয়ও অনুপস্থিত থাকে।

১৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Lewis, W. Arthur (1960) : *Development Planning : The Essential of Economic Policy,* George Allen & Unwin; London.

Streeten, Paul and Michael Lipton (1972) : *The Crisis of Indian Planning,* Oxford University Press, London.

Chakravarty, Sukhamoy (1987) : *Development Planning - The Indian Experience,* Oxford, Clarendon.

১৫.১০ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১) (ক) ✓
(খ) ✓
(গ) ×
(ঘ) ✓
(ঙ) ×

২) ১৫.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

অনুশীলনী ২

১) ইঙ্গিত ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পনা। ১৫.৩.১ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

২) ১৫.৩.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

৩) ১৫.৩.৪ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

অনুশীলনী ৩

১) ১৫.৪ অনুচ্ছেদের (গ) অংশটি দেখুন।

২) (ক) ✓
(খ) ×
(গ) ✓
(ঘ) ×
(ঙ) ✓

অনুশীলনী ৪

১) ১৫.৫.১ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

২) ইঙ্গিত ঃ স্বল্প আয় — স্বল্প সঞ্চয় — স্বল্প বিনিয়োগ — স্বল্প আয়

অনুশীলনী ৫

১) আন্তঃক্ষেত্র সমতা বলতে বোঝায় যে, যখন কোনো একটি ক্ষেত্রের উৎপাদন যা অন্য ক্ষেত্রে উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা যতে ঐ ক্ষেত্রে উৎপাদনকে লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছতে পূর্ণ ভাবে সাহায্য করে বা যথেষ্ট হয়।

২) পরিকল্পনা গ্রহণের পর পরিকল্পনাকালের মধ্যবর্তী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এই পরিকল্পনার সাফল্যের যে মূল্যায়ণ করা হয় তাকে বলা হয় মধ্যবর্তী মূল্যায়ণ এবং এই মূল্যায়ণ পরর্বতী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করে।

৩) উন্নয়ন-পরিকল্পনাকে সহায়তা দান করতে উপযুক্ত আর্থিক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ অপরিহার্য।

একক ১৬ ❒ পরিকল্পনার কৌশলসমূহ - ১

গঠন

১৬.০ উদ্দেশ্য
১৬.১ প্রস্তাবনা
১৬.২ পরিকল্পনার সংজ্ঞা
১৬.৩ ভারতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য
১৬.৪ পরিকল্পনা কমিশনের (পর্ষদের) কার্যাবলী
১৬.৫ পরিকল্পনা প্রণয়ন
১৬.৬ পরিকল্পনার কৌশল
    ১৬.৬.১ শিল্পনীতি
    ১৬.৬.২ কৃষিনীতি
    ১৬.৬.৩ নিয়োগ-সংক্রান্ত নীতি
১৬.৭ পরিকল্পনার অনুষঙ্গসমূহ
১৬.৮ পরিকল্পনার অগ্রগতির পর্যালোচনা
১৬.৯ পরিকল্পনা কীভাবে আমাদের প্রভাবিত করে
১৬.১০ সারাংশ
১৬.১১ প্রধান শব্দগুচ্ছ
১৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী
১৬.১৩ উত্তরমালা

১৬.০ উদ্দেশ্য

পরিকল্পনার ধারণাটি পরিষ্কার করা এবং কীভাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হয়েছে, তা বিবৃত করাই হচ্ছে এই পাঠের অভিলক্ষ্য। এই অংশটির পাঠ শেষ করলে আপনি বুঝতে পারবেন ঃ

- কীভাবে পরিকল্পনা এদেশে উদ্ভূত হল।
- ভারতে পরিকল্পনার অভিলক্ষ্যসমূহ এবং পরিকল্পনার কৌশলগুলি।
- পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা, এবং
- কীভাবে পরিকল্পনা আমাদের সবার ওপর প্রভাব ফেলে।

১৬.১ প্রস্তাবনা

পরিকল্পনা কৌশলসমূহ আলোচনার আগেই আমাদের বোঝা দরকার কেন পরিকল্পনা এদেশে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। এই বিষয়ে একক ১৫তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা কয়েকটি অতি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের বিবরণ দেব। এই প্রসঙ্গ অবতারণা করতে গিয়ে প্রথমে আমরা প্রাক্-

স্বাধীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোটি আলোচনা করব। এই সময় ভারতবর্ষে শিল্প তার শৈশব অবস্থা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রাক্-স্বাধীনতা অর্থনীতি ছিল মূলত আমদানি নির্ভর, আর এই আমদানি প্রধানত হত ব্রিটেন থেকে; রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে প্রধান ছিল কৃষিজ কাঁচামাল ও খনিজ দ্রব্য, এই গঠন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ ধারাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারতবর্ষ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে তা থেকে যে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করত— সেটাই আবার তারা ভারতবর্ষে রপ্তানি করত। ভারতীয় কৃষি ছিল মান্ধাতার আমলের, যেখানে ছিল জমিদার সমেত একগুচ্ছ মধ্যস্বত্বভোগী এবং কৃষির ওপর নির্ভর করে থাকত অসংখ্য অসহায় মানুষ, ফলে এমনিতেই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল স্বল্প। এই উদ্বৃত্তের একটা বড় অংশ খাজনা হিসেবে সংগৃহীত হয়ে ব্রিটিশ পরিচালন ব্যবস্থার ব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হত। আর একটা অংশ দেশের বাইরে চলে যেত রপ্তানি হিসেবে।

এইরকম ঔপনিবেশিক পিছুটান নিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে আধুনিক শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠা ছিল অসম্ভব এবং প্রত্যক্ষ সরকারি হস্তক্ষেপ প্রায় অনিবার্য ছিল। এই আধুনিকীকরণের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল পরিকাঠামোর উন্নয়ন, মূল ও ভারী শিল্পের বিস্তার এবং একটি ব্যাপক শিল্পের বাতাবরণ। এইরকম একটি শিল্পের পরিবেশ বেসরকারি উদ্যোগে এদেশে আসেনি, তার কারণ হতে পারে সম্পদের অভাব অথবা উদ্যোগ এবং ইচ্ছার অভাব। বেসরকারি উদ্যোগের অভাবের একটা অন্যতম কারণ হতে পারে যে এই সমস্ত শিল্পে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পরিমণ খুব বেশি এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মধ্যে একটা দীর্ঘ সময় বিনষ্ট হয়। আর ঠিক এই কারণে স্বাধীনতার আগে থেকেই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল এবং একটি শক্তিশালী অর্থব্যবস্থা নির্মাণের পিছনে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা কি হতে পারে তা অনুধাবন করতে পেরেছিল। এই প্রেক্ষাপটে বেসরকারি উদ্যোগের অভাব মোচন করতেই রাষ্ট্রীয় শক্তি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে। একটি অনুরূপ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্পায়নের কৌশল হিসেবে সুসংহত পরিকল্পনাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল একটি 'বিকল্প' হিসেবে। একটি অনুন্নত অর্থনীতি থেকে একটি বলিষ্ঠ শিল্পোন্নত আর্থিক-রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে যে সাফল্যের নজির সোভিয়েত রাশিয়া তুলে ধরেছিল তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠন করে। এই সমিতির সভাপতি হিসেবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা করার দায়িত্বে ছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সব স্তরের মানুষই পরিকল্পনা নির্ভর আর্থিক বিকাশের ধারার স্বপক্ষে নিজেদের মতামত গঠন করেছিল। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৪৪ সালে জন্ম নিয়েছিল বিখ্যাত 'বোম্বাই-পরিকল্পনা'। জে. আর. ডি. টাটার নেতৃত্বে আট বৃহৎ শিল্পপতির মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল এই 'বোম্বাই-পরিকল্পনা'। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল যে আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ করে তোলা এবং সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ব্যয়ের মাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ১০,০০০ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপদানের দায়িত্ব ও প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে বেসরকারি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির কথা ভাবা হয়েছিল। যদিও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেই সময় সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন ছিল জাতীয় কংগ্রেস, যাদের ধারণা ছিল অন্যরকম। জাতীয় পরিকল্পনা সংসদ যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল সেগুলি হল দেশ থেকে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও রোগ নির্মূল করা এবং উৎপাদন বিকাশের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক উৎপাদন কৌশলকে উৎসাহ প্রদান করা এবং সুষম বণ্টন ব্যবস্থার প্রতি নজর রাখা। উন্নয়ন ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথে যাতে আয় ও সম্পদের সুষম পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠা করা যায় তার ওপরও সমান গুরুত্বের অঙ্গীকার ছিল এই সমিতির প্রস্তাবে। এই সমস্ত 'মূল্যবোধ'গুলিকে এক কথায় বলা যায়

‘সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা’ যা অর্জন করাই ছিল একমাত্র ‘লক্ষ্য’। এই উদ্দেশ্য সাধন করতেই ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে গঠিত হয় পরিকল্পনা কমিশন, আর সেই সময় থেকেই শুরু হয়ে যায় পরিকল্পিত অর্থনীতির যাত্রাপথ।

১৬.২ পরিকল্পনার সংজ্ঞা

‘পরিকল্পনা’ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে বোঝায় ভবিষ্যতের জন্য কৌশল রূপায়ণ। এই ভবিষ্যৎ বলতে ‘নিকট’ অথবা ‘দূর’ উভয় ভবিষ্যৎই বোঝাতে পারে। অর্থনীতির পরিভাষায় পরিকল্পনা বলতে বোঝায় একটি দেশের সম্পদ ভাণ্ডারের বর্তমান অবস্থা এবং এই সম্পদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা, যাতে ভবিষ্যতের জন্য ধার্য লক্ষ্যমাত্রাগুলি সাফল্যের সাথে অর্জন করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি তার ভবিষ্যতের আয়কে সুনিশ্চিত করতে চায় তখন সে তার বর্তমান আয়কে বর্তমান ভোগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে বণ্টন করে নেবে। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে বীমা করে নিতে পারে অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা করে দিতে পারে। তেমনি কোনো উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যদি তার উৎপাদনকে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ করে তুলতে চায় তাহলে তাকে স্থির করতে হবে কি পরিমাণ অর্থ সে অভ্যন্তরীণ-সম্পদ হিসেবে রাখবে, কি পরিমাণ অর্থ তাকে বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং কি কি ধরনের যন্ত্রপাতি তাকে কিনতে হবে। এইসব হচ্ছে ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার অন্তর্গত বিষয়সমূহ। বিশাল মাপের হলেও এই একই ধরনের অনুশীলনই রাষ্ট্রের পরিকল্পনার অন্তর্গত বিষয়। এক্ষেত্রেও প্রয়োজন হয়ে পড়ে সম্পদের ভাণ্ডারের সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে এই সম্পদকে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া, অবশ্যই সেক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলির গুরুত্ব মাথায় রেখেই এই বণ্টন করতে হবে। সম্পদগুলি মূলত তিন প্রকারের—প্রাকৃতিক, আর্থিক ও মানব। পরিকল্পনার দায়িত্ব-প্রাপ্ত সংগঠনকে দেখতে হবে এই তিন ধরনের সম্পদের পরিমাণ থেকে তাদের প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার স্বার্থে কতটা তাদের ব্যবহার করা সঙ্গত। এবং কতটা অর্থনৈতিক বিকাশ এর প্রয়োজন ভবিষ্যতের স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে। এই সংস্থার আরো একটি অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে কতটা সময়-সীমার মধ্যে ধার্য লক্ষ্যমাত্রাগুলি অর্জন করতে হবে তা নির্ধারণ করা। স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে একটি বাড়তি দায়িত্ব হচ্ছে স্বল্প উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার অনুন্নত অর্থনীতি থেকে রূপান্তরিত হয়ে উচ্চ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা স্বয়ং-চালিত অর্থনীতিতে প্রবেশ করার অভিলক্ষ্যসমূহের রূপরেখা প্রণয়ন করা। এই কাজ পরিকল্পনার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে করা যায়। কারণ সম্পদের আরো কার্যকরী ব্যবহার এর দ্বারা সুনিশ্চিত হয়। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎ সম্পদের বিকাশকেও ত্বরান্বিত করা সম্ভব পরিকল্পনার মাধ্যমেই। এছাড়া আর্থিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের প্রতিকূল প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাসমূহকে বিনষ্ট করতেও পরিকল্পনা এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

অনুশীলনী ১

১। অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রকারের সম্পদগুলি কি কি?

....

....

....
....
....
....
....
....
....
....

২। আপনার নিজের ভাষায় পরিকল্পনার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

৩। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে সঠিক (স) ও ভুল (ভু) চিহ্নিত করুন ঃ

(ক) পরিকল্পনা সময় ও অর্থের অপচয়, তাই এটি বাতিল করা প্রয়োজন। (স/ভু)

(খ) পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা কিন্তু কীভাবে তা অর্জন করতে হবে সে ব্যাপারে তার কোনো দায়িত্ব নেই। (স/ভু)

(গ) অনুন্নত অর্থনীতিতে পরিকল্পনার প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাগুলিকে জয় করা। (স/ভু)

১৬.৩ ভারতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

ভারতে পরিকল্পনার সহায়ক রেখাগুলি সংবিধান এবং রাষ্ট্রনীতির নির্দেশক সূত্র থেকে অনুসৃত হয়েছে। ভারতের সংবিধানের অঙ্গীকার অনুসারে ভারত একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র (পরে ১৯৭৭ সালের ৩রা জানুয়ারী সংসদে ঘোষিত হয় যে ভারত একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) এবং রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সুবিচার; চিন্তা, অভিব্যক্তি, ধারণা,

বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা এবং প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ-এর সাম্যকে সুনিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ; এছাড়া ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও রাষ্ট্রের অখণ্ডতাকে সুদৃঢ় করতেও অঙ্গীকারবদ্ধ। এর পেছনে যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে তা হল ভারতবর্ষের মতো একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতি, ধর্ম অথবা জন্মসূত্রে লব্ধ আর্থিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের ক্ষেত্রে যেন সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আশা করা হয়েছিল যে, সাংস্কৃতিক ও পরম্পরাগত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও সাম্যের সুযোগের মাধ্যমে রাজনৈতিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হবে।

আরো একটি বৈশিষ্ট্য যা আমাদের পরিকল্পনার সহায়ক রেখাকে প্রভাবিত করেছে তা হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ (*Directive Principles of State Policy*) ; যার মধ্যে রাষ্ট্রকে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা করা এবং সমস্ত নাগরিকের জন্য জীবনধারণের উপযোগী পরিস্থিতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। শুধু তাই নয়, মালিকানা ও সম্পদের বণ্টনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া, রাষ্ট্র সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানার কেন্দ্রীভবনকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাবে। তার কারণ এই ধরনের কেন্দ্রীভবন বৃহত্তম জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। এই সমস্ত মৌলিক দৃঢ় উক্তি ছাড়াও নির্দেশমূলক নীতি স্থানীয়ভাবে স্বশাসনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিকরণ, বিনাব্যয়ে শিশুদের জন্য শিক্ষার বাধ্যতাকরণ এবং পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও জীবনধারণের সামগ্রিক মান উন্নয়নের কার্যাবলীকে সহায়তা প্রদান করে।

আর তাই বলা যায় যে, সংবিধান শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে জীবনধারণের মান উন্নয়নের দায়িত্বে সীমাবদ্ধ নয়, তা এক সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিকল্পনা কমিশন তাই গঠন করা হয়েছে সংবিধান অনুসৃত একটি সামাজিক ধারা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, যাতে পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

অনুশীলনী ২

১। আনুমানিক একশো শব্দের মধ্যে ভারতে পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহকে বিবৃত করুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২। ভারতে পরিকল্পনার মূল সহায়ক রেখা কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে?

....

....
....
....
....
....
....
....
....

১৬.৪ পরিকল্পনা কমিশনের (পর্ষদের) কার্যাবলী

পরিকল্পনা কমিশন নিম্নলিখিত কার্যগুলি সংজ্ঞায়িত করেছে ঃ

— মূলধন ও মানব সম্পদসহ একটি দেশের সমস্ত বস্তুর একটি মূল্যায়ণ করা; এই সম্পদের মধ্যে কারিগরী জ্ঞানপ্রাপ্ত কুশলী শ্রমিকদেরও অন্তর্গত করা হয়; রাষ্ট্রের উন্নয়নে প্রয়োজনের তুলনায় যে সম্পদ অপ্রতুল তা কীভাবে বর্ধিত করা যায় তা অনুসন্ধান করাও এই কার্যাবলীর অন্তর্গত;

— সম্পদের সর্বাধিক কর্মক্ষম ও সুষম ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

— অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে, যে বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, সেই স্তরগুলির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা এবং বিভিন্ন স্তরগুলির জন্য উপযোগী সম্পদের বণ্টনকে নিশ্চিত করা;

— অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে যে সব বিষয় কাজ করে সেগুলিকে নির্দেশ করা এবং পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য যে আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন তা সৃষ্টি করা;

— পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরগুলির সফল রূপায়ণের জন্য যে প্রকারের উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা;

— পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরের রূপায়ণের একটি মূল্যায়ণ করা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী নীতি পরিবর্তন সম্পর্কে সুপারিশ করা; এবং

— যাতে কমিশন তার ওপর ন্যস্ত কাজ ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই অন্তবর্তী ও সহযোগী সুপারিশগুলি প্রয়োজন। তাছাড়া প্রচলিত আর্থিক পরিস্থিতি ও বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি দ্বারা উপলব্ধ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের উপায় পরিবর্তনের সুপারিশ করা যেতে পারে।

অনুশীলনী ৩

১। পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন যে যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে তা পাঁচটি বাক্যে বিবৃত করুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২। পরিকল্পনা কমিশন কি তাদের গৃহীত নীতির পুনর্বিচার করতে পারে? যদি পারে তবে কখন?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

১৬.৫ পরিকল্পনা প্রণয়ন

পরিকল্পনা সক্রিয়ভাবে শুরু হওয়ার ঠিক তিন বছর আগেই পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়ে যায়। প্রথমেই আলোচনার জন্য পরিকল্পনার একটি আগাম খসড়া প্রস্তুত করা হয়। এই খসড়ার মধ্যে বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির মূল্যায়ণ, আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্বলতার নির্দেশ, এবং আর্থিক অগ্রগতির হারের ধারার পর্যালোচনা করা থাকে। কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের কাছে এইসব বিষয়ে তাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত দাখিল করে। এইসব প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলি বিচার-বিবেচনা করে পরিকল্পনা পর্ষদ উন্নয়নের হার সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা ও অভিলক্ষ্য ও অন্যান্য অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিকে নির্দেশ করে।

উন্নয়নের হার মনোনয়নের পর, পরিকল্পনা পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় অন্তবর্তী উপাদান-এর প্রতুলতা সুনিশ্চিত করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে থেকে এর যোগানের মাত্রাও নির্ধারণ করা হয় যাতে লক্ষ্যমাত্রা যা ধার্য করা হয়েছে তা সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করা যায়। যদি দেখা যায় প্রয়োজনীয় পরিমাণে অন্তবর্তী উপাদান সংগ্রহ করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে পরিকল্পনা এই সমস্ত উপাদান সৃষ্টির জন্য বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করে যাতে করে ধার্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অন্তিম দ্রব্যের উৎপাদনকে অব্যাহত রাখা যায়। পরিশেষে

বলতে হয় যে, এই সমস্ত পরিবর্তন যাতে প্রাপ্ত সম্পদের সীমার মধ্যে করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। সম্পদের বণ্টন যাতে ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় অর্থনীতিতে গাণিতিক-প্রতিকল্পের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

অনুশীলনী ৪

একটি বাক্যে আপনার উত্তর সম্পূর্ণ করুন ঃ

১। পরিকল্পনা গ্রহণের কত বছর আগেই পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করে?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২। পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা পর্ষদের ভূমিকা কী?

....

....

....

....

....

....

৩। উন্নয়ন হারে লক্ষ্যমাত্রা ধার্যের ক্ষেত্রে কি কি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে?

....

....

....

....

....

....

১৬.৬ পরিকল্পনার কৌশল

পরিকল্পনার কৌশল একাধিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এই বিষয়ে প্রথম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়সমূহ যা আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। একদিকে ভূমি বিষয়ক সম্পর্ক, সম্পত্তি ও আয়-এর কেন্দ্রীভবন, অন্যদিকে দারিদ্র্য, নিম্নমানের শিক্ষা ও কারিগরী জ্ঞানের স্তর, এবং নিম্ন শ্রমিক সংগঠনের মান মূলত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ফলশ্রুতি। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধন ও কারিগরীভিত্তিক উন্নয়ন। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে সমস্ত কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা আছে এবং যারা সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারকে বাধা দান করে থাকে সেগুলিকে নির্মূল করা। সর্বশেষে বলা যায় যে, পরিকল্পনা কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অর্থনীতির সেই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে চয়ন করা যেখানে সরাসরি সরকারি বিনিয়োগ বা উৎপাদন অনিবার্য ও অপরিহার্য বিশেষত অর্থনীতির স্বনির্ভরতা আনার জন্য।

১৬.৬.১ শিল্পনীতি

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি-প্রস্তাব ও ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি-বিবৃতির মধ্যে ভারতের শিল্প সংক্রান্ত নীতির মূল বিষয়গুলির ধ্রুবকসমূহের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ছিল। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে স্থির করা হয়েছিল যে কিছু কিছু ক্ষেত্রকে 'মূল' ও কৌশলগত গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে চিহ্নিত করা হবে এবং এই সমস্ত শিল্পগুলিতে সরকার সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ভোগ করবে। শিল্পগুলির মূল শ্রেণিবিন্যাসটি নিম্নরূপ ঃ

(ক) যে শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের এক্তিয়ার সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের;

(খ) যে শিল্পগুলিতে সরকার অগ্রগামী ভূমিকা নেবে এবং নতুন প্রতিষ্ঠানগুলি সরাসরি উদ্যোগে আসবে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি পরিপূরকের ভূমিকা গ্রহণ করবে;

(গ) অন্য সমস্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন বেসরকারি প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের ওপর ন্যস্ত হবে।

আণবিক শক্তি, সামরিক শিল্প, রেলওয়ে এবং বিমান পরিবহন ছাড়াও উপরে উল্লেখিত প্রথম শ্রেণির শিল্পে আরো ১৩টি শিল্পক্ষেত্র অন্তর্গত ছিল। এগুলির মধ্যে লৌহ-ইস্পাত, ভারী বৈদ্যুতিক, কয়লা, খনিজ তেল, অন্যান্য খনিজ আকরিক এবং কিছু সুনির্দিষ্ট ধাতব-শিল্প, বিমান, জাহাজ-নির্মাণ, সুনির্দিষ্ট যোগাযোগের যন্ত্রপাতি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন ছিল প্রধান। অবশ্য এইসব ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রস্তাব ইতিমধ্যে সাফল্যের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে সেগুলির বিকাশকে বাধা না দেওয়ার অঙ্গীকারও ছিল, তাতে এও বলা হয়েছিল যে ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলিকে সহযোগীর ভূমিকায় উৎসাহদান করা যেতে পারে অবশ্য তাদের সরকারি রূপরেখা মেনে চলতে হবে এবং তাদের উৎপাদন ও পরিচালনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে ১২টি শিল্প অন্তর্গত। এর মধ্যে মূল খনিজ ও অ-লৌহ ধাতু যা প্রথম শ্রেণিতে অন্তর্গত হয়নি, কলের যন্ত্রপাতি, লৌহ-সঙ্কর, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, প্লাস্টিক, সার, কৃত্রিম রাবার, রাসায়নিক মন্ড এবং সড়ক ও সমুদ্র পরিবহন শিল্পগুলি বিদ্যমান। এছাড়া অন্য সমস্ত শিল্পগুলিকে তৃতীয় ক্ষেত্রের অন্তর্গত করা হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রটির সরকারি ভূমিকা হচ্ছে বেসরকারি উৎপাদন ও

উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা। উন্নত পরিকাঠামো, উপযুক্ত সরকারি আয়-ব্যয় নীতি ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে বিশেষ ঋজুতা এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, প্রয়োজনে অল্পবিস্তর রদ-বদলের সুয়োগও প্রযোজ্য। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকার ওপরও প্রাধান্যের কথা এই নীতিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। মূল কথা, বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে যাতে শিল্পগুলি দৃঢ়তা অর্জনে সমর্থ হয়ে স্বনির্ভর শিল্পে রূপান্তরিত হয় এবং শিল্পের ও প্রযুক্তির আধুনিকীকরণকে সুনিশ্চিত করতে পারে সেটাই প্রধান লক্ষ্য।।

১৬.৬.২ কৃষিনীতি

ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। শুধুমাত্র উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, শ্রমিক বাহিনীর একটি বৃহত্তর অংশ এই কৃষিক্ষেত্রের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। যদিও কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি ঘটেছে তবুও বলা যায় যে মাথাপিছু খাদ্যদ্রব্যের যোগান এখনো এই দেশে অতি নগণ্য, বিশেষ করে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায়।

স্বাধীনতার পর সরকার কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য বিবিধ আইন সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও কৃষি সংস্কার কার্যসূচী গ্রহণ করে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, যার মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক মধ্যভোগী শ্রেণির অবলুপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা, কৃষি উদ্বৃত্তের এক বড় অংশ ভোগ করার আইনী অধিকার ভোগ করত। এই সংস্কারের ফলে তা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারটি হচ্ছে ভূমি-সংস্কার যার ফলে কৃষকের ভূমি কর্ষণের অধিকার সুনিশ্চিত হয়। তাই বড় চাষীদের জমির ঊর্ধ্ব সীমার বাইরে যে অতিরিক্ত জমি আছে তা অধিগ্রহণ করে আইনের সাহায্যে তা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ভাগচাষী কর্তৃক প্রদত্ত খাজনার অংশকেও কমিয়ে আনা হয়।

ষাট-এর দশকের মাঝামাঝি যে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি হয় তার ফলশ্রুতি ছিল খাদ্যের ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরশীলতাকে কাটিয়ে তোলার জন্য সরকার কৃষি-প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি-উৎপাদন উন্নয়ন কৌশলের দ্বারস্থ হয় যা পরবর্তীকালে সবুজ বিপ্লব নামে চিহ্নিত হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর কিছু জেলাকে চিহ্নিত করে সেই সমস্ত অঞ্চলে উন্নত, উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও নিয়ন্ত্রিত জলের সরবরাহ করে উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে বর্তমানে রাষ্ট্র সাধারণভাবে খাদ্য-শস্যের ব্যাপারে স্বনির্ভরতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

১৬.৬.৩ নিয়োগ-সংক্রান্ত নীতি

অনেক সময়ে আমরা দেখে থাকি যে বহু সুস্থ ও সমর্থ পুরুষ ও স্ত্রী আমাদের কাছে খাদ্য বা অর্থ ভিক্ষা করছে। এর কারণ নিয়োগের সুযোগের অভাবে এদের কোনো আয় নেই। এটি বেকারীর একটি উদাহরণ যা সহজেই দৃশ্যমান। এছাড়া আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা হয়ত ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় নামেনি কিন্তু তারাও অলস ও অনিযুক্ত অবস্থায় দিন যাপন করছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার একটি ফলশ্রুতি হচ্ছে এই বেকারত্ব। গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই বেকারত্বের প্রকোপ অপরিসীম। গ্রামীণ ক্ষেত্রে বেকারত্ব বহুক্ষেত্রেই

প্রচ্ছন্ন, তার কারণ এই যে, কার্যের জন্য যে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন সে তুলনায় অনেক বেশি ব্যক্তি সেখানে বাধ্য হয়ে নিয়োজিত থাকে কারণ বিকল্প-নিয়োগের সুযোগ অনুপস্থিত। এছাড়াও আছে মরশুম। বেকারত্ব-জমি কর্ষণ, বীজ বপন, ঝাড়াই প্রভৃতি কৃষিকার্যের সময় গ্রামীণ শ্রমিক নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পায় কিন্তু বৎসরের অন্য সময় এরা অনিয়োজিত অবস্থায় অলস জীবনযাপনে বাধ্য হয়। শহরেও কাজের অভাবে বেকারত্ব ক্রমবর্ধমান। এই সঙ্কট আরো ঘনীভূত হয় গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের ভীড়ে। নবীন প্রজন্ম এই ভয়াবহ পরিস্থিতির দরুন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

বেকারত্বের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তাই প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নিয়োগমুখী কৌশল এবং ব্যাপক শিল্পায়ন যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেকারত্বকে পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করতে সক্ষম হবে। গ্রামীণ অঞ্চলে নিয়োগ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সরকারের কতকগুলি কর্ম পরিকল্পনা হল—সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (আই.আর.ডি.পি.), জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ প্রকল্প (এন.আর.ই.পি.), গ্রামীণ শ্রমিক নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্প (আর.এল.ই.জি.পি.)। ভূমিহীন গ্রামীণ শ্রমিকদের নিয়োগের ব্যবস্থা ছাড়াও এই প্রকল্পের অন্য আরো একটি অভিপ্রায় হল গ্রামীণী কৃষিক্ষেত্রে পরিকাঠামোর বিস্তার ঘটানো। এছাড়াও এর মাধ্যমে সরকার গ্রামীণ ও পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে শিল্পের বিস্তারকে উৎসাহদান করতে চায় যার ফলে ওইসব অঞ্চলের বেকার জনসমষ্টির নিয়োগ বৃদ্ধি পেতে পারে। শহরাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ঋণ এবং কারিগরী শিক্ষাদানের মাধ্যমে স্বনিয়োজিত প্রকল্পকে উৎসাহ প্রদান করে বেকারত্ব হ্রাসের অভিপ্রায় লক্ষ্য করা গেছে। সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে বিশেষ উৎসাহ প্রদানে বেশি আগ্রহী তার কারণ এগুলি নিয়োগ নিবিড় প্রযুক্তির অন্তর্গত।

অনুশীলনী ৫

আনুমানিক পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন ঃ

১। **পরিকল্পনার কৌশল সম্পর্কিত প্রধান উপাদানগুলির বিবরণ লিখুন।**

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

২। **পরিকল্পনা প্রণয়ন বিবেচনা করে সরকারি ভূমিকার বিশ্লেষণ করুন।**

....
....
....

৩। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্যে কী কী ধরনের সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

৪। সবুজ বিপ্লবের যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার গোচরে এসেছে তা বিবৃত করুন।

৫। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বেকারত্ব বিলোপের উদ্দেশ্যে যে ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

....
....
....
....
....
....
....
....
....

১৬.৭ পরিকল্পনার অনুষঙ্গসমূহ

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সম্পদকে গতিশীল করার ব্যবস্থা করা পরিকল্পনা-পদ্ধতির অন্তর্গত। এর পূর্ববর্তী পদক্ষেপ হল প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাব্য ও প্রকৃত পরিমাণ-এর একটি মূল্যায়ণ। প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে আর্থিক সম্পদকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য গতিশীল করা। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বৈদেশিক মূলধনের অন্তঃস্রোতের মূল্যায়ণের মাধ্যমে আর্থিক পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ পরিমাপে দেখা হয় অতীতে সরকারি সঞ্চয়ও, পরিবারিক সঞ্চয় ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয়ের পরিমাণ কি ছিল এবং সেগুলির ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির হার কি হতে পারে। এই দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরি করা হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য সরকার অতিরিক্ত কর আরোপ করতে পারে বা বেসরকারি সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান করতে পারে। বাজেটীয় সংস্থান ছাড়াও ঘাটতি ব্যয়, বৈদেশিক সম্পদ ও বৈদেশিক মুদ্রার মারফৎ সরকারি অর্থসংস্থান ঘটানো যেতে পারে। সঞ্চয়-এর উৎসগুলির মধ্যে সরকার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও পরিবার ছাড়াও সঞ্চয়কে স্ফীত করতে বৈদেশিক সঞ্চয়. বা নীট মূলধন প্রবাহ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রকৃত বিনিয়োগ-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার অভিলক্ষ্যে আর্থিক সম্পদের সংস্থান করা হচ্ছে আর্থিক-পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই আর্থিক পরিকল্পনার আরো একটি অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক-সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন করা। সঞ্চয়-এর ক্ষেত্রগত বিভাজনের পরিযোজনা (projection) থেকে আমরা অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের প্রাপ্যতা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি। এরপর অন্তঃক্ষেত্র সঞ্চয়ের চলাচলকে এবং বহির্বিশ্ব থেকে নীট মূলধন প্রবাহকে হিসেব-এর মধ্যে এনে, প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎস ও চাহিদার মধ্যে পার্থক্যের একটি আগাম ধারণা পেতে পারি এবং তার ওপর ভিত্তি করে উদ্বৃত্ত ক্ষেত্র হতে ঘাটতি ক্ষেত্রে সঞ্চয় প্রবাহকে নির্দেশিত করতে পারি।

পরিকল্পিত বিনিয়োগের প্রয়োজনে যে সম্পদের প্রয়োজন তার উৎস হিসেবে আমরা সরকারি ক্ষেত্র, বেসরকারি ক্ষেত্র, পারিবারিক ক্ষেত্র ছাড়াও আরো কয়েকটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করতে পারি। এদের অন্যতম হচ্ছে বৈদেশিক মূলধনের প্রবাহ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের উদ্বৃত্ত (যেমন— রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ ও অন্যান্য সরকারি ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত), অভ্যন্তরীণ ঋণের বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ, স্বল্প-সঞ্চয় প্রকল্প ও সরকারি প্রভিডেন্ড ফাণ্ড-এর সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিভিন্ন ধরনের মূলধনী সংগ্রহ। প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ কর, ঘাটতি ব্যয় ও নীট মূলধনী প্রবাহ হচ্ছে পরিকল্পনার অতিরিক্ত আর্থিক সংস্থান।

অনুশীলনী ৬

১। **'আর্থিক-পরিকল্পনা' বলতে আপনি কি বোঝেন? এ সম্বন্ধে দুটি বাক্যে উত্তর লিখুন।**

....

....

....

....

....

....

২। **পরিকল্পনার আর্থিক সংস্থানের বিভিন্ন উৎসগুলি কি কি?**

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। **সঠিক না ভুল স্থির করুন। সঠিক হলে (স) এবং ভুল হলে (ভু) লিখুন ঃ**

(ক) ঘাটতি ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বাজেটীয় সংস্থান—(স/ভু)

(খ) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-এর পরিমাণ নীট মূলধন প্রবাহ-এর ওপর নির্ভরশীল—(স/ভু)

(গ) অতিরিক্ত কর সরকারি সঞ্চয়কে স্ফীত করে — (স/ভু)

১৬.৮ পরিকল্পনার অগ্রগতির পর্যালোচনাক্র

যে উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, সেই উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হচ্ছে তার এক পর্যালোচনা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। পরিকল্পনার অভিলক্ষ্য আমরা পূর্বেই বিবৃত করেছি-আর্থিক বৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়বিচার হচ্ছে এই অভিলক্ষ্যের মূল বিন্দু; এখন আমরা এরই প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনার একটি পর্যালোচনা করতে চাই।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিল্পোৎপাদন এবং শিল্পের বহুমুখীতা প্রশ্নাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইস্পাত, কয়লা, খনিজতেল, ধাতু এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদন বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০-৫১ সালে কয়লার উৎপাদন ছিল ৩৩ মিলিয়ন টন, ১৯৮৪-৮৫ সালে তার উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৫ মিলিয়ন টনে। ইস্পাত-

এর উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালে ছিল মাত্র ১ মিলিয়ন টনে যা ঐ একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে ৭০৮ মিলিয়ন টনে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫০৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫৬.৪ মিঃ কিঃ ওয়াট আওয়ার-এ। সিমেন্ট-এর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে দশগুণ। অর্থাৎ ৩ মিলিয়ন টন থেকে ৩০ মিলিয়ন টনে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত আমরা মূলধনী দ্রব্য, যেমন মেশিন টুলস্, জেনারেটর, টারবাইন, বয়লার ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নির্ভর করতাম আমদানির ওপর। বর্তমানে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ দেশীয় উৎপাদনের সমর্থ। কৃষিক্ষেত্রেও অগ্রগতি উল্লেখ্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, খাদ্যশস্যের ৫১ মিলিয়ন টন থেকে ঐ একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে। অর্থাৎ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৩ গুণ। তুলার উৎপাদন বেড়েছে ৩ মিলিয়ন বেল থেকে ৯ মিলিয়ন বেল-এ। সেবাক্ষেত্রের সম্প্রসারণও উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত প্রায় সমস্ত শিল্পদ্রব্যের ক্ষেত্রেই আমরা ছিলাম আমদানি নির্ভর, বর্তমানে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই দেশীয় উৎপাদন যথেষ্ট। অতীতে দেশকে নির্ভর করতে হত খাদ্য সাহায্যের ওপর, বর্তমানে অন্তত দেশ তার আমদানি নির্ভরতা বেশ খানিকটা কমিয়ে এনেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রাষ্ট্র তার নিজস্ব পরিকল্পনায় ও ক্ষমতায় পরমাণু শক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম। কৃত্রিম উপগ্রহ, জাহাজ-নির্মাণ এবং উড়োজাহাজ নির্মাণ আজ এদেশে অতি সহজেই সম্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন মানব শক্তির সংখ্যার বিচারে এই দেশ আজ বিশ্বে তৃতীয়।

এসব সত্ত্বেও পরিকল্পনার ব্যর্থতার দিকটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনার ব্যর্থতম অংশ হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণ। প্রায় দুই পঞ্চমাংশ জনসংখ্যা আজও দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। এই বৃহৎ অংশটি আজও তাদের ন্যূনতম খাদ্য থেকে বঞ্চিত।

শিল্পের অগ্রগতি হয়েছে, যদিও সেই অগ্রগতির হার অনিয়োজিত শ্রমিক বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়নি, ফলে বিগত বছরগুলিতে বেকার বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দুর্বার গতিতে। বিভিন্ন আইনী ব্যবস্থা সত্ত্বেও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে শিল্পের কেন্দ্রীভবন। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেতৃত্ব প্রদান করার পরিবর্তে এক টাল-মাটাল পরিস্থিতিতে পড়েছে। উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টির পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র অর্থনীতিতে আর্থিক বোঝার ভার ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে, বাজেটীয় সহায়তা ছাড়া এই প্রকল্পগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন। চাহিদার অভাবে শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদব্যবহার হচ্ছে না, এবং একটি বৃহৎ অংশ ক্রমশই রুগ্নতা প্রাপ্ত হচ্ছে।

বহির্বিশ্বে প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে খাপ খাইয়ে দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি হয়নি ফলে দ্রব্যের মান ও দামের ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্পদ্রব্য স্থান করে নিতে পারছে না।

কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের ফলস্বরূপ বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু এর সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে আঞ্চলিক ও গ্রামীণ বৈষম্যের হার। যেসব অঞ্চলে সবুজ বিপ্লবের সফল রূপায়ণ হয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের বৈষম্য বেড়েছে। ভূমিসংস্কার এদেশের ভূমি-সম্পর্কের ওপর প্রায় কোনো প্রভাবই ফেলেনি। বহু সংখ্যক কৃষক জমি থেকে উৎখাত হয়ে ভূমিহীন বেকার কৃষক শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

গ্রামীণ নিয়োগমুখী প্রকল্পগুলিও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা, এবং ব্যবস্থার মধ্যে যে সমস্ত ছিদ্র পথ আছে তার জন্য কাঙ্ক্ষিত সুবিধাভোগীরা বঞ্চিত হয়েছে।

একদিকে যেমন বৃহৎ সংখ্যক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন সম্পদ তেমনি অন্যদিকে আছে সমুদ্র প্রতিম নিরক্ষর মানুষের ভিড়। এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়নি এবং এটি ক্রমবর্ধমান। জনসংখ্যার মাত্র ৩৬ শতাংশ হচ্ছে সাক্ষর। অবশ্যই এর থেকে সাক্ষরতার স্তর বোঝা সম্ভব নয়। কারণ নিজের নাম স্বাক্ষরে সক্ষম ব্যক্তির পরিচয় সাক্ষর।

সেবাক্ষেত্রটি শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে অর্থব্যবস্থা বেশি পরিণত হয়েছে। সেবাক্ষেত্রের মূল সম্প্রসারণ হয়েছে সরকারি সেবাক্ষেত্রটিতে, মূলত সরকারি প্রশাসনও সামরিক বিভাগে। অর্থাৎ সরকারি ব্যয় যখন বৃদ্ধি পায় তখন সরকারি প্রশাসন ও সামরিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদেরও আয় বৃদ্ধি পায়। যার ফলে বৃদ্ধি পায় দ্রব্যের চাহিদা। অন্য দিকে যদি কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি যথেষ্ট না হয় তবে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্ফীতির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় অর্থব্যবস্থায়।

অনুশীলনী ৭

পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ

১) পরিকল্পনাকালে ভারতীয় শিল্পের সাফল্যগুলি কি কি?

....
....
....
....
....
....
....
....

২) কৃষিক্ষেত্রে মূল সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি কি কি?

....
....
....
....
....
....
....
....

৩) আপনি কি মনে করেন আয় ও সম্পদের সমবণ্টন-এর অভিলক্ষ্যটি পরিকল্পনাকালে সাফল্যের সঙ্গে অর্জিত হয়েছে?

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

৪) সেবাক্ষেত্রের বৃদ্ধির সাথে কী ধরনের সমস্যা জড়িত?

....
....
....
....
....
....
....
....
....

১৬.৯ পরিকল্পনা কীভাবে আমাদের প্রভাবিত করে

ইতিমধ্যেই আমরা সাধারণভাবে 'পরিকল্পনা' ও বিশেষভাবে 'ভারতে পরিকল্পনা' সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আহরণ করেছি, এর সাহায্যে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক থেকে উপলব্ধি করতে পারি যে, কীভাবে পরিকল্পনা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধতর করেছে। স্বাধীনতার সময়কালে, একটা বিরাট সংখ্যক গ্রাম ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার আওতার বাইরে। কিন্তু এখন এদের অধিকাংশই বিদ্যুতের ব্যবহারে সুযোগ পেয়েছে। এখন যদি আপনি বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর নীচে বসে পড়াশুনো করেন তবে তার পশ্চাতে সর্বাধিক অবদান পরিকল্পনা কর্মসূচীর। যখন আপনাদের মধ্যে কেউ বা আপনাদের পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন অথবা দুর্ঘটনায় পড়েন তবে তাকে নিকটবর্তী কোনো সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয় স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য; এই পরিষেবার অধিকারও আমাদের কাছে এসেছে পরিকল্পনার অবদান হিসাবে। আমরা সবাই যে স্কুলে পড়েছি এবং যে শিক্ষালাভ করেছি তাও সম্ভব হয়েছে পরিকল্পনার ফলস্বরূপ। বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আমাদের সম্মুখে এসেছে পরিকল্পনার অবদান হিসেবে। আমরা অনেকেই ন্যায্যমূল্যের রেশন দোকান থেকে চাল বা আটা কিনে থাকি। পরিকল্পনার সাহায্য ব্যতীত খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বণ্টনকে লক্ষণীয় ভাবে বাড়ানো সম্ভব হত না, সম্ভব হত না বৃহত্তর জনসংখ্যার

খাদ্যের যোগানকে বজায় রাখা। সেচব্যবস্থা, রাসায়নিক সার, উচ্চফলনশীল বীজ-এর যোগান এবং কৃষি-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্তে নিরন্তর গবেষণা এসবই সম্ভব হয়েছে পরিকল্পনা বাবদ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই সমস্ত উন্নতিই মূলত দেশজ উদ্যোগ ও সম্পদের মাধ্যমে হয়েছে।

দূর-দূরান্তে অথবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য আমরা ট্রেনে চাপি—এটিও পরিকল্পনার একটি অন্যতম অবদান। একথা সত্যি যে স্বাধীনতার পূর্বেও এদেশে রেল ব্যবস্থা চালু হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তার যে বিস্তার এবং ব্যাপ্তি ঘটেছে তা শুধু পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছে। এই রেলপথ বিস্তারের কাজে যে রেললাইন ইত্যদি ব্যবহৃত হয়েছে তাও অভ্যন্তরীণ ইস্পাত উৎপাদনের মাধ্যমেই যোগান দেওয়া হয়েছে। রেল-এর ইঞ্জিন ও ওয়াগনও তৈরি হয়েছে দেশের অভ্যন্তরে, অথচ এগুলি আগে আমাদের আমদানি করে আনতে হত।

একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে বৃহৎ ইস্পাত কারখানা, সার কারখানা, জলাধার, বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ব্যতীত বর্তমান শিল্পায়নের স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব ছিল না। এই সমস্ত শিল্পের বিনিয়োগ যে শুধু এই সমস্ত শিল্পেরই উন্নতি ঘটিয়েছে তা নয় অন্যান্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালিত সহযোগী শিল্পগুলিও এর দ্বারা উৎসাহিত হয়েছে, এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চালিত শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য অন্য সমস্ত শিল্পগুলিতে উপাদানের যোগানকে সুনিশ্চিত করে শিল্পায়ন দ্রুততর করেছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরিকল্পনার ধনাত্মক দিকগুলিকেই তুলে ধরেছি, এখন আমরা এর ব্যর্থতাকেও দেখতে চাই। পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা অতি প্রয়োজনীয়। এমনভাবে সম্পদের সদ্ব্যবহার হওয়া উচিত যাতে মূল্যস্ফীতি উৎসাহিত না হয়। কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। শুধুমাত্র প্রথম পরিকল্পনা ছাড়া প্রায় প্রতিটি পরিকল্পনাকালেই মূল্যস্ফীতি ঘটেছে, শেষের দিকে এই মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর বেড়েছে কুড়ি শতাংশ হারে। পরের দিকে এই হার আরো বেড়েছে। ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে মূল্যস্তর বেড়েছে দুই শতাংশ হারে। আবার ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৮৭-৮৮ সালের মধ্যে বেড়েছে তিনশত শতাংশের মতো। এই ব্যর্থতার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে সম্পদের গতিশীলতার অভাব; সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কেনার ক্ষমতা ব্যাহত হয়েছে প্রবলভাবে। কেন্দ্রীয় বাজেটের বিপুল ঘাটতিও এর পেছনে অন্যতম কারণ। কর প্রদানে সক্ষম ব্যক্তিদের কাছে কর সংগ্রহ ব্যর্থ হয়ে সরকার ঘাটতি ব্যয় প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ায়। কর বৃদ্ধি না ঘটিয়ে প্রশাসনিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে মূলত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর। এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে মদত পেয়েছে মূল্যস্ফীতি।

প্রশাসনিক মূল্যবৃদ্ধির মারফৎ হয়ত সেই সমস্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, হয়ত এর ফলে এই সমস্ত শিল্পের পুনর্বিনিয়োগ করার ক্ষমতা বেড়েছে একথা সত্য কিন্তু এর ফল অন্যদিকে আরো ভয়াবহ। ধরা যাক্, রেলের যাত্রী ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি ঘটিয়ে সেই অতিরিক্ত আয় থেকে নতুন রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এই পরিষেবার ব্যাপ্তি বাড়ানো হল। কিন্তু এই ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির জন্য কয়লার পরিবহন ব্যয় গেল বেড়ে যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয়কে বাড়িয়ে তুলে সমস্ত শিল্পের উৎপাদন ব্যয় ও তাদের মূল্যবৃদ্ধিকে অপরিহার্য করে তুলল, যা প্রকারান্তরে মূল্যস্ফীতিকে উৎসাহ যোগাল, মূল্যবৃদ্ধির দুষ্ট চক্রে পড়ে।

সরকার যখন পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন তার পরবর্তী পদক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায় হয় ঋণ সংগ্রহ করা অথবা ঘাটতি ব্যয় প্রণয়ন করা। প্রথমটিতে সরকার সংগ্রহ করে দেশের মধ্যে হয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যাঙ্ক-এর কাছ থেকে অথবা দেশের বাইরে থেকে, উভয় ক্ষেত্রেই সুদ ও ঋণ ফেরৎ

বাবদ সরকারের ব্যয় বাড়ে। যথেষ্ট রাজস্ব সংগ্রহে ব্যর্থ হলে পুনরায় ঋণ অথবা পরিশেষে ঘাটতি ব্যয় - এইভাবে সরকার ঋণ এর ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। ঘাটতি ব্যায়ের প্রভাব সরাসরি পড়ে মূল্যস্ফীতিতে। অতিরিক্ত অর্থ ধাওয়া করে সমপরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী, যদি না উৎপাদনকে সমহারে বাড়ানো যায়; তখন দেখা যায় মূল্যস্ফীতি অবধারিত। তাই বলা যায়, পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে সরকারের সম্পদ সংগ্রহের সাফল্যের ওপর।

অনুশীলনী ৮

১) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি সঠিক কোন্‌টি ভুল নির্ধারণ ক(ন। সঠিক বাক্যের পাশে (স) এবং ভুল বাক্যের পাশে (ভু) শব্দটি লিখুন ঃ

(ক) ভারতীয় শিল্পের উন্নয়নে পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করেছে। ( )

(খ) পরিকল্পনাকালে কৃষির অগ্রগতি ঘটেছে। ( )

(গ) সমগ্র পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর বাড়েনি। ( )

(ঘ) পরিকল্পনা ব্যয়-এর একটি অংশ মেটাবার জন্য সরকার ঘাটতি-ব্যয় প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হয়েছে। ( )

১৬.১০ সারাংশ

এই এককটিতে আমরা ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা ও বিশেষভাবে ভারতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আহরণ করলাম। এই অধ্যায়ে আমরা আরো দেখলাম, ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোকে নষ্ট করে কীভাবে পরিকল্পনার কৌশলগুলি ভারতকে দ্রুত উন্নতি ও আর্থিক অগ্রগতির পথ দেখাল। সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পনার সাফল্যই আমাদের দেশের পরিকল্পনায় উৎসাহ যুগিয়েছে।

আমরা দেখলাম, পরিকল্পনা বলতে কিছু কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে কিছু সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্যে পৌছানো। অনগ্রসর দেশে, এছাড়াও পরিকল্পনার অতিরিক্ত লক্ষ্য হল অর্থনীতিকে স্বল্প উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার স্তর থেকে উচ্চ ও স্বয়ং চালিত উন্নতির স্তরে পৌছে দেওয়া। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিকে সংক্ষেপে বলা যায় যে সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও জনজীবনের মান উন্নয়ন।

ভারতে যোজনা পর্ষদ প্রথমে সম্পদের পরিমাণের মূল্যায়ণ করে তার সর্বাধিক কার্যকর ও সমতাপূর্ণ ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব নেয়। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ দ্বারা নিধারিত অগ্রাধিকারকে বিবেচনা করে পরিকল্পনা পর্ষদ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য সম্পদের বণ্টন করে। আমরা দেখেছি যে শিল্পায়নের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উপর মূল দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে এবং সেখানে বেসরকারি ক্ষেত্রটি পরিপূরকতার পালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কৃষিক্ষেত্রে, কৃষি-সংস্কারের সমস্ত প্রচেষ্টা মূলত অসফল। তুলনায় খাদ্যশস্যের বিক্রয়, উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি ও সবুজ বিপ্লবের প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল। অবশ্য এর ফলে গ্রামীণ ও আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, একদিকে পরিকল্পনার ফলে দেশের অর্থনীতির উৎপাদনের বুনিয়াদ

বৃদ্ধি পেয়েছে, জনজীবনের মানের উন্নয়ন ঘটেছে অথচ অন্যদিকে দারিদ্র্যের প্রকোপ সেভাবে কমানো সম্ভব হয়নি, বেকারী, নিরক্ষরতা ও মূল্যস্ফীতির হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাফল্য আসেনি। সম্পদের কেন্দ্রীভবন রুখতে এবং গ্রামীণ ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীভূত করতে পরিকল্পনা সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

১৬.১১ প্রধান শব্দগুচ্ছ

মূল শিল্প ঃ যে সমস্ত শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য অন্য শিল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ ঃ ইস্পাত।

মূলধনী দ্রব্য ঃ যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদিত হয় অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করার জন্য, এগুলি প্রত্যক্ষভাবে কোনো শিল্পে অন্তিম দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না ঃ যেমন—'যন্ত্রপাতি'।

প্রচ্ছন্ন বেকার ঃ দৃশ্যত এরা নিয়োজিত, কিন্তু এদের প্রত্যাহার করে নিলে উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস হয় না।

সাম্য ঃ আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার ও সমতা।

সামন্ততান্ত্রিক মধ্যস্বত্বভোগী ঃ যে সমস্ত ব্যক্তি বা শ্রেণী কৃষিতে অর্থনীতি বহির্ভূত প্রক্রিয়ার শোষণের মাধ্যমে মূলত কৃষি-উদ্বৃত্তের একটি অংশকে ভোগ করে নেয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিজেকে যুক্ত না করেই, শুধু রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে অবস্থান করে।

মূল্যস্ফীতি ঃ যে পরিস্থিতিতে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়তে থাকে এবং যার সাথে সাথে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

অন্তর্বর্তী উপাদান ঃ যে সমস্ত দ্রব্য কোনো অন্তিম দ্রব্যের উৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন ঃ বাস, ট্রাকের উৎপাদনে ব্যবহৃত ইস্পাত।

ভূমিসংস্কার ঃ বৃহৎ জোটের বিভাজনের মাধ্যমে জমির পুনর্বণ্টন যা প্রকৃত কৃষককে উদ্বৃত্ত জমির সিংহভাগ ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়; এই সংস্কারের ফলে মধ্যস্বত্ব ভোগকারীদের গুরুত্ব কমে যায়।

বিত্র(য়যোগ্য উদ্বৃত্ত ঃ এটি মূলত খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; কৃষকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন যা কৃষক বাজারে বিক্রয় করতে সক্ষম।

দারিদ্র সীমা ঃ এটি একটি আয়ের সীমা যার নীচে আয় হলে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য, জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে উপকরণ প্রয়োজন তা ক্রয় করতে সক্ষম হয় না। ভারতবর্ষে এই ন্যূনতম প্রয়োজনের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে এইভাবে ঃ যে আয়ে একজন বয়স্ক ব্যক্তির বেঁচে থাকা ও শ্রম-দান (কাজ) করতে যে পুষ্টিটুকু প্রয়োজন তা ক্রয় করা সম্ভব হয়, তাই হল ন্যূনতম আয়, তার নিম্নপ্রান্তই হল দারিদ্র্য সীমা। দারিদ্র্য সীমার সংজ্ঞা ও সীমারেখা প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে একরকম নয়।

সম্পদ ঃ সম্পদ তিন প্রকার—প্রাকৃতিক, আর্থিক ও মানবসম্পদ। জমি, জল, কয়লা ও অন্যান্য আকরিক, গরু, বাছুর ইত্যাদি হল প্রাকৃতিক সম্পদ। সঞ্চয়, কর সংগ্রহ, মূলধন ইত্যাদি হচ্ছে আর্থিক সম্পদের উদাহরণ। মানবসম্পদ বলতে বোঝায় মানবশ্রমের কুশলতা ও কর্মদক্ষতা যা তাকে উৎপাদন ও সমাজের কাছে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঃ যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপকরণগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে তাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে।

কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা ঃ যখন কোন ক্ষেত্রে বা ঐ ক্ষেত্রের একটি বিশেষ অংশ অন্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; তখন বলা হয় যে অর্থনীতিতে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা আছে।

১৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

Chaudhary, Pramit (1985) : *The Indian Economy,* Vani Educational Books, Vikas, New Delhi.

Singh, Tarlok (1974) : *India's Development Experience,* Macmillan, London.

D. R. Gadgil (1972) : *planning and Economic Policy in* India, Gokhale Institute, Poona.

১৬.১৩ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১) সম্পদ মূলত তিন প্রকারের— প্রাকৃতিক, আর্থিক এবং মানব। প্রাকৃতিক সম্পদ দুই প্রকারের—জীব সম্পদ ও জড় সম্পদ। ভূমি, জল, খনিজ এবং প্রাণী প্রভৃতি সম্পদগুলি এর অন্তর্গত। কর-আরোপণ, সঞ্চয়, ঋণ ইত্যাদি আর্থিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। মানবশক্তি ও দক্ষতার সমন্বয়ে মানব সম্পদ গঠিত।

২) পরিকল্পনা বলতে বোঝায় ভবিষ্যতের জন্য প্রণীত একটি কৌশল যা একটি দেশের সম্পদ ভাণ্ডারের বর্তমান অবস্থা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার রূপদান করে। একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে জাতীয় আয়, উৎপাদন ইত্যাদির ক্রমবৃদ্ধির (বা ক্রমোন্নতির) হার সুনিশ্চিত করার জন্য আর্থিক পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর দেশগুলির ক্ষেত্রে পরিকল্পনার একটি বৃহৎ অর্থ করা হয়। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা হল একটি কৌশল যার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা হয় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অনগ্রসরতা ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা যা নিম্ন উৎপাদনশীলতা থেকে উচ্চ পর্যায়ের স্বনির্ভরযোগ্য উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করে।

৩) (ক) ভুল
(খ) ভুল
(গ) সঠিক

অনুশীলনী ২

১) সংকেত ঃ ভারতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হল ন্যায়পরায়ণের সঙ্গে উন্নতি অর্জন করা - সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমান সুযোগ, যথেষ্ট জীবিকানির্বাহের উপায় প্রভৃতি।

২) সংকেত ঃ মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ।

অনুশীলনী ৩

১) ১৬.৪ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

২) সংকেত ঃ ঠিক

অনুশীলনী ৪

১) পরিকল্পনা প্রণয়ণের কাজ শুরু হয় পরিকল্পনা গ্রহণের তিন বছর আগে।

২) পরিকল্পনা পর্যায়কালে কী হারে আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করা হবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কোন লক্ষ্য বা পরিকল্পনাগুলি অগ্রাধিকার পাবে সে ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনকে নির্দেশ দেয় জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ। মধ্যবর্তী যোগানের যথেষ্ট সুবিধা আছে কিনা এবং সম্পূর্ণ ব্যয়, সম্পদের সুবিধা অনুযায়ী ধার্য করা হয়েছে কিনা তা পরিকল্পনা কমিশন বিবেচনা করে।

অনুশীলনী ৫

১) সংকেত ঃ ১৬.৬ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।

২) কিছু নির্দিষ্ট প্রাথমিক ও কৌশলগত শিল্পে বিনিয়োগ ও উন্নতির দায়িত্ব একচেটিয়াভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছিল। এটা আশা করা হয়েছিল যে সরকারি উদ্যোগে অর্থনৈতিক উন্নতির সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত হতে সাহায্য করবে এবং এর মাধ্যমে শিল্পায়ন উন্নতি বিধানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৩) সংকেত ঃ ১৬.৬.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

৪) সবুজ-বিপ্লব একটি প্রযুক্তিভিত্তিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের কৌশল। এই বিপ্লব দেশের সমগ্র খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং বিক্রয়যোগ্য অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের যোগান দিয়েছিল। কিন্তু একই সঙ্গে এই বিপ্লব ভারতের গ্রামাঞ্চলে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে তুলেছিল কারণ সবুজ-বিপ্লব মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট রাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, অপরপক্ষে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলি এর প্রভাবমুক্ত ছিল।

৫) ভারতের গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়োগমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন—সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (আই. আর. ডি. পি.), জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্প (এন. আর. ই. জি.পি) কর্মসূচী। যদিও শহরে এ ধরনের কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি তবে স্ব-নিয়োজন প্রকল্প ও প্রভূত শ্রম-শিল্পের (যে শিল্পে শ্রমিকের চাহিদা বেশি) উন্নতিবিধানের মাধ্যমে এক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুশীলনী ৬

১) আর্থিক পরিকল্পনা বলতে বোঝায় বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদের মূল্যায়ণ ও সঞ্চয়, কর-আরোপণ এবং সাহায্য - আন্তঃসরকারি সাহায্য বা ধার বা বিনিয়োগকারী সংস্থা এবং বৈদেশিক অধিকোষ (ব্যাঙ্ক) থেকে বাণিজ্যিক ঋণ-এর মাধ্যমে বিনিয়োগের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের মূল্যায়ন। অন্য কথায় বলা যায়, পরিকল্পনা হল সম্পদ এবং পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার জন্য নির্দিষ্ট অর্থভাণ্ডারের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

২) পরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য অর্থ ভাণ্ডারের অর্থের বিভিন্ন উৎসগুলি হল — কর-আরোপণ, সরকারি সঞ্চয়, পারিবারিক ও বেসরকারি যৌথ বিভাগ এবং অন্তঃপ্রবাহী বিদেশী পুঁজি। এছাড়া, সরকারি উদ্যোগসমূহ, যেমন - রেল, ডাক ও তার বিভাগ, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগসমূহ, বাজার থেকে পাওয়া ঋণ প্রভৃতিরও এতে অবদান থাকে। অবশেষে সরকার ঘাটতি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে পারে।

৩) (ক) সঠিক
(খ) ভুল
(গ) সঠিক

অনুশীলনী ৭

১) সংকেত ঃ শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন দ্রব্যের প্রসারিত ক্রমবিন্যাস।
২) সংকেত ঃ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ ও আঞ্চলিক বৈষম্যের উদ্ভব।
৩) না, ১৬.৮ অনুচ্ছেদটি দেখুন।
৪) সংকেত ঃ দ্রব্য উৎপাদনের বৃদ্ধি ছাড়াই অর্থ উপার্জন বৃদ্ধি।

অনুশীলনী ৮

১) (ক) সঠিক
(খ) সঠিক
(গ) ভুল
(ঘ) সঠিক

একক ১৭ ❐ পরিকল্পনার কৌশলসমূহ - ২

গঠন

১৭.০ উদ্দেশ্য
১৭.১ প্রস্তাবনা
১৭.২ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের পরস্পর নির্ভরতা
১৭.৩ শিল্প
১৭.৩.১ ক্ষুদ্রায়তন শিল্প
১৭.৩.২ মূলধনী দ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য শিল্প
১৭.৪ গণবণ্টন ব্যবস্থার ও সামাজিক কল্যাণ
১৭.৪.১ ঐতিহাসিক পটভূমি
১৭.৪.২ গণবণ্টন ব্যবস্থার কার্যাবলী
১৭.৪.৩ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কিছু প্রস্তাব
১৭.৫. বহুস্তরবিশিষ্ট পরিকল্পনা
১৭.৫.১ বহুস্তরবিশিষ্ট পরিকল্পনার নানান ধাপ
১৭.৬ সারাংশ
১৭.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ
১৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী
১৭.৯ উত্তরমালা

১৭.০ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্র এবং স্তরের সাথে পরিকল্পনার কৌশলের সম্পর্ক কী তা বিবেচনা করা। এই অধ্যায় পাঠ শেষে আপনি যা জানবেন তা হল—

- কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের পরস্পর নির্ভরতা।
- অর্থনীতির ক্ষেত্রগত শ্রেণীবিন্যাস, ভারতের শিল্পায়ন এবং রাষ্ট্রয়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকা।
- গণবণ্টন ব্যবস্থা ও জনকল্যাণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ, এবং
- বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং বহুস্তর-বিশিষ্ট পরিকল্পনার কৌশল।

১৭.১ প্রস্তাবনা

ভারতের যে পরিকল্পনা কৌশল গৃহীত হয়েছে, তার প্রধান বিষয়গুলি হল ঃ সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাকে ক্ষেত্র অনুযায়ী ভাগ করে দেখান, কৃষি, মূলধনী দ্রব্য, ভোগপণ্য শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলির মধ্যে বিনিয়োগের বণ্টন ব্যবস্থা করা এবং এরই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ও গণবণ্টন

ব্যবস্থার ভূমিকা নির্ধারণ। পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও বিনিয়োগের বণ্টনের পরিমাণ বিভিন্ন প্রাদেশিক স্তরে—প্রকৃতপক্ষে, কেন্দ্র থেকে রাজ্য স্তরে, সেখান থেকে জেলা স্তরে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্লক বা পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি নীচে আলোচিত হল।

১৭.২ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের পরস্পর নির্ভরতা

কৃষি ও শিল্প এই দুটি ক্ষেত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে অনেকগুলি যোগসূত্র আছে। এই মূল সত্যকে স্বীকার করে নিয়েই ভারতে পরিকল্পনা কৌশল গৃহীত হয়েছে।

যদি আমরা গ্রামের হাটে যাই, তাহলে দেখব যে গ্রামের কৃষকরা মাথায় বা গরুর গাড়িতে চাল বা গম হাটে আনছেন। কৃষকরা এসব ফসল ব্যাপারী বা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন এবং ব্যবসায়ীরা আবার এসব জিনিস শহরে নিয়ে গিয়ে শিল্প বা সেবামূলক ক্ষেত্রে যেসব লোক কাজ করেন তাদের কাছে বিক্রি করে দেন। ভারতবর্ষে যা কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয়, তার তিন ভাগের দু'ভাগ কৃষিক্ষেত্রের মধ্যেই ভাগ করা হয়ে থাকে। বাকি এক ভাগ, অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ ফসল কৃষিক্ষেত্রের বাইরে বিক্রয় করা হয়। এই অংশটুকুকেই অকৃষিক্ষেত্রের জন্য কৃষিক্ষেত্রের 'বিপনন কৃত' উদ্বৃত্ত বলা হয়। অকৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

তাছাড়া কৃষিভিত্তিক কিছু শিল্প আছে, যেগুলির উপকরণ কৃষিক্ষেত্র থেকেই আসে। যেমন, সূতীবস্ত্রশিল্পের প্রয়োজন কাঁচা তুলো বা চিনি শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ আখ—যেগুলি সরবরাহ করে কৃষিক্ষেত্রই।

ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগই তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে থাকেন। জাতীয় মোট আয়ের শতকরা ৩৭ ভাগই সৃষ্টি হয় কৃষিক্ষেত্রে। ভারতীয় কৃষকসমাজের অধিকাংশই এত দরিদ্র যে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যটুকু কেনার পর, অন্যান্য খাতে খরচ করার মতো অর্থ তাদের হাতে থাকে না বললেই চলে। তথাপি শিল্পজাত পণ্যের একটা বড় অংশ গ্রামীণ ক্ষেত্রেই ভোগ করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বস্ত্র, পোষাক, জুতো, চিনি বা ভোজ্যতেল ইত্যাদি পণ্যের চাহিদা বা ভোগ শহর এলাকায় যা হয়ে থাকে, গ্রামীণ এলাকায় হয় তার তিনগুণ বেশি।

কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে ভারতীয় কৃষিতে একটা নতুন যুগের সূচনা করার প্রচেষ্টা ষাটের দশকের মাঝামাঝি শুরু হয়েছিল—যা সবুজ বিপ্লব নামে খ্যাত হয়ে আছে। কৃষি উৎপাদনের এই নতুন কৌশলের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে, এটা বেশি পরিমাণে কীটনাশক ওষুধ, রাসায়নিক সার, পাম্পসেট্, ট্রাকটর ইত্যাদি শিল্পজাত উপকরণের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল ছিল।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কৃষিক্ষেত্র শিল্পকে যোগান দেয় মজুরীপণ্য তথা খাদ্যশস্য এবং কিছু শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। খাদ্যশস্যকেই মজুরীপণ্য হিসেবে গণ্য করা হয় এবং অকৃষিক্ষেত্রে যেসব শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন তাঁরা ভোগ্যপণ্য হিসেবেই একে ব্যবহার করেন। অন্যদিকে কাঁচামাল শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অন্তর্বর্তী দ্রব্য হিসেবে অর্থাৎ চূড়ান্ত দ্রব্য তৈরির উদ্দেশ্যে এগুলির ব্যবহার হয় সহায়ক উপাদান হিসেবে। চূড়ান্ত দ্রব্যের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন— চিনি, ভোজ্যতেল, চা, সূতীবস্ত্র, চটের বস্তা ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে, শিল্পক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রকে যোগান দেয় এমন সব দ্রব্য যা সাধারণভাবে চূড়ান্ত ভোগ্যদ্রব্য

হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন— চা বস্ত্র, চিনি, ট্রানজিস্টর রেডিও, সাইকেল, সাবান ইত্যাদি। শিল্পক্ষেত্র কিছু উৎপাদনের উপকরণও যোগান দেয় যেগুলি কৃষিক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন— সার, কীটনাশক দ্রব্য ইত্যাদি যেগুলি কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে অন্যান্য কয়েকটি যোগসূত্র নিয়ে আমরা এবার আলোচনা করব।

আপনারা নিশ্চয়ই গ্রামাঞ্চলে ভয়াবহ ও তীব্র দারিদ্র্যের অবস্থা লক্ষ্য করেছেন এবং জানতে চেয়েছেন কেন এমন হয়। কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল জমির স্বল্পতা, যেহেতু আমাদের দেশের চাষযোগ্য জমির প্রায় সবটাই চাষের আওতায় ইতিমধ্যেই আনা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, বছরের অধিকাংশ সময়েই গ্রামের মানুষেরা অল্প মজুরীতে কাজ করতে চাইলেও কাজ পান না। এইসব লোকের বেকারীত্বকে ঋতুগত বেকারীত্ব বলা যায়। আবার অনেক কৃষক আছেন যাঁরা তাদের পারিবারিক খামারেই সারা বছর কাজ করে যান। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, যে কাজ তিনজন শ্রমিকের শ্রমে করে ফেলা যায়, সেখানে পাঁচজন শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়েছে। যখন পাঁচজনের শ্রমে তিনজন শ্রমিকের কাজ সম্পন্ন করা হয়, তখন আমরা বলি যে, দুজন শ্রমিক আধা-কর্মহীন। এই সমস্ত অ-নিযুক্ত ও অর্ধ-নিযুক্ত শ্রমিক মিলেই গঠিত হয় 'উদ্বৃত্ত শ্রমিকে'র বাহিনী।

আমাদের পরিকল্পনার কৌশল হল দ্রুত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে এমন পদক্ষেপ নেওয়া যাতে কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমিককে স্থানান্তর করা যায়। এইভাবে দেখলে কৃষিক্ষেত্রকে মনে হবে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির বিশাল ভাণ্ডার যেখান থেকে শ্রমিককে শিল্পে নিয়োগ করার জন্য স্থানান্তর করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই ব্যাপারে খুব বেশি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। গত প্রায় সাড়ে চার দশকের পরিকল্পনার যুগে কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে খুব সামান্যই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের যোগসূত্রের সম্পর্কটি এবার আমরা সম্পদ সংগ্রহের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিচার করব। এখানে আমরা মূলত সঞ্চয় ও কর—সম্পদের এই দুটি উৎস নিয়ে আলোচনা করব।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, কীভাবে '৭০ ও '৮০-র দশকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি গ্রামাঞ্চল থেকে আমানত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কী বিপুল পরিমাণে শাখা বিস্তার করেছিল। এর ফলে আংশিক হলেও জমি, সোনাদানা বা গয়না কেনার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় যে 'অনুৎপাদক সম্পদ' জমা হত তার কিছুটা অংশ ব্যাঙ্ক আমানতের মাধ্যমে 'উৎপাদক সম্পদে' পরিণত হল। ব্যাঙ্কে জমা পড়া টাকা সহজেই শিল্প বা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা সম্ভব।

সঞ্চয় ও কর—দুই-ই সম্পদের উৎস হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সঞ্চয় একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ, কিন্তু কর তা নয়। সরকার ব্যক্তি অথবা পণ্য বা উভয়ের উপরই কর বসায়—এই আদায়ীকৃত কর থেকেই সরকারের ব্যয় সঙ্কুলান হয় - অবশ্য সরকারি ব্যয়ের একটি অংশই কেবল উন্নয়নমূলক। কৃষিক্ষেত্রেও কর বসানো যায় এবং শিল্পায়নের জন্য এভাবে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য ভারতবর্ষে বাস্তবে কৃষিক্ষেত্র থেকে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কর আদায় হয় না। তার কারণ যত না অর্থনৈতিক তার চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক-রাজনৈতিক। এক সময় ভূমিরাজস্ব, সরকারি আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলেও বর্তমানে তা খুবই নগণ্য স্তরে এসে পৌঁছেছে। দেখা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে মোট আয়ের মধ্যে কৃষি আয়করের অংশ ছিল শতকরা ০.৬ ভাগ - ১৯৮৩-৮৪ সালে তা কমে গিয়ে হয়েছে শতকরা মাত্র ০.১ ভাগ। পাশাপাশি, ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ঐ সময়কালে শতকরা ৮.২৫ ভাগ থেকে কমে ০.৫৪ ভাগে নেমে এসেছে। কৃষিক্ষেত্রকে পরোক্ষ করের বোঝা বইতে হয় যখন কৃষিক্ষেত্র চিনি, দেশলাই, তামাক, সাইকেল, বস্ত্র, কেরোসিন ইত্যাদি শিল্পজাত পণ্য ক্রয় করে থাকে।

একদিকে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষ যখন সার কেনেন, সেচের জন্য জল বা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন তখন সরকারের কাছ থেকে ভরতুকি পেয়ে থাকেন। কৃষিক্ষেত্রের মধ্যেই অবশ্য একটা বড় ধরনের অসাম্যের উপাদান আছে কারণ, সরকারি ভরতুকি কৃষিক্ষেত্রের সকলেই পায়নি বা সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত হয়নি। কৃষক সমাজের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত ধনী ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের বা দেশের মধ্যে যেখানে গ্রামীণ এলাকা তুলনামূলকভাবে বেশি উন্নত (যথা— পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ), তারাই সরকার প্রদত্ত ভরতুকির সিংহভাগ ভোগ করেছে। অন্যদিকে, গরীব মানুষের আয়ের বেশিরভাগ অংশই ব্যয় হয় গণভোগের দ্রব্যগুলির উপর। এগুলির বেশিরভাগই সরকারের করনীতির মূল ভিত্তি। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে, গ্রামীণ মানুষ যাঁরা কৃষির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের উপর কর-ভার শহরের মানুষের তুলনায় কম। জনসংখ্যাকে যদি ব্যয়ের অনুপাত অনুসারে ভাগ করা হয় অর্থাৎ ভোগের জন্য শূন্য থেকে ১৫ টাকা, ১৫ থেকে ২৮ টাকা ব্যয় করেন যেসব জনগোষ্ঠী এই ক্রম অনুসারে জনসংখ্যার শ্রেণীবিন্যাস করা হয়, তাহলে দেখব যে, শহর এলাকায় অকৃষি পেশায় যাঁরা নিযুক্ত তাঁরা গ্রাম-এলাকায়, যাঁরা কৃষি পেশার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের তুলনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের করই বেশি দিয়ে থাকেন। অবশ্য মোট করভারের তুলনায় শুধুমাত্র পরোক্ষ করের দিক থেকে বিচার করলে দেখব যে, গ্রাম-শহরের করভারের পার্থক্য অনেক কম। অর্থাৎ গ্রাম-শহরের মানুষের করভারের পার্থক্য প্রত্যক্ষ করের বেলায় তুলনামূলকভাবে বেশি।

এখন আমরা কৃষি ও অকৃষিজাত দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মোট যে করভার চাপায় তার তুলনামূলক আলোচনা করব। কৃষিক্ষেত্রের উপর মোট আয়ের অনুপাতে যে করভার চাপানো হয়েছিল, তা ১৯৫১-৫২ সালে ছিল শতকরা ৪.৫ ভাগ। ১৯৬৮ - ৬৯ সালে তা বেড়ে হয়েছিল শতকরা ৭.৯ ভাগ। তুলনায় দেখা যায়, ঐ একই সময়ে অকৃষিক্ষেত্রের আয়ের অনুপাতে করভার ১৯৫০-৫১ সালে শতকরা ৮.৭ ভাগ থেকে বেড়ে হয়েছিল শতকরা ১৮.৬ ভাগ। এবার যদি আমরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ করের হিসেব নিই, তাহলে দেখব যে কৃষিক্ষেত্র তার আয়ের অনুপাতে প্রত্যক্ষ কর যা দিয়েছিল তা ১৯৫০-৫১ সালে শতকরা ১.২ ভাগ থেকে কমে ১৯৬৮-৬৯ সালে হয়েছিল মাত্র শতকরা ০.৯ ভাগ। পক্ষান্তরে, অকৃষিক্ষেত্রের বেলায় ঐ একইসময়ে প্রত্যক্ষ করের ভার শতকরা ৪.৫ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ৬.২ ভাগ হয়েছিল। পরোক্ষ করের হিসেব আলাদাভাবে নিলে দেখা যায় যে, কৃষিক্ষেত্রের উপর পরোক্ষ করের চাপ ঐ একই সময়ে খুব সামান্যই বেড়েছিল—শতকরা ৫.৩ ভাগ থেকে বেড়ে হয় শতকরা ৭.০ ভাগ। কিন্তু অকৃষিক্ষেত্রের উপর পরোক্ষ করের চাপের বৃদ্ধির হার ছিল অনেক বেশি—শতকরা ৪.৩ ভাগ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ১২.৪ ভাগ।

করনীতি হল সরকারের সম্পদ সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রত্যক্ষ হাতিয়ার। অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্র থেকে অকৃষিক্ষেত্রে সম্পদ স্থানান্তর করার একটি পরোক্ষ উপায়ও আছে। কৃষি ও অকৃষি দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক অনুপাতকে বলা যেতে পারে কৃষি এবং অকৃষিক্ষেত্রের মধ্যে নীট বিনিময় হার। এই দামের অনুপাতকে কৃষিক্ষেত্রের বিপক্ষে পরিবর্তন করে কৃষিক্ষেত্র থেকে অকৃষিক্ষেত্রে সম্পদ স্থানান্তর করে নেওয়া সম্ভব। এভাবে কৃষিক্ষেত্র থেকে সম্পদ অকৃষিক্ষেত্রে হস্তান্তরিত হবে কারণ একই পরিমাণ অকৃষি দ্রব্য বা সেবা পেতে হলে কৃষিক্ষেত্রকে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য ও সেবা বিনিময়ে দিতে হয়। অবশ্য কৃষিক্ষেত্রের বিরুদ্ধে বিনিময় হারকে খুব বেশি বাড়ানো যায় না, কারণ তাহলে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনের উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে বাধ্য এবং শেষ পর্যন্ত কৃষিজাত পণ্যের দামও বাড়তে শুরু করবে। ফলে কৃষিক্ষেত্র থেকে অকৃষিক্ষেত্রের সম্পদের স্থানান্তরের পরিমাণ প্রকৃত প্রস্তাবে কমতে শুরু করবে। অন্যদিকে যদি বিনিময় হার কৃষিক্ষেত্রের অনুকূলে পরিবর্তন করা হয়, তাহলে অকৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রকৃত

আয় কমতে থাকবে কারণ অকৃষি শ্রমিকদের ব্যয়ের একটা বড় অংশ হয়ে থাকে খাদ্যশস্যের উপর যা কৃষিক্ষেত্র থেকে আসে। যদি অকৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকরা বেশ সংগঠিত হন, এবং তাঁদের প্রকৃত মজুরীর স্তর কমে যাওয়া প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন, তাহলে শিল্পক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ কমতে শুরু করবে এবং শিল্পায়নের উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। সুতরাং যা প্রয়োজন তা হল কৃষি ও শিল্পের মধ্যে আপেক্ষিক বিনিময় হারের এবং পরিমাণের দিক থেকে একটা যুক্তিসঙ্গত ভারসাম্য স্থাপন করা। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি থেকে মুক্ত কৃষি ও শিল্পের ক্রমান্বয় উন্নয়ন চালু করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটি ক্ষেত্রগত ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে যে পরিকল্পনা কৌশল গৃহীত হয়েছে তাতে এই প্রয়োজন ও গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

অনুশীলনী ১

১) কীভাবে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্র পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল? (ছয় লাইনে উত্তর লিখুন)

....
....
....
....
....
....
....
....
....

২) কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে ক্ষেত্রগত ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা কী? (ছয় লাইনে উত্তর লিখুন)

....
....
....
....
....
....
....
....

৩) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতে প্রতিটির ক্ষেত্রে তিনটি উদাহরণ দিন।

(ক) কৃষিভিত্তিক শিল্প

(খ) অকৃষিভিত্তিক শিল্প

(গ) গণভোগের সামগ্রী

(ঘ) পরোক্ষ কর

....

....

....

....

....

....

....

৪) সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন ঃ

(ক) কৃষিক্ষেত্রের বিপণনকৃত উদ্বৃত্ত হচ্ছে—

(১) কৃষিক্ষেত্রের অভ্যন্তরেই যে সমস্ত কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও ভোগ করা হয়।

(২) কৃষিক্ষেত্রের কাছে যেসব অকৃষি দ্রব্য বিক্রয় করা হয়।

(৩) অকৃষিক্ষেত্রকে যেসব কৃষিজাত পণ্য কৃষিক্ষেত্র বিক্রয় করে।

(খ) ভারতে কৃষিক্ষেত্র থেকে যে আয় সৃষ্ট হয়, তা হচ্ছে—

(১) জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ থেকে ৪০ ভাগ।

(২) জাতীয় আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ থেকে ৪৫ ভাগ।

(৩) জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৫ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ।

৫) কর অথবা সঞ্চয়—কোন্‌টি ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন?

....

....

৬) কোন্ কোন্ কর প্রত্যক্ষ এবং কোন্ কোন্ কর পরোক্ষ বলে অভিহিত হয় কেন? (ছয় লাইনে উত্তর দিন)

....

....

....

....

....

....

১৭.৩ শিল্প

উন্নয়নের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উপায় হিসেবে শিল্পায়নের গুরুত্ব পরিকল্পিত অর্থনীতির যুগে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার কৌশলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ভারতের শিল্পায়নের কর্মসূচী নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে ঃ

ক) শিল্পের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

খ) শিল্প উৎপাদনের বহু বিস্তৃত ভিত্তি তৈরি করে স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্য অনুসরণ করা;

গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে নেতৃত্ব প্রদানকারী উচ্চতায় উন্নীত করা; এবং

ঘ) উদ্যোগী শক্তির বিকাশ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, মূলধনী ও ভোগ্যপণ্য শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শিল্পায়নের উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

১৭.৩.১ ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে ভারতে পরিকল্পনার যুগে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত একরকম অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছে। মোট সংখ্যার বিচারে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আয়তন বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং তার ফলে ব্যাপক বেকারী, অর্ধবেকারী ও বিপুল দারিদ্র্যের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ভারতকে একটি শ্রম-উদ্বৃত্ত অর্থনীতি বলে গণ্য করা যেতে পারে। একই সাথে এই অর্থনীতির অন্য সীমাবদ্ধতাগুলি হল ঃ মূলধনের স্বল্পতা, উদ্যোগী প্রতিভার অভাব এবং উন্নত পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা। (পরিকাঠামো অর্থাৎ পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিপণনের সুযোগ ইত্যাদি।)

এরকম একটা যুক্তি দেওয়া হয় যে, সুদূর প্রত্যান্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করলে কৃষিক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমিককে কাজ দেওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের মূলধনের অভাব, উদ্বৃত্ত শ্রমের আধিক্য, অনুন্নত পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা ইত্যাদি অসুবিধার কথা মনে রাখলে, এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এ দেশের শিল্পায়নের প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্রশিল্পের এমনকি তার সাথে হস্তশিল্পের বিকাশও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে, ভারতে শিল্পায়নের মূল কৌশলই ছিল বৃহদায়তন শিল্পের-বিশেষ করে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের দ্রুত বিস্তারের কৌশল। অবশ্য ভারতের নীতি-প্রণেতারা ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন যে, বৃহদায়তন মূলধনী শিল্পের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষমতা অনেক কম। এই সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই নেহরু-মহলানবীশ শিল্পায়নের কৌশলে বৃহদাকার মূলধনী শিল্পের বিকাশের উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র শিল্প গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করে গ্রামীণ উন্নয়নের প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত করা সম্ভব। তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটায়। চতুর্থত, ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বিকাশে বৃহৎ শিল্পের তুলনায় কম মূলধন এবং কম শ্রমদক্ষতার প্রয়োজন হয় এবং দারিদ্র্য ও বেকারী দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।
এই বিষয়গুলির কথা মনে রেখে গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র শিল্পের স্থাপনে ও বিকাশের উদ্দেশ্যে নানাবিধ আর্থিক ও বিপণন সংস্থা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উভয় উদ্যোগে গড়ে উঠেছে।

১৭.৩.২ মূলধনী দ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য শিল্প

স্বাধীনতা প্রাপ্তীর সময় ভারতের অর্থনীতির মূলধন-ভিত্তি ছিল খুবই সংকীর্ণ। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর দেশে একটি বৈচিত্র্যময় বৃহদাকার মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্র গড়ে তোলা হল। শিল্পায়নের এই বিশেষ ধরনের কৌশলকে বলা হয় আমদানি-বিকল্প-চালিত শিল্পায়ন। দেশে

যেসব শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হবে তা বিদেশ থেকে সমজাতীয় পণ্য আমদানির জায়গা নেবে। বিশেষ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই ধরনের শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল পরিমাণ সংগ্রহ করা এবং সাথে সাথে সুদক্ষ ও উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ শ্রমশক্তির ভাণ্ডার গড়ে তোলা। যদিও শিল্পায়নের এই কৌশলের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত স্বয়ম্ভরতা অর্জন, তবুও স্বাধীনতার পর পরিকল্পনার প্রথম পর্বে মূলধনী দ্রব্য, কাঁচামাল এবং প্রযুক্তি বেশ কিছু পরিমাণেই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছিল, কারণ এগুলি তখন এদেশে সহজলভ্য ছিল না।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের যে শিল্পনীতি ঘোষিত হল, তা ভারতে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেটিকে উজ্জীবিত করে তুলল। মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্র বলতে মূলত বোঝায় লোহা, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, অ্যালুমিনিয়ম, সিমেন্ট ইত্যাদি। মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন সব মূলধনী সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি তৈরি হয়, যা ভোগ্যপণ্য কিংবা বা মূলধনী সরঞ্জাম উৎপাদনের কাজে লাগে। ফলে একটি ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা থেকে হয়ত বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি তৈরি হল (অর্থাৎ মূলধনী সরঞ্জাম) যা ব্যবহৃত হচ্ছে কাপড় উৎপাদনে (অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য)। তেমনি লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কারখানায় এমন যন্ত্রপাতি তৈরি হল যা ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ব্যবহৃত হল এবং সেখানে পুনরায় এমন একটি মূলধনী সামগ্রী উৎপাদিত হল যা হয়ত শেষ পর্যন্ত সিমেন্ট বা ঐ জাতীয় মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে কাজে লাগল।

মূলধনী শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও তৈরি হয়ে থাকে, যেমন, ট্রাক্টর হার্ভেস্টর, থ্রেশার। তাছাড়াও বহুমুখী সেচ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও এই ক্ষেত্রেই উৎপাদিত হয়, যেমন সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদি। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ তো এই মূলধনী শিল্পক্ষেত্রেরই অবদান। শিল্প যন্ত্রপাতি রপ্তানি করতে এবং দুর্লভ বিদেশি মুদ্রা অর্জন করতেও এই ক্ষেত্র সাহায্য করে।

মূলধনী দ্রব্য শিল্পের সঙ্গে ভোগ্যপণ্য শিল্পের তফাৎ হল যে মূলধনী দ্রব্য শিল্পে এমন সব সামগ্রী তৈরি হয় যা শিল্প উৎপাদনের মাঝপথে কোনো না কোনো স্তরে ব্যবহৃত হয়—অন্যদিকে ভোগ্যপণ্য শিল্পে যা উৎপাদিত হয় তা চূড়ান্ত পর্বে ভোগের জন্য ব্যবহার করা হয়। ভোগ্যপণ্যের মধ্যে এমন দ্রব্যও থাকে যা স্থায়ী নয়—যেমন, ডাল, ভোজ্যতেল, চিনি, নুন; আবার কিছু আধা-স্থায়ী দ্রব্যও থাকে যেমন, কাপড় সাবান জুতো। এ ছাড়া কিছু স্থায়ী ভোগদ্রব্যও তৈরি হয়ে থাকে, যেমন যাত্রীবাহী গাড়ি, বসত-বাড়ি ইত্যাদি। এই সব নান ধরনের ভোগ্যপণ্যের মধ্যে কিছু দ্রব্য মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ করে—যেমন, চাল, নুন অল্প মূল্যের কাপড়, কম দামের বাড়ি; আর কিছু আছে যা তত প্রয়োজনীয় নয় অর্থাৎ বিলাসদ্রব্য—যেমন গাড়ি, শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি। মূলধনী দ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। তা যদি না হয় তাহলে সমতা ও ভারসাম্যের নীতি ব্যাহত হয়। উৎপাদনক্ষমতা ও সামগ্রিক উন্নয়নের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। যদি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের হার বেশি হয়, তাহলে মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

অনুশীলনী-২

১। **পার্থক্য নির্দেশ করুন (প্রত্যেকটির উত্তর-এর লাইনে)**

(ক) মূলধনী দ্রব্য ও ভোগ্য দ্রব্য।

(খ) স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য।

(গ) বিলাস দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

(ঘ) বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রয়তন শিল্প।

....

....

....

....

....

....

২। **নীচের প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনটি করে দৃষ্টান্ত দিন।**

(ক) শহরাঞ্চলের অবস্থিত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প।

(খ) মূলধনী দ্রব্য শিল্প।

(গ) গ্রামীণ ও হস্ত শিল্প।

(ঘ) ভোগ্যপণ্য শিল্প।

....

....

....

....

....

....

৩। **সম পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে নীচের শিল্পক্ষেত্রগুলির মধ্যে কোনটিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ ও সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি?**

(ক) একটি মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন শিল্প অথবা একটি ভোগ্যপণ্য উৎপাদন শিল্পে?

(খ) একটি বৃহদায়তন শিল্প অথবা একটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প?

....

....

....

....

....

....

১৭.৪ গণবন্টন ব্যবস্থা ও সামাজিক কল্যাণ

শহর এলাকায় এরকম দৃশ্য প্রায়শই দেখা যায় যে, কিছু লোক দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কখন রেশন দোকান খুলবে এই প্রতীক্ষায়। এই সমস্ত রেশন দোকানে প্রতিটি ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণে বাজার দামের থেকে কম দামে অতি প্রয়োজনীয় কিছু ভোগ্যপণ্য যথা, চাল, গম, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি কিনতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই রেশনিং ব্যবস্থা আসলে কি? কেন এর প্রয়োজন? এর অর্থনৈতিক তাৎপর্যই বা কী?

১৭.৪.১ ঐতিহাসিক পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯৩৯-৪৫) কালোবাজারির কারণে খাদ্যশস্যের ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য আকাশচুম্বি হয়ে উঠেছিল। এর ফলশ্রুতি হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল দুর্ভিক্ষ বা প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা। যাঁরা খুবই দরিদ্র তাঁদের খোলা বাজার থেকে খাদ্য কেনার ক্ষমতা একেবারেই ছিল না। এই ঘটনা বাজার-ব্যবস্থার ব্যর্থতার একটি দৃষ্টান্ত (একক নং ১৫ দ্রষ্টব্য)। সরকার চালু করলেন গণ-বন্টন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য একটি নির্দিষ্ট দামে বন্টন করা হবে—যে নির্দিষ্ট দামটি হবে বাজারে প্রচলিত দামের থেকে কম। এই উদ্দেশ্যে ন্যায্য মূল্যের দোকান (বা রেশন দোকান) খোলা হয়েছিল। সেই সময় থেকেই এ দেশে গণবন্টন ব্যবস্থা ক্রমশ শক্তিশালী করা হয়েছে এবং এর পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু শহর এলাকার তুলনায় গ্রাম এলাকায় গণবন্টন ব্যবস্থার বিস্তার অনেক কম হয়েছে। গণবন্টন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল ঘাটতির সময়ে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ করে আর্থিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা। কৃষি-পণ্যের দামে ঋতুগত ওঠানামা দূর করে স্থিতিশীলতা আনাও ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। তাছাড়া অসৎ ব্যবসায়ীদের বেআইনী মজুত, ফাটকাবাজি ও কালোবাজরির বিরুধ্বে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেও এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল।

১৭.৪.২ গণবন্টন ব্যবস্থার কার্যাবলী

গণ-বন্টন ব্যবস্থায় দরিদ্রদের জন্য দ্বিবিধ রক্ষাকবচ আছে। একদিকে উৎপন্ন ফসলের ন্যূনতম দাম নিশ্চিত করে দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা। অন্যদিকে ন্যায্য দামে অত্যাবশকীয় ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করে দরিদ্র পরিবারদের পক্ষে কাজ করা। কৃষি উৎপাদন শুরু হওয়ার আগেই সরকার বিভিন্ন ফসলের সংগ্রহ মূল্য ও ন্যূনতম সহায়ক ক্রয়মূল্য ঘোষণা করেন। সরকার ঘোষিত ফসলের এই মূল্য কৃষকদের কাছে সূচক বা নির্দেশক হিসেবে কাজ করে যার ভিত্তিতে দরিদ্র কৃষকেরা কোনো ফসল কত পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সরকার ঘোষিত ন্যূনতম দাম একটি নিম্নতম বাঁধ হিসেবে কাজ করে যার নীচে বাজার দাম নেমে যেতে পারে না। বাজার দাম বলতে আমরা বুঝি যা সাধারণভাবে বাজারের চাহিদা ও যোগানের শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে অবাধে স্থির হয়। যখনই কোনো ফসলের দামে সরকার ঘোষিত ন্যূনতম সহায়ক দাম থেকে কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, তখনই সরকার নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি

(যেমন, ফুড কর্পোরেশন অফ্ ইন্ডিয়া, জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদি) নির্দিষ্ট ঘোষিত দামে ঐ ফসল কিনে নেয়। ফসলের সংগ্রহ মূল্য হচ্ছে সেই দাম যে দামে সরকার কৃষিক্ষেত্র থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে থাকেন। এই সংগ্রহ-মূল্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সমান বা তার থেকে বেশি হতে পারে। সরকার আরও এক ধরনের দাম ঘোষণা করেন—তা হচ্ছে খাদ্যশস্য বা অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বিক্রয়মূল্য-অর্থাৎ যে দামে ন্যায্য-মূল্যের দোকান থেকে রেশনকার্ডধারী ব্যক্তি বা পরিবারদের খাদ্য বা অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। সরকার ঘোষিত এই বিক্রয়মূল্য খোলাবাজারে প্রচলিত দাম থেকে কম হয়ে থাকে।

ফসলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও সরকার আর এক ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন—তা হচ্ছে ফসলের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যশস্য বা ভোগ্যপণ্যের যোগান বা সরবরাহে স্থিতাবস্থা রক্ষা করা। ফলে যে বছর ফসলের উৎপাদন বেশ ভালো হয়, সে বছর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন এফ. সি. আই. বা জে.সি.আই.) প্রচুর পরিমাণে ফসল কিনে গুদামজাত করে। যে বছর শস্যের বা ফসলের উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়, সে বছর এই প্রতিষ্ঠানগুলির মজুত ভাণ্ডার থেকে শস্য বার করে এনে রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে সরবরাহ বাড়ানো হয়, এর ফলে ফসলের মূল্য সারা বছর ধরেই একটি নির্দিষ্ট স্তরে ধরে রাখা সম্ভব হয়।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দেশে মোট ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৩৯ হাজার। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৩ লক্ষ ১৫ হাজার। গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে মোট বিক্রয় পরিমাণও এই সময়কালের মধ্যে ১৭.৯৪ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ২৪.৭৭ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছিল।

কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে গণবন্টন ব্যবস্থা একটি দ্বৈত্য মূল্য ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করে, যেমন, চিনি। মোট উৎপন্ন চিনির একটি নির্দিষ্ট অংশে সরকারি প্রতিষ্টানের মাধ্যমে উৎপাদকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। এই পরিমাণে সংগৃহীত চিনি রেশন দোকানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট দামে মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে রেশনকার্ড আছে এমন পরিবার বা ব্যক্তিদের সরবরাহ করা হয়। চিনি উৎপাদকের উৎপন্নের বাকি অংশ খোলা বাজারে যে কোনও দামে বিক্রি করে দেওয়ার স্বাধীনতা থাকে। এই ভাবে উৎপাদক ও ভোগকারী উভয় গোষ্ঠীরই স্বার্থে সুরক্ষিত থাকে। উৎপাদকরা চিনির যা উৎপাদন খরচ তা ফিরে পান এবং লাভ করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে ভোগকারী যাঁরা তঁদেরও ন্যূনতম চাহিদা তৃপ্ত হয় এই গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে। ভারতে ষষ্ঠ পরিকল্পনা, পর্বে গণবন্টন ব্যবস্থার গুরুত্ব সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়।

১৭.৪.৩ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কিছু প্রস্তাব

গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় দ্রবাদি বিলিবন্টন ও আরও ভালোভাবে করতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(ক) সরবরাহ ব্যবস্থায় কোনও রকম বাধা বা হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটলে, তা দূর করতে হবে এবং ভালো মানের দ্রব্য অবাধে, নিয়মিত ও যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে।

(খ) দেশের মধ্যে যেসব এলাকা অনুন্নত, দূরবর্তী ও দুর্গম সেসব অঞ্চলকেও এই ব্যবস্থার অধীনে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) দেখতে হবে যাতে সমাজে যারা নানাভাবে বঞ্চিত গোষ্ঠী—বিশেষ করে, যাঁরা দারিদ্র্য-সীমার

নীচে বাস করছেন যেমন, ভূমিহীন দরিদ্র শ্রমিক—তাঁদের কাছে এই ব্যবস্থার সুফল পৌঁছতে পারে।

(ঘ) সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন মজুত ভাণ্ডারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঙ) শস্য গুদামজাতকরণ এবং পরিবহন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, যাতে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়।

(চ) রেশনকার্ড বন্টনের সুষ্ঠুব্যবস্থা এবং গণবন্টন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তবে—যথা, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, বন্টন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব দুর্নীতি ও অব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় তা অবিলম্বে দূর করতে হবে এবং

(ছ) রাজনৈতিক অনুগ্রহ বিতরণের জন্য এই ব্যবস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

এ ছাড়া গণবন্টন ব্যবস্থার চালু কাঠামোকে উজ্জীবিত শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। যেসব রাজ্যে সমবায় আন্দোলন বেশ শক্তিশালী সেসব রাজ্যে রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা সমবায় বিপণন সমিতিগুলি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ এবং পরিবহন ও বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। অনেক রাজ্যে দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর কাছে এই সব অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সহজেই পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'সিভিল সাপ্লাই কর্পোরেশন' অর্থাৎ পণ্য সরবরাহ নিগম' জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়াও বন্টনের ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে দক্ষ ও সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে পরিচালিত বিপণন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। যে সব জায়গায় নির্মাণের কাজ চলছে সেখানে ভ্রাম্যমান ন্যায্য মূল্যের দোকান সংগঠিত করতে হবে।

যতদিন দেশে দারিদ্র্য ও দ্রব্যের ঘাটতির সমস্যা থাকবে ততদিন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে গণবন্টন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এই ব্যবস্থার গুরুত্ব আরও বহুগুণ অনুভূত হবে বিশেষ করে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর স্বার্থের কথা ভেবে।

অনুশীলনী—৩

১। নিম্নলিখিত ধারণাগুলি একটি বাক্যে ব্যাখ্যা করুন।

(ক) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য।

(খ) সংগ্রহ মূল্য।

(গ) সরকারি ভাণ্ডার থেকে ফসলের বিক্রয়মূল্য।

....

....

....

....

....

....

....

২। গণবন্টন ব্যবস্থার সাথে অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সম্পর্ক দেখান।

....
....
....
....
....
....
....

৩। দ্বৈত দাম-ব্যবস্থা কী? কীভাবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদক ও ভোগকারীর স্বার্থে রক্ষিত হয়?

....
....
....
....
....
....
....

১৭.৫ বহুস্তরবিশিষ্ট পরিকল্পনা

ভারতে পরিকল্পনা চালু হওয়ার প্রথম পর্বে, পরিকল্পনা রচনা করার কথা ভাবা হত প্রধানত দুটি স্তরে— (ক) জাতীয় স্তর এবং (খ) রাজ্য স্তর-এ। ফলে পরিকল্পনার কিছু সুফল তৃণমূল স্তরে ছিটেফোঁটা এসে পৌঁছলেও ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব অবস্থার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি সকলেই এটা স্বীকার করেছেন যে, দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা বহুস্তরে হওয়া উচিত—রাজ্য, জেলা ব্লকে, এমনকি গ্রাম স্তরেও।

গ্রামে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যাঁরই আছে তিনিই জানেন যে, পাশাপাশি অবস্থিত গ্রামগুলির মধ্যেও মাটির বৈশিষ্ট্য, জলের যোগান বা অন্যান্য নানা বিষয়ে অনেক পার্থক্য বা বৈচিত্র্য রয়েছে। এর ফলে এক একটা গ্রামে জমি চাষ করার পদ্ধতিও ভিন্ন রকম হতে পারে। এই রকম অবস্থায় যদি কোনও পরিকল্পনা রচয়িতা গ্রাম থেকে বহু দূরে অবস্থিত দেশের রাজধানীতে বসে পরিকল্পনা রচনা করেন এবং একটি গ্রাম বা অঞ্চলের তুলনায় অন্য অঞ্চলের সম্পদ বা জমির বিভিন্নতা সম্পর্কে অবহিত না হয়েই যদি সমস্ত অঞ্চলের জন্য একই রকম ফসল উৎপাদন বা একই ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করার পরামর্শ দেন, তা'হলে দেশের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে না। মোট উৎপাদন স্বভাবতই অনেক কমে যাবে। ফলে উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হলে একেবারে তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।

প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলিতে বহুস্তর-বিশিষ্ট পরিকল্পনার ধারণা, পদ্ধতি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা হলেও, পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার সময়েই কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সেগুলি রূপায়ণের জন্য কতকগুলি বিশেষ এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠানও তৈরি করা হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য কর্মসূচী, ন্যূনতম চাহিদা-পূরণের প্রকল্প, এবং গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির কার্যক্রমের উপর যত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকল, বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার প্রয়োজন তত বেশি অনুভূত হতে থাকল। বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার সুবিধাগুলি কী? উত্তর হচ্ছে, এর ফলে—বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নের প্রয়োজন ও প্রকৃতি আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়; উন্নততর তথ্য ও জ্ঞানের ভিত্তিতে সিধান্ত গ্রহণ সহজ হয়; স্থানীয় মানুকে তার এলাকার উন্নয়ন ও জনকল্যান স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আরও বেশি স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দেওয়া যাবে; বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্পের মধ্যে আরও বেশি সংহতি ও সমন্বয় আনা সম্ভব হবে; পরিকল্পনা রচনার প্রক্রিয়ার মধ্যে এলাকার মানুষের প্রয়োজন, চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এবং তাদের অংশগ্রহণও সুনিশ্চিত করবে। এছাড়া নগদ টাকা বা দ্রব্যের আকারে সমাজের স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ করার মধ্যে দিয়ে এ জাতীয় পরিকল্পনা এক একটি অঞ্চলকে স্বয়ংস্পূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করে এবং এলাকার উৎপাদনশীলতা ও বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের অনুকূলে সম্পদের আরও কার্যকর ব্যবহার সম্ভব করে তোলে। সুতরাং পরিকল্পনার সুফল সমাজের সমস্ত স্তরে পৌঁছতে হলে পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকৃত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তবুও একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বহুস্তর-বিশিষ্ট পরিকল্পনা রচনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা ও দুর্বলতার সম্মুখীন হতে হয়। এই ধরনের পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে যেসব বাধা বা সমস্যার দেখা পাওয়া যায় সেগুলি হল ঃ

(ক) সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা দায়িত্ব সাধারণভাবে প্রশাসনের উঁচু মহলের ব্যক্তিদের হাতে সীমাবদ্ধ থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়;

(খ) এলাকার উন্নয়ন বা জনকল্যাণের স্বার্থে গৃহীত কর্মসূচীর সঙ্গে এলাকার সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ হতে পারে;

(গ) জেলা বা ব্লক স্তরের উন্নয়ন সংস্থাগুলির হাতে কোনও সম্পদই থাকে না বা থাকলেও তা খুবই নগণ্য;

(ঘ) স্থানীয় মানুষদের পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে যে প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, তা প্রায়শই কার্যকর হয় না;

(ঙ) বিভিন্ন স্তরে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার জন্য বিশেষজ্ঞ ও কারিগরি দক্ষতার অভাব; এবং

(চ) জাতীয়, রাজ্য, জেলা বা স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা ও সঠিক জ্ঞানের অভাব ফলে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে পরিকল্পনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের কাজ করার ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি ও ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়।

১৭.৫.১ বহুস্তরবিশিষ্ট পরিকল্পনার নানান ধাপ

প্রত্যেক স্তরেই পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের নানা পর্ব থাকে ঃ

● প্রাক্-পরিকল্পনা পর্ব
● পরিকল্পনা পর্ব
● পরিকল্পনা রূপায়ণের পর্ব
● পরিকল্পনার অগ্রগতির বিষয়ে তথ্য জ্ঞাপন ও মূল্যায়ন পর্ব

এই পর্বগুলি যে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন তা নয়, তবে পরিকল্পনা রচয়িতাদের এই পর্বগুলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। অভীষ্টলক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে পরিকল্পনা রচনার কাজ কয়েকটি ধাপে ভাগ করে নিতে হবে — যেমন, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের বিশ্লেষণ, স্থানীয় সম্পদ ও সামর্থ্য কতটা তার হিসেব করা, অগ্রাধিকার স্থির করে নেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করা। এটা করতে গিয়ে অবশ্যই অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা সংগঠন বা দপ্তরের নিজস্ব উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে এলাকার জন্য রচিত পরিকল্পনার সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা কার্যকর ও সফল করতে গেলে এর সঙ্গে জড়িত নানা ধরনের কর্মী আধিকারিক ও ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের কাজকর্মের মূল্যায়ন করা দরকার। এই সমস্ত কাজ ক্রমাগত অব্যাহত গতিতে চলবে।

বহুস্তর-বিশিষ্ট পরিকল্পনাকে কার্যকর ও সফল করতে হলে আরও কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হবে ঃ

(ক) প্রত্যেক স্তরে কর্মসূচীগুলিতে চিহ্নিত করতে হবে;
(খ) কর্মসূচী-ভিত্তিক অর্থের সংস্থান করতে হবে;
(গ) প্রতিটি স্তরেই পরিকল্পনা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে;
(ঘ) প্রতিটি স্তরের জন্য পরিকল্পনা রচনা করতে হবে;
(ঙ) পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

অল্পবিস্তর সংশোধনসহ প্রতিটি স্তরেই এই বিষয়গুলি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। পরিকল্পনা রচনার এই পদ্ধতি আরও বিশদভাবে বোঝানো যেতে পারে যদি আমরা একটি জেলাস্তরের পরিকল্পনা মডেল এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরি।

একটি জেলা স্তরের পরিকল্পনা রচনা করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন -

(ক) জেলা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য স্থির করা;
(খ) জেলা পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং সংকলিত করা;
(খ) পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জেলার বর্তমান অবস্থার চিত্র তৈরি করা;
(গ) জেলা পরিকল্পনার মূল কৌশল নির্ধারণ এবং কোন বিষয়ে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা স্থির করা; এবং
(ঙ) মূল কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে জেলায় চালু প্রকল্পগুলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ। এর ফলে জেলা পরিকল্পনায় কিছু প্রস্তাব রাখা যেতে পাবে—যেমন,
(১) চালু প্রকল্পগুলির কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধন;
(২) জেলার বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য পদক্ষেপ;
(৩) জেলায় বেকারী বা আধাবেকারীর পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং মানবিক সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা ও লক্ষ্য স্থির করা;

(৪) নতুন কর্মসূচী ও প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা;
(৫) বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্পের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সন্ধান করা; এবং
(৬) এমন সংগঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে পরিকল্পনা রূপায়ণে কোনো ফাঁক না থাকে।
(চ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর জন্য অর্থসংস্থান করার উদ্দেশ্যে সম্পদের পরিমাপ করা;
(ছ) জেলা পরিকল্পনার বস্তুগত ও অর্থগত বিভাগের বিবরণ দিতে হবে;
(জ) জেলা পরিকল্পনার স্থানগত বিষয়গুলি উল্লেখ করে একটি বিবরণ প্রস্তুত করা এবং
(ঝ) জেলা পরিকল্পনার সাথে আঞ্চলিক ও রাজ্য পরিকল্পনার সম্পর্ক ও যোগাযোগ নির্ধারণ করা।

অনুশীলনী-৪

(১) বহুস্তর-বিশিষ্ট পরিকল্পনা কী? আপনি কি মনে করেন কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা অপেক্ষা এই পরিকল্পনা উন্নততর? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে অন্তত দুটি কারণ দেখান।

....
....
....
....
....
....
....
....

২। বহুস্তর-বিশিষ্ট পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরগুলি কী কী? শীর্ষ স্তর থেকে আলোচনা শুরু করেন।

....
....
....
....
....
....

১৭.৬ সারাংশ

পাঠক্রমের এই অংশে কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরতা, গণবন্টন ব্যবস্থা, শিল্পায়নের কৌশল এবং বহুস্তর-বিশিষ্ট পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা কৌশল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভারতে গৃহীত পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে নানাবিধ যোগসূত্রের

অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের ভারসাম্য সমন্বিত উন্নয়ন ও দামের স্তরকে স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আর্থিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার হাতিয়ার হিসেবে গণবন্টন ব্যবস্থা কাজ করে যদিও এই ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার অবকাশ আছে। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে, ভারতের শিল্পায়ন নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহদায়তন মূলধনী ভিত্তি স্থাপন করে দেশের আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা। অন্যদিকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপনের লক্ষ্য হচ্ছে কার্যকরী কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া এবং দারিদ্র্য দূর করা। এর ফলে গ্রামাঞ্চলেও শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে। পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের কাজের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করলে পরিকল্পনার প্রক্রিয়া আরও গতিময় হয়ে উঠবে। এটাই হচ্ছে বহুস্তর-বিশিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি।

১৭.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

মূলধনী দ্রব্য উৎপাদক শিল্প ঃ সেইসব শিল্প যা আরও অধিক পরিমাণে ভোগ্য ও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের সাহায্য করে, এমন দ্রব্য উৎপাদন করে।

ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদক শিল্প ঃ সেইসব শিল্প বা চূড়ান্ত ভোগের উপযোগী দ্রব্য উৎপাদন করে।

প্রত্যক্ষ কর ঃ যেসব করের ভার প্রত্যক্ষভাবে করদাতার ওপর পড়ে সেগুলি প্রত্যক্ষ কর—এই করভার করদাতা অন্য কোনও ব্যক্তির ওপর চালান করে দিতে পারে না। যেমন—আয় কর, দান কর, সম্পদ কর ইত্যাদি।

দ্বৈত দাম-ব্যবস্থা ঃ এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একটি দ্রব্যের দু-রকম দাম ধার্য হয়—একটি দাম সরকার নির্ধারিত ন্যায্য মূল্যের দোকানে পাওয়া যায়; অন্য দামটি খোলা বাজারে চালু থাকে।

বিদেশি মুদ্রা ঃ বিদেশি রাষ্ট্রের মুদ্রা যথা আমেরিকার ডলার বা গ্রেট ব্রিটেনের পাউন্ড স্টারলিং বা জাপানের ইয়েন ইত্যাদি।

সবুজ বিপ্লব ঃ কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন যা সম্ভব হয়েছিল উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কীটনাশক, সেচের সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদির সমবেত প্রয়োগে এবং যার ফলে ভারতে ৬০-এর দশকে কৃষি উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পরোক্ষ কর ঃ যেসব করের ভার করদাতা অন্য কোনও ব্যক্তির ওপর সরিয়ে দিতে পারেন বা চালনা করে দিতে পারেন তাদের পরোক্ষ কর বলে। যেমন—বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক।

বিক্রীত উদ্বৃত্ত ঃ নিজের এবং পরিবারের ভোগের জন্য যা প্রয়োজন এবং বীজ হিসাবে কিছু অংশ সরিয়ে রাখার পর কৃষক তাঁর উৎপন্ন ফসলের যে অংশ বাজারে বিক্রয় করেন তা হচ্ছে বিক্রীত উদ্বৃত্ত।

বহুস্তর-বিশিষ্ট পরিকল্পনা ঃ বিভিন্ন স্তরে রচিত ও রূপায়িত পরিকল্পনা যা বিভিন্ন স্তরের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, জনগণের সব অংশের মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে।

শ্রম-উদ্বৃত্ত অর্থনীতি ঃ যে অর্থনীতিতে জমি বা মূলধন ইত্যাদি উপাদানের অনুপাতে কাজ করতে ইচ্ছুক শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, যার ফলে শ্রমশক্তির একটি অংশ বেকার বা অর্ধ বেকার থেকে যায়।

প্রকৃত আয় ঃ অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত বস্তুগত পণ্য ও সেবাকর্মের পরিমাণ হচ্ছে ব্যক্তির প্রকৃত আয়।

অর্ধ বেকার ঃ পূর্ণ সময়ের জন্য কর্মসংস্থান এবং পূর্ণ বেকারত্বের মাঝামাঝি অবস্থা।

মজুরী-দ্রব্য ঃ যেসব দ্রব্য গণভোগের সামগ্রী, যথা—ডাল, চাল, অল্প দামের কাপড় ইত্যাদি যা শ্রমিকের ন্যূনতম চাহিদার অন্তর্ভুক্ত।

১৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

Chaudhury, Pramit (1978) : *The Indian Economy,* Vani Publicaitons, Delhi.

Chakraborty, Sukhomoy (1987) :

Development Planning, Oxford Univesity Press, New Delhi.

Kamta Prasad (1984) : *Scope and Functioning of the Public Distribution System in India in Economic Policy and Planning in India* (ed.) Singh, A. N., Papola; T.S. and Mathur, R.S. New Delhi, Sterling Publishers, pp. 207-30.

Papola, T.S. (1982) : *Rural Industrialization : Approaches and Potential,* Himalaya Publishing, Bombay.

Government of India (1985) : *The Seventh Five Year Plan,* Planning Commission, New Delhi.

Government of India (1969) : *Multi-level Planning,* Planning Commission, New Delhi.

১৭.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। সংকেত ঃ আপনার উত্তরে আপনাকে দেখতে হবে কীভাবে কৃষিজ দ্রব্য শিল্পে সরবরাহ হয় এবং অনুরূপভাবে শিল্পজ দ্রব্য কৃষিতে আসে। (১৭.২ অংশের ২-৬ অনুচ্ছেদ দেখুন)।

২। ১৭.২ অংশের শেষ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩। ক) কৃষিভিত্তিক শিল্প ঃ বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, প্রাকৃতিক রবার শিল্প।

খ) অ-কৃষিভিত্তিক শিল্প ঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, খনিজতৈল শিল্প, সিমেন্ট শিল্প।

৪। ক) (১) খ) (১)

৫। সঞ্চয় স্বেচ্ছাধীন।

৬। যদি কোনো অর্থনৈতিক একক (ব্যক্তি বা সংস্থা) তার উপর আরোপিত কর অন্যের উপর চালান করতে না পারে তখন ঐ করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। সুতরাং, একজন ব্যক্তিকে আয়কর (প্রত্যক্ষ কর) দিতে হয় যদি তার আয় ধার্য ন্যূনতম আয়ের চেয়ে বেশি হয়। যদি করভার অন্যের উপর চালান করা যায় তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলা হয়।

প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ ঃ সম্পদ কর, কর্পোরেশন কর, ভূ-সম্পত্তির উপর কর ইত্যাদি।

অ-প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ ঃ আবগারি শুল্ক, বিক্রয় কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি।

অনুশীলনী - ২

১। (ক) ১৭.৩.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

(খ) টেঁকসই ভোগ্য পণ্য হল সেইসব দ্রব্য যেগুলি বেশ কিছুদিন ধরে একনাগাড়ে ব্যবহার করা যায়, যেমন—বাড়ি। টেঁকসই নয় এমন দ্রব্য একবারই ব্যবহার করা যায় অথবা দ্রুত ব্যবহারে ফুরিয়ে যায়।

(গ) বিলাসদ্রব্য হল সেইসব ভোগ্যপণ্য যেগুলি ছাড়াও মানুষের জীবন চলে, যেমন—প্রসাধনসামগ্রী। প্রয়োজনীয় দ্রব্য হল যেগুলি মানুষের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটায়, যেমন—চাল, সস্তার কাপড় ইত্যাদি।

(ঘ) সংকেত ঃ তফাৎটি প্রযুক্ত মূলধন এবং শ্রমিকসংখ্যা ছাড়াও কোনো শিল্পের উৎপাদনের মানদণ্ড অথবা পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

২। ১৭.৩.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন। নিজস্ব উদাহরণ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

৩। (ক) একটি ভোগ্যপণ্য শিল্প

(খ) একটি ক্ষুদ্র শিল্প

অনুশীলনী - ৩

১। ১৭.৪.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন (প্রথম অনুচ্ছেদ)।

২। সংকেত ঃ জনসংখ্যার এক ব্যাপক অংশে, বিশেষত দুর্বলতর অংশের মধ্যে ন্যায্য দামে খাদ্যশস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গণবন্টন ব্যবস্থার ভূমিকা উল্লেখ করুন। কীভাবে এটি উৎপাদকদেরও সহায়তা করে তাও উল্লেখ করুন (বিশেষত প্রথম এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)।

৩। ১৭.৪.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন (চতুর্থ অনুচ্ছেদ)।

৪। ১৭.৪.৩ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

অনুশীলনী - ৪

১। ১৭.৫ অনুচ্ছেদটি দেখুন। (বিশেষত প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ)

২। ১৭.৫ অনুচ্ছেদটি দেখুন। লক্ষ্য করুন পাঁচটি স্তর আছে যেটিকে বহু-স্তরবিশিষ্ট পরিকল্পনা বলে।

একক ১৮ ❐ জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন

গঠন

১৮.০ উদ্দেশ্য
১৮.১ প্রস্তাবনা
১৮.২ জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি
১৮.২.১ জনসংখ্যা ঃ একটি স্বাধীন চলরাশি
১৮.২.২ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
১৮.২.৩ ম্যালথাস তত্ত্বের সমালোচনা
১৮.২.৪ অসাম্য এবং দারিদ্র্য ঃ সামাজিক কাঠামোর একটি বৈশিষ্ট্য
১৮.৩ জনসংখ্যা ঃ সাপেক্ষ চলরাশি
১৮.৩.১ পরিবারের আয়তন ও তাদের আয়ত্তাধীন জমির পরিমাণ
১৮.৪ জনসংখ্যা ও উন্নয়নের দ্বিমুখী সম্পর্ক
১৮.৪.১ পরিমাণবাচক কোনও নির্দিষ্ট সম্পর্ক নয়
১৮.৫ জনসংখ্যাগত বিবর্তন
১৮.৫.১ জনসংখ্যাগত বিবর্তনের তিনটি ধাপ
১৮.৫.২ আজকের উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য
১৮.৬ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া
১৮.৬.১ বিকৃত বয়স-কাঠামো
১৮.৬.২ বয়স-লিঙ্গের পিরামিড
১৮.৭ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের নীতি ঃ উন্নয়নের নীতির সঙ্গে সমন্বয়
১৮.৭.১ জন্মহারের উপর উন্নয়নের প্রভাব
১৮.৭.২ অর্থনৈতিক উন্নতি কি প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসের সবচেয়ে কার্যকর উপায়
১৮.৮ সারাংশ
১৮.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ
১৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী
১৮.১১ উত্তরমালা

১৮.০ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ে পাঠ করে আপনি যা জানবেন তা হল—

- এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ ঃ (১) জনসংখ্যা ও উন্নয়ন; এবং (২) উন্নয়ন ও জনসংখ্যা,
- জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল চরিত্র,
- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের বিশ্লেষণ,
- জনসংখ্যাগত বিবর্তনের ধারণা,

● উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য,
● উন্নত দেশগুলির জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার চরিত্র, এবং
● উন্নয়নশীল দেশগুলির যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা।

১৮.১ প্রস্তাবনা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একদিকে যেমন একটি দেশের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে তেমনি এগুলির একটি অন্যটির উপর ক্রিয়াশীল। আমাদের দেশে শহরাঞ্চলে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারগুলি আয়তনে ছোট। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বৃহৎ জমির মালিকানা রয়েছে এমন পরিবার বড়, তুলনায় ভূমিহীন শ্রমজীবী পরিবারগুলি সচরাচর আয়তনে ছোট হয়। এ কারণ হল অর্থনৈতিক উন্নতি প্রারম্ভিক পর্বে কখনো কখনো জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। কিন্তু জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে কারণ এর ফলে সম্পদ সংগ্রহ বিঘ্নিত হয়। ভারতের ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটছে। এমতাবস্থায় জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি দেশে বিপর্যয় ঘটাতে পারে যদি না নতুন নতুন বৃহদায়তন কৃষি জমি ও সম্পদ কাজে লাগান যায়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। আজকের ভারতে জনসংখ্যা যত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম ততই কঠিন হচ্ছে। জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্য দুটি প্রধান বিবেচ্য দিক হল ঃ

(ক) বর্ধিত জনসংখ্যা এবং প্রাপ্ত সম্পদের পারস্পরিক সম্পর্ক; এবং

(খ) প্রচলিত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেসব সমস্যা সৃষ্টি করে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কীভাবে হ্রাস পায়।

উন্নত পশ্চিমি দেশগুলিও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনাপর্বে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে শিল্প বিপ্লব জনিত যেসব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন এসেছিল তার ফলে জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মানের হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব তাকে সহজেই তারা মোকাবিলা করতে পেরেছিল। উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদন এসময় এত বৃদ্ধি পায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোনও গুরুতর সমস্যা হয়নি। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে এসময় ইওরোপের জনসংখ্যার এক বৃহদাংশের উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসন না ঘটলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা হয়ত ইওরোপকেও প্রভাবিত করত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জীবনযাত্রার মান একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করার পর অবশ্য জনসংখ্যার হার পশ্চিমি দেশগুলিতে যথেষ্ট হ্রাস পায়।

অতএব জনসংখ্যা এবং অর্থনীতির মধ্যে যে একটি সক্রিয় পারস্পরিক সম্পর্ক আছে সে সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সারা পৃথিবীব্যাপী আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়েছে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারত প্রথম উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং খুব শীঘ্রই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা অনুভব করতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধান করতে না পারলে যে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশেষ অগ্রগতি হবে না তা অচিরেই বোঝা যায়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলনে একটি কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এটি নির্দেশ করে যে, জনসংখ্যার চলরাশিগুলি উন্নয়নের চলরাশিগুলিকে প্রভাবিত করে। এর ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে একীভূত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্র পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারলে তখনই এটা সম্ভব হবে।

১৮.২ জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি

জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক তিনটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায় ঃ

(ক) উন্নয়ন জনসংখ্যার ওপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ জনসংখ্যা হল স্বাধীন চলরাশি এবং উন্নয়ন হল সাপেক্ষ চলরাশি;

(খ) জনসংখ্যা উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ উন্নয়ন হল স্বাধীন চলরাশি এবং জনসংখ্যা হল সাপেক্ষ চলরাশি; এবং

(গ) জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন পরস্পরকে প্রভাবিত করে অতএব উভয়ের মধ্যে একটি পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে।

অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে উভয়ের এই পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। এই জটিলতাকে যদি আমরা অস্বীকার করি তাহলে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের সঠিক চরিত্র অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এবার এই তিনটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা যাক।

১৮.২.১ জনসংখ্যা ঃ একটি স্বাধীন চলরাশি

যাঁরা জনসংখ্যাকে একটি স্বাধীন চলরাশি বলে মনে করেন তাঁদের মতে জনসংখ্যাকে সর্বদা প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জনসংখ্যার প্রয়োজনানুসারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো দরকার। কিন্তু উন্নয়ন যদি দ্রুত না হয় তাহলে জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটবে না এবং যার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হল দারিদ্র্য ও অতিরিক্ত জনসংখ্যা। এ কারণে অনেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দারিদ্র্যের মূল কারণ হল দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এক বৃহৎ জনসংখ্যা, যা সচরাচর উচ্চ জন্মহারের কারণে ঘটে। এর থেকে এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, দরিদ্র জনগণ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি যদি তাদের উচ্চ জন্মহার চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভবপর নয়।

১৮.২.২ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, দারিদ্র্য হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল তাঁরা টমাস রবার্ট ম্যালথাসের তত্ত্বকেই আসলে সমর্থন করেন। দুশো বছর আগে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যালথাস নামে একজন ইংরেজ পাদ্রী লেখক পরিচয়বিহীন যে বইটির মাধ্যমে তাঁর জনসংখ্যা তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন তার নাম হল 'অ্যান এসে অন দ্য প্রিন্সিপল অফ পপুলেশন অ্যাজ ইট অ্যাফেক্টস দ্য ফিউচার ইমপ্রুভমেন্ট অফ সোসাইটি'। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে লেখকের নাম প্রকাশ করা হয় এবং তত্ত্বটিকেও বহুলাংশে সংশোধন করা হয়।

ম্যালথাস খাদ্য সরবরাহের প্রকৃতি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে দুটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন ঃ

(ক) জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত হলে বৃদ্ধির হার হয় জ্যামিতিক, অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রারম্ভিক বছরের সংখ্যাই বর্ধিত হয় না। বর্তমানে যা যুক্ত হয়েছে তাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর (অর্থাৎ খাদ্যশস্যের সরবরাহ) বৃদ্ধির হার হল গাণিতিক, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের জন্য যে

সাধারণ সুদ পাওয়া যায় তা প্রতি বছর প্রারম্ভিক বছরের অঙ্কের সঙ্গেই যুক্ত হয়। এর অর্থ হল জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার খাদ্য জোগানের হারের চেয়ে দ্রুততর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে ১২ বছরে যেভাবে বৃদ্ধি পাবে তা হল ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ৬৪, ১২৮, ২৫৬, ৫১২, ১০২৪ এবং ২০৪৮। অন্যদিকে ১২ বছরে খাদ্য সরবরাহ গাণিতিক হারে যেভাবে বৃদ্ধি পাবে তা হল ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২১ এবং ২৩। উভয়ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির গুণনীয়ক হল ২। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যার হার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তুলনায় বেশি হবে ফলে খাদ্যভাব জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে কমিয়ে দেবে; এবং

(খ) জন্মহার কমানোর জন্য মানুষ যদি 'প্রতিরোধমূলক' কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেমন নৈতিক সংযম, বেশি বয়সে বিবাহ ইত্যাদি গ্রহণ না করে তাহলে মহামারী, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ইত্যাদি কিছু 'অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ' ব্যবস্থা মৃত্যুহার বৃদ্ধি করে জনসংখ্যার হার হ্রাস করবে।

ম্যালথাসের তত্ত্ব প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ ইওরোপবাসীর মনে এক গভীর ও নৈরাশ্যবাদী প্রভাব রেখে যায়। এই তত্ত্বানুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে খাদ্য সরবরাহের বৃদ্ধিও প্রয়োজন কিন্তু প্রকৃতি হল কৃপণ স্বভাবের এবং খাদ্যের যোগান খুব ধীর লয়ে বৃদ্ধি পায়। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং খাদ্যের যোগানের বৃদ্ধির হারের মধ্যে এক ধরনের অসাম্যের প্রবণতা লক্ষিত হয় যদি বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হয় তাহলে ম্যালথাসের গণনা অনুযায়ী আগামী তিনশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে ৪০৯৬ গুণ, অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদনের হার মাত্র ১৩ গুণের বেশি হবে না। এই যুক্তিটিই হল ম্যালথাস তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যার অর্থ জনসংখ্যা হল একটি স্বাধীন চলরাশি।

১৮.২.৩ ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা

পরবর্তী কিছু গবেষণা এবং বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করেছে যে ম্যালথাসের এই যুক্তি সঠিক নয়। ম্যালথাস-তত্ত্বের সমালোচনার কয়েকটি মূল বিষয় হল ঃ

(ক) প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে খাদ্য উৎপাদনের হার যে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব ম্যালথাস এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছেন।

(খ) জন্মহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মানুষের খুব বেশি মাত্রায় আছে, ফলে দেখা যায় যে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে জন্মের হার স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়।

(গ) ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা ম্যালথাস তত্ত্ব সমর্থিত নয়।

ম্যালথাসের পূর্বানুমানের বিরোধী এমন তিনটি বিষয় হল ঃ (ক) গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং খাদ্যোৎপাদনের প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য দ্রুত উন্নতি, (খ) কৃত্রিম, উন্নত ও নিরাপদ জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন এবং (গ) জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও জন্মহার হ্রাস।

এছাড়াও একটি স্বাধীন চলরাশি হিসেবে কোন কোন অবস্থায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি উন্নত অর্থনীতির ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। বেশি জনসংখ্যার অর্থ হল পণ্য, চাকুরী এবং বৃহৎ বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি যার ফলে উৎপাদন বাড়বে এবং স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে। গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সম্পদের তুলনায় মানবসম্পদ (অর্থাৎ জনসংখ্যা) উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির ক্ষেত্রে অধিক সহায়ক হয় কারণ মানবসম্পদ বৃদ্ধির অর্থ হল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার বৃদ্ধি যার প্রয়োজনীয়তা ক্রমবর্ধমান। এটি শুধু আর অতীতের বিষয় নয়। দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

জনসংখ্যার মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণদের সুদক্ষ মানব-মূলধন হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য সুশিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন কারণ তরুণরা বয়স্কদের তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই বেশি সক্ষম ও দক্ষ হয়।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব একটি নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতালব্ধ হওয়ায় অপ্রমাণিত এবং অতি-সরলীকৃত ও এই কারণে যুক্তির নিরিখে অচল। উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নতি ছাড়া যদি জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে তাহলে কিছুকাল পরে আয় বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়, এমনকি গড় আয়ের পরিমাণও কমে যায়।

১৮.২.৪ অসাম্য এবং দারিদ্র্য ঃ সামাজিক কাঠামোর একটি বৈশিষ্ট্য

অসাম্য এবং দারিদ্র্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এ হল সামাজিক কাঠামোরই একটি বৈশিষ্ট্য এবং অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলশ্রুতি খুব একটা নয়। একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনোটিই এককভাবে অসাম্য এবং দারিদ্র্যের সমস্যা দূর করতে পারে না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছাড়াও আমাদের সামাজিক পরিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে একমাত্র বৃহৎ পরিবার থাকার কারণেই মানুষ দরিদ্র হয় না। অন্যদিকে এটাও দেখা যায় যে মানুষ দরিদ্র বলেই তার পরিবার বৃহদায়তন হয়। অবশ্য এটা যে সবসময় সত্য হয় না তা আমরা এই আলোচনার প্রারম্ভের দৃষ্টান্তে দেখেছি।

অনুশীলনী—১

সঠিক মন্তব্যের পাশে (✓) চিহ্ন এবং ভুল মন্তব্যের পাশে চিহ্ন (×) দিন ঃ

১। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যা ঘটে ঃ

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ( )

(খ) দরিদ্র পরিবারগুলির তুলনায় ধনী পরিবারগুলি আয়তনে ছোট হয়। ( )

(গ) নগরায়নের প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। ( )

(ঘ) উপরোক্ত সবগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। ( )

২। জনসংখ্যা তত্ত্ব পাঠের তাৎপর্য সম্পর্কে একশ শব্দের মধ্যে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। নীচের বন্ধনীর মধ্যে থেকে উপযুক্ত শব্দ (অথবা শব্দাবলী) চয়ন করে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) আজকের ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধি যত .... (দ্রুত/শ্লথ) হয়, আমাদের জীবনধারণের সংগ্রাম ততই ....(কঠোর/উজ্জ্বল) হয়।

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রারম্ভিক পর্বে উন্নত পশ্চিমি দেশগুলি জনসংখ্যা সমস্যার........................(সম্মুখীন হয়েছে/সম্মুখীন হয়নি)।

(গ) জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বব্যাপী বিতর্কের বিষয় .... (হয়েছে/হয়নি)।

(ঘ) .... (জেনিভা/বুখারেস্ট) এ অনুষ্ঠিত ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলন একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

৪। জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণকারী তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি কি কি?

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

৫। নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলি সত্য অথবা মিথ্যা নির্দেশ করুন ঃ

(ক) যাঁরা বিশ্বাস করেন যে অত্যধিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি দারিদ্র্যের কারণ, তাঁরা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের দ্বারা সমর্থিত। ( )

(খ) প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ( )

(গ) দরিদ্র মানুষ এবং উচ্চ জন্মহার এ দুয়ের মধ্যে সচরাচর সম্পর্ক থাকে না। ( )

(ঘ) জনসংখ্যা ও উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্র অত্যন্ত সরল। ( )

৬। একশ শব্দের মধ্যে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব বিবৃত করুন। ( )

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

১৮.৩ জনসংখ্যা ঃ সাপেক্ষ চলরাশি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। এই অনুমানের মূল কথা হল যে কোনো উন্নয়নশীল দেশে স্বাধীন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করা অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন। কিন্তু একটি উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত বর্ধিত জনসংখ্যার সকলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে ফলে কাজে লাগানো যাবে এই অনুমানই উপরোক্ত ধারণার সবচেয়ে দুর্বল দিক। ফলে আমরা যদি একটি উন্নয়নশীল দেশের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করি তাহলে দেখব যে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এধরনের কোনো পূর্ব শর্ত অর্জন করা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এরকম একটি সুদূর পরাহত ঘটনার জন্য কোনো উন্নয়নশীল দেশ অপেক্ষা করতে পারে না।

১৮.৩.১ পরিবারের আয়তন ও তাদের আয়ত্তাধীন জমির পরিমাণ

ভারতের গ্রামঞ্চলে দেখা যায় যে বৃহৎ জমির মালিকানা রয়েছে এমন পরিবারগুলি আয়তনে সাধারণত বড় হয়। এর একটা কারণ ভারতের সনাতন যৌথ পরিবার প্রথা। এছাড়াও বৃহদায়তন জোতগুলি চাষ করতে বেশি মজুরের প্রয়োজন হয় সে কারণে পরিবার বৃহৎ হলে শ্রমের যোগান সহজ হয়। সাধারণত এই ধরনের পরিবারগুলি জমির বিভাজন চায় না কারণ বৃহদায়তন জমির মালিকানা শুধু যে সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে তাই নয়, পরিবার থেকেই বড় সংখ্যার কৃষি-মজুরও পাওয়া যায়। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৃহৎ পরিবারের অর্থ হল বেশি লোকবল যা সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়ায়।

১৮.৪ জনসংখ্যা ও উন্নয়নের দ্বিমুখী সম্পর্ক

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যদিও একের ওপর অন্যের প্রভাব খুব বেশি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে তেমনই জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। এই অর্থে দুয়ের মধ্যে একটি পারস্পরিক আদান-প্রদানের অথবা দ্বিমুখী সম্পর্ক আছে। এই অভিমতটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং বিশ্ব জনসংখ্যা কর্ম পরিকল্পনা একে সমর্থন করেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাকে একীভূত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন উভয়কে পরস্পরের উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, বর্ধিত জনসংখ্যা উন্নয়নের সহায়ক অথবা প্রতিবন্ধকতা আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

১৮.৪.১ পরিমাণবাচক কোনও নির্দিষ্ট সম্পর্ক নয়

জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এরা পরস্পরকে প্রভাবিতও করে। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণগত সম্পর্ক নয়। যদিও এরা পরস্পরকে প্রভাবিত করে কিন্তু

দেশভেদে তার মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়। একাধিক কারণের উপর এই প্রভাবের পরিমাণ নির্ভরশীল যেমন, সাংস্কৃতিক, এমন কি ধর্মীয় যেমন পরিবার পরিকল্পনার ফলে নানারকম বিধি-নিষেধ ইত্যাদি। জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই দ্বিমুখী সম্পর্ক পশ্চিমি দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্বে জনসংখ্যার বিবর্তনগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

১৮.৫ জনসংখ্যাগত বিবর্তন

জনগোষ্ঠীর বিবর্তন জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কটিকে বিশ্লেষণ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন চলাকালীন এই সম্পর্ক প্রকাশ পায়। বর্তমান পশ্চিমি দেশগুলিতে দেখা গেছে যে উচ্চ জন্ম এবং মৃত্যু হারের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নীট হার শ্লথ হয়ে গেছে, এমন অবস্থা থেকে তাদের উত্তরণ ঘটেছে নিম্ন জন্ম ও মৃত্যু হারে। তারপর পুনরায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গেছে। জন্ম-মৃত্যু হারের এই পরিবর্তনকে জনসংখ্যার বিবর্তন আখ্যা দেওয়া হয়। একটি দেশ কীভাবে উচ্চ জন্ম ও মৃত্যু হার থেকে নিম্ন হারের দিকে অগ্রসর হয় সেই ইতিহাসই হল জনসংখ্যার বিবর্তন তত্ত্ব। অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে দেশ অগ্রসর হচ্ছে তাকেই এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়।

অবশ্য এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই পরিবর্তনের কারণগুলি খুবই অনিশ্চিত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জন্ম ও মৃত্যু হার হ্রাস এ দুয়ের মধ্যে কোনো নিরবচ্ছিন্ন বা পরিমাণগত সম্পর্ক নেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জনসংখ্যার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঐতিহাসিক প্রবণতা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শ্লথ রাখা এবং জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকলে তবেই এটা সম্ভব। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে কোনও দেশের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হল একটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। জনসংখ্যাগত বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে এবং এই ধাপগুলির বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হল।

১৮.৫.১ জনসংখ্যাগত বিবর্তনের তিনটি ধাপ

জনসংখ্যাগত বিবর্তন হল একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং তাকে সেই নিরিখে বিচার করতে হবে। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ককে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায় ঃ

(ক) প্রথম স্তরে বৈশিষ্ট্য হল উচ্চ জন্ম ও মৃত্যু হার এবং জনসংখ্যা সচরাচর অপরিবর্তিত থাকে। এই সমাজে অর্থনীতি হয় প্রাক্-শিল্পায়ন যুগের ও কৃষিনির্ভর এবং পরিচালন ব্যবস্থাও সাবেককালের। এরকম সমাজে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণ হল দীর্ঘকালব্যাপী অপুষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জীবনধারণের মানের শোচনীয় অবস্থা। উচ্চ জন্মহারের কারণ হল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা (যেমন নিরক্ষরতা, অপরিণত বয়সে বিবাহ, ধর্মীয় বিশ্বাস, পারিবারিক শ্রমের চাহিদা ইত্যাদি)। উচ্চ জন্ম এবং মৃত্যুহারের মধ্যে পার্থক্য এতই কম যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বার্ষিক এক শতাংশ বা আরও কম হারে হয়। কোনো কোনো পর্যায়ে এই বৃদ্ধির হার অনড় অবস্থায় থাকে। জনসংখ্যাগত বিবর্তনের প্রথম স্তরে দেশের অর্থনীতি হয় অনগ্রসর এবং মাথাপিছু আয়ের পরিমাণও থাকে কম। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে জনসংখ্যার এক বৃহদাংশের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটে না। এই কারণে সর্বব্যাপী দারিদ্র্য চোখে পড়ে।

(খ) জনসংখ্যাগত বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা হয়। ফলে অপুষ্টি দূর এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় মৃত্যু হার কমতে থাকে। যদিও জন্মহার বেশ বেশিই থাকে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নীট হার বৃদ্ধি পায় এবং এই বৃদ্ধি বেশ দ্রুত হারেই ঘটে। আমরা ভারতীয়রা এই দ্বিতীয় ধাপে রয়েছি।

(গ) জনসংখ্যাগত বিবর্তনের তৃতীয় স্তর দেশের অর্থনীতি যথেষ্ট উন্নত হয় এবং মৃত্যু হার যা ইতিপূর্বেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে তা আরও অল্প কিছুটা কমে যায়, অন্যদিকে জন্মহার খুব দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় কিছুটা বেশি থাকে। জন্ম ও মৃত্যুর এই নিম্নহার সুস্থিত হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যায়। এইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকায় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারও শ্লথ হয়ে যায়।
আশা করা যায় যে বর্তমানের উন্নয়নশীল দেশগুলি যদি তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাফল্য লাভ করে তাহলে বিবর্তনের এই ধাপগুলি অতিক্রম করবে।

১৮.৫.২ আজকের উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য

উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল আজকের যুগের উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে জনসংখ্যার স্বাধীন চরিত্র সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আজকের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় ঃ

(ক) উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এবং

(খ) মানব সম্পদকে কাজে লাগানোর উপযুক্ত সুযোগের অভাব।

জনসংখ্যার উচ্চহারে বৃদ্ধির কারণ হল উচ্চ জন্মহার এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির ফলে দ্রুত মৃত্যুহার কমে যাওয়া। বর্তমান যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। অন্যদিকে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মানবসম্পদকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা কিন্তু সীমাবদ্ধ। বর্তমানে প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সচরাচর পুঁজি নির্ভর ফলে অচিরে কর্মসংস্থানের খুব একটা সম্ভাবনা নেই যেহেতু জনসংখ্যার মোট পরিমাণ যথেষ্ট বৃহৎ অতএব খুব দ্রুত একটি জনসংখ্যাগত বিবর্তন (উচ্চ জন্মহার থেকে নিম্ন জন্মহার যার ফলশ্রুতি হল জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়া) ঘটে যাওয়া প্রয়োজন।

অনুশীলনী—২

১। নীচের বন্ধনীর মধ্যে থেকে উপযুক্ত শব্দ/শব্দাবলী চয়ন করে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন সব শক্তির উন্মেষ ঘটাবে যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার .... (কমাতে/বাড়াতে সাহায্য করবে।

(খ) একটি উন্নয়নশীল দেশে কোনও স্বাধীন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি হল .... (প্রয়োজনীয়/অপ্রয়োজনীয়) এবং .... (নিরর্থক/অর্থপূর্ণ)।

(গ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন সময় .... (নেয়/নেয় না) এবং একটি উন্নয়নশীল দেশ এরকম দূরাগত সম্ভাবনার জন্য অপেক্ষা করতে .... (পারে/পারে না)।

(ঘ) জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনসংখ্যার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্দেশ করা .... (সহজ/কঠিন) কাজ।

২। **নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি সত্য অথবা মিথ্যা নির্দেশ করুন ঃ**

(ক) জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি পারস্পরিক আদান প্রদানের অথবা উভয়মুখী সম্পর্ক আছে। ( )

(খ) বর্ধিত জনসংখ্যা উন্নয়নের সহায়ক অথবা প্রতিবন্ধকতা একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ( )

(গ) জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের সম্পর্কটি নির্দিষ্ট ও পরিমাণগত। ( )

(ঘ) জনসংখ্যার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঐতিহাসিক প্রবণতা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধীর লয়ে আবদ্ধ রাখা। ( )

৩। **দেড়শ শব্দের মধ্যে জনসংখ্যা বিবর্তনের তিনটি ধাপ ব্যাখ্যা করুন।**

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

৪। **পাঁচটি বাক্যে আজকের উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।**

....
....
....
....
....
....
....
....
....

১৮.৬ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া

ভারতে জনসংখ্যার ব্যাপক ও দ্রুত বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত কিছু সমস্যার উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। সমস্যাগুলি হল ঃ

(ক) বাড়তি জনসংখ্যার উন্নয়ন ও কর্মনিয়োগই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কাজে নিযুক্ত হতে চান। কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত না থাকলে এই কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। কিন্তু নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প মূলধন নিবিড় হওয়ার ফলে অর্থনীতিতে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এই ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে ইতিমধ্যেই নিযুক্ত মানুষকে কর্মচ্যুত করে। যার ফলে অর্ধবেকার ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এমনকি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শিক্ষিত ও উন্নত মানবিক সম্পদের বিরাট অপচয় হয়।

(খ) ভারতের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার বিশেষত্বের আর একটি কারণ হচ্ছে ভারতের জনসংখ্যার বড় অংশই হচ্ছে নিরক্ষর। ভারতে বিদ্যালয় যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের শিশুর সংখ্যা বিশাল। যদিও বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত শিশুর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি বিদ্যালয়ে একেবারেই না যাওয়া শিশুর সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে ভারতে নিরক্ষরের সংখ্য ক্রমশই প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানবিক সম্পদ অপচয়ের এও এক দৃষ্টান্ত।

(গ) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে পরিকাঠামোও বিপর্যস্ত হয়। এর কুফল সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়—যেমন, আবাসন, যানবাহন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, কর্মনিয়োগ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ অনুভূত হয়। জনস্ফীতির সবচেয়ে বড় কুফল দেখা যায় শহর এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রেই। ভারতে আমরা অত্যধিক নগরায়ণের অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছি বলা যায়, যার ফলে প্রায় সব শহরেই দেখা যায় অত্যধিক ঘন জনবসতি, বস্তি এলাকা এবং যেখানে অতি দূষিত অস্বাস্থ্যকর বসবাসের পরিবেশ, রাস্তায় রাস্তায় যানজট এবং হাসপাতালে রোগীর ভিড়। এ সমস্তই আমাদের শহরগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(ঘ) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ দেশের জমি ও নবীকরণযোগ্য অন্য প্রাকৃতিক সম্পদ, যথা জল, বনাঞ্চল ইত্যাদির উপরও তীব্র চাপ সৃষ্টি করে। এইসব সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বনাঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মরু অঞ্চলের সীমানা বাড়তে থাকে। এতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

(ঙ) জনসংখ্যা বাড়লেই দেশের উৎপাদন বাড়ে না। বরং জনসংখ্যা যখন দ্রুত বৃদ্ধি পায়, খাদ্য উৎপাদনের ব্যয়ও বাড়তে থাকে কারণ ক্রমশ নিকৃষ্ট জমি উৎপাদনের আওতায় আনা হয় এবং এগুলির জন্য সেচের ব্যবস্থা করাও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে।

(চ) জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির চাপে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বাড়লেও মাথাপিছু আয় সমানুপাতে বাড়ে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে মোট জাতীয় উৎপাদন বাৎসরিক শতকরা ৩.৬ হারে বাড়লেও মাথাপিছু আয় বেড়েছে শতকরা ১.৬ হারে। জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধিই এর প্রধান কারণ। উন্নত

এবং উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয়ের বিশাল পার্থক্যের কারণও হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ।

১৮.৬.১ বিকৃত বয়স-কাঠামো

জন্মহারের দ্রুত বৃদ্ধি এবং মৃত্যুহারের দ্রুত হ্রাস—এই দুই বিপরীত প্রবণতার ফলে দেশের জনসংখ্যার মধ্যে এক বিকৃত বয়স-কাঠামোর উদ্ভব ঘটে। এই ধরনের বিকৃতির ফলে দেশের কর্মরত জনগোষ্ঠীর উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়; কারণ তাদের উপরই দেশের শিশু ও বৃদ্ধেরা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেশের মোট জনসংখ্যাকে নিম্নলিখিত তিনটি বয়স-ভিত্তিক মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) বয়স ০ থেকে ১৪ বৎসর (শিশু হিসাবে গণ্য করা হয়),

(খ) বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বৎসর (কর্মরত জনগোষ্ঠী),

(গ) বয়স ৬৫ ও তদোর্ধ্ব (বয়স্ক জনগোষ্ঠী

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিশু ও বয়স্ক জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার কর্মরত অংশের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। শিশু ও কর্মরত জনসংখ্যার অনুপাত থেকে বোঝা যায় শিশু বা কিশোরদের কত অংশ কর্মরত মানুষদের উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে শিশু ও বয়স্ক জনসংখ্যার মোট যোগফল এবং কর্মরত জনসংখ্যার অনুপাত থেকে জানা যায় মোট জনসংখ্যার কী পরিমাণ অর্থনৈতিক বোঝা জনসংখ্যার কর্মরত অংশের উপর পড়ছে।

যে সব উন্নয়নশীল দেশে মৃত্যুহার বেশ দ্রুত হ্রাস পেয়েছে অথচ জন্মহার কমছে খুব ধীর গতিতে, সেখানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিশুদের অনুপাত অনেক বেশি হওয়ার প্রবণতা থাকে। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিশুদের অনুপাত ছিল শতকরা ৩৯.৫৪ ভাগ। জনসংখ্যার মধ্যে শিশুদের প্রাধান্য থাকার তাৎপর্য হল জন্মহার কমে যাওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান সুযোগের উপর জনসংখ্যার চাপ অব্যাহত গতিতে বাড়তেই থাকে অন্তত বেশ কিছু বছরের জন্য। অনুরূপ কারণে জন্মহার কমে যাওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যার মধ্যে সন্তানধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মহিলার অনুপাত বেড়ে চলে বেশ কয়েক বছর ধরে। এসবের নীট ফল হল জন্মহার কমে গেলেও মোট জনসংখ্যা বেশ দ্রুতহারেই বৃদ্ধি পায় কিছুকাল যাবৎ।

১৮.৬.২ বয়স-লিঙ্গের পিরামিড

যখন কোনো জনসংখ্যার বয়স কাঠামোকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে লিঙ্গানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয় তখন তাকে বয়সলিঙ্গের পিরামিড বলা হয়। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের বয়স-লিঙ্গের পিরামিডের ভিত্তি অতি প্রসারিত। কিন্তু ইংল্যান্ড বা ওয়েলশ-এর ক্ষেত্রে উক্ত চিত্রটি মোটামুটি উল্লম্ব আয়তক্ষেত্রের মতো। সুতরাং আমরা উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যার বয়স-কাঠামোয় প্রভূত পার্থক্য দেখতে পাই। উন্নত দেশে জন্ম এবং মৃত্যু দুই-এর হার খুব নিম্ন। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমার সময়ে জনসংখ্যার মধ্যে তরুণদের সংখ্যাধিক্য দেখা যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক

পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে উচ্চ মৃত্যুহারের মধ্যে শিশু মৃত্যুহারই বেশি ছিল। অন্যদিকে, মৃত্যুহার কমার প্রাথমিক কারণ হল শিশু মৃত্যুর হার কমা। সুতরাং, মৃত্যুহার দ্রুত কমার অর্থই হল মোট জনসংখ্যার তরুণদের সংখ্যা বৃদ্ধি। কিছু জনসংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, ১৯৭০ এর দশক থেকে ভারত জন্মহার হ্রাসের স্তরে প্রবেশ করেছে এবং ভবিষ্যতে ভারতের জনসংখ্যায় এত তারুণ্যের আধিক্য থাকবে না, এখন যেমন আছে। তবে সেটা কত তাড়াতাড়ি হবে সেটা এখনই কেউই বলতে পারে না।

১৮.৭ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের নীতি ঃ উন্নয়নের নীতির সঙ্গে সমন্বয়

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে ভারতের মতো দেশ যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে অন্যতম। সুতরাং একটি উপযুক্ত জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি সংযুক্ত করা আরও বেশি প্রয়োজনীয় কাজ। জনসংখ্যা নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হল জন্মহার কমানো। কিন্তু একই সঙ্গে জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করার সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে জন্মহারের সম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রভাব কি তাও বিবেচনা করতে হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন যে পরস্পরকে প্রভাবিত করে এ নিয়ে বর্তমানে কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই, একথা বলা বাহুল্য। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটি আরও গভীরভাবেই অনুধাবন করা প্রয়োজন যাতে সঠিক পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

১৮.৭.১ জন্মহারের উপর উন্নয়নের প্রভাব

জন্মহারের উপর উন্নয়নের প্রভাব নিয়ে নানারকম ব্যাখ্যা আছে। যেমন,

(ক) একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে পুরোপুরি অর্থনৈতিক। এই ব্যাখ্যা উন্নত দেশের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অভিজ্ঞতা অনুসারে বলা হয় যে, জন্মহারের উপর উন্নয়নের প্রভাব ঋণাত্মক। দেশের উন্নয়নের হার ও স্তর যত বৃদ্ধি পাবে, জন্মহার হ্রাস পাবে তত বেশি। এখানে অনুমান করা হয়ে থাকে যে উন্নত দেশে পিতামাতারা সন্তানকে একটি স্থায়ী ভোগ্য পণ্য হিসেবে গণ্য করেন। এই সমস্ত দেশে উন্নয়নের হার যত বাড়ে, সন্তানের পিতামাতারা সন্তান প্রতিপালনের আয় ও ব্যয়ের মাত্রা সম্পর্কের সচেতন থাকেন। এই ধরনের মনোভাব জন্মহার এবং পরিবারের আয়তনের উপর স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই মনোভাবের ফলেই উন্নত দেশে পরিবার বৃহৎ আকারের হয় না সন্তান-সন্ততিও কম হয়। উন্নয়নশীল দেশে অবস্থাটা ঠিক বিপরীত। জন্মহার ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে জন্মহার ও উন্নয়নের মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্ক প্রযোজ্য নয়।

(খ) জন্মহারের উপর উন্নয়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করার অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গিও আছে-তা হল সন্তান-সন্ততির প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা ও স্নেহ। সন্তান প্রতিপালনের কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা হচ্ছে পিতামাতার স্নেহ ও ভালোবাসা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে পরিবারের আয়তন কতটা হবে অর্থাৎ ছেলেমেয়ের সংখ্যা কত হবে তা স্থির করার সময় পিতামাতারা সন্তানের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখেন। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশে সন্তান প্রতিপালনের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার

ও তদনুপাতে প্রতিদান কত পাওয়া যায় এই ভাবনা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং পরিবারের আয়তন বড় হয়ে গেলে সন্তানদের ভবিষ্যৎ বৃত্তির জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যাবে না—এই চিন্তাই প্রধান হয়ে ওঠে। পরিবার বড় করার উৎসাহ এ কারণে পিতামাতারা হারিয়ে ফেলে।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, জনসংখ্যার বিবর্তনের প্রথম পর্বে শিশুরা পিতামাতার সামাজিক মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে; কারণ ঐ পর্বে পরিবারই ছিল উৎপাদনের একটি সংগঠন এবং কোনও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সে ভাবে গড়ে ওঠেনি। অর্থনীতি ও সমাজ যত সংগঠিত আকার নেয়, প্রত্যেক শিশুকেই তার পরিবারের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে নিজস্ব সামাজিক মর্যাদা অর্জন করতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পিতামাতারাও ক্রমশ সচেতন হয়ে ওঠেন যে, তাঁদের সন্তানদের সন্তোষজনক ও মর্যাদাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া তাঁদের কর্তব্য। তাঁরা চেষ্টা করেন যাতে সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা তাঁদের পূর্ব মর্যাদার থেকে কম না হয়। সুতরাং যেসব পিতামাতা এই প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন, তাঁরা সাধারণভাবে পরিবার ছোট রাখতে চান, কারণ উন্নয়নের সাথে সাথে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের বৃত্তি উপযোগী শিক্ষা দিতে চান।

১৮.৭.২ অর্থনৈতিক উন্নতি কি প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসের সবচেয়ে কার্যকরী উপায়

উপরিউক্ত দুটি ব্যাখ্যার সাহায্যে জন্মহারের উপর উন্নয়নের প্রভাব কী ভাবে কাজ করে তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু দুটি ব্যাখ্যা পরস্পর থেকে একেবারে আলাদা তাই আমরা এরকম সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হলে জন্মহার স্বাভাবিকভাবেই কমে যাবে। সুতরাং জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতি প্রণয়নের সময় উন্নয়নই হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর জন্মহার নিরোধক এই মত মেনে নেওয়া যায় না। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির সমস্যার সমাধান করতে হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রমের সঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনার সংযুক্তিকরণ একান্তভাবে প্রয়োজন।

অনুশীলনী - ৩

১। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কুফলগুলি কী? অন্তত পাঁচটি উল্লেখ করুন ঃ

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২। **বন্ধনীস্থিত শব্দ বা শব্দগুলির সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) উৎপাদন পদ্ধতি মূলধন-নিবিড় হওয়ার ফলে....................বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। (বেকারী/কর্মসংস্থান)

(খ) ভারতের অধিকাংশ মানুষই.......................(সাক্ষর/নিরক্ষর) সুতরাং স্কুলে যাওয়ার বয়সীদের সংখ্যার চাপ (সহনীয়/অসহনীয়)।

(গ) দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা লব্ধ পরিকাঠামো এবং সুযোগের...................(সদ্ব্যবহার/অপব্যবহার) করে।

(ঘ) ভারতে আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি, তা হল.......................(অতি নগরায়ণ/অব-নগরায়ণ)।

(ঙ) শিশু ওবয়স্করা কর্মনিযুক্ত লোকের উপর অর্থনৈতিকভাবে.......................(নির্ভরশীল/স্বাধীন)।

৩। **নীচে বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্য থেকে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির পাঁচটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করুন ঃ**

(ক) জনসংখ্যার মধ্যে কর্মহীনের অনুপাত বৃদ্ধি।

(খ) নির্ভরশীলতার অনুপাত হ্রাস।

(গ) খাদ্যশস্যের মাথাপিছু যোগান বৃদ্ধি।

(ঘ) মূলধন সৃষ্টির উচ্চ স্তর।

(ঙ) সমাজ-সেবামূলক কাজে অধিক ব্যয়।

(চ) বেকারী বৃদ্ধি।

(ছ) মাথাপিছু আয়ের হার বৃদ্ধি।

(জ) বিদ্যমান সেবামূলক কাজের উপর চাপ বৃদ্ধি।

(ঝ) সামাজিক উত্তেজনা বৃদ্ধি।

৪। **নীচের বাক্যে যে বক্তব্য বিবৃত হয়েছে তা সত্য না মিথ্যা লিখুন ঃ**

(ক) উচ্চ জন্মহার এবং হ্রাসমান মৃত্যু হারে ফলে একটি বিকৃত বয়স কাঠামোর উদ্ভব হয়। ( )

(খ) উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে পরিবারের আয়তন ছোট হয়। ( )

(গ) জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নশীল দেশের সমাজ জীবনের সর্বত্রই বিষময় ফল লক্ষ্য করা যায়। ( )

ঘ) উন্নয়নশীল দেশে জন্মহার কমলেও জনসংখ্যার মধ্যে শিশুদের শতকরা অনুপাত কমতে থাকে। ( )

৫। জন্মহার কমাতে হলে অর্থনেতিক উন্নয়নই কী সবচেয়ে কার্যকরী উপায়? (উত্তর একশ শব্দের মধ্যে)

....

....

....

....

....

....

....
....
....
....

১৮.৮ সারাংশ

প্রতিটি দেশেই জনসংখ্যার দীর্ঘকালীন প্রবণতা হচ্ছে ধীরগতিতে বেড়ে ওঠা। জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে ভারসাম্য হওয়ার ফলেই এটা ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের আধুনিক যুগের সূচনা হওয়ার আগে পর্যন্ত ছিল জনসংখ্যার পরিবর্তনের প্রথম পর্ব। এই পর্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল খুবই ধীরগতিসম্পন্ন। কারণ এই পর্বে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুটিই ছিল খুব বেশি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত হারে ঘটার ফলে উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আবার ধীরগতি হয়ে আসছে; কারণ এই পর্বে জন্ম ও মৃত্যুহার দুইই অনেক কমে গেছে। এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় জনসংখ্যার পরিবর্তনের তৃতীয় পর্বে। অবশ্য জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে যায় জনসংখ্যা পরিবর্তনের দ্বিতীয় পর্বে কারণ এই পর্বে জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার অনেক দ্রুতহারে হ্রাস পায়। এর ফলে এই পর্বে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়।

এখন যেসব দেশ উন্নত তারা উপরিউক্ত দ্বিতীয় পর্বের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সমস্যা অনেক সহজে সামলেছিল, কারণ জনবিস্ফোরণের মাত্রা ছিল কিছুটা মাঝারি ধরনের এবং সে সময়কার অবস্থাও ছিল অনেক অনুকূলে, যেমন সে সময় এমন অনেক দেশ ছিল যেগুলি ছিল বিরল জনবসতির দেশ। কিন্তু বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনস্ফীতির হার অনেক বেশি এবং যে অবস্থার মধ্যে তা ঘটছে তাও অনেক বেশি প্রতিকূল। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা সমাধান করা এ সমস্ত দেশের পক্ষে আরও দুরূহ হয়ে উঠছে। এ সমস্ত দেশে শিক্ষা, কর্মসংস্থান-এর সুযোগ বৃদ্ধি করা, নগরায়ণজনিত সমস্যা বা পরিবেশ নানাভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যা বিপুল আকারের।

উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে প্রধান সমস্যাই হল জন্মহার কমিয়ে আনা বিশেষ করে মৃত্যুহার যে হারে কমছে অন্তত ততটা দ্রুত বা তার চেয়ে বেশি দ্রুতহারে কমানো। এই কাজ করতে হলে জন্মহারের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব বা এ দুটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালোভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, আগে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, না হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত গতিতে ঘটবে না। অন্যদিকে অনেকের বিপরীত মত হচ্ছে এই যে, জন্মহার অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। এর অর্থ হচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজেই প্রথমে সর্ব শক্তি নিয়োগ করা উচিত, তাহলেই জন্মহার কমবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জন্মহারের মধ্যে সম্পর্কটি হচ্ছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক। একটি উন্নয়নশীল দেশের সামনে প্রকৃত রাস্তা হচ্ছে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই দুই বিষয়েই সংহত ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা।

১৮.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

বয়স-ভিত্তিক নির্ভরশীলতার অনুপাত ঃ মোট জনসংখ্যার মধ্যে যে অংশ অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল বলে

মনে করা হয় (অর্থাৎ যাঁরা ১৫ বছরের নীচে এবং ৬৪ বছরের বেশি) এবং যে অংশ অর্থনৈতিকভাবে কর্মনিযুক্ত (অর্থাৎ ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক যাঁরা) এই দুই অংশের অনুপাত।

বয়স-ভিত্তিক শ্রেণী (গ্রুপ) ঃ প্রতিটি দেশেই দেশের মোট জনসংখ্যাকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বয়স অনুসারে ভাগ করা হয় যেমন, ০ থেকে ১৪ এবং ১৫ থেকে ৬৪ বছর ইত্যাদি।

জনসংখ্যার বয়স-ভিত্তিক কাঠামো ঃ এর অর্থ বিভিন্ন বয়সভিত্তিক গ্রুপে জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ আছে। উন্নয়নশীল দেশে ১৫ বছর বয়সের চেয়ে কম শিশুদের সংখ্যা অনেক বেশি। অন্যদিকে উন্নত দেশে গড় আয়ু বেশি এবং জন্মহার কম হওয়ায় ৬৪ বছরের অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা অনেক বেশি।

জন্মহার ঃ কোনো বৎসরে মোট জনসংখ্যার অন্তর্গত প্রতি ১০০০ ব্যক্তি পিছু কত শিশু জন্মায় সেই হিসেব।

গাণিতিক হার ঃ বিভিন্ন সংখ্যার একটি সিরিজ যাতে পরপর দুটি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য একই পরিমাণের অর্থাৎ স্থির পার্থক্য যেমন ২, ৪, ৬, ৮, ১০...এই সিরিজটি গাণিতিক হারের বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত।

নির্ভরশীলতার অনুপাত ঃ জনসংখ্যার অনুৎপাদনশীল অংশ কতটা উৎপাদনশীল ও কর্মনিযুক্ত অংশের উপর নির্ভরশীল। যেমন উন্নয়নশীল দেশে ০-১৪ বছরের বয়সের গোষ্ঠীতে আনুপাতিক হারে বেশি সংখ্যায় শিশু থাকে, যা উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্তু তা সমাজের মোট ভোগ ও সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে বাধ্য করে।

মূলধন নিবিড় ঃ উৎপাদনের এমন পদ্ধতি যাতে শ্রমের অনুপাতে মূলধনের নিয়োগ অনেক বেশি।

মূলধন শ্রম অনুপাত ঃ অর্থনীতির সমগ্র ক্ষেত্র বা কোনো বিশেষ ক্ষেত্র বা শিল্পে নিযুক্ত মোট মূলধন ও শ্রমের অনুপাত।

মৃত্যুহার ঃ কোনো বৎসরে মোট জনসংখ্যার অন্তর্গত প্রতি ১০০০ ব্যক্তি পিছু কত জনের মৃত্যু হয় সেই হিসেব।

জনসংখ্যা-বিজ্ঞান (ডেমোগ্রাফি) ঃ জনসংখ্যা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। এতে জনসংখ্যার আয়তন, গঠন, বয়স ও গোষ্ঠীগত বিভাগ, ঘনত্ব, বৃদ্ধি বা হ্রাস এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং কী কারণে এইসব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটে তাও আলোচিত হয়।

স্থায়ী ভোগ্য-পণ্য ঃ যেসব ভোগ্যপণ্য বহু বছর ধরে ব্যবহার বা ভোগ করা যায়। যেমন গাড়ি, টেলিভিশন, আসবাবপত্র, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি।

জ্যামিতিক হার ঃ বিভিন্ন সংখ্যার এমন একটি সিরিজ যাতে পরপর দুটি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য একটি নির্দিষ্ট গুণিতক হারে বেড়ে যায়—যেমন ২,৪,৮,১৬,৩২ ইত্যাদি।

পরিকাঠামো ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি, শিল্প ইত্যাদি উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তি, বৃদ্ধির সহায়ক বিভিন্ন সেবা ও কাঠামোগত সুবিধা—যেমন, যানবাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুতের সরবরাহ, জল, সেতু, উড়ালপুল ইত্যাদি। সামাজিক পরিকাঠামো বলতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা বোঝানো হয়।

শ্রম-নিবিড় ঃ উৎপাদনের এমন পদ্ধতি যেখানে মূলধনের অনুপাতে শ্রমের নিয়োগ বেশি।

টমাস ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪) ঃ একজন ইংরেজ পাদ্রী ও অর্থনীতিবিদ। তাঁর বিখ্যাত জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি ও দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে একসময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব, যুদ্ধ ইত্যাদি শুরু হয় এবং বাড়তি জনসংখ্যা লোপ পায়।

পেশাগত কাঠামো ঃ জনসংখ্যার যে অংশ উৎপাদনের কাজকর্মে নিযুক্ততাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—কৃষি-উৎপাদনে নিযুক্ত (প্রাথমিক ক্ষেত্র), শিল্প-উৎপাদনে নিযুক্ত (মাধ্যমিক ক্ষেত্র) সেবামূলক কাজে নিযুক্ত (তৃতীয় ক্ষেত্র)। এই তিন মিলে হয় পেশাগত কাঠামো।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঃ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার অনেক বেশি হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে ব্যাপক প্রবণতা দেখা যায়, সে ঘটনাকেই জনবিস্ফোরণ বলা হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যুহারের পার্থক্য। এর সঙ্গে দেশে কোনো নির্দিষ্ট বৎসরে যে সংখ্যক মানুষ বাইরের দেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে তা যোগ করলে দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পাওয়া যায়। ভারতে মৃত্যুহার কমে গেলেও জন্মহার সে তুলনায় অনেক বেশি। ফলে ভারতে বার্ষিক শতকরা ২ বা তার থেকেও বেশি হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশ ঃ যেসব দেশে উন্নয়নের হার, সম্পদের ব্যবহারের মাত্রা এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান খুবই ধীর গতিতে বিকাশ লাভ করে সেগুলিকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। এক সময় এগুলিকে অনুন্নত দেশও বলা হত।

বেকার ঃ যাঁরা কাজ করতে ইচ্ছুক অথচ কর্ম-নিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের অর্থনৈতিকভাবে বেকার বলা হয়।

অর্ধ বেকার ঃ যখন কোনও ব্যক্তি কাজ করতে ইচ্ছুক হলেও বছরের পূর্ণ সময়ের জন্য কাজ পান না বা কাজ করে যা উপার্জন করেন তা তাঁর মৌলিক চাহিদা মেটানোর পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, তখন তাকে অর্ধ বেকার বলা হয়।

নগরায়ণ ঃ সাধারণভাবে নগরের সীমানা বিস্তৃত হয়ে যখন পার্শ্ববর্তী গ্রাম-অঞ্চলকেও শহরের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে, সে প্রক্রিয়াকে নগরায়ণ বলে। জনসংখ্যাতত্ত্বে নগরায়ণ বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে শহর বা নগরের সংখ্যার আনুপাতিক ও সামগ্রিক বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার বেশি অংশ যখন শহর বা নগরে কেন্দ্রীভূত হয়। নাগরিক সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম যখন শহরের সীমানা অতিক্রম করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনকেও স্পর্শ করে, তাও নগরায়ণের অঙ্গ।

১৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Cassen, R.H. (1979) : *India : Population, Economy, Society,* Chapter I (pp. 9-32), Chap. 4 (pp. 221-231, 245-250, 272-279), Delhi, Macmillan.

United Nations (1982) : *Population of India : Country Monograph Series No. 10* Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Chap. 5 (pp. 107-108), Chap. 8 (pp. 176-187).

১৮.১১ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

১। ‘ঘ’

২। ১৮.১ এবং ১৮.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন এবং উত্তর লিখুন।

৩। (ক) দ্রুত এবং কঠোর অথবা শ্লথ এবং উজ্জ্বল।
(খ) সম্মুখীন।
(গ) হয়েছে।
(ঘ) বুখারেস্ট।

৪। ১৮.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

৫। (ক) সত্য
(খ) সত্য
(গ) মিথ্যা
(ঘ) মিথ্যা

৬। ১৮.২.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন এবং উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী - ২

১। (ক) কমাতে।
(খ) অপ্রয়োজনীয়, নিরর্থক।
(গ) নেয়, পারে না।
(ঘ) কঠিন।

২। (ক) সত্য
(খ) সত্য
(গ) মিথ্যা
(ঘ) সত্য

৩। ১৮.৫ এবং ১৮.৫.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন এবং উত্তর লিখুন।

৪। ১৮.৫.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

অনুশীলনী - ৩

১। (ক) লব্ধ পরিকাঠামো এবং সুযোগের উপর চাপ।
(খ) চাকরীর সীমিত সুযোগ।
(গ) নির্ভরশীলতার অনুপাতের ক্রমবর্ধমান বোঝা।
(ঘ) জমি এবং অন্যান্য পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের উপর চাপ।
(ঙ) ন্যায় বণ্টনের ক্ষেত্রে অধিকতর মন্দ হওয়া।

২। (ক) কর্মসংস্থান

(খ) নিরক্ষর, অসহনীয়

(গ) অপব্যবহার

(ঘ) অতি নগরায়ণ

(ঙ) নির্ভরশীল

৩। (ক), (ঙ), (চ), (ছ) এবং (ঝ)

৪। (ক) সত্য

(খ) মিথ্যা

(গ) সত্য

(ঘ) মিথ্যা

৫) ১৮.৭.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন এবং উত্তর লিখুন।